শ্রীকৃষ্ণ প্রসঙ্গ
মহামহোপাধ্যায় শ্রী পীনাথ কবিরাজ
এম. এ., ডি. লিট, পদ্মবিভূষণ
It isn't cover
banglaboipdf.com

শ্রীকৃষ্ণ প্রসঙ্গ

মহামহোপাধ্যায় শ্রীগোপীনাথ কবিরাজ
এম. এ., ডি. লিট, পদ্মবিভুষণ

প্রাচী পাবলিকেশনস

যাঁহার প্রেরণায়
ভগবত্তত্ত্ব চিন্তার সহায় রূপে
শ্রীকৃষ্ণ প্রসঙ্গে
অবতরণ হইয়াছিল
আজ উহা সেই তপঃসিদ্ধ তীর্থস্বামী
মহাত্মা প্রেমানন্দজীর
পুণ্য স্মৃতি দিবসে
শ্রদ্ধাঞ্জলি স্বরূপ
তাঁহাকেই
উৎসর্গ
করা হইল

—গোপীনাথ

প্রথম প্রকাশের নিবেদন

ক্ষুদ্র খদ্যোতের জ্যোতিঃ বিমলকিরণ চন্দ্রের সিগ্ধপ্রভা প্রকাশ করিবার ব্যর্থ চেষ্টা করে। একান্ত নগণ্য আমিও বিশ্ববরেণ্য পণ্ডিত প্রবর মহামহোপাধ্যায় শ্রীমদাচার্য্য গোপীনাথ কবিরাজ মহোদয়ের শ্রীকৃষ্ণ প্রসঙ্গ পুস্তকখানির প্রকাশনের ভার পাইয়াছি।

বহুদিন পূর্ব্বে পরমারাধ্য ঠাকুর শ্রীশ্রীপ্রেমানন্দতীর্থ স্বামীজী মহারাজের সঙ্গে কাশীধাম লক্ষীকুণ্ডে একত্র বাস করিবার কালে তিনি অনেক সময় স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া আমাদের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব ও তাঁহার ঐতিহাসিক এবং পারমার্থিক স্বরূপ সম্বন্ধে নানাপ্রকার গভীর আলোচনা করিতেন। পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণের নানাপ্রকার শাস্ত্রীয় ব্যাখ্যান আদি শ্রবণ করিবার জন্য পরম পুজ্যপাদ কবিরাজ মহাশয়কে কখন কখন আহ্বান করিয়া লক্ষীকুণ্ডে নিয়া আসা হইত, কখনও বা শ্রীমৎ স্বামীজী মহারাজ স্বয়ং আমাদের সঙ্গে করিয়া শ্রদ্ধেয় কবিরাজ মহাশয়ের সিগরা ভবনেও যাইতেন। শ্রীমৎ স্বামীজী মহারাজের দিব্য অনুপ্রেরণাতেই শ্রীকৃষ্ণ প্রসঙ্গ লিখিত হইয়াছিল। ১৯৪৪ সনের কথা মনে পড়ে। শ্রীশ্রীস্বামীজী, মহারাজ এবং শ্রীমদাচার্য্য কবিরাজ মহাশয়ের সিগরা ভবনে কিংবা লক্ষ্মীকুণ্ড বাগানে যখনই মিলনের সুযোগ হইত তখন তাঁহাদের মধ্যে পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে নিজ নিজ প্রজ্ঞালব্ধ অনুভূতির এবং প্রেমভক্তিমূলক তত্ত্বকথার প্রবাহ চলিত। এইরূপে শ্রীকৃষ্ণ প্রসঙ্গের যে সূত্রপাত হয় তাহার বিশেষ বিবরণ পূজ্যপাদ কবিরাজ মহাশয় স্বয়ংই এই পুস্তকের প্রাক্ কথনে লিখিয়াছেন।

এই অনুলিখন কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া ইহা যে আমি সুসম্পন্ন করিতে পারিয়াছি তাহা একমাত্র উক্ত মহাপুরুষদ্বয়েরই অহেতুক কৃপা। তাঁহাদের পবিত্র চরণকমলে আমার অজস্র প্রণাম। পরিশেষে

বাৎসল্যরসে আপ্লুত হইয়া পিতৃপ্রতিম কবিরাজ মহাশয় তত্ত্ব জিজ্ঞাসু ভক্ত ও সুধী সমাজে শ্রীকৃষ্ণ প্রসঙ্গ প্রকাশনের ভার আমার মত অযোগ্য জনের উপর ন্যস্ত করিয়া আমাকে কৃতার্থ করিয়াছেন। তাঁহারই আশীর্ব্বাদপুষ্ট নবগঠিত শ্রীকৃষ্ণসঙ্ঘ এই শ্রীকৃষ্ণ প্রসঙ্গ প্রকাশনের গুরু ভার বহন করিয়া ধন্য হইয়াছে। অলমতি বিস্তরেণ।

২রা মে ১৯৬৭

শ্রীসদানন্দ ব্রহ্মচারী।

শ্রীকৃষ্ণসঙ্ঘ
পি ৪৮১ কেয়াতলা
কলিকাতা-২৯

শ্রীকৃষ্ণ সঙ্ঘ শাখা
ডি ৫২।৪৬ লক্ষী কুণ্ড
বারাণসী

দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশকের নিবেদন

ভারতবিশ্রুত মনিষী ও সাধক মহামহোপাধ্যায় ডঃ গোপীনাথ কবিরাজের পরিচয় বিদগ্ধ সমাজে নূতন করে দেবার মত কিছুই নাই। অবশেষে আমরা তাঁহার "শ্রীকৃষ্ণ প্রসঙ্গ" গ্রন্থ প্রকাশ করিতে পারায় আনন্দিত ও গর্ব্বিত। বহুদিন হয় এই পুস্তকখানি প্রথম প্রকাশের পর অপ্রকাশিত অবস্থায় ছিল। ভগবৎইচ্ছায় পুনরায় এই গ্রন্থ প্রকাশিত হইল। অধ্যাত্মপিপাসু অগনিত ভক্তগণ এই গ্রন্থের মাধ্যমে পরমপুরুষ শ্রীকৃষ্ণের তত্ত্ব প্রসঙ্গ অনুধাবন করিতে পারিলে আমাদের শ্রম সার্থক বলিয়া বিবেচিত হইবে। পূজার পূর্বেই পুস্তকখানি প্রকাশ করার কচ্ছা ছিল। আনুষঙ্গিক কিছু ঝামেলার জন্য পুস্তকখানি যথাসময় প্রকাশ করিতে না পারায় আমরা দুঃখিত।

আর্য্যশাস্ত্রপ্রদীপ চারখণ্ড। সাধুদর্শন ও সৎপ্রসঙ্গ (৫ম) খণ্ড ও বিশুদ্ধানন্দ প্রসঙ্গ পাঁচ খণ্ডের (১ম খণ্ড প্রকাশিত) কার্য্য খুবই দ্রুতলয়ে এগোচ্ছে। এই পুস্তকসমূহ শীঘ্রই প্রকাশ কবিতে পারিব বলিয়া আশা করি।

তৃতীয় পর্য্যায়ে যোগএয়ানন্দের "মানবতত্ত্ব" "পরলোকতত্ত্ব ও পরলোক" (৪ খণ্ড), শিবরাত্রি ও শিবপূজা"। আয়ুবেদাচার্য্য শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যঠাকুর মহাশয়ের "চিকিৎসাবিধানে তন্ত্রশাস্ত্র" (দু'খণ্ড) স্বামী সোমেশ্বরানন্দের "সপার্ষদ শ্রী রামকৃষ্ণ" (চিত্রে) ও 'শ্রীরামকৃষ্ণ মহাতীর্থ পরিক্রমা (সচিত্র) এই পুস্তকসমূহ প্রকাশের পর চতুর্থ পর্য্যায়ে মহামহোপাধ্যায় ডঃ গোপীনাথ কবিরাজের অন্যান্য পুস্তকা-সমূহ প্রকাশিত হইবে।

আমাদের প্রতিষ্ঠান এই বিরাটকার্য্যের ভার নিয়াছে, চলার পথে ত্রুটি বিচ্যুতি অসম্ভব নহে। সদস্য ও পাঠকবর্গের নিকট আমাদের সেজন্য অনুরোধ পূর্বের ন্যায় তাঁহারা যেন সর্ব্বদাই দোষ ত্রুটি দেখাইয়া আমাদের চলার পথের সঠিক নির্দেশ দেন। অলমতি বিস্তরেণ।

ইতি—প্রকাশক।

প্রাক্ কথন

বিশ বৎসরের কিছু অধিক সময় অতীত হইয়া গিয়াছে। আমি তখন কাশীর সিগারাস্থ নিজগৃহে কিছুদিনের জন্য গুরূপদিষ্ট কোন বিশিষ্ট সাধনকর্মে নিযুক্ত ছিলাম। ইহা মহানিশাকালে করিতে হইত। তখন পরম শ্রদ্ধের স্বামী ৺প্রেমানন্দজী মহারাজ কিছু দিনের জন্য কাশীধামে বিশ্রাম করিতেছিলেন। তিনি লক্ষ্মীকুণ্ডের উপর একটি ভক্তগৃহের বাগানে অবস্থান করিতেন। তিনি বাস্তবিকই একজন অসাধারণ মহাপুরুষ ছিলেন। ইহা তাঁহার ভক্তজন ব্যতীত অন্য লোকেও যাঁহারা তাঁহার সম্পর্কে আসিত—প্রত্যক্ষ অনুভব করিত। সৌভাগ্যবশতঃ উহার কিছুদিন পূর্ব হইতেই তাঁহার সহিত আমার বিশেষ পরিচয় ও ঘনিষ্ঠতা সংঘটিত হইয়াছিল। তিনি দয়া করিয়া কখনও কখনও আমার নিকট আসিতেন এবং আমিও কখনও কখনও তাঁহার নিকট যাইতাম। কি জানি কেন কোন অচিন্ত্য কারণসূত্রে তিনি আমাকে খুবই স্নেহ করিতেন। তাঁহার মধ্যে কখনও কোন সাম্প্রদায়িকতা বা সঙ্কীর্ণ ভাব দেখিতে পাই নাই। তবে যদিও সকল ভাব লইয়াই তিনি স্বচ্ছন্দে খেলা করিতে পারিতেন তথাপি তাঁহার নিজের অধ্যাত্ম জীবনে শ্রীকৃষ্ণ ভাবকেই বিশেষ রূপে নিজের আদর্শ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন।

প্রসঙ্গতঃ একদিন কিছু সময়ের জন্য তাঁহার অনুরোধে শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব বিষয়ে তাঁহার সঙ্গে আমার আলোচনা হয়। এই আলোচনার ফলে তাঁহার চিত্তে গভীর ও ব্যাপক জিজ্ঞাসার উদয় হয়, যাহার নিবৃত্তি একদিনের আলোচনাতে সম্ভবপর ছিল না। তিনি প্রস্তাব করেন যে আমার অসুবিধা না হইলে যথাসম্ভব প্রতিদিন তাঁহার নিত্য মননের জন্য কিছু কিছু শ্রীকৃষ্ণ প্রসঙ্গ আমি যেন লিখাইয়া দিই। আমি সানন্দে সম্মতি প্রকাশ করিবার পর তাঁহার নির্দ্দেশ অনুসারে তাঁহার প্রিয় সেবক ও ভক্ত শ্রীমান্ সদানন্দ ব্রহ্মচারী আমার নিকট প্রত্যহ আমি মহানিশা ক্রিয়ার উপবিষ্ট হইবার পূর্ব্বে রাত্রি নয়টা বা দশটার সময় উপস্থিত হইত। আমি তাহাকে কিছু কিছু প্রসঙ্গ লিখাইয়া দিতাম। সময়ের সুবিধা অনুসারে কোনদিন কম কোনদিন

কিছু অধিক সময় লেখার কার্য্য চলিত। অবশ্য কদাচিৎ কোনদিন প্রতিবন্ধক বশতঃ উহা সাময়িক ভাবে বন্ধও যে না থাকিত তাহা নহে।

সদানন্দ ধীর, স্থির ও সুলেখক। তা ছাড়া তাহার শ্রুতলিপি লিখিবার ক্ষমতা অসাধারণ ছিল। ইহাতে আমার খুব সুবিধাই হইয়াছিল। আমি একাসনে বসিয়া একাগ্র চিত্তে যাহাকিছু বলিয়া যাইতাম তাহা সে অবাধে অতিক্রুত লিখিয়া যাইত। প্রকরণ সমাপ্ত হইলে সে উহা পড়িয়া শুনাইত ; কোন স্থানে সংশোধন বা পরিবর্ত্তন আবশ্যক মনে হইলে তখন উহা করা হইত।

স্বামীজী প্রতিদিন উহা প্রাপ্ত হইয়াই একটি পৃথক খাতায় নিজ হস্তে উহার একটি প্রতিলিপি নিজের ব্যবহারের জন্য প্রস্তুত করিতেন। ঐ প্রতিলিপিটি তিনি নিয়মিত ভাবে শ্রদ্ধার সঙ্গে পাঠ করিতেন ও উহার উপর বিশেষ ভাবে মনন করিতেন। বস্তুতঃ এই প্রসঙ্গগুলি স্বামীজীর intensive studyর বিষয় ছিল। শ্রদ্ধেয় স্বামীজী তাঁহার নিজের খাতাটিকে তাঁহার সাধনার সঙ্গী বলিয়া মনে করিতেন এবং ইহা একটি গেরুয়া বসনে রঞ্জিত ঝোলাতে অতি যত্নের সহিত রক্ষা করিতেন। স্বামীজী এই খাতাগুলি কতবার ও কত চিন্তাশীলতার সহিত পাঠ করিতেন তাহা খাতাগুলিতে তাঁহার নানাপ্রকার রঙ্গিন পেনসিলের চিহ্ন দ্বারা ও marginal note সংকলন চেষ্টা হইতে প্রতীত হয়।

এই প্রসঙ্গের লেখাগুলির সময় ১৯৪৪ সনের অক্টোবর মাস হইতে ১৯৪৫ সালের আগষ্ট পর্য্যন্ত ধরা যাইতে পারে। ইহা ঐতিহাসিক অথবা সাংস্কৃতিক দৃষ্টিকোণ হইতে লিখিত হয় নাই। শ্রীকৃষ্ণকে তিনি 'স্বয়ং ভগবান' বলিয়া বিশ্বাস করিতেন এবং আমিও তাহাই করি। ইহাই শ্রীকৃষ্ণের পরমভাব। কিন্তু মানুষ দেহ ধারণ করিয়া তিনি কোন সময়ে ধরাতলে প্রকট হইয়াছিলেন—এই দিকটা ঐতিহাসিক আলোচনার বিষয়। কোন কোন বৈষ্ণব আগমগ্রন্থে আছে যে পুরুষোত্তমের তিন প্রকার লীলা—পরমার্থিক, প্রাতিভাসিক ও

ব্যাবহারিক। পারমার্থিক লীলাটি হয় নিরন্তর অক্ষরব্রহ্মের অভ্যন্তরে প্রাতিভাসিক লীলার ক্ষেত্র ভক্তের হৃদয়ে ও ব্যবহারিক লীলাটি হয় আমাদের এই ধরাধামে। তাঁহার এই পার্থিব লীলাটি ঐতিহাসিক আলোচনার বিষয়, কিন্তু মনে রাখিতে হইবে তিনটি লীলার মধ্যে পরস্পর সম্বন্ধও যে না আছে এরূপ নহে।

স্বয়ং ভগবানকে মনন করিবার বহু প্রণালী ও দিক্ আছে। প্রাচীন ও মধ্য যুগের ভাগবতগণ উহার পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে অতি সামান্য কয়েকটি সূত্র মাত্র অবলম্বন করা হইয়াছে এবং বুঝিবার জন্য বিভিন্ন দিক হইতে দৃষ্টিক্ষেপের চেষ্টা করা হইয়াছে।

এই প্রসঙ্গটি কোন বিশেষ বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের দৃষ্টিকোণ হইতে লিখিত না হইলেও কোন কোন বৈষ্ণব সাধক সম্প্রদায়ের ভাব যে ইহাতে না আছে তাহাও নহে। এমন কি অবৈষ্ণব দৃষ্টিকোণও ইহার একান্ত অপরিচিত নহে। যাঁহার ব্যক্তিগত মননের জন্য ইহা সঙ্কলিত হইয়াছিল তিনি কোন বিশেষ সম্প্রদায়ের অবলম্বী না হইলেও সকল সম্প্রদায়ের দৃষ্টিকোণকেই সমান শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে দেখিতেন। তাঁহার ভাবে ভাবিত হইয়াই আমাকে লিখিতে হইয়াছিল ইহা বলাই বাহুল্য।

এই প্রসঙ্গগুলি যখন লিখিত হয় তখন ইহা যে পরে প্রকাশিত হইবে এরূপ কল্পনা মোটেই ছিল না আমারও ছিল না এবং স্বামীজীরও ছিল না। স্বামীজী যতদিন দেহে বর্তমান ছিলেন ততদিন ঐ খাতাগুলি তাঁহার সাধনার নিত্যসাথীরূপে সঙ্গে সঙ্গে থাকিত। কিন্তু ১৯৫৯ সালে তাঁহার দেহাবসান হওয়ার পরে এগুলি তাঁহার ভক্তমণ্ডলী দ্বারা সাবধানতার সহিত রক্ষিত হইয়াছিল। কিন্তু রক্ষিত হইলেও ইহাদের ভবিষ্যত অনিশ্চিত মনে করিয়া স্বামীজীর পরমভক্ত ও আমার অপার স্নেহভাজন স্বর্গীয় ডক্টর শশিভূষণ দাসগুপ্ত এগুলি একদিন আমাকে প্রত্যার্পণ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। সময়ের স্থিতি অনুসারে কিছুদিন পরে আমিও উহা সঙ্গত বিবেচনা করি। তদনুসারে শ্রীমান্ সদানন্দ

ঐ খাতাগুলি সহ স্বামীজীর গেরুয়া ঝোলাটি আমাকে ফেরত দেন। সদানন্দের স্বহস্তে লিখিত খাতাও আমার নিকট ছিল। বৎসরাধিক কাল এগুলি আমার নিকট আসিয়াও পড়িয়াই ছিল।

এই প্রসঙ্গগুলি প্রকাশের জন্য এক এক সময় আমার ইচ্ছা হইত। মনে হইত রুচি বিশেষে কাহারও কাহারও এগুলি ভাল লাগিতে পারে কিন্তু ইচ্ছা হইলেও উহা দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত কার্য্যকরী হয় নাই। ইতিমধ্যে শ্রীমান্ সদানন্দ স্বামীজীর "যজ্ঞ" নামক গ্রন্থ প্রকাশের পর আমার নিকট ইচ্ছা প্রকাশ করে যে "শ্রীকৃষ্ণপ্রসঙ্গটি প্রকাশিত হইলে ভাল হয়, এবং ইহাও বলে যে সে নিজেই এই প্রকাশনের ভার নিবে, এবং উহা আমার সান্নিধ্যে কাশীতে মুদ্রিত হইবে। এই লেখাগুলি স্বামীজীর প্রিয় ছিল, সুতরাং তাঁহার ভক্তগণের নিকটও হয়ত এগুলি সাদরে গৃহীত হইবে। আমিও মনে করিলাম এতদিনের পরিশ্রমের ফল উপেক্ষিত ভাবে নষ্ট হওয়া অপেক্ষা প্রকাশিত হওয়াই যুক্তিসঙ্গত। তাই আমি এগুলি প্রকাশনের জন্য লিখিত না হইলেও প্রকাশণের অনুমতি দান করিয়াছি।

বলা বাহুল্য এই গ্রন্থ স্বতঃ পূর্ণ হইলেও এক হিসাবে অসম্পূর্ণ। কারণ কোন কোন বিষয়ের বিশদ আলোচনা পরে করা হইবে বলা সত্ত্বেও করিবার অবসর আসে নাই। এবং মনে হয় কোন কোন বিষয়ে কোন কোন স্থলে একটু পুনরুক্তিও হইয়া থাকিবে। অবশ্য ইহা বিষয়ের স্পষ্টীকরণের জন্য হইয়াছে বলিয়া ক্ষন্তব্য! মুদ্রকের অসাবধানতা বশতঃ এবং শারীরিক অসুস্থতাজনিত নিজের দুর্ব্বলতা নিবন্ধন যে সকল ত্রুটি রহিয়া গিয়াছে তাহার জন্য আমি দুঃখিত। পরিস্থিতি বিচার করিয়া পাঠকবর্গ আমাকে ক্ষমা করিবেন।

২।এ, সিগ্‌রা,
বারাণসী।
২৭।৪।১৯৬০

শ্রীগোপীনাথ কবিরাজ,

সূচীপত্র

———

(১)

অদ্বয়তত্ত্ব—ব্রহ্ম—পরমাত্মা ভগবান জীব জগৎ শক্তি

শ্রীকৃষ্ণ প্রসঙ্গ

পূর্ণভাবে শ্রীকৃষ্ণ-তত্ত্বের ব্যাখ্যা করা আমার পক্ষে অসম্ভব। কারণ একমাত্র রাধাভাবে উপনীত হইতে পারিলেই শ্রীকৃষ্ণ তত্ত্বের পরম স্বরূপটির স্ফুরণ সম্ভব হয়—তৎপূর্বে ঠিক ঠিক স্ফূর্ত্তি হয় না। যাহা হয় তাহাতে স্বভাবতঃই পরিচ্ছন্নতা দোষের স্পর্শ থাকে। শ্রীকৃষ্ণ-তত্ত্ব ভগবৎ-তত্ত্বের স্বরূপভূত হইয়াও তাহার অতীত একটি দিক্, যাহা উপলব্ধি করিতে না পারিলে ভগবৎ-তত্ত্বের পূর্ণ আস্বাদন লাভ করা যায় না। এই কথার সার্থকতা ক্রমশঃ আলোচনা প্রসঙ্গে স্পষ্ট হইবে। পূর্ণ সত্তাকে সর্বতত্ত্বের নির্য্যাস বলিলেও অত্যুক্তি হয় না এবং উহা তত্ত্বরূপে প্রকাশমান হইলেও নির্দিষ্ট কোন তত্ত্বরূপে পরিগণিত হইবার যোগ্য নহে—ইহাই বর্ত্তমান প্রসঙ্গে আলোচনার মুখ্য বিষয়।

এই পূর্ণ সত্তা অখণ্ড এবং অদ্বৈত; ইহার অনন্ত প্রকাশ আছে, অনন্ত প্রকার স্ফুরণ আছে—কলা আছে, অংশ আছে, অংশেরও অংশ আছে, অথচ এই সকল থাকা সত্ত্বেও ইহা নিষ্কল, নিরংশ, সমরস, নির্গুণ এবং নিষ্ক্রিয়। ইহাতে অনন্ত শক্তির নিত্য-সম্বন্ধ বিদ্যমান রহিয়াছে। এই সকল শক্তির সহিত পূর্ণ স্বরূপের যে সম্বন্ধ তাহাকে অভেদ বলিয়া ধরা যায়, আবার ভেদ ও অভেদ উভয়াত্মক বলিয়াও ধরা যায়। সুতরাং সম্বন্ধের ভিন্নতাবশতঃ তাঁহার অনন্ত শক্তি ভিন্নরূপে প্রতীত হয়। স্বরূপ এবং তাহার শক্তি যেখানে অভিন্ন সেখানে উভয়ের পরস্পর সম্বন্ধকে অভেদ সম্বন্ধ বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। এই প্রকার ভেদ সম্বন্ধ এবং ভেদাভেদ সম্বন্ধেও বুঝিতে হইবে। শক্তি বর্জন করিয়া স্বরূপকে চিনিবার চেষ্টা আকাশকুসুম চয়নের ন্যায় উপহাসাস্পদ। বস্তুতঃ, শক্তি ব্যতীত স্বরূপের সন্ধানই পাওয়া যায় না, পরিচয় তো দূরের কথা। শক্তির মাত্রা এবং বৈশিষ্ট্য অনুসারে

স্বরূপের বৈশিষ্ট্য নিরূপিত হয়। বস্তুতঃ স্বরূপের আস্বাদন এবং পরিজ্ঞান সবই শক্তির উপলব্ধির উপর নির্ভর করে। যে সকল শক্তির সহিত স্বরূপের ভেদ সম্বন্ধ, সে সকল শক্তিকে সাধারণতঃ জড় শক্তি বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। পক্ষান্তরে যে সকল শক্তি অভিন্ন-রূপে আশ্রিত রহিয়াছে তাহাদিগকে এক কথায় চিৎ-শক্তি বা চৈতন্য-শক্তি নাম দেওয়া যাইতে পারে। ভাবিয়া দেখিতে গেলে বুঝিতে পারা যাইবে যে স্বরূপের সহিত জড় শক্তির কোন বিরোধ নাই। যাহা কিছু বিরোধ প্রতীত হয় তাহা জড় শক্তির সহিত চৈতন্যশক্তির বিরোধ। কিন্তু চৈতন্যশক্তি স্বরূপের সহিত অভিন্ন ভাবাপন্ন বলিয়া চৈতন্য-শক্তির বিরোধকেই কেহ কেহ স্বরূপের বিরোধ মনে করিয়া থাকেন। বস্তুতঃ স্বরূপের সহিত যদি কোন শক্তির বিরোধই হইবে তাহা হইলে উহা ঐ শক্তির আশ্রিত কি প্রকারে হইতে পারে? বাস্তবিক পক্ষে স্বরূপ সর্ব্বশক্তির আশ্রয়। চৈতন্য-শক্তিও যেমন তাহাতে প্রতিষ্ঠিত, তদ্রূপ জড় শক্তিও তাহাতেই আশ্রিত। পরস্পর ভেদ ও ব্যাবৃত্তি চৈতন্যশক্তি এবং জড় শক্তিতে অবশ্যই রহিয়াছে। শক্তি ও শক্তিমানে কখনই কোন বিরোধ থাকে না। এই যে চৈতন্যশক্তির কথা বলা হইল ইহা স্বরূপশক্তি নামে পরিচিত এবং কেহ কেহ ইহাকে অন্তরঙ্গা শক্তিও বলিয়া থাকেন। এই শক্তিরই ব্যাপক প্রকাশের অন্তর্গতরূপে অনন্ত খণ্ড খণ্ড অংশ বিদ্যমান রহিয়াছে। এই সকল খণ্ড অংশ বস্তুতঃ শক্তিরই অংশ। তথাপি স্বরূপশক্তি স্বরূপ হইতে অভিন্ন বলিয়া ইহাকে স্বরূপের অংশ বলিয়াই পরিচয় দিতে হয়। এই অংশাংশিভাব থাকার দরুণ এই স্তরটিকে সাক্ষাদ্‌ভাবে অখণ্ড স্বরূপ শক্তির মণ্ডলের অন্তর্গত বলিয়া গ্রহণ করা চলে না। এই অংশগুলি স্বাংশ ও বিভিন্নাংশ ভেদে দুই প্রকার। ইহারা অণুরূপ, অর্থাৎ ইহাদিগকে চিৎ-পরমাণু বলিয়া পরিচয় দেওয়া চলে। এই ভিন্নাংশগুলি স্বরূপশক্তির ব্যাপক সত্তার যে প্রদেশে বিদ্যমান রহিয়াছে তাহা ঐ শক্তির অন্তরঙ্গ স্বরূপের বাহ্যভাগে অবস্থিত। এই প্রদেশটি

স্বরূপশক্তির অন্তর্গত হইলেও অখণ্ড নিরংশ শক্তিরাজ্যের বহির্ভূত এবং জড় রাজ্যেরও বহির্ভূত। এই প্রদেশটিব নাম তটস্থ প্রদেশ এবং এই পরমাণু-পুঞ্জই অনন্ত জীবকণা, যাহা চিৎ-শক্তির বাহ্যাংশকে আশ্রয় করিয়া বিদ্যমান রহিয়াছে।

চিৎ-শক্তি অত্যন্ত রহস্যময়ী। এই রহস্যের যথাশক্তি উদ্ঘাটন করিতে ক্রমশঃ একটু একটু চেষ্টা করা যাইবে। সম্প্রতি ইহা জানা আবশ্যক যে চিৎ-শক্তি দুইটি বিভিন্ন ধারাতে কার্য্য করিয়া থাকে। একটি ধারাতে তাহা অবিচ্ছিন্ন প্রবাহে প্রবাহিত হয়। ইহার মধ্যেও অনেক অবান্তর বৈচিত্র্য অছে, যাহা লীলা-রহস্যের আলোচনাকালে বুঝিতে পারা যাইবে। আর একটি ধারাতে ইহা বিন্দু বিন্দু ঝরিতে থাকে, অর্থাৎ ইহার ক্ষরণ হয়। এই যে ক্ষরণ ইহা অক্ষরের ক্ষরণ ইহা মনে রাখিতে হইবে। এই ক্ষরণশীল ধারাই স্বরূপের তটস্থ শক্তি। ইহার আত্যন্তিক পৃথক্ সত্তা নাই। অবশ্য আত্যন্তিক অভেদ সত্তাও নাই—ইহাও সত্য। অগ্নি হইতে যেমন স্ফুলিঙ্গ নির্গত হয় তদ্রূপ এই মূল অক্ষর সত্তা হইতে কণারূপে ক্ষরণশীল অক্ষরগুলি নির্গত হইতেছে। সৃষ্টির আদি ক্ষণে স্পন্দনে যে বহির্মুখ ভাব উদিত হয় তাহারই প্রভাবে এই অক্ষরকণার নির্গম নিষ্পন্ন হইয়া থাকে। সাধারণতঃ আমরা এই কণাগুলিকেই জীবকণা বা জীবাণু বলিয়া গ্রহণ করিয়া থাকি।

এই যে জীবকণার কথা বলা হইল ইহা চিৎকণা। জীবের স্বরূপ এবং উদ্ভব বুঝিতে হইলে এই প্রসঙ্গে আরও কয়েকটি কথা মনে রাখিতে হইবে। পূর্ণ স্বরূপের সহিত পূর্ণরূপা অন্তরঙ্গা শক্তি বা চৈতন্যশক্তি বস্তুতঃ সমরস ভাবে ব্যাপ্ত থাকিলেও বহিঃপ্রকাশের দিক্ দিয়া ঐ ব্যাপ্তিতে যে একটি স্বগত ন্যূনাধিক ভাব রহিয়াছে তাহা বলিতেই হইবে। পূর্ণ স্বরূপটিকে যদি সচ্চিদানন্দ বলিয়া ধরা যায় এবং উহা নিরংশ হইলেও যদি উহাতে উহার অচিন্ত্য প্রভাববশতঃ সৎ চিৎ ও আনন্দ এই তিনটি অংশ স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে বুঝিবার

সুবিধার জন্য বলিতে পারা যায় যে ঐ অন্তরঙ্গা শক্তিও স্বীয় অখণ্ডতা সত্ত্বেও তিন অংশে আপেক্ষিক ব্যাপ্তিবিশিষ্ট। অর্থাৎ উহার সদংশের অন্তরঙ্গা শক্তি সর্বাপেক্ষা অধিক ব্যাপক, চিদংশের অন্তরঙ্গা শক্তির ব্যাপ্তি অপেক্ষাকৃত অল্প এবং আনন্দাংশের ব্যাপ্তি আরও কম। সঙ্গে সঙ্গে ইহাও মনে রাখিতে হইবে যেখানে ব্যাপ্তি কম সেখানে গভীরতা অধিক। এই দৃষ্টিকোণ হইতে দেখিতে গেলে আনন্দাংশের শক্তি মণ্ডলের বিন্দুরূপে, চিদংশের শক্তি মণ্ডলের বিন্দু হইতে পরিধি পর্য্যন্ত রেখারূপে এবং সদংশের শক্তি মণ্ডলের পরিধিরূপে পরিগণিত হইতে পারে। মায়া বা জড় শক্তি অন্তরঙ্গা শক্তির সদংশের দ্বারা ব্যাপ্ত। এইজন্যই মায়িক জগতের সর্ব্বত্রই পূর্ণ স্বরূপের সত্তাংশ প্রতিফলিত রূপে দেখিতে পাওয়া যায়। তটস্থ বা জীব-শক্তি অন্তরঙ্গা শক্তির চিদংশ দ্বারা ব্যাপ্ত। অখণ্ড স্বরূপশক্তি নিজ স্বরূপের আনন্দাংশের দ্বারা পরিব্যাপ্ত। মায়া-শক্তির বৈভব, তটস্থ শক্তির বৈভব এবং অন্তরঙ্গা শক্তির বৈভব সর্ব্বত্রই অন্তরঙ্গা শক্তির অস্তিত্ব বিদ্যমান থাকিয়া উহাকে কার্য্যোন্মুখ করিতেছে। মায়াতে এবং মায়িক জগতে শুধু সদংশ কার্য্য করে। জীব-জগতে সদংশ সহিত চিদংশ কার্য্য করে এবং আনন্দময় ভগবদ্ধামে সচ্চিৎ-অংশের সহিত আনন্দাংশ কার্য্য করে। অথচ সকল অংশই সর্ব্বাত্মক বলিয়া প্রত্যেক অংশেই অপরাংশের অনুপ্রবেশ না থাকিয়া পারে না।

পূর্ব্বে যে জীবরূপী অণুর কথা বলা হইয়াছে তাহা চিদাত্মক হইলেও অখণ্ড চিৎ-শক্তি হইতে পৃথক্-রূপে প্রতিভাসমান হয়। কিন্তু সৃষ্টির আদিতে স্ফুরণের অভাববশতঃ পৃথক্-রূপে ভাসমানতা থাকে না। মহা ইচ্ছা বা স্বাতন্ত্র্যের উন্মেষে যখন সৃষ্টির সূচনা হয় তখন ঐ সকল অন্তর্লীন পরমাণুপুঞ্জ চৈতন্যের তলদেশ হইতে বহির্ম্মুখে ঊর্দ্ধে উত্থিত হয়। উত্থিত হইলেই উহাদিগের মধ্যে একটি বেগের সঞ্চার হয়। এই বেগের প্রভাবে পরমাণু সকলের মধ্যে যাহার যে প্রকার প্রকৃতি সে তদভিমুখে আকৃষ্ট হয় ও বাকী পরমাণুপুঞ্জ অনাদিকালের

ঘোর সুষুপ্তিতে পূর্ব্ববৎ মগ্ন থাকে। জাগ্রত পরমাণুর মধ্যে যেগুলির প্রকৃতি অন্তর্মুখ সেগুলি পরমতত্ত্বের নিত্য বৈভবে অর্থাৎ চিদানন্দময় রাজ্যে প্রবিষ্ট হইয়া নিত্য আনন্দময় লীলায় স্বীয় স্বভাবের অনুরূপ-ভাবে যোগদান করে। পক্ষান্তরে যেগুলির প্রকৃতি বহির্মুখ তাহারা আত্মবিস্মৃত হইয়া বাহ্য শক্তিরূপা মায়ার আকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়া মায়াগর্ভে প্রবেশ করে। এই সকল জীবের প্রকৃতি বহির্মুখ বলিয়া উল্লেখ করা হইল, কিন্তু ইহাদের মধ্যে কাহারও কাহারও অন্তঃ প্রকৃতি আচ্ছন্ন এবং বহিঃপ্রকৃতি বহিরুন্মুখ, আবার কাহারও অন্তর্মুখ প্রকৃতি এত গভীর সুষুপ্তিতে মগ্ন যে তাহার অস্তিত্বেরও সন্ধান পাওয়া যায় না। শুধু তাহার বহিঃপ্রকৃতি জাগ্রত হইয়া সৃষ্টিদশায় তাহাকে বহির্মুখে প্রেরণ করে। মোটের উপর জীবতত্ত্ব অত্যন্ত জটিল! জীবস্বরূপ চিদাত্মক, শুধু এইটুকু জানিলেই জীব সম্বন্ধে তাত্ত্বিক জ্ঞান হয় না, বিশেষ জ্ঞান আবশ্যক।

যে সকল জীব সৃষ্টির আদিতে উদ্বুদ্ধ হয় না তাহাদের প্রকৃতি সম্বন্ধে কোন বিচার করিবার আবশ্যকতা নাই, কারণ অব্যক্তাবস্থায় প্রকৃতির বিচার করা চলে না। কিন্তু যে সকল জীব প্রবুদ্ধ হয় তাহারা কোনও না কোন প্রকৃতি নিয়াই প্রবুদ্ধ হয়, এইজন্য তাহাদের প্রকৃতি বিষয়ক আলোচনা আবশ্যক। আদিম উন্মেষের সময় জীব জাগিয়া উঠিয়া স্বীয় প্রকৃতির প্রেরণায় যখন আনন্দ শক্তির দিকে অথবা সৎ-শক্তির দিকে ধাবিত হয় তখন হইতেই তাহার জীবনের সূচনা। সুষুপ্তাবস্থায় জীবের নিত্যসিদ্ধ আত্মজ্ঞান আচ্ছন্ন থাকে। জীব চিদণু বলিয়া কখনই চিৎ-শক্তি হইতে পৃথক্‌কৃত হয় না বটে, কিন্তু অব্যক্তা-বস্থায় চিৎ-শক্তির কোন ক্রিয়া থাকে না বটে, কিন্তু অব্যক্তাবস্থায় চিৎ-শক্তির কোন ক্রিয়া থাকে না। ইহাই জীবের আত্মচৈতন্যের আচ্ছন্নতা। 'আমি আছি' এই মৌলিক বোধটুকুও তখন তাহার থাকে না অর্থাৎ আবৃত থাকে। কিন্তু জাগিবার সঙ্গে সঙ্গেই সর্ব-প্রথমে স্বীয় সত্তাবোধ উদ্রিক্ত হইয়া উঠে। তখন দৃক্‌শক্তির স্ফুরণ হয়

এবং স্বীয় প্রকৃতি অনুসারে ঐ দৃক্‌শক্তির ক্রিয়ার দিক্ নিরূপিত হয়। ইহার ফলে কেহ কেহ যেমন আনন্দময়ী জ্যোতিঃস্বরূপা শক্তির গর্ভে প্রবেশ করে, কেহ কেহ তেমনি আনন্দহীন অমারূপা জড় শক্তির গর্ভে প্রবেশ করে। কিন্তু এমনও জীব আছে যাহার প্রকৃতিতে এই উভয় দিকের আকর্ষণ সমরূপে আছে বলিয়া জাগ্রত অবস্থায় যে কোন দিকে আকৃষ্ট না হইয়া মধ্যে অবস্থান করে। বলা বাহুল্য, ইহা সুষুপ্ত অবস্থা নহে। এই যে মধ্যাবস্থা বলা হইল জাগ্রৎ জীব ইহাতে অবস্থিত হইয়া নিজের নবোন্মেষিত আমিত্ববোধকে এই ব্যাপক নিষ্কল চিন্ময় মধ্যে সত্তার সহিত অভিন্ন বোধ করে। চিন্ময় স্বরূপানুভূতি মধ্যাবস্থার অনুভূতি।

এই যে প্রকৃতিগত বৈচিত্র্যের কথা বলা হইল ইহার অবান্তর ভেদ এত অধিক যে বলিতে গেলে তত্ত্বদৃষ্টিতে শ্রেণীবিভাগ সম্ভবপর হইলেও অতি কঠিন—প্রত্যেক জীবেরই এমন একটি বৈশিষ্ট্য আছে যাহা শুধু তাহারই সম্পত্তি এবং যাহা অন্য জীবে থাকিতে পারে না। এই বৈশিষ্ট্যের মূল কোথায় জানিতে চেষ্টা করিলে বুঝিতে পারা যাইবে যে পূর্ণ স্বরূপের অন্তরঙ্গা শক্তির আনন্দাংশের স্বগত বৈচিত্র্যই ইহার মূল। যদিও জীব চিদণু তাহাতে সন্দেহ নাই এবং চিৎ-শক্তিতে কোন প্রকার বৈচিত্র্য থাকিতে পারে না ইহাও সত্য, তথাপি মনে রাখিতে হইবে যে চিদংশের অন্তরঙ্গা শক্তির সঙ্গে ওতপ্রোত ভাবে আনন্দাংশের অন্তরঙ্গা শক্তি জড়িত রহিয়াছে। আনন্দাংশের শক্তিতে বৈচিত্র্য থাকিবার দরুণ চিদংশে বৈচিত্র্য না থাকিলেও উহাতে ঐ বৈচিত্র্যের একটা ছাপ লাগিয়া যায়। ইহা অত্যন্ত গুপ্তভাবে জীবের স্বরূপে নিহিত থাকে। জীব নিজে ইহার সন্ধান জানে না এবং তাহা জানিবারও কোন উপায় নাই। মায়ারাজ্যে জীব যতদিন পরিভ্রমণ করে ততদিন সে ইহা জানিতে পারে না। মায়ামুক্ত হইয়া আত্ম-স্বরূপজ্ঞান লাভ করিলেও (ব্রহ্মের সহিত বিবিক্ত ভাবেই হউক বা অবিবিক্ত ভাবেই হউক) ইহা জানিতে পারে না। একমাত্র সাধু

গুরুর কৃপায় ভগবদনুগ্রহে জীব যখন ভগবদ্-রাজ্যে প্রবেশের অধিকার পায় তখন তাহার এই গুপ্ত প্রকৃতি না জাগিয়া উঠে। এই প্রকৃতি জাগিলে নিত্য লীলায় প্রবেশই হইতে পারে না।

স্বরূপ শক্তির আনন্দাংশগত বৈচিত্র্যই মূল প্রকৃতিগত বৈচিত্র্য। চিদণুতে এই বৈচিত্র্য প্রতিফলিত হয়। এই বৈচিত্র্য এমনই অদ্ভুত যে ইহার অচিন্ত্য প্রভাব বশতঃ সর্ব্বত্র অনুস্যূত অবিচ্ছিন্ন অদ্বৈত সত্তা যেন ঢাকা পড়িয়া যায়। এই বৈচিত্র্যবশতঃ আনন্দগত দুইটি অংশ ঠিক এক প্রকার হয় না - এবং হইতেও পারে না। এই বৈশিষ্ট্য চিদংশে প্রতিবিম্বিত হইলে ইহা চিৎ এর অব্যক্ত ধর্মরূপে বর্ত্তমান থাকে। চিদণু যেমন অনন্ত তেমনি এই আনন্দাংশগুলিও অনন্ত। এক একটি চিদণুতে এক একটি অংশ ধর্মরূপে নিহিত রহিয়াছে। এই আনন্দ ভক্তি, প্রীতি বা রাগেরই নামান্তর। ইহার বিশেষ আলোচনা পরে করা হইবে। সুতরাং প্রত্যেকটি জীব-অণুতেই একটি বিশিষ্ট রকমের প্রীতির ভাব উহার স্বধর্ম্মরূপে নিত্য নিহিত রহিয়াছে। ইহাই উহার প্রকৃতি বা স্বভাব। যতদিন এই স্বভাবের উন্মেষ ও ক্রিয়া না হইবে ততদিন জীবের পরমানন্দ লাভ ঘটিবে না।

এইখানে আর একটি বিষয় লক্ষ্য রাখিতে হইবে। অণুস্বরূপ জীব নিদ্রাভঙ্গের পর হয় অন্তর্মুখে অথবা বহির্মুখে অথবা উভয় শক্তির সাম্যময় মধ্যভূমিতে অবস্থান করে। অন্তর্মুখ ও বহির্মুখ অবস্থিতির স্থলে যে গতি রহিয়াছে তাহা স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায়। নিত্যধাম আনন্দময়ী স্বরূপশক্তির রাজ্য, কালের অতীত। ভগবানের পরিকররূপে মহাকাল সেখানে কালের ক্রিয়া করিয়া থাকেন। কারণ সেখানে একমাত্র বর্ত্তমান ভিন্ন অন্যকাল নাই। অথচ লীলা-প্রসঙ্গে অতীত ও অনাগতেরও আভাস জাগিয়া উঠে। যে সকল অণু জাগিবার সঙ্গে সঙ্গেই নিত্যধামে প্রবেশ করে তাহারা নিত্য লীলার অন্তঃপাতী হইয়া স্বভাবের খেলা খেলিতে থাকে। কিন্তু যাহারা জাগিবার সঙ্গে সঙ্গেই জড়শক্তি মায়ার আকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়া বহির্মুখে

ধাবিত হয় এবং মায়া গর্ভে প্রবেশ করে, তাহারা কালশক্তির অধীন হইয়া পড়ে। তাহাদের সমগ্র সাংসারিক জীবনের ধারাটাই কাল শক্তির অধীন হইয়া চলিবার ধারা,কিন্তু যে সকল জীব জাগিয়া উঠিলে কোন প্রকার গতি লাভ করে না, বেগের অভাববশতঃ নিত্য কিংবা অনিত্য কোনও রাজ্যেই যাহাদের প্রবেশ হয় না, যাহাদের মধ্যে ভূমিতে বিরাট চৈতন্যস্বরূপে এক প্রকার অভেদজ্ঞানে স্থিতি লাভ হয় তাহারা নিষ্ক্রিয় নিরাকার নির্বিশেষ স্ব-স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত থাকে। যতদিন এই অবস্থা হইতে অন্তরঙ্গা শক্তির বিশেষ প্রেরণা দ্বারা তাহারা উত্থিত হইতে এবং উত্থিত হইয়া ভগবানের পরম ধামে প্রবেশ করিতে না পারিবে ততদিন তাহাদের পক্ষে ইহাই পরম স্থিতি। মধ্য ভূমিতে কোন বৈচিত্র্য নাই। তাই ঐ ভূমি প্রশান্ত আনন্দরূপে প্রতিষ্ঠিত থাকিলেও উহাতে রসের হিল্লোল খেলে না। চিন্ময়ধামে এবং জড় জগতে উভয়েই বৈচিত্র্য সমরূপে বিদ্যমান—উভয়ত্রই আকৃতি এবং প্রকৃতি-গত অনন্ত প্রকার বৈশিষ্ট্য যথাক্রমে লীলা ও ক্রিয়া শক্তির বেগে উচ্ছলিত হইয়া উঠিতেছে। ভেদ শুধু এই—নিত্যধাম লীলায় স্ফূর্ত্তি হয়, সেখানে আনন্দের সঙ্গে দুঃখের মিশ্রণ থাকে না, রোগ শোক জরা মৃত্যু ক্ষুধা পিপাসা পাপ ও মলিনতা সেখান হইতে চিরতরে অস্তমিত। কুণ্ঠারহিত বলিয়া তাহা নিত্যই উজ্জ্বল—বিকুণ্ঠ বা বৈকুণ্ঠ রূপে প্রকাশমান থাকে। বিকার এবং অপূর্ণতা সেখানে অনুভূত হয় না। কিন্তু অনিত্য রাজ্য ঠিক তাহার বিপরীত—ইহা রোগ শোক জরা মৃত্যু পাপ ও মলিনতার আধার স্বরূপ। এখানে শুদ্ধ আনন্দের প্রকাশ নাই, যাহা আছে তাহা কর্মফলরূপে সুখ-দুঃখের খেলা। নিত্যধাম জ্ঞানালোকে আলোকিত, অনিত্য রাজ্য আদি হইতে অন্ত পর্যন্ত অজ্ঞানের অধীন।

পূর্বেই বলা হইয়াছে আনন্দ জীবের স্বভাব সিদ্ধ ধর্ম। তাই মায়া বা কালের রাজ্যে আসিয়াও জীব হারানিধির ন্যায় নিরন্তর এই আনন্দেরই অন্বেষণ করিতে থাকে। অন্বেষণ করে আনন্দের, কিন্তু

পায় দুঃখ, কারণ অবিদ্যার প্রভাবে আত্মবিস্মৃত জীব বিপরীত গতি-বিশিষ্ট হইয়াই ধাবিত হয়। ভগবানের প্রতি বৈমুখ্যই আত্মবিস্মৃতির কারণ এবং আত্মবিস্মৃতিই মায়ারাজ্যে পতনের হেতু। বস্তুতঃ জীবের আত্মস্মৃতি অক্ষুণ্ণ থাকিলে মায়ার এমন কোন সামর্থ নাই যে সে তাহাকে টানিয়া নিজের দিকে আনিতে পারে। জীব আনন্দের অন্বেষণে মায়ার হাটে আসিয়া পড়িয়াছে। এখানে ছায়া ভিন্ন কায়া প্রাপ্তির আশা নাই। তাই যাহাকে সে আনন্দ বলিয়া অথবা আনন্দের উপায় বলিয়া ধারণা করে তাহাই কার্য্যকালে তাহাকে ছলনা করে। সংসারের প্রতিবস্তুই এইভাবে জীবকে প্রতারণা করিতেছে। তাই সে মায়া মরীচিকা গন্ধর্ব নগর স্বপ্নরাজ্য প্রভৃতি বলিয়া সংসারের প্রতি বিতৃষ্ণা প্রকাশ করিয়া থাকে। কিন্তু বস্তুতঃ ইহা তাহার ভুল। সে প্রথমেই আত্মাকে বিস্মৃত হইয়াই সংসারে আসিয়াছে, এখন সংসারকে দোষ দিলে চলিবে কেন? আনন্দের যাহা মূলস্থান, দিব্য জ্ঞানের যাহা একমাত্র উৎস, নিত্যধামের যাহা কেন্দ্ররূপ, তাহার দিকে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করিলে এইরূপই হইয়া থাকে। ইহাই মায়াকৃত জীবের দণ্ড।

বাস্তবিক পক্ষে সংসারে দুঃখ ভোগ করাও জীবের পক্ষে অমঙ্গল নহে। কারণ এই দুঃখ ভোগের অভিজ্ঞতা হইতেই সে নিত্যধামে যাইয়া নিজের প্রকৃতিগত আনন্দকে চিনিয়া লইতে পারে। দুঃখের সহিত পরিচিত না হইলে আনন্দের সমুদ্রে অবগাহন করিয়াও আনন্দের আস্বাদন পাওয়া যায় না।

নিত্যধাম হইতে অনিত্য জগতে জীবের অবতরণ হয়। আবার অনিত্য জগৎ হইতে নিত্যধামে জীবের উদ্ধার হয়। ব্রহ্মচক্রের অচিন্ত্য আবর্তনের মহিমায় সবই হইতে পারে এবং হইয়া থাকে। নিত্যধাম হইতে যে অবতরণ হয় তাহা স্থূলতঃ দুই প্রকার—

১। নিত্যধামের পরমানন্দের সন্ধান দুঃখমগ্ন অনিত্য জগৎকে দিবার জন্য। এই সন্ধান অনিত্য জগৎ হইতে পাওয়ার উপায় নাই,

অথচ এই সন্ধান না পাইলে অনিত্য জগতের জীব কিসের আকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়া নিত্য রাজ্যে যাইবার চেষ্টা করিবে ? যাঁহাদের এই প্রকার অবতরণ হয় তাঁহারা ভগবানের (অর্থাৎ পরমাত্মার) ভিন্নাংশ জীব বলিয়াই এখানে ধরিয়া লইলাম। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে তাঁহার অভিন্নাংশেরও অবতরণ হইয়া থাকে। ইহার আলোচনা যথাস্থানে করা যাইবে।

২। জাগতিক ক্ষোভ অথবা বিপ্লব অত্যন্ত তীব্র হইলে শুধু ঐ সাময়িক উপদ্রবের উপশমের জন্য কখনও কখনও নিত্যধাম হইতে অনুরূপ শক্তি অর্থাৎ ঐ কার্য্য সম্পাদনে সমর্থ শক্তি অবতীর্ণ হইয়া থাকে। মায়াচ্ছন্ন জীবের মধ্যে পরস্পর সংঘর্ষ হইলে যখন জাগতিক সত্তা সংঘর্ষ নিবারণে সমর্থ হয় না তখন সাম্য সংস্থাপনের জন্য নিত্যধাম হইতে শক্তির অবতরণ হইয়া থাকে। এখানে আপাততঃ আমরা ঐ শক্তিকে জীব বলিয়াই ধরিয়া লইলাম, কিন্তু উহা ভগবানের স্বাংশেও হইতে পারে।

আনন্দের স্বরূপগত বৈশিষ্ট্য যেমন তটস্থ ভূমির জীবাণুতে তাহার প্রকৃতি বা ধর্মরূপে নিহিত আছে, তদ্রূপ প্রত্যেকটি অণুই প্রতিবিম্বিত-রূপে পূর্ব্বোক্ত আনন্দাংশ নিত্য জাগ্রৎ রহিয়াছে, ইহা একটি অত্যন্ত গভীর তত্ত্ব এবং রহস্যময়। ইহা না বুঝিলে নিত্যলীলায় জীবের স্থান কোথায় এই সমস্যার সমাধান হইতে পারে না। এই যে নিত্যধামে প্রতি জীবের অবস্থিতির কথা বলা হইল ইহাই জীবের নিত্যসিদ্ধ স্বরূপ দেহ বলিয়া পরিচিত। ইহার বিশেষ বিবরণ পরে বলিব।

জীবের স্বরূপ দেহের কথা শুনিয়া বিস্মিত হইবার কারণ নাই। সত্যই জীবের স্বরূপ দেহ আছে। প্রতি জীবেরই আপন আপন স্বরূপ দেহ আছে। ইহাই আত্মা। ইহা সাকার—নিরাকার নহে। আত্মার নিরাকার স্বরূপের কথা এখানে আলোচ্য নহে। এই স্বরূপ-দেহ বস্তুত ভগবৎস্বরূপেরই অন্তর্গত। শুধু অন্তর্গত নহে, তাহারই অংশ। এই দেহই জীবের প্রকৃতি। ইহা আনন্দাত্মক। ইহার কর-

চরণাদি অবয়ব বিন্যাস আছে, অথচ সব এক-রস—এক বিশুদ্ধ আনন্দতত্ত্ব দিয়াই যেন ইহা গঠিত।

গঠিত বলিলাম বটে, কিন্তু গঠিত নহে। ইহার রহস্য পরে স্পষ্টিকৃত হইবে। একটি চৈতন্যস্বরূপ আনন্দঘন বস্তুই যেন অনন্ত পৃথক্ পৃথক্, অথচ পৃথক্ হইয়াও অপৃথক্ আকারে বিদ্যমান রহিয়াছে। এই দেহ আবরণে আচ্ছন্ন! ইহাই লিঙ্গাবরণ। মহাকল্পের সূত্রপাত ও লিঙ্গাবরণের প্রারম্ভ সমকালীন। কল্পারম্ভে লিঙ্গাবরণের উপর আর একটি আবরণ পড়ে—তাহাই ভৌতিক আবরণ। এই ভৌতিক শরীরটাকে কর্মদেহ বলা হয়। ইহা প্রতি কল্পে ভিন্ন ভিন্ন। কল্পের আদিতে এই দেহের জন্ম হয়। কল্পের অবসানে এই দেহের নাশ হয়। সমস্ত কল্পব্যাপী এই দেহের জীবন। এই দেহের সত্তাও ভৌতিক সত্তা। ইহাকে আশ্রয় করিয়াই কর্ম্মসংস্কার ক্রিয়া করিয়া থাকে। যিনি কোন কৌশলে কর্ম্মের অতীত হইতে পারেন তিনিই ভৌতিক আবরণ হইতে মুক্ত হইয়া মহাকল্পে-প্রবেশ করেন।

ইহাই লিঙ্গাবরণ। ইহা মহাকল্পের প্রারম্ভ হইতেই আছে। লিঙ্গভঙ্গ না হওয়া পর্য্যন্তই মহাকল্প—ইহাই হিরণ্যগর্ভের জীবিত কাল। লিঙ্গাবরণ হইতে অব্যাহতি না পাইলে স্বরূপদেহের চেতন হয় না। মহাকল্প ভেদ করাও যা, স্বরূপদেহের উপলব্ধিও ঠিক তাহাই। স্বরূপদেহ সচ্চিদানন্দময়, কিন্তু লিঙ্গের আবরণ অপসারিত না হওয়া পর্য্যন্ত জীব তাহার সন্ধান পাইতে পারে না। জীব যে প্রাকৃতিক সৃষ্টি প্রবাহে পতিত হইয়াছে তাহার উদ্দেশ্য এই আবরণের অপসারণ। কর্মের স্রোতে জীবকে চলিতে হয়। যে জীব যে গুণ প্রধান তাহাকে সেই প্রকার কর্মই করিতে হয়। তবে লিঙ্গভঙ্গ হয়। মহাকল্পের অবসানে ইহা নিষ্পন্ন হয়। তখন সকলেই আপন আপন স্বরূপদেহে অবস্থান করে।

আসল কথা, কালের স্রোতে উজাইয়া যাইতে হয়। গুরু ধারার কথা বলিতেছি না। কালের ধারা ধরিয়া গেলে উজাইয়া যাইতেই

হইবে। কালের আবর্ত্তের মধ্যে যেটি মহত্তম আবর্ত্ত বলিয়া লৌকিক দৃষ্টিতে বিবেচিত হয়, তাহা ভেদ করিতে পারিলেই স্বরূপদেহের সন্ধান পাওয়ার রাস্তা ধরা যায়। কালের ক্ষুদ্রতম আবর্ত্ত ভেদ করিলেও ঐ সন্ধান পাওয়া যায়।

মহাকল্পই লৌকিক হিসাবে বৃহত্তম আবর্ত্ত—ইহা ভেদ করা এবং মহাপ্রলয়ের সাক্ষী হওয়া মোটের উপর একই কথা। লোকোত্তর দৃষ্টিতে ইহার চেয়েও বড় আবর্ত্ত আছে। বস্তুতঃ তাহাও ভেদ করিতে হইবে! তবে স্বরূপদেহের প্রকৃত পরিচয় পাইবার উপায় আয়ত্ত হইবে। ইহা অতি-মহাপ্রলয়ের অতিক্রমণ। প্রকৃত প্রস্তাবে ইহাই সুষুম্নাতে প্রবেশ। যোগ ও শব্দবিজ্ঞান আলোচনাকালে ইহার চর্চ্চা প্রাসঙ্গিক হইবে। তাই এখানে অধিক বলা হইল না। এখন বুঝা যাইবে যে এক হিসাবে প্রত্যেকের স্বরূপদেহই ভগবান্—অর্থাৎ ভগদংশ। তাহাই যেন বিম্ব। একই মহাবিম্বে অনন্ত স্বগত ভেদ রহিয়াছে। সব লইয়াই এক অখণ্ড ভগবৎসত্তা। ইহাই মহাসৃষ্টি ও মহাপ্রলয়ের অতীত অবস্থা। এই বিম্বই যেন অনন্ত প্রতিবিম্বরূপে জগতে প্রতিভাসমান হইতেছে। প্রত্যেকটি বিম্বের ভগবৎস্বরূপাত্মক আত্মবিম্বে প্রবেশই জীবের স্বরূপ স্থিতি। শুধু প্রবেশ নহে, নির্গমেরও অধিকার থাকা চাই। ইহা অতি দুর্লভ অবস্থা। ইহাই যোগ। কেহ কেহ ইহাকে সাযুজ্য নাম দেন। কালের স্বাভাবিক ধারা আশ্রয় করিয়া উর্দ্ধ গতিতে এই অবস্থায় উপনীত হওয়া অতি কঠিন; এক একটি মহাপ্রলয়ে এক এক জন এই অবস্থা লাভ করেন। তবে সাধনা বা কৃপার ধারায় কালকে বঞ্চনা করিয়া এই অবস্থায় যাওয়ার কৌশল আছে।

আত্মবিম্বলাভ না করিলেও আত্মবিম্বের সদৃশ বিম্বলাভ অপেক্ষাকৃত সহজ। ইহা মুক্ত পুরুষ মাত্রেরই হইয়া থাকে। স্বরূপদেহ সকল জীবের একপ্রকার নহে। যাহার যেটি স্বরূপদেহ তাহার পক্ষে তাহাই প্রাপ্য। প্রকৃতির ক্রমবিকাশের ধারা বাস্তবিক পক্ষে ঐ স্বরূপ-

দেহটিকে অভিব্যক্ত করিবার জন্য একটি কালগত ক্রিয়া মাত্র। স্বরূপ-দেহের অভিব্যক্তিই মুক্তি।

স্বরূপ প্রাপ্ত এই সকল মুক্ত পুরুষ অভিনব সৃষ্টিতে নানাস্থানে নানাভাবে স্থিতি ও সঞ্চরণ করেন। কিন্তু সৃষ্টির সাময়িক অবসান কালে ঐ সকল স্বরূপ বিশুদ্ধ চিদাকাশে প্রতিষ্ঠিত থাকেন। সিদ্ধগণের মধ্যে সকলেরই সর্বাবস্থায় ভগবৎসেবা মুখ্য কার্য্য।

এখন ভগবত্তত্ত্ব সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলা যাইতেছে। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। স্বরূপের সহিত অনন্ত শক্তির নিত্য সম্বন্ধ রহিয়াছে। বলা বাহুল্য, এই সম্বন্ধ শক্তির ব্যক্তাবস্থাতেই সম্ভবপর। যিনি এই অনন্ত শক্তির একমাত্র আশ্রয় তিনিই ভগবান্। ভগবান্ ব্যতীত শক্তিমান—সর্ব্বশক্তিমান্ আর কাহাকেও বলা চলে না। সুতরাং স্বরূপশক্তির সত্তাই ভগবত্তা। তটস্থ শক্তির মায়া শক্তির অধিষ্ঠানও স্বরূপশক্তির দ্বারাই সম্পন্ন হয়। যিনি স্বরূপশক্তিহীন তিনিই একদিকে জীবের ও অপরদিকে জগতের অন্তর্য্যামী হইতে পারেন না। কারণ সূত্র ধরিতে না পারিলে সূত্রধর হওয়া যায় না। সূত্রই স্বরূপ শক্তি—যাহা দ্বারা জীব ও জগৎকে জ্ঞান ও কর্মপথে প্রেরণা দেওয়া হয়।

এই স্বরূপশক্তি চিৎকলা ব্যতিরেকে অপর কিছুই নহে। ইহাতে অনন্ত কলার সমাবেশ আছে, কিন্তু অনন্ত কলাতেও সমাধান হয় না। ষোড়শী কলাতেই পূর্ণতার স্বরূপ ফুটিয়া উঠে। সপ্তদশী কলা অনন্ত কলার প্রতীকস্বরূপ। ইহা মহাশক্তিরূপে নিত্যজাগরুক থাকে। কলার তারতম্য অনুসারেই শক্তির নিত্যসিদ্ধ বৈশিষ্ট্য প্রকাশিত হয়। সৎশক্তি বা সন্ধিনীকলা, চিৎশক্তি বা সংবিৎ কলা এবং আনন্দ শক্তি বা হ্লাদিনী কলা বস্তুতঃ চিৎকলারই মাত্রাগত ক্রমোৎকর্ষজনিত বৈশিষ্ট্য মাত্র। চিৎকলার উজ্জ্বলতা একটু ক্ষীণ না হইলে আত্মস্বরূপ ভিন্ন অপর কিছু দেখা যায় না। জীব ও জগৎকে দেখিতে গেলে তদনুসারে চৈতন্যশক্তির সঙ্কোচ আবশ্যক। যেমন অত্যন্ত তীব্র

জ্যোতিতে চক্ষু ঝলসিয়া যায়, শুধু জ্যোতিই দৃশ্য হয়, তদ্ভিন্ন দৃশ্য-পদার্থের দর্শন হয় না, তদ্রূপ চিৎকলা অত্যন্ত অধিক মাত্রাতে প্রকাশিত থাকিলে চৈতন্য ভিন্ন অপর কিছু দৃষ্টিগোচর হয় না। যে অবস্থায় জীব ও জগতের ভান পর্য্যন্ত হয় না সে অবস্থায় তাহাদের নিয়ন্ত্রণের প্রশ্নই উঠে না। এইজন্যই ভগবান পূর্ণ স্বরূপশক্তির অধিষ্ঠাতা থাকিলে জীবের হৃদয়স্থিত অন্তর্য্যামী পুরুষরূপেও প্রকাশিত হন না, জগতের চালক পুরুষরূপেও নহে। স্বরূপশক্তির কিঞ্চিৎ ন্যূনতা না হইলে নিয়মন কার্য্য সিদ্ধ হইতে পারে না।

ব্রহ্মে স্বরূপশক্তির অভিব্যক্তি নাই। তাই ব্রহ্ম নিষ্ক্রিয় ও উদাসীন। ব্রহ্ম জীব ভাবের ও মায়ার অধিষ্ঠান মাত্র। ভগবান তিনি, যাঁহাতে স্বরূপশক্তির পূর্ণ অভিব্যক্তি আছে, তাঁহাতে সকল শক্তিই আশ্রিত—স্বরূপশক্তি সাক্ষাদ্‌ভাবে এবং অন্যান্য শক্তি স্বরূপ শক্তির মধ্যস্থতায়। কিন্তু স্বরূপের যে অবস্থায় চিৎকলা পূর্ণ মাত্রায় অভিব্যক্ত থাকে না তাহা ভগবদভাবও নহে, ব্রহ্মভাবও নহে। তাহাই পরমাত্ম ভাব। সুতরাং পরমাত্মাই জীব ও জগতের ঈশ্বর। সাক্ষাদ্‌ভাবে ভগবানকে জীব ও জগতের ঈশ্বর বলা চলে না। কারণ ভগবৎস্বরূপ পূর্ণ চিৎশক্তিময় বলিয়া সেখানে স্বভাবসিদ্ধভাবে জীবের কোন স্থান নাই এবং জড়েরও কোন স্থান নাই—তাহা চিদ্রূপা নিজ শক্তিরই বিলাসে ভরপুর। তবে পরমাত্মা ভগবানেরই একদেশ বলিয়া যে কোন ধর্ম পরমাত্মাতে প্রযুক্ত হইবার যোগ্য তাহা ভগবানেও আরোপিত হয়।

পরমাত্মা মায়াচক্রের অধ্যক্ষ, জীব ও মায়ার অধিষ্ঠাতা, উভয়েরই প্রভু। যোগী যোগবলে চিত্তবৃত্তি একাগ্র করিয়া হৃদয়াকাশে যাঁহার দর্শন লাভ করেন তিনিই পরমাত্মা—অর্থাৎ পরমাত্মার অংশভূত চৈত্য পুরুষ বা অন্তরাত্মা। এই দেহযন্ত্রের যন্ত্রী—ইনি দ্রষ্টা বটেন, কিন্তু ইঁহার দৃষ্টিই ক্রিয়া। এই দৃষ্টির প্রভাবে দেহযন্ত্র চলিতে থাকে। ইনি অসঙ্গ বলিয়া দেহে অভিমান হীন—অথচ ইঁহারই দৃষ্টিতে দেহ

সঞ্চালিত হয়। জীব যন্ত্রে আরূঢ় পশু, দেহাত্মবোধে বদ্ধ। জীব যখন দেহাত্মভাব ত্যাগ করিয়া অন্তর্মুখ হয় তখনই পরমাত্মার দর্শন লাভ করে—পরমাত্মা নির্লিপ্ত দ্রষ্টামাত্র, জীব নিজেকেও তখন তদ্রূপ অনুভব করে। ইহা জীবের মুক্তাবস্থা, দ্রষ্টা পুরুষরূপে স্থিতি। অন্তর্যামী পুরুষের দৃষ্টিই যে সৃষ্টি, তাঁহার জ্ঞানই যে ক্রিয়া, তাহা পুরুষ মুক্ত অবস্থাতেও প্রথমে অনুভব করিতে পারে না। কিন্তু প্রথমে না পারিলেও পরে পারে। তখন জীব আর জীব থাকে না—জীবে ঈশ্বরত্ব অভিব্যক্ত হয়। সে তখন দ্রষ্টামাত্র নহে, দৃষ্টি দ্বারা সে প্রকৃতির নিয়ামক হয়, সে তখন প্রকৃতির স্বামী। মায়া তখন তাঁহার অধীন। ইহাই যোগৈশ্বর্য্য। যোগবলে প্রকৃতি হইতে বিবিক্ত হইয়া প্রথমে শুদ্ধ দ্রষ্টা বা নিষ্ক্রিয় চিৎস্বরূপ অবস্থান হয়; তারপর ধীরে ধীরে ঐ প্রকৃতিকে আয়ত্ত করিয়া ক্রিয়া শক্তির দ্বারা উহার নিয়ন্ত্রণ বা ঈশ্বরত্ব-লাভ ঘটে। বাহ্য যোগের দ্বারা এই পর্য্যন্তই হইয়া থাকে। ইহার পরে অগ্রসর হইতে হইলে অন্য উপায় আবশ্যক হয়।

এই যে যোগলব্ধ ঐশ্বর্য্য, বস্তুতঃ ইহাও ভগবত্তাই। তবে ইহা ভগবত্তার পূর্ণ স্বরূপ নহে—অংশমাত্র। অংশমাত্র বলিয়াই যোগী বিশ্বরাজ্যের অধীশ্বর বা মায়িক জগতের অধিষ্ঠাতা হয়, জড় সাম্রাজ্যের সম্রাট্-পদে অভিষিক্ত হয়। ইহাও যে চিৎকলারই মহিমা তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু এখনও জড় সম্বন্ধ অতিক্রান্ত হয় নাই।

কিন্তু জড়রাজ্যের ন্যায় চিদানন্দময় সাম্রাজ্যও আছে। তাহার প্রভুত্ব যাঁহাতে নিহিত, যিনি এ মহান্ রাজ্যের অধীশ্বর, যাঁহার অনন্ত ঐশ্বর্য্যের কণিকা মাত্র অবলম্বন করিয়া কোটি ব্রহ্মাণ্ডময় মায়িক জগতের বিভূতি প্রকাশিত হয়, তিনিই প্রকৃত ভগবান্। চিৎকলার অভিব্যক্তি অত্যন্ত অধিক মাত্রায় না হইলে ভগবান্‌কে পাওয়া যায় না। যোগীর ইষ্টদেব হৃদয়ে নিহিত, কিন্তু তাঁহাকে হৃদয় হইতে বাহির করিতে হইলে পূর্ব্ববর্ণিত যোগশক্তি অপেক্ষা আরও অধিক শক্তির প্রয়োজন হয়। যোগী দর্শন পায় স্বপ্নবৎ ধ্যানের মধ্যে, ভক্ত পায়

সাধারণ জাগ্রৎ ভাবের মধ্যে। তাই ভক্তের অনুভূতিতে যে তৃপ্তি তাহা যোগীর অনুভূতিতে আশা করা যায় না।

এই অধিক শক্তি ভক্তি হইতে উপলব্ধ হয়। ভক্তি আপনিই আপনার বিষয়কে ফুটাইয়া তুলে। ভক্তির বিষয় ভগবান্—ভক্তির অনুশীলনের প্রভাবে ভগবান আবির্ভূত হন। তাঁহাকে সাক্ষাৎ করিবার জন্য বৃত্তি রোধ করিতে হয় না। বৃত্তির বাহ্য অবস্থাতেও তাঁহাকে পাওয়া যায়, ভাবের অঞ্জন মাখাইয়া নিলে সকল ইন্দ্রিয় দ্বারাই ভগবানের আস্বাদন লাভ করা যায়। যোগীর দর্শন হয় অন্তরাকাশে, ভক্তের দর্শন হয় বহিরাকাশে। যোগী জ্যোতির্ময় পুরুষরূপে হৃদয়ে পরমাত্মার দর্শন পান, কিন্তু ভক্ত ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য বাহ্য পুরুষের ন্যায় বহির্জগতেও ভাবসংস্কৃত ইন্দ্রিয়গোচর রূপে ভগবানের দর্শন লাভ করেন। ভক্ত প্রতি ইন্দ্রিয় দ্বারাই ভগবদ্‌দেহের অনুভূতি প্রাপ্ত হন, কিন্তু যোগীর ইষ্টানুভূতি সেরূপ হয় না।

ভগবান্ চিদানন্দ দ্বারা গঠিত জীবন্ত মূর্ত্তি। এই মূর্ত্তিই রচয়িতা ভক্ত স্বয়ম্। ভগবদনুভূতি ও পরমাত্মানুভূতির মধ্যে মূলগত পার্থক্য আছে। স্বরূপ শক্তির কিঞ্চিৎ উন্মেষ না হইলে পরমাত্মার অনুভূতি হয় না। যে শক্তির প্রভাবে এই অনুভূতি হয় তাহা যদিও স্বরূপ শক্তিই বটে, তথাপি তাহাতে অতি সূক্ষ্মতম ভাবে মায়ার আভাস ঘেরিয়া থাকে। পরমাত্মা মায়ার অধিষ্ঠাতা, জীবেরও অধিষ্ঠাতা। সুতরাং যে শক্তি জীব ও মায়াকে নিয়ন্ত্রিত করিয়া থাকে সেই শক্তিই পরমাত্মা-সাক্ষাৎকারের অনুকূল। তাহা বস্তুতঃ স্বরূপ শক্তি হইলেও চৈতন্যের পূর্ণকলা তাহাতে বিকশিত থাকে না। শাস্ত্রীয় পরিভাষা অনুসারে বলিতে পারা যায় যে প্রাকৃতিক সত্ত্ব-গুণ যখন রজঃ ও তমঃ গুণের দ্বারা অভিভূত না হইয়া অত্যন্ত উৎকর্ষ লাভ করে, যখন ত্রিগুণের পরিণাম স্বরূপ চিত্ত বিশুদ্ধ হয়, তখনই উহা পরমাত্ম দর্শনের উপযোগী হয়। প্রাকৃতিক সত্ত্বগুণকে অতিক্রম না করিয়া পরমাত্মাকে দর্শন করা যায় না—যদিও ইহাও সত্য যে যতক্ষণ ঐ

সত্ত্বগুণে রজোগুণের চঞ্চলতা বা বিক্ষেপ এবং তমোগুণের আবরণ বা লয় বিদ্যমান থাকে, যতক্ষণ চিত্ত স্বীয় উপাদানে সত্ত্বগুণের পুষ্টিতে প্রবলতা লাভ করিতে না পারে ততক্ষণ সমাধি ও সমাধিজনিত প্রজ্ঞার আবির্ভাব হইতেই পারে না। শুদ্ধচিত্তে পরমাত্মার অনুভূতি হয় বলিয়াই পরমাত্ম দর্শন হৃদয় মধ্যেই হইয়া থাকে, কারণ হৃদয়ই চিত্তের বিশ্রামের উপযোগী অবকাশ। কিন্তু যেখানে দেহ নাই, সেখানে হৃদয় কোথায়? দেহকে আশ্রয় করিয়াই সাক্ষী ও প্রেরয়িতারূপে পরমাত্মা এবং কর্ত্তা ও ভোক্তারূপে গুণবদ্ধ জীবাত্মা অবস্থান করে। ইহা হইতে বুঝা যাইবে যে প্রাকৃতিক পিণ্ডে অবস্থিত হইয়াই সাক্ষিরূপে পরমাত্মার অনুভব হয়। শুধু সাক্ষিভাবে নহে। প্রকৃতি ও প্রাকৃতিক পিণ্ডের নিয়ামকরূপেও হৃদয়স্থ পরমাত্মাকে অনুভব করা যায়। বলা বাহুল্য, ইহাও সাক্ষি স্বরূপ নিজেরই অনুভূতি। কিন্তু ভগবদ্দর্শন এইভাবে হয় না। চিৎকলার পূর্ণ অভিব্যক্তি না হওয়া পর্য্যন্ত পূর্ণচিৎকলাময় ভগবৎ সত্তার সাক্ষাৎকার সম্ভবপর নহে। স্বরূপ শক্তির পূর্ণপ্রকাশ হ্লাদিনীতে। হ্লাদিনীর আশ্রয় ব্যতিরেকে অন্য কোন উপায়ে ভগবদ্দর্শন হইতেই পারে না। হ্লাদিনী শক্তিরও একটি ক্রমবিকাশ আছে। এই বিকাশের নিম্নতর স্তরে যদি হ্লাদিনী শক্তির স্ফুরণ হয় তখনও বস্তুতঃ উহা হ্লাদিনী শক্তি, অন্য কিছু নহে। এইজন্য সে অবস্থাতেও ভগবদ্দর্শন সম্ভবপর। কিন্তু প্রাকৃতিক চিত্তকে শুদ্ধ করিয়া তাহা দ্বারা ভগবৎ সাক্ষাৎকার হয় না, হইতেও পারে না। কারণ ভগবান্ প্রাকৃতিক সত্ত্বগুণের অগোচর। অপ্রাকৃত সত্ত্ব বা বিশুদ্ধ সত্ত্বই ভগবৎদর্শনের জন্য সর্ব্বপ্রথম আবশ্যক। ইহা গুণবদ্ধ জীবের স্বায়ত্ত নহে। যদিও জীব-স্বরূপের গভীরতম প্রদেশে কণারূপে অপ্রাকৃত সত্ত্ব নিহিত রহিয়াছে, তথাপি উহাকে উদ্রিক্ত করিবার জন্য বাহির হইতে অপ্রাকৃত সত্ত্বের অনুপ্রবেশ আবশ্যক। বিশুদ্ধ সত্ত্ব হ্লাদিনী শক্তিরই বৃত্তি। সুতরাং যতক্ষণ পর্য্যন্ত স্বয়ং ভগবান্ সাক্ষাদভাবে জীবে হ্লাদিনীশক্তি সঞ্চার না করেন,

অথবা হ্লাদিনীশক্তি প্রাপ্ত ভগবদ্ ভক্ত কৃপারূপে ইহা জীবকে অর্পণ না করেন, ততক্ষণ জীবের স্বকীয় সত্ত্ববীজ অঙ্কুরিত হইবার অবকাশ পায় না। বিশুদ্ধ সত্ত্বের ক্ষোভজনিত প্রথম উন্মেষই ভাব, যাহা ক্রমশঃ পরিণত হইয়া প্রেমের আকার ধারণ করে। ইহা নিত্যসিদ্ধ, তবে সাধনার দ্বারা হৃদয়ে অভিব্যক্ত হয় মাত্র। বস্তুতঃ ইহা সাধনার ফল নহে। সাধনার সহিত ভাবোদয়ের যে কার্য্য-কারণ ভাব দেখিতে পাওয়া যায় তাহা মৌলিক নহে। সাধনা অভিব্যঞ্জক, ভাব অভি-ব্যঙ্গ্য। এই ভাবকেই সাধ্য-ভক্তি বলে—ইহা প্রেমের অঙ্কুর স্বরূপ। ভাব আবির্ভূত হইয়া দেহ মন ইন্দ্রিয় প্রভৃতিতে অবতীর্ণ হইলে ঐ সকল বস্তু যে পরিণতি লাভ করে তাহা হইতেই ভাবের আবির্ভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। ভাবই ভক্তির বীজ, প্রেম তাহার ফল। প্রেমও ক্রমশঃ পুষ্টিলাভ করিয়া বিভিন্ন প্রকাশ বিলাসে আস্বাদনের বিভিন্ন প্রকার বৈচিত্র্য প্রকট করিয়া থাকে। প্রেম-বিলাসের পূর্ণ এবং পরিণত স্বরূপই রাধাতত্ত্ব। ইহার বিবরণ পরে করা যাইবে।

পূর্ব্বোক্ত বিবরণ হইতে বুঝিতে পারা যাইবে যে ত্রিগুণের সহিত সম্বন্ধের আভাস মাত্র থাকিলেও ভগবদনুভূতি আসে না। ভগবদ্ অনুভবের জন্য চিৎকলার পূর্ণ আবির্ভাব আবশ্যক। যেখানে চিৎকলার অভিব্যক্তি পূর্ণ সেখানে অচিৎ বা মায়ার আভাস থাকিবে কি করিয়া? তাই চিৎশক্তির যতখানি বিকাশে হৃদয়ে পরমাত্মার সাক্ষাৎকার হইতে পারে তাহার অধিক বিকাশ না হইলে হৃদয়ের অতীত প্রদেশে ভগবানের দর্শন পাওয়া যায় না। চিৎশক্তির এই পূর্ণতা বিশুদ্ধ হ্লাদিনী শক্তির বৃত্তি বিশুদ্ধ সত্ত্বে উপনীত হয়। বিশুদ্ধ সত্ত্বের পরিণামই ভক্তি। যাঁহারা সংবিৎ ও হ্লাদিনী শক্তি-সমবেত সারকে ভক্তি বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন তাঁহারাও বস্তুতঃ এই কথাই প্রকাশ করিয়াছেন।

ভগবান্‌কে অনুভব করিবার জন্য কোন ইন্দ্রিয়কে রোধ করিতে হয় না, কারণ প্রত্যেকটি ইন্দ্রিয়ের পূর্ণ তৃপ্তি-ভগবদ্ আস্বাদনে হইয়া

থাকে। কিন্তু পরমাত্মার অনুভব ইন্দ্রিয়ের অন্তর্মুখী গতি ভিন্ন হইতে পারে না। আসল কথা এই, জীব নিজভূমি ত্যাগ না করিয়া ভগবান্‌কে দেখিতে বা জানিতে পারে না। বস্তুতঃ ভগবান্ নিজেকে নিজেই দেখেন, নিজেকে নিজেই জানেন এবং নিজেই নিজেকে আস্বাদন করেন। ইহাই তাঁহার স্বরূপ শক্তির লীলা। জীব ঐ শক্তির অনুগত হইয়া তাঁহাকে দেখিতেও পারে, জানিতেও পারে, এবং অনন্ত প্রকারে আস্বাদনও করিতে পারে। ইহাই ভক্তির খেলা।

ভগবদনুভূতি ও পরমাত্মানুভূতি সম্বন্ধে সংক্ষেপে দুই একটি কথা বলা হইয়াছে। এবার ব্রহ্মানুভূতির বৈশিষ্ট্য বলা যাইতেছে। ব্রহ্ম স্বরূপ-শক্তিহীন হইলে অর্থাৎ শুধু স্বরূপাবস্থায় অসৎকল্প, থাকিয়াও না থাকিবার মতন। তাহা প্রকাশ স্বরূপ হইয়াও স্ব প্রকাশ পদবাচ্য হইতে পারে না। প্রকাশের স্বরূপভূতা বিমর্শরূপা শক্তিই প্রকাশকে প্রকাশরূপে পরিচিত করে। অর্থাৎ প্রকাশ যে প্রকাশ তাহা তাহার স্বকীয় শক্তি বিমর্শ দ্বারাই উপলব্ধি করা যায়। স্বরূপ শক্তির সংবিৎ কলা দ্বারা ব্রহ্মের এই স্ব-প্রকাশত্ব সিদ্ধ হয়। যাহাকে ব্রহ্মানুভূতি বলা হয় তাহা ব্রহ্মের স্ব-প্রকাশত্ব। সংবিৎ শক্তি দ্বারা ব্রহ্মানুভূতি সিদ্ধ হয়। এই অনুভূতিতে জীবের পৃথক সত্তা স্পষ্টতঃ ধরা যায় না। ব্রহ্মের সহিত অপৃথগ্‌ভাবে জীব নিজেকে নিজে অনুভব করে। এই অনুভব অখণ্ড আনন্দাত্মক। ইহা দেশ কাল প্রভৃতি উপাধি দ্বারা পরিচ্ছিন্ন নহে। যাঁহারা বিশুদ্ধ জ্ঞান পথের পথিক তাঁহারা শুদ্ধ সংবিৎশক্তির প্রভাবে অভেদ জ্ঞানরূপে ব্রহ্মদর্শন করিয়া থাকেন।

ব্রহ্মানুভূতি, পরমাত্মানুভূতি ও ভগবদনুভূতি—তিনটি অনুভূতিই ভাল করিয়া বুঝা আবশ্যক। তাই আরও স্পষ্ট করিয়া বলিবার চেষ্টা করিতেছি। ব্রহ্ম নির্বিশেষ হইলে ব্রহ্মানুভূতি বলিয়া কোন পারমার্থিক অবস্থা স্বীকার করা চলে না। অচিন্ত্য স্বরূপ-শক্তিরই নামান্তর বিশেষ। ব্রহ্মে স্বরূপশক্তি স্বীকৃত না হইলে ব্রহ্মানুভূতির কোন অর্থই থাকে না। কারণ প্রকাশের প্রকাশমানতাই স্বরূপশক্তির

ব্যাপার—তাহার অভাবে "ন প্রকাশঃ প্রকাশেত"। বস্তুতঃ অনুভূতি-হীন চিৎস্বরূপে স্থিতিই ব্রহ্ম—ইহা বাক্য ও মনের বৃত্তির অগোচর। স্বরূপভূতা শক্তির দ্বারা ব্রহ্মের প্রকাশ হয়। ইহা নিজের কাছেই নিজের প্রকাশ এবং নিজে হতেই প্রকাশ। এই শক্তি ব্রহ্মস্বরূপ হইতে ভিন্ন নয়। তাই ব্রহ্মাত্মক প্রকাশকে স্ব-প্রকাশ বলিয়া বর্ণনা করা হয়।

দৃষ্টান্ত রূপে একটি বিশাল জ্যোতিঃ গ্রহণ করা যাইতেছে। জ্যোতিঃ ছাড়া অন্য কোন শব্দ দ্বারা ঠিক ঠিক উহা বুঝান যায় না, তাই জ্যোতিঃ বলিলাম। বস্তুতঃ জ্যোতিঃও স্বরূপের ঠিক বাচক শব্দ নহে। উর্দ্ধ, অধঃ আট দিক্—সর্ব্বত্র এক অখণ্ড অনন্ত জ্যোতিঃ আপন আলোকে আপনি দেদীপ্যমান রহিয়াছে। দেখিবার পৃথক্ কেহ নাই, দৃশ্যও পৃথক্ কিছু নাই—যেন জ্যোতিঃই দ্রষ্টা, জ্যোতিঃই দৃশ্য, জ্যোতিঃই দর্শন। স্বরূপটি যেন আপনাতে আপনি বিশ্রান্ত, তরঙ্গ নাই, ক্ষোভ নাই, হিল্লোল নাই, স্পন্দন নাই, ক্রিয়া বিকার নাই—আছে একটি প্রশান্ত চৈতন্যময় অবস্থা। নিদ্রা নয়, স্বপ্ন নয়, জাগরণ নয়—স্বয়ংপ্রকাশ বিশুদ্ধ চৈতন্য মাত্র। ইহাই সচ্চিদানন্দময় ব্রহ্মভাব।

ব্রহ্মের অনুভব সংবিৎ-শক্তির প্রকাশ। এই প্রকাশে বৈচিত্র্যের ভাব থাকে না, সত্তা জ্ঞান ও আনন্দপূর্ণ, কিন্তু বৈচিত্র্যহীন। উহাতে দ্রষ্টা ও দৃশ্যের পরস্পর ভেদও নাই, দৃশ্যের স্বগতভেদও নাই—একটি বৈচিত্র্যহীন অভিন্ন সত্তা নিজাধারে নিজে বিদ্যমান।

যখন এই স্ব-প্রকাশ জ্যোতিঃকে কেন্দ্র করিয়া কোন জড়পিণ্ড রচিত হয়, যাহা এই জ্যোতিঃর প্রকাশে প্রকাশিত এবং ইহার শক্তিতে শক্তিমান্, তখন এই জ্যোতিঃ স্ব-প্রকাশ থাকিয়াও পর প্রকাশক অবস্থা লাভ করে। এই জ্যোতিঃই তখন মূল জড় সত্তা মায়াকে আবিষ্ট করে এবং মায়ার কার্য্যভূত পিণ্ডে অবস্থিত থাকিয়া উহার জ্ঞান ও ক্রিয়ার ধারা নিয়ন্ত্রিত করে। জ্যোতিঃ স্বতঃ শুদ্ধ থাকিয়াও যে

শক্তির প্রভাবে মায়াকে দর্শন বা চালনা করে—তাহাই তাহার স্বরূপশক্তি। স্বরূপশক্তি ব্রহ্মানুভূতি কালে অন্তর্মুখ ছিল, এখন ইহা বহির্মুখ হইয়া বহিরঙ্গা শক্তি মায়াকে দর্শন করে। ইহা এখন আর 'ব্রহ্মজ্যোতিঃ' পদবাচ্য নহে। ইহা পরমাত্মা, যাহার অনুভব হৃদয় প্রদেশে হইয়া থাকে।

সংবিৎশক্তির অন্তর্মুখ দৃষ্টিতে অভেদ দর্শন হয়। ইহার বাহ্য দৃষ্টিতে মায়া দর্শন হয়,—মায়িক জগতের সৃষ্টি হয় ও মায়িক সৃষ্টির নিয়মন হয়। একটি শক্তির নিমেষ, অপরটি উহার উন্মেষ। ব্যবহারতঃ একটির পর অপরটির আবির্ভাব হয়। কিন্তু তত্ত্বতঃ উভয়ই যুগপৎ বিদ্যমান। যখন কোনটিই বর্তমান নাই বলিয়া মনে করা হয়, যখন শক্তি অন্তর্মুখও নয় বহির্মুখও নয়, তখন ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার অথবা পরমাত্ম সাক্ষাৎকার অথবা পরমাত্ম কর্তৃক মায়া দর্শন কিছুই থাকে না। যাহা থাকে তাহাই ব্রহ্ম—তাহা সৎ হইয়াও অসৎকল্প, তাহার স্ব-প্রকাশত্ব একপ্রকার অসিদ্ধ। তাহাই অলখ।

ব্রহ্ম-শূন্য-জগৎ, ইহাই সৃষ্টিবিকাশের ক্রম। ব্রহ্ম পূর্ণ—তাহাতে অভাব নাই, শূন্যের অবকাশ নাই। তাই পূর্ণ হইয়াও তাহা অব্যক্ত। শূন্য সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গেই ব্রহ্ম অনুভূতির গোচর হইয়া পড়িলেন—ব্যক্ত হইলেন; যেমন মহাকাশে সূর্য্যমণ্ডল, ঠিক সেইরূপ। সঙ্গে সঙ্গে দ্রষ্টার স্ফুরণ হইল। শূন্যের অতীত অবস্থায় দ্রষ্টা কোথায়? উহা অভেদ সত্তা। এই শূন্যটি হইল হৃদয়, জগৎটি দেহ। শূন্যস্থিত ব্রহ্ম-জ্যোতির প্রতিবিম্বটি হইল পরমাত্মা, দেহের মধ্যে হৃদয়ে পরমাত্মার দর্শন হয়। তখন দেহ থাকে, কিন্তু অভিমান থাকে না, দেহ যে আছে সে বোধ থাকে না। কারণ দেহ বোধই পরমাত্ম দর্শনের প্রতিবন্ধক। অথচ দেহ না থাকিলেও পরমাত্মদর্শন হইতে পারে না। বিদেহ কৈবল্যে পরমাত্মা কোথায়?

ভগবদ্ দর্শন কিন্তু এই প্রকার নহে। ব্রহ্ম দর্শন হয় বৃত্তির নিরোধে, পরমাত্ম দর্শন হয় বৃত্তির একাগ্রতায়, ভগবদ্দর্শন হয় বৃত্তির বৈচিত্র্যে।

প্রথমটিতে বৃত্তির উপশম হয়। তাহার পর ঐ নিরুদ্ধ দশাতে মহাশূন্যে জ্যোতিঃপিণ্ডের উদয়ের ন্যায় এক জ্যোতিঃ উদিত হয়। ইহাই পরমাত্মা। তারপর এই একের মধ্যেই একত্বের অবিরোধ অনন্ত বৈচিত্র্য খেলিতে থাকে। ইহাই ভগবদ্ধাম। তিনটিই অদ্বৈত। প্রথম দ্বৈত নিবৃত্তি সিদ্ধ হইয়াছে। দ্বিতীয়টিতে অদ্বৈতের শক্তির স্ফূর্তি হইয়াছে, তবে তাহা বহির্মুখ বলিয়া ঐ স্ফূর্তির সঙ্গে জীব ও জগতের বিকাশ হইয়াছে। তৃতীয়টিতে শক্তি অন্তর্মুখ বলিয়া অদ্বৈতের মধ্যেই অনন্ত বৈচিত্র্যের বিলাস উপলব্ধি হইতেছে। জাগতিক অবস্থার দৃষ্টান্তে বলা যায়—ব্রহ্মদর্শন সুষুপ্তিবৎ, পরমাত্মদর্শন স্বপ্নবৎ, এবং ভগবৎ দর্শন জাগ্রদ্‌বৎ।

আর একদিক দিয়াও দেখিতে পারা যায়। ব্রহ্মে জগতের উদয়, ব্রাহ্ম জগতের স্থিতি এবং ব্রহ্মেই তাহার অবসান। পরমাত্মা তাঁহার দৃষ্টি দ্বারা জগতের প্রত্যেকটি ব্যাপারে ব্যষ্টি ও সমষ্টিভাবে নিয়ামক রহিয়াছেন। কিন্তু ভগবান্ জগতের ও সৃষ্টির অতীত। তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাদ্ ভাবে সৃষ্টির কোনই সম্বন্ধ নাই। সৃষ্টির অধিষ্ঠান ব্রহ্ম, সৃষ্টির কারণ পরমাত্মা ও মায়া। ভগবান্ সৃষ্টি হইতে, মায়া হইতে, বহু দূরে।

জীব যতক্ষণ মায়ার আবরণে আচ্ছন্ন থাকে, যতক্ষণ তাহার জ্ঞান-নয়ন উন্মীলিত না হয়, ততক্ষণ ভেদজ্ঞান নিবৃত্ত হয় না, ততক্ষণ অদ্বৈত প্রতিষ্ঠা সম্ভবপর নহে। ভগবৎ কৃপার কিঞ্চিৎ প্রকাশ হইলেই জীব অপরোক্ষ ব্রহ্মানুভূতি লাভ করিয়া মায়ার অধিকার হইতে মুক্তি প্রাপ্ত হয়—মায়া ও মায়িক জগৎ আর তাহার ভোগ নেত্রের বিষয়ীভূত হয় না। ব্রহ্মানুভূতি কালে একমাত্র অদ্বৈত ব্রহ্মসত্তাই অর্থাৎ আত্মসত্তাই স্ব-প্রকাশ-রূপে বিরাজ করে। সেই নির্বিকল্পক চৈতন্যে জগৎবোধ চিরদিনের জন্য অস্তমিত থাকে। ভগবৎ কৃপা বা চিৎশক্তির তীব্রতর সঞ্চার থাকিলে আত্মস্বরূপ বা ব্রহ্মস্বরূপ চিৎকলার সাহচর্য্য নিবন্ধন পরমাত্মরূপে প্রকটিত হয়। পরমাত্মভাবে স্থির হওয়ার পূর্ব্বে পরমাত্ম-

ভাবের সাক্ষাৎকার হয়। জীব তখন সাক্ষিভাবে বা মুক্তপুরুষের ভাবে, প্রকৃতি ও তাহার খেলা দর্শন করে। ভোক্তৃভাব আর থাকে না। ব্রহ্মজ্ঞান লাভের পূর্বে বদ্ধ জীব যেভাবে জগৎ দর্শন করিত—ইহা সেরূপ দর্শন নহে। ইহা মুক্ত পুরুষের দর্শন—পরমাত্মার সহিত যুক্তভাবে দর্শন, প্রেক্ষকবৎ দর্শন। ইহার পর পরমাত্মার স্বরূপ স্থিতি হয়। যখন পরমাত্মার দৃষ্টিই যে ক্রিয়াশক্তি তাহার সাক্ষাৎ উপলব্ধি হয় তখন জীব নিজেই পরমাত্মা; তখন তাহার দৃষ্টি দ্বারাই প্রকৃতি যন্ত্র ও দেহযন্ত্র চালিত হয়। ভগবৎ কৃপার আরও অধিক সঞ্চার থাকিলে মুক্ত পুরুষ ভাবও আর থাকে না—সাক্ষিভাবও নহে—পূর্ণ পরমাত্ম ভাবও নহে। ভগবৎ দর্শনও থাকে না। জগতের নিয়ন্ত্রণও থাকে না। দ্রষ্টাও নাই, দৃশ্যও নাই, দর্শনও নাই, অথচ সবই আছে। অনন্ত বৈচিত্র্যময় চিদানন্দময় লীলারাজ্য তখন খুলিয়া যায়। কিন্তু জীবের তাহাতে প্রবেশ নাই। মায়া বা প্রকৃতিরও তাহাতে সঞ্চার নাই। অথচ নাই যে তাহাও বলা যায় না। কি ভাবে ইহা হয় তাহাই বলিতেছি।

পূর্বেই বলা হইয়াছে ভগবদ্ রাজ্যে ত্রিগুণের কোন সম্বন্ধ নাই। সুতরাং ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতির কার্যরূপ জগতের কিছুই সেখানে থাকিতে পারে না। এই জন্যই এই ধামকে প্রাকৃতিক জগতের অতীত, এমন কি প্রকৃতি বা মায়ারও অতীত বলা হইয়া থাকে। জীব যতদিন প্রকৃতির বন্ধনে আবদ্ধ থাকে ততদিন ঐ পরমধামের কোন সন্ধান পায় না, এমন কি মায়াতীত হইলেই যে পাইবে তাহারও কোন স্থিরতা নাই, কারণ দীর্ঘকাল তটস্থ ভূমিতেও সে থাকিয়া যাইতে পারে। মোট কথা, যতক্ষণ জীবের অন্তঃস্থিত আনন্দের প্রতিবিম্ব অর্থাৎ হ্লাদিনী শক্তির প্রচ্ছন্ন সত্তা উদ্দীপিত না হয়, যতদিন ভাবের বিকাশ না হয়, ততদিন হ্লাদিনী শক্তির বিলাস আস্বাদন করিবার জন্য তাহার যোগ্যতা থাকে না। অর্থাৎ ততদিন শ্রীভগবানের লীলা মণ্ডলে সে প্রবেশ লাভ করিতে পারে না।

ভগবদ্ধাম অদ্বৈত চিদানন্দময়। সেখানে অনন্ত বৈচিত্র্য থাকিলেও সবই একের দ্বারা অনুপ্রাণিত এবং মূলতঃ এক শক্তি হইতেই সকলের স্ফুরণ। সেখানে ভক্ত ও ভগবান্, ভগবানের অনন্তপরিবার, অনন্ত প্রকারের দৃশ্যরাজি, সমস্তই ভাবময়। এই ভাবই—স্বভাব। এই ভাবের অনুগত না হইয়া স্বতন্ত্রভাবে জীব লীলারাজ্যে প্রবেশ করিতে পারে না। এই অনুগত ভাবই জীবের পরতন্ত্রতা—ইহাই জীবের কৈঙ্কর্য্য বা দাস্য।

জীব কাহার অনুগমন করে? এই প্রশ্নের উত্তরে এক কথায় বলিতে গেলে বলিতে পারা যায়—জীব নিজের স্বভাবেরই অনুগমন করে। সুতরাং নিত্য লীলায় অনুগতরূপেই জীবের স্থিতি। ইহাই তাহার লীলানন্দ আস্বাদনের একমাত্র দ্বার। ইহার ক্রমবিকাশ হইতে কি কি অবস্থার স্ফুরণ হয় তাহা যথাসময়ে আলোচনা করিব।

ব্রহ্ম পরমাত্মা ও ভগবান্, তিনটি অনুভূতির প্রত্যেকটিরই এক একটি স্থিতির অবস্থা আছে। স্থিতি প্রাপ্ত হইলে এক অনুভূতি হইতে অন্য অনুভূতিতে উত্তীর্ণ হওয়া কঠিন হইয়া পড়ে। যেমন ব্রহ্মানুভূতির ফলে ব্রহ্মস্থিতি লাভ করিয়া পরমাত্মার অনুভূতি প্রাপ্ত হওয়া কঠিন—তদ্রূপ পরমাত্মানুভূতির ফলে পরমাত্মস্বরূপে স্থিতি লাভ করিয়া ভগবদনুভূতি লাভ করা কঠিন। বস্তুতঃ ভগবদনুভূতিও অনুরূপ স্থিতিকে পর্য্যবসিত হইয়া যাইতে পারে। যে পূর্ণত্বের আকাঙ্খা রাখে তাহার পক্ষে কোন স্থিতিতে আবদ্ধ হইবার সম্ভাবনা নাই। কারণ প্রত্যেকটি স্থিতি লাভ করিয়া এবং তাহাকে অতিক্রম করিয়াই তাহাকে চলিতে হয়। নিত্যলীলায় যাঁহারা বৃত হইয়াছেন তাঁহারা পরিপূর্ণ স্থিতি লাভ করিয়াও স্থিতিতে আবদ্ধ থাকেন না—তাঁহারা তৃপ্ত হইয়াও অতৃপ্ত। নিত্য মিলনের মধ্যেও তাঁহারা নিত্য বিরহের অনুভব করিয়া থাকেন। বিরহ অনুভব করেন বলিয়াই যে তাঁহাদের মিলনের সার্থকতা নাই তাহাও নহে। পক্ষান্তরে তাঁহাদের মিলন নিত্য বলিয়াই যে তাহাতে বিরহের উন্মেষ থাকিতে পারে না এমনও

নহে। বস্তুতঃ প্রত্যেকটি স্থিতিই পূর্ণ স্থিতি। ব্রহ্মরূপে যে বস্তু অভিন্ন সত্তাস্বরূপ, পরমাত্মরূপে সেই বস্তুই অনন্ত জীব ও অনন্ত জগতের একচ্ছত্র সম্রাট। পক্ষান্তরে ভগবদ্রূপে সেই একই বস্তু আপনারই মধ্যে—অর্থাৎ স্বীয় অখণ্ড অনন্ত সত্তার মধ্যে স্বীয় স্বরূপময় অনন্ত সাম্রাজ্যের অধীশ্বর। আবার ভগবৎরূপের মধ্যে সেই একই বস্তু চিদানন্দময় অখণ্ড অদ্বিতীয় সম্রাট ভাব হইতেও উত্তীর্ণ হইয়া অচিন্ত্য মাধুর্য্য ভাবের আস্বাদনে আপনাতে আপনি বিভোর। প্রত্যেকটি স্থিতিই পূর্ণ অথচ কোনটিই চরম নহে। আবার চরম নহে যে তাহাও বলা যায় না। কারণ যাহার যে প্রকার দৃষ্টি এবং লক্ষ্য— সে তদনুরূপ সত্তাতেই চরমত্ব অনুভব করিয়া পূর্ণ তৃপ্তি লাভ করিয়া থাকে। এই যে মহাস্থিতির মধ্যেও অনন্ত চলিষ্ণুতা, এই যে পাইয়াও আশা না মেটা—পরিপূর্ণতম তৃপ্তির মধ্যেও অতৃপ্তির পুনরুদয়, এই যে ভাবের মধ্যেও অভাবের অনুভূতি—ইহাই নিত্যানন্দময় স্বভাবের খেলা। কিছুই নাই—অথচ সবই আছে। পক্ষান্তরে সবই আছে অথচ কিছুই নাই। দুইই এক—উভয়ে কোনই ভেদ নাই। ইহাই অদ্বয় আস্বাদনের নিষ্কর্ষ।

শক্তি ও শক্তিমানের মধ্যে পার্থক্য এই যে শক্তির সঙ্কোচ এবং বিকাশ এই দুইটি অবস্থা আছে। কিন্তু শক্তিমানের স্থিতিতে কখনই কোন পরিবর্ত্তন হয় না—ইহা নিত্যই সাক্ষিরূপে নিজ শক্তির সঙ্কোচ ও বিকাশ রূপ খেলা দেখিতে থাকে। কিন্তু বস্তুতঃ ইহাও চরম কথা নহে। কারণ এই যে নিজ শক্তির খেলা দেখা ইহাও শক্তির কার্য্য। তাহা অন্তরঙ্গ শক্তি হইতে পারে, কিন্তু তাহাও তো শক্তি। সুতরাং এই দেখারও ভাব এবং অভাব দুইটি অবস্থা বিদ্যমান রহিয়াছে। যখন এই দেখা এবং না দেখার পার্থক্য লুপ্ত হইয়া যায়, অথচ দেখাও থাকে এবং না দেখাও থাকে ও উভয়ের মধ্যে কোন ভেদ থাকে না। তাহাই প্রকৃত অদ্বৈত অবস্থা।

যাহা হউক অত ভিতরে প্রবিষ্ট না হইয়া কতকটা বাহিরের দিক

হইতেই কয়েকটি কথা বলিতেছি। মায়াশক্তি এবং তাহার অন্তর্গত যে সকল অবান্তর শক্তি আছে তাহাদের স্ফুরণ হইলেই ব্রহ্মাণ্ড প্রভৃতি সৃষ্টির বিস্তার আরম্ভ হয়। আবার ঐ সকল শক্তির প্রত্যাহরণের সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র মায়িক সৃষ্টি সঙ্কুচিত হইয়া কারণের মধ্যে অন্তর্লীন হইয়া যায়। যে সময়ে সমগ্র মায়িক প্রপঞ্চ সমষ্টি ভাবে উপসংহৃত হয় তখন যে সকল জীবাণু পুঞ্জ মায়ায় অন্তর্গত কোন না কোন তত্ত্বকে আশ্রয় করিয়া, দেহেন্দ্রিয় যুক্ত হইয়া, কার্য্য ও ভোগ পথে বিচরণ করিতেছিল তাহারা আপনাপন আশ্রয়ভূত তত্ত্বে সুপ্তবৎ লীন হইয়া থাকে। ঐ সকল মায়িক তত্ত্ব প্রকৃতি বিকৃতি ভাবের ক্রম অনুসারে লীন হইতে হইতে চরম অবস্থায় মূলা প্রকৃতিতে লীন হইয়া যায়। একটি মহাকল্পের মধ্যে একটি মহা জীব অঙ্গিভাবে মায়াচক্র হইতে নিষ্ক্রান্ত হয়। অন্যান্য জীবের মধ্যে কতকটি ঐ মহাজীবের সঙ্গে অভিন্নভাবেই হউক অথবা ভিন্ন ভাবেই হউক উহাকে আশ্রয় করিয়া উহারই সঙ্গে সঙ্গে স্থিতি লাভ করে। ইহাদের ক্রমোন্নতির ধারা স্বতন্ত্র। দ্বিতীয় মহাকল্পে আবার পূর্ব সৃষ্টির ন্যায় ঐ সৃষ্টির বিস্তার হইতে থাকে। বহু নূতন জীব তখন অনাদি সুষুপ্তি হইতে উত্থিত হয়। প্রাচীন জীবের মধ্যে বহু জীব পুনরুদ্ভূত হয়। যে সকল জীব বিবেক জ্ঞানের প্রভাবে তটস্থ ভূমিতে অবস্থিত হয় তাহারা আর মায়াচক্রে ফিরিয়া আসে না। ঊর্দ্ধে উত্থিত হইবার উপযোগী আকর্ষণ লাভ করিলে ঊর্দ্ধে উত্থিত হইয়া ভগবদ্ধামে প্রবেশ করে। যতদিন সেরূপ অবসর না আসে ততদিন তটস্থ ভূমিতেই প্রতীক্ষা করে।

বলা বাহুল্য, তটস্থ শক্তিরও সংকোচ প্রসার আছে। তটস্থ শক্তির সংকোচ অবস্থায় জীবাণু সকল তটস্থ ভূমিতে অন্ধকারময় অথবা আলোকময় প্রদেশে সুপ্তবৎ বিদ্যমান থাকে। ইহা একজাতীয় কৈবল্য। যখন তটস্থ শক্তির ক্ষোভ হয় তখন ঐ সকল অণু উদ্রিক্ত হয় এবং অন্তর্নিহিত অভাবের তাড়নায় ব্যাকুল হইয়া উঠে। পূর্ণ চৈতন্য পরিচ্ছিন্ন হইয়াই অণু চৈতন্য আকার ধারণ করে। ইহা অনাদি

সিদ্ধ ব্যাপার হইলেও তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের স্পষ্টতার জন্য তত্ত্ববোধের দিক্ দিয়া অসংকুচিত এবং সংকুচিত অবস্থার মধ্যে একটি ক্রম স্বীকার করিতেই হয়। চৈতন্যই আনন্দ। পূর্ণাবস্থায় চৈতন্যের সহিত আনন্দের পৃথক্‌ভাব থাকে না এবং অপৃথক্ ভাবও থাকে না। উভয়ই তখন একা। কিন্তু অপূর্ণাবস্থায় অর্থাৎ যখন চৈতন্য স্বীয় স্বাতন্ত্র্য বলে নিজেকে সংকুচিত করিয়া অণুরূপ ধারণ করে তখন চিদংশ হইতে আনন্দাংশ পৃথক হইয়া পড়ে। ইহার ফলে অণুচৈতন্যে অর্থাৎ চিদণুতে আনন্দাংশের অভাব থাকিয়া যায়। ইহাই চিদণুর চঞ্চলতার মূল কারণ। চৈতন্যের সংকোচের সঙ্গে সঙ্গেই অচিদ্‌রূপিণী মায়া বাহির হইতে আসিয়া তাহাতে আপন ছায়া প্রদান করে। এইজন্যই চিদণুর গর্ভে তাহার স্বরূপভূত ও স্বধর্ম আনন্দের প্রতিবিম্ব থাকিলেও উহা মায়ার আবরণে আচ্ছন্ন হইয়া থাকে। অণুতে শুধু অস্ফুট অভাব বোধটি মাত্র থাকে। ইহাই অস্পষ্ট স্মৃতিরূপে পুনর্বার তাহাকে আনন্দের সন্ধানে চালিত করে। ক্ষোভের সঙ্গে সঙ্গেই জীবাণুতে এইজন্য অভাব বোধ জাগিয়া উঠে। বস্তুতঃ জড় রাজ্যে অর্থাৎ মায়ারাজ্যেও ইহারই অনুরূপ ব্যাপার সংঘটিত হয়। বাস্তবিক পক্ষে মায়িক জগতের যে প্রতিক্ষণের পরিণাম উহাও এই সুপ্ত আনন্দকে পুনঃ প্রাপ্ত হইবার জন্যই। চিদণুর সহযোগ ব্যতিরেকে অচিদণু এই আনন্দ বা সাম্যাবস্থা লাভ করিতে পারে না। এই জন্য অচিদণুও চদিণুকে চায়। পক্ষান্তরে চিদণু ও অচিতের সাহায্য ব্যতিরেকে আনন্দকে লাভ করিতে পারে না বলিয়া অচিদণুকে চায়। বস্তুতঃ উভয়ে উভয়কে চায় আনন্দের জন্য। আনন্দই পূর্ণতা। পরে আমরা বুঝিতে পারিব চিৎ ও অচিৎ উভয়ের সার্থকতা এই প্রাপ্তির মধ্যে নিহত রহিয়াছে। ক্ষর, অক্ষর ও পুরুষোত্তম এই তিনটি তত্ত্বের ইহাই রহস্য। কারণ পুরুষোত্তমে ক্ষর এবং অক্ষর এই পরস্পর বিরুদ্ধে ধর্ম্মের সমন্বয়। পূর্ণ চৈতন্য, যাহার মানান্তয় পূর্ণানন্দ, অখণ্ড সত্তা স্বরূপ। ইহাই সচ্চিদানন্দ। কিন্তু খণ্ড সত্তাত্মক অণুচৈতন্যে আস্বাদনও নাই

বোধও নাই। ইহা প্রসুপ্ত ভাবের অবস্থা। ইহার পর ক্ষোভের উদয় হইলে পূর্ণ থাকিয়াও অপূর্ণবৎ প্রতিভাসমান হয়। ব্যাপক চৈতন্য অণু চৈতন্যে পরিণত হয় এবং চৈতন্যাত্মক বলিয়া এই অণু বস্তুতঃ আনন্দস্বরূপ হইলেও আনন্দের অভাবে চঞ্চল হইয়া ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করে। ইহা অভাব অবস্থা। ইহার পর যখন এই অণু প্রত্যাবর্তন মুখে ব্যাপকের সহিত মিলিত হয়—যখন বহিরঙ্গা মায়ার ছায়া তাহার স্বরূপ হইতে অপগত হয় তখন তাহার সমগ্র আনন্দ আবার ফিরিয়া আসে। নিজের স্বরূপভূত এবং স্বরূপধর্মভূত আনন্দকে ফিরিয়া পাইয়া অণু চৈতন্য বিভুর সহিত যোগাবস্থায় সেই পূর্ণানন্দের আস্বাদন অনন্ত প্রকারে লাভ করিতে সমর্থ হয়—ইহাই স্বভাব অবস্থা।

আমরা যে শক্তির সংকোচ ও বিকাশের কথা বলিয়াছি তাহা অন্তরঙ্গা বা স্বরূপশক্তি সম্বন্ধেও প্রযোজ্য। স্বরূপশক্তির সংকোচ অবস্থায়—শক্তি স্বরূপে লীন হইয়া যায়। প্রসার অবস্থায় উহা পুনর্ব্বার স্বরূপ হইতে প্রসারিত হয়। অষ্টকালীন লীলারহস্য উদঘাটন করিতে গেলে স্বরূপ শক্তির মধ্যেও যে সংকোচ ও প্রসার রহিয়াছে তাহা স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। স্বরূপশক্তির রাজ্যে অণু চৈতন্য প্রবিষ্ট হইলে স্বরূপশক্তির অনন্ত বিলাস বস্তুতঃ তখন অণুচৈতন্যেরই আনন্দবর্দ্ধনে নিযুক্ত থাকে। অণুরূপী অংশ বিভুরূপী অংশীর সহিত মিলিত না হইলে নিত্যলীলারই বা আস্বাদন গ্রহণ কে করে! যদিও অণু অনুগত ভাবেই এই আস্বাদন প্রাপ্ত হয়, তথাপি ইহা সত্য যে অনন্ত লীলাবিলাস তাহারই জন্য। স্বভাবে প্রবেশ করিতে গেলে অনুগত হইতেই হয়। বস্তুতঃ ভগবৎস্বরূপ ও স্বরূপশক্তি এই উভয়কে আশ্রয় করিয়া যে অনন্ত লীলাবিলাস অবিচ্ছিন্ন ধারাতে প্রবাহিত হইতেছে তাহা জীবেরই ভোগের জন্য। অথচ জীব জীব থাকিয়া তাহা ভোগ কবিবার অধিকারী নয়। জীবের আত্মবলি পূর্ণ না হইলে তাহার আত্মপ্রতিষ্ঠা পূর্ণ হইতে পারে না।

মায়াশক্তির বিস্তার অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডরূপে অব্যাকৃত আকাশের মধ্যে প্রকাশিত হয়। চিৎশক্তির বিস্তার অনন্ত বৈকুণ্ঠরূপে চিদাকাশের মধ্যে প্রকাশিত হয়। অনন্ত বৈকুণ্ঠের সমষ্টি মহাবৈকুণ্ঠরূপী সাম্রাজ্য যে আকাশে বিদ্যমান তাহাই চিদাকাশ। অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের সমষ্টি যে মহাশূন্যে প্রকাশ পায় তাহাই অব্যাকৃত আকাশ বা অচিদাকাশ। উভয়ের মধ্যে যে সাম্যরূপা শুদ্ধা শক্তি বিরাজ করিতেছে তাহারই নাম বিরজা নদী। এই জন্যই জীবকে ভগবদ্‌ধামে যাইতে হইলে পিণ্ড হইতে ব্রহ্মাণ্ডে, ব্রহ্মাণ্ড হইতে উত্তীর্ণ হইয়া বিরজাতে অবগাহনপূর্ব্বক সেখান হইতে উত্থিত হইয়া চিদাকাশ স্থিত ভগবদ্‌ রাজ্যে প্রবেশ করিতে হয়। প্রাকৃত শরীর ও ইন্দ্রিয় প্রভৃতি নিয়ে ভগবদ্ধামে প্রবেশ করা যায় না। এইজন্য প্রথমে স্থূল, সূক্ষ্ম, কারণ এই তিনটি শরীর চিরতরে বিসর্জ্জন দিয়া এবং বিশুদ্ধ সত্ত্বময় অপ্রাকৃত বিগ্রহ গ্রহণ-পূর্ব্বক ভগবদ্‌ধামে প্রবেশ করিতে হয়। পূর্ব্বে যে আমরা স্বরূপদেহের কথা বলিয়াছি এই অপ্রাকৃত দেহ বস্তুতঃ তাহারই নামান্তর। এই সম্বন্ধে বহু কথা বলিবার আছে, ক্রমে বলিব।

স্বরূপদেহ ভগবদ্ধাম প্রভৃতির বর্ণনা প্রসঙ্গে আনুষঙ্গিকভাবে অপ্রাকৃত জগতের কথা কিছু কিছু বলা হইয়াছে। অপ্রাকৃত জগতের কথা শুনিয়া বিচলিত হইবার কোন কারণ নাই। যদিও প্রচলিত দার্শনিক শাস্ত্রে এবং তদনুকূল সাধনায় নিরত সাধকশ্রেণীর মধ্যে অপ্রাকৃত জগতের কোনই সন্ধান পাওয়া যায় না তথাপি ইহা সত্য যে সর্বদেশে এবং সর্বকালে কোন কোন বিশিষ্ট সাধক ও সাধক সম্প্রদায় অপ্রাকৃত জগতের সন্ধান পাইয়াছেন এবং কোন না কোন প্রকারে তাহার আভাসও দিয়াছেন। এই প্রশ্নের সম্যক্‌ আলোচনা ঐতিহাসিক দৃষ্টি হইতে করিবার প্রয়োজন নাই। এই জন্য এই বিষয়ে অপ্রাসঙ্গিক বোধে কোনও সমালোচনা করা হইল না।

২

শক্তি-ধাম—লীলা-ভাব (ক)

প্রকৃতি ত্রিগুণাত্মিকা। সৃষ্টির প্রারম্ভে যখন গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থা ভঙ্গ হয় তখন ক্রমশঃ প্রকৃতি হইতে তত্ত্বসমূহের আবির্ভাব হইয়া থাকে। তত্ত্বান্তর পরিণাম নিষ্পন্ন হইলে ঐ সকল তত্ত্ব দ্বারা ভোগায়তন দেহ, ভোগের বিষয়ীভূত পদার্থ, ভোগের করণ ইন্দ্রিয়াদি এবং ভোগের অধিকরণ লোক লোকান্তর রচিত হয়। এই সকল লোক সৃষ্টপদার্থ এবং দেহ সাক্ষাদ্‌ভাবে না হইলেও পরম্পরাতে প্রকৃতি হইতেই উদ্ভূত। গুণত্রয়ের সন্নিবেশের তারতম্য নিবন্ধন ইহাদের মধ্যে পরস্পর ভেদ সিদ্ধ হয়। ভোক্তা পুরুষ কৃতকর্মের ফলভোগের জন্যই দেহগ্রহণে বাধ্য হয়। সুতরাং কর্মানুসারে যাহার যেরূপ ভোগ প্রাপ্য তদ্রূপ ভোগের উপযোগী দেহ তাহাকে গ্রহণ করিতে হয়। এইজন্য অর্থাৎ ভোগ বৈচিত্র্যের মূলে কর্ম্ম বৈচিত্র্য রহিয়াছে বলিয়া ভোগমূলক প্রাকৃতিক জগতের বৈচিত্র্য কর্মের বিচিত্রতা হইতেই সম্পন্ন হয়। ভোক্তাপুরুষ যখন কর্তৃত্বাভিমান বিলয়ের সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে সাক্ষিরূপে উপলব্ধি করে তখন আর তাহার ভোগের আবশ্যকতা থাকে না বলিয়া তাহার নিকট প্রাকৃতিক সৃষ্টির ধারা অর্থাৎ ত্রিগুণের বিসদৃশ পরিণাম সমাপ্ত হইয়া যায়। পরিণামের সমাপ্তি বলিতে পরিণামের ক্রম-সমাপ্তি বুঝিতে হইবে। কারণ প্রকৃতির স্বভাবসিদ্ধ সদৃশ পরিণাম তখনও থাকে। পুরুষ দ্রষ্টা হইয়া স্ব-স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়। অপ্রাকৃত জগৎ পুরুষের কর্মফল ভোগের জন্য নহে। অপ্রাকৃত জগৎ শুদ্ধ সত্ত্বময় অথবা বৈন্দব এবং সাক্ষাৎ চিন্ময় বা শাক্ত এই দুই প্রকারে বর্ণিত হইবার যোগ্য। বৈন্দব-জগত ত্রিগুণাতীত ও মায়াতীত হইলেও গুণময়। কারণ বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণ দ্বারা উহা রচিত। বিশুদ্ধ সত্ত্ব অত্যন্ত নির্মল, তাহাতে রজোগুণ ও তমোগুণের স্পর্শ কখনও হয় না এবং

হইতেও পারে না। এই বিশুদ্ধ সত্ত্বই মহামায়ার স্বরূপ বিন্দুতত্ত্ব। যখন বিশুদ্ধ সত্ত্ব ভগবদিচ্ছায় অথবা যুক্ত মহাযোগীর ইচ্ছায় পরিণাম প্রাপ্ত হইয়া অনন্ত দৃশ্যও ভোগ্য পদার্থরূপে আত্মপ্রকাশ করে তখনই বিশুদ্ধ সত্ত্বময় বৈন্দব জগতের আবির্ভাব হয়। ইহাও অপ্রাকৃত জগত কিন্তু সর্বথা গুণাতীত নহে। যাঁহারা এই জগতে অবস্থান করেন, কোনও স্তরের অধিষ্ঠাতা ঈশ্বররূপেই হউক অথবা উক্ত ঈশ্বরের সেবক বা ভক্ত রূপেই হউক তাঁহাদের দেহ বিশুদ্ধ সত্ত্বময়। উহার সহিত মায়া কিংবা অবিদ্যার কোন সম্বন্ধ নাই—উহা মায়িক দেহ নহে, কিন্তু সিদ্ধদেহ। ঐ দেহে কর্মফলের ভোগ হয় না। কারণ কর্ম করা এবং তদনুরূপ ফল ভোগ করা উভয়ই মায়িক জগতের ব্যাপার। যিনি কর্ম এবং মায়া উভয়ের অতীত হইয়াছেন তিনি কর্মও করেন না এবং তাহার ফল ভোগও করেন না। কর্মফল ভোগ হয় মায়িক সংসারে। কিন্তু বিশুদ্ধ সত্ত্বময় জগৎ কর্ম ও মায়ার অতীত বলিয়া মায়িক সংসারের অন্তর্গত নহে। অপ্রাকৃত রাজ্যের ইহাই নিম্নভূমি। নিম্ন এইজন্য বলিতেছি যে ইহা ত্রিগুণাতীত হইলেও গুণময়, সর্বথা গুণাতীত নহে। অপ্রাকৃত রাজ্যের ঊর্দ্ধ ভূমিতে এই বিশুদ্ধ সত্ত্বের ক্রিয়াও থাকে না। উহা শুদ্ধ চিন্ময়, সর্বপ্রকারে গুণাতীত। উহার কথা পরে বলিতেছি।

অপ্রাকৃত জগতের নিম্ন বা বাহ্য মণ্ডল এবং ঊর্দ্ধ বা আন্তর মণ্ডল পরস্পর সংশ্লিষ্ট, কারণ শুদ্ধ সত্ত্ব চিৎশক্তি দ্বারা উজ্জ্বলীকৃত হইয়াই স্বীয় পরিণাম সাধন করিয়া থাকে। সুতরাং বৈন্দব জগত এক পক্ষে যেমন মায়াতীত, অপর পক্ষে তেমনি চিৎশক্তির স্ফুরণাত্মক নহে। তথাপি চিৎশক্তির বিন্দু সত্তায় ওতপ্রোতরূপে নিহিত রহিয়াছে। বিন্দু স্বচ্ছ বলিয়া চিৎশক্তিকে ধারণ করিয়া প্রকাশ করিতে পারে। বস্তুতঃ বিন্দু চিৎশক্তিকে প্রকাশ করে না, চিৎশক্তিই বিন্দুর সহিত সংযুক্ত হইয়া স্বয়ংই জ্যোতিঃরূপে প্রকাশমান হয়। চিৎশক্তির সহিত বিন্দুর যোগ না থাকিলে জ্যোতিঃরূপে উহার প্রকাশ সম্ভবপর হয় না। অতএব বৈন্দব জগৎটি যে জ্যোতির্ময় মহামণ্ডল স্বরূপ তাহা বুঝিতে

পারা যায়। পক্ষান্তরে চিৎশক্তি যদিও বিন্দুসাপেক্ষ নহে—কারণ ইহা স্বতন্ত্র,—তথাপি যখন ইহা তত্তৎরূপে স্ফুরিত হয়—তখন বিন্দুর আভাস আবশ্যক হয়। কারণ বিন্দুর আভাস না থাকিলে চিৎশক্তির বাহ্য স্ফুর্ত্তি হইতে পারে না। শুদ্ধ সত্ত্বময় জগতের উপাদান শুদ্ধ সত্ত্ব বা বিন্দু, এবং চিৎশক্তিময় অর্থাৎ শাক্ত-জগতের উপাদান শক্তি। এই অংশে উভয়ে কিঞ্চিৎ পার্থক্য লক্ষিত হয়। কিন্তু শুদ্ধ সত্ত্বময় জগতের প্রকাশের জন্য যেমন চিৎশক্তি আবশ্যক তেমনি চিন্ময় সত্তার বাহ্য স্ফুরণের জন্যও সাক্ষাদ্ ভাবে না হইলেও শুদ্ধ সত্ত্বের আভাস আবশ্যক হয়।

অপ্রাকৃত জগতের অন্তর্মণ্ডল এবং বহির্মণ্ডল এই প্রকার বুঝিতে হইবে। বহির্মণ্ডলে তিনটি প্রকোষ্ঠ আছে। একটি মায়িক জগতের সৃষ্টি, স্থিতি, সংহার প্রভৃতি যাবতীয় কৃত্য সম্পাদনের যোগ্যতা বিশিষ্ট অধিকারী পুরুষগণের আবাসভূমি। যাঁহারা আধিকারিক, যাঁহাদের উপর মায়িক জগতের অসংখ্য কর্ম্মভার বিন্যস্ত রহিয়াছে, তাঁহারা অপ্রাকৃত জগতের বহির্মণ্ডলের এই প্রকোষ্ঠে অবস্থান করেন। ইহার বিশেষ বিবরণ সময়ান্তরে দেওয়া হইবে। সৃষ্টি, সৃষ্ট পদার্থের রক্ষণ, সংহার, অনুগ্রহ ও নিগ্রহ—এই সকল ভগবৎকৃত্য—যোগ্যতা সম্পন্ন অধিকারবর্গের উপর ন্যস্ত আছে। অধিকারিগণের মধ্যে যাঁহার যে কার্য্যে অধিকার স্বীয় শুদ্ধ বাসনা এবং স্বরূপ যোগ্যতা অনুসারে নিরূপিত হয় তাঁহাকে সেই কার্যে নিযুক্ত থাকিতে হয়।

প্রত্যেক অধিকারীর আপন আপন ধামে সেবক পরিচারক প্রভৃতি অসংখ্য আছে। প্রত্যেকেরই পৃথক পৃথক কর্ম নির্দিষ্ট আছে। ইহারা সকলেই শক্তিযুক্ত। কারণ মহামায়া জগতে শক্তিহীনের স্থান নাই। আপনা আপন শক্তির সাহায্যে ইঁহারা স্বীয় কর্তব্য নিষ্পন্ন করিয়া থাকেন। এইটি বাহ্যমণ্ডলের ঐশ্বর্য্যের দিক্। তাহার পর আর একটি প্রকোষ্ঠ আছে যাহাতে শুধু মাধুর্য্য অথবা চিদানন্দের আস্বাদনই মুখ্যরূপে বিদ্যমান। এইটি সেই মহামন্দিরের অন্তর্গত ভোগমন্দির

বলিয়া বর্ণিত হইবার যোগ্য। যে সকল মহাপুরুষ জাগতিক অধিকারে বীততৃষ্ণ, যাঁহারা স্বরূপানন্দ উপভোগ করিবার জন্য স্থির এবং শান্তভাবে আপনাতে আপনি সমাহিত, তাঁহারা এই প্রকোষ্ঠে অবস্থান করেন। ইঁহারা কৃতকৃত্য হইয়া যাবতীয় কর্ত্তব্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াছেন। স্বরূপানন্দের আস্বাদনই ইঁহাদের একমাত্র লক্ষ্য। বাহ্যমণ্ডলের তৃতীয় প্রকোষ্ঠে সেই সকল মহাপুরুষের অবস্থিতি যাঁহারা অধিকার এবং ভোগ উভয় হইতেই বিরত। বস্তুতঃ এই তৃতীয় প্রকোষ্ঠ হইতেই অন্তর্মণ্ডলে প্রবেশ হইয়া থাকে। তবে সকলেরই যে হইবে এরূপ কথা নাই। মায়িক জগতে যেমন কর্ম করা এবং ভোগের আস্বাদন করা এই দুইটি ব্যাপার আছে, তেমনি মহামায়ার জগতেও অতি বিরাট ভাবে কর্ম করা এবং ভোগের আস্বাদন করা এই দুইটি ব্যাপার রহিয়াছে। কিন্তু উভয়ে পার্থক্য এই—মায়িক জগতের কর্ম এবং ভোগের মূলে কর্ত্তৃত্বাভিমান বিদ্যমান রহিয়াছে, কিন্তু মহামায়ার জগতে কর্ম ও ভোগের মূলে তাদৃশ কোন অভিমান নাই। মায়িক জগতের কর্ত্তা কর্ম করে স্বার্থের জন্য অর্থাৎ ইষ্ট বা সুখের প্রাপ্তি এবং অনিষ্ট বা দুঃখের পরিহারের জন্য. কিন্তু মহামায়া জগতের কর্ত্তা— যিনি কর্ত্তা হইয়াও অকর্ত্তা এবং অকর্ত্তা হইয়াও কর্ত্তা—কর্ম করেন পরার্থে অর্থাৎ অন্যের দুঃখ নিবৃত্তির উদ্দেশ্যে। মহামায়ার জগতে অধিকারী-বর্গের মধ্যে স্বার্থের জন্য কর্ম লেশমাত্রও বিদ্যমান নাই। অধিকারীবর্গ সকলেই নিঃস্বার্থ, পরোপকারী এবং অনন্ত করুণার ভাণ্ডার। তাঁহাদের মধ্যে কাহারও মলিন বাসনা নাই—কারণ তাঁহারা ক্লিষ্ট অজ্ঞানের রাজ্য অতিক্রম করিয়া আসিয়াছেন। কিন্তু তাই বলিয়া তাঁহারা কামনা রহিত নহেন। তাঁহাদের উদ্দেশ্য জগতের কল্যাণ সাধন। ইহাই নিষ্কাম কর্ম। ইহাই 'যোগস্থ' কর্ম। ইহাই ভগবানের যন্ত্ররূপে কর্ম সম্পাদন। ইঁহাদের শুদ্ধ কামনা রহিয়াছে। কারণ ইঁহারা অনন্ত করুণার দ্বারা প্রেরিত হইয়া ভগবানের সেবকরূপে জগতের দুঃখ নিবৃত্তিরূপ ভগবৎকার্য্য সম্পাদন করিয়া থাকেন। মহামায়া জগতের

কর্ম এবং মায়িক জগতের কর্ম মধ্যে পার্থক্য ইহা হইতে বুঝিতে পারা যাইবে। তদ্রূপ ভোগ সম্বন্ধেও পার্থক্য রহিয়াছে। মায়িক জগতের ভোগ যতই শুদ্ধ হউক, বিষয়ানন্দের আস্বাদন ভিন্ন অপর কিছু নহে। কিন্তু মহামায়া জগতের ভোগ বস্তুতঃ আত্মস্বরূপেরই আস্বাদন। কারণ ঐস্থানে বিষয় নাই। আনন্দস্বরূপ আত্মাই তখন অন্তর্মুখ হইয়া বিশ্রান্তভাবে নিজ স্বরূপের আস্বাদন করিয়া থাকেন। তৃতীয় প্রকোষ্ঠে বিরাট কর্ম এবং বিরাট ভোগ ইহার কিছুই নাই। বহির্মুখ অবস্থায় কর্ম ও অন্তর্মুখ অবস্থায় ভোগ। কিন্তু যে সকল মহান্ আত্মা তৃতীয় প্রকোষ্ঠে বিরাজ করেন তাঁহারা বহির্মুখও নন এবং অন্তর্মুখও নন। তাঁহারা সাক্ষাৎ শিবভাবে প্রতিষ্ঠিত। তাঁহারাই বস্তুতঃ নিবৃত্ত, কারণ তাঁহারা পরমানন্দ হইতেও নিবৃত্ত।

এই তিনটি প্রকোষ্ঠ অপ্রাকৃত জগতের বাহ্যমণ্ডলের অন্তর্গত। ইহার মধ্যে তৃতীয় প্রকোষ্ঠ পর্য্যন্ত উপনীত হইলেই বুঝিতে পারা যায় যে বৈন্দব জগৎ উপসংহৃত হইয়া বিন্দুরূপে পরিণত হইয়াছে। বলা বাহুল্য এখানেও ভুবন আছে।

বৈন্দব জগতে যে তিনটি মুখ্য বিভাগ আছে তাহার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে। প্রত্যেক বিভাগের অন্তর্গত বিভিন্ন স্তরে অসংখ্য ধাম বিদ্যমান রহিয়াছে। আধিকারিক বিভাগে যে সকল ধাম আছে তাহার প্রত্যেকটি কমলের আকার ও চারিদিকে অসংখ্য দল এবং কোণ বিশিষ্ট। মধ্য বিন্দুরূপ কর্ণিকা লইয়া এক একটি ধাম রচিত হয়। ধামের যিনি অধিষ্ঠাতা তিনি মধ্য বিন্দুতে আসীন থাকেন। তাঁহার আশ্রিত ভক্ত পরিবার সখা এবং সেবক-মণ্ডল আপন আপন অধিকার যোগ্যতা এবং সম্বন্ধ অনুসারে চারিদিকে কোন না কোন দলে অবস্থিত হন। মণ্ডলের যিনি অধিষ্ঠাতা তিনি এবং তাঁহার আশ্রিতবর্গ তাঁহার অধীন কিংকর স্বরূপ। ইহাই স্বাভাবিক সম্বন্ধ। যাঁহারা দল আশ্রয় করিয়া থাকেন তাঁহারা সকলেই বিন্দুর দিকে অভিমুখ। সকলেই বিন্দুকে লক্ষ্য করিয়া স্ব স্ব কৃত্য সম্পাদন করিয়া থাকেন! এইভাবে

যখন তাঁহাদের যোগ্যতার বিকাশ ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে থাকে তখন তাঁহারা ঐ যোগ্যতার অনুরূপ স্তর প্রাপ্ত হন। অর্থাৎ ক্রমশঃই মধ্যবিন্দুর নিকটবর্ত্তী হইতে থাকেন। ইহা তাঁহাদের স্বভাব সিদ্ধ সাধনা। এই সাধনার পূর্ণ পরিণতিতে আশ্রিত বর্গ ক্রমশঃ মূল আশ্রয়ের নিকটবর্ত্তী হইতে হইতে চরম অবস্থায় তাঁহার সহিত সাযুজ্য প্রাপ্ত হন। এদিক যে সকল দলে তাঁহারা অধিষ্ঠিত ছিলেন ঐ সকল দল ক্রমশঃ বিন্দুতে লয় প্রাপ্ত হয়। যখন মণ্ডলাত্মক কমলের প্রত্যেকটি দল মধ্য বিন্দুতে লীন হইয়া যায় তখন একটি বিন্দু মাত্রই থাকে। ইহার পর ঐ পুষ্ট বিন্দু ক্রমশঃ উর্দ্ধগতি প্রাপ্ত হয় এবং তাহার বাসনার অনুরূপ অপর মণ্ডলে স্থিতি লাভ করে। ঐ স্থানেও এই প্রকারে প্রথমে বাহির হইতে অন্তর্মুখগতি এবং তদনন্তর সাযুজ্য লাভ হইয়া থাকে। যতদিন অধিকার মল সম্পূর্ণরূপে নিঃশেষ না হয় ততদিন এইভাবে ক্রমশঃ মলক্ষয় হইতে থাকে। ইহার পর শুদ্ধ ভোগ-বাসনা থাকিলে বাহ্য-মণ্ডলের দ্বিতীয় বিভাগে প্রবেশ হয়।

একটি মণ্ডল ভেদ করিয়া অপর মণ্ডলে যাত্রা করার যথার্থ হেতু পূর্ব্ব মণ্ডলের প্রতি বৈরাগ্যভাগের উৎপত্তি। যদি কাহারও কোন অবস্থাতে পূর্বেই এই বৈরাগ্য ভাব উদ্ভূত হয় তাহা হইলে তাহার পক্ষে ঐ স্তরে আর অগ্রসর হইবার আবশ্যকতা থাকে না। বৈরাগ্য হইলে এক মুহূর্তের জন্যও ঐ স্থানে অবস্থিতি হইতে পারে না। যে কোন অবস্থায় বৈরাগ্য হউক সেই অবস্থা হইতেই গতি হইয়া থাকে।

অধিকার মণ্ডলের যিনি মূল অধিকারী তিনি স্বতন্ত্র। যাঁহারা তাঁহার আশ্রিত তাঁহারা পরতন্ত্র অর্থাৎ এই মূল অধিকারীর অধীন। জ্ঞান ও ক্রিয়া শক্তি অভিন্নরূপে ঐশ্বর্য্যের আকারে প্রকটিত হয়। তন্মধ্যে জ্ঞান শক্তিতে আশ্রিত ও আশ্রয় উভয়ের মধ্যে এবং আশ্রিত বর্গের পরস্পরের মধ্যে কোন পার্থক্য নাই। কিন্তু ক্রিয়া শক্তির বিকাশের দিক দিয়া সর্বত্রই ক্রমবিকশিত ভেদ লক্ষিত হইয়া থাকে। শুদ্ধ বিদ্যার উদয় হওয়াই জ্ঞান শক্তির বিকাশ। ইহারই প্রভাবে

মায়া নিবৃত্ত হয় এবং মায়িক জগতের আকর্ষণ হইতে আত্মা চিরদিনের জন্য অব্যাহতি লাভ করে। শুদ্ধভাবে প্রবিষ্ট প্রত্যেক আত্মাই সমরূপে জ্ঞানশক্তি সম্পন্ন। কারণ তাহারা সকলেই মায়ার অতীত এবং অবিদ্যাহীন। জ্ঞান-শক্তির স্ফুরণ বিষয়ে শুদ্ধ জগতবাসী আত্ম-বর্গের মধ্যে পরস্পর কোন বৈলক্ষণ্য নাই। সকলেই বিভু অর্থাৎ সর্বব্যাপক। "সর্ব" বলিতে এখানে মায়িক জগতকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে মনে রাখিতে হইবে। অর্থাৎ মায়িক জগতের সর্ব বিষয়ের জ্ঞান এবং মায়িক জগতের সর্বত্র ব্যাপ্তি প্রতি আত্মাতে বিদ্যমান। কিন্তু ক্রিয়াশক্তির বিকাশ সকলের এক প্রকার নহে। প্রত্যেকটি মণ্ডলেই যিনি মণ্ডলেশ্বর রূপে মধ্য বিন্দুতে সমাসীন তাঁহার ক্রিয়া শক্তি সর্বাপেক্ষা অধিক বিকশিত। অন্যান্য সকলের বিকাশ তদপেক্ষা ন্যূন। তবে তাহাদের মধ্যেও পরস্পর ন্যূনাধিক ভাব রহিয়াছে। এই ক্রিয়া শক্তি বিকাশের তারতম্যের উপরেই আশ্রয় ও আশ্রয়বর্গের মধ্যবর্ত্তী ব্যবধান নির্ভর করে সুতরাং ইহা হইতে স্পষ্ট বুঝিতে পারা যাইবে যে যে সকল আত্মা কমলের বাহ্যদলে উপবিষ্ট তাহারা সর্বজ্ঞ ও সর্বব্যাপক হইলেও ক্রিয়াশক্তি বিষয়ে অত্যন্ত নিকৃষ্ট। যেমন যেমন এই শক্তির বিকাশ বাড়িতে থাকে তেমনি তেমনি এই সকল আত্মা বাহ্যদল হইতে অপেক্ষাকৃত আন্তরদলে স্থান লাভ করে। সঙ্গে সঙ্গে ঐ দলও লীন হইয়া যায়। এই প্রণালী অনুসারে যখন সকল আত্মাই ক্রম-বিকাশের ফলে মধ্যে বিন্দুতে উপনীত হয় এবং মূল অধিকারীর সহিত যোগযুক্ত হয় তখন আর রাজাটি অভিব্যক্ত থাকে না। রাজ্য তখন রাজার স্বরূপে অস্তমিত হয়। এক রাজাই তখন অনন্ত স্বাংশ লইয়া একাকী বিরাজ করেন।

বৈন্দব জগতের আধিকারিক বিভাগে সর্বত্রই এই নিয়ম। ভোগ বিভাগে কিঞ্চিৎ পার্থক্য আছে। যে কমলে চিদানন্দের ভোগ নিষ্পন্ন হয় তাহা পূর্বোক্ত কমলের সহিত অনেক বিষয়েই সাদৃশ্য সম্পন্ন হইলেও তাহাতে কিঞ্চিৎ বৈশিষ্ট্য আছে। কিন্তু বৈশিষ্ট্য থাকিলেও মূলাধার

একই প্রকার। কারণ আনন্দের বিকাশও প্রতি আত্মায় সমরূপে হয় না। ঐ স্থানেও ক্রিয়াশক্তির বিকাশের তারতম্য মূলক তারতম্য লক্ষিত হয়। কমলের বাহ্যদলে যে আত্মা উপবিষ্ট তাহার আনন্দ ও কমলের মধ্য বিন্দুতে আসীন আত্মার আনন্দ তুল্য হইতে পারে না; এই প্রকার সকল আত্মার মধ্যেই আনন্দের অনুভূতিগত অর্থাৎ অনুভূতির মাত্রাগত উৎকর্ষ অপকর্ষ রহিয়াছে। পূর্বোক্ত নীতি অনুসারে মধ্য বিন্দুস্থ আত্মাই পূর্ণমাত্রায় আনন্দ আস্বাদন করিয়া থাকে। তাহার সহিত সান্নিধ্যের প্রকর্ষ অনুসারে অন্যান্য আত্মার অনুভূত আনন্দের মাত্রা নিয়মিত হয়। আসল কথা এই, একই মহান্ আনন্দ এই ভোগ কমল আশ্রয় করিয়া আত্ম-প্রকাশ করিতেছে। যাহার আধার যতটা বিকাশ প্রাপ্ত সে ইহার ততটা অংশ গ্রহণ করিতে সমর্থ হয়। তবে ইহা মনে রাখিতে হইবে যে ইহা স্বভাবতঃ পূর্ণানন্দ রাজ্য বলিয়া প্রত্যেকের আনন্দই মাত্রাগত তারতম্য সত্ত্বেও পূর্ণানন্দরূপে বর্ণিত হইবার যোগ্য। কারণ আনন্দ-ভবনে কাহারও পাত্র অপূর্ণ থাকে না। তবে পাত্রের উৎকর্ষ অথবা অপকর্ষ শক্তির বিকাশের তারতম্যের উপর নির্ভর করে।

অধিকার মণ্ডল ও ভোগ মণ্ডলের মধ্যে প্রধান পার্থক্য এই যে অধিকার সৃষ্টি ভাবাপন্ন এবং ভোগ স্থিতি ভাবাপন্ন। সৃষ্টি ও স্থিতি উভয়ের অতীত, অর্থাৎ শুদ্ধ কর্ম ও শুদ্ধ ভোগ উভয়ের অতীত, একটি লয় অবস্থা আছে। যে আত্মার বৈরাগ্য সম্যক্ প্রকারে সিদ্ধ হইয়াছে অর্থাৎ যে কর্ম ও ভোগ উভয় হইতেই বিরত হইয়াছে একমাত্র সেই এই তৃতীয় বিভাগে স্থান লাভ করিতে পারে। এই বিভাগটি লয়ের বিভাগ বা সংহারের বিভাগ। আত্মা এই অবস্থায় উপনীত হইলে মহামায়ার রাজ্যের কেন্দ্র স্থলে প্রবিষ্ট হয়। শুদ্ধ জগতের কর্ম ও ভোগ তাহার বাহিরে পড়িয়া থাকে। এইখান হইতেই চিৎশক্তিময় আন্তর মণ্ডল অথবা লোকোত্তর ঊর্দ্ধমণ্ডলে প্রবিষ্ট হইতে হয়। আপাততঃ সে বিষয়ে কিছু বলিবার প্রয়োজন নাই।

অপ্রাকৃত জগতের বাহ্যমণ্ডলের সর্বত্রই অল্প-বিস্তর আণব মল আভাসরূপে বর্তমান থাকে। মহামায়ার রাজ্য ভেদ না হওয়া পর্য্যন্ত পূর্ণত্বলাভ হয় না। যদিও শুদ্ধ জগৎও শিবময়, যদিও এখানেও জরা ও মৃত্যু নাই এবং ইহাও এক হিসাবে মুক্তিস্থান, যদিও শুদ্ধ জগৎও মায়িক জগতের ন্যায় সংসারমণ্ডলরূপে পরিচিত হইবার যোগ্য নহে, তথাপি ইহা তত্ত্বাতীত নির্মল পরমপদ নহে। কারণ আত্যন্তিক শুদ্ধি সত্ত্বেও এখানে অচিৎ অথবা জড়সত্তা সর্বথা তিরোহিত হয় নাই। শুদ্ধ জগৎ জ্যোতির্ময় ইহা সত্য। শুদ্ধ জগতের দৃশ্য ও ভোগ্য-বস্তু এবং দেহ ইন্দ্রিয়াদি সবই জ্যোতির্ময় এবং সচ্চিদানন্দ স্বরূপকে অনুভব করিবার সর্বথা উপযোগী ইহাও সত্য। তথাপি ইহাকে শুদ্ধ চিদ্‌ভবন বলা চলে না। শুদ্ধ চিদ্‌ভবনে উপাদান রূপে অচিৎসত্তা থাকিতে পারে না। অর্থাৎ শাক্ত জগতের সবই শুদ্ধ চিৎশক্তিরূপ উপাদান হইতে আবির্ভূত, বিন্দুরূপ উপাদান হইতে নহে। শাক্ত জগত এই জন্যই লোকোত্তর এবং তত্ত্বাতীত।

চিদণু শুদ্ধ কৈবল্যাবস্থায় বিন্দুকে আশ্রয় করিয়া বিন্দুর সহিত অভিন্নভাবে বর্তমান থাকে। ভগবদনুগ্রহের প্রভাবে যখন এই জ্ঞান-সুষুপ্তি হইতে আত্মা জাগিয়া উঠে তখন তাহার জাগরণের সঙ্গে সঙ্গেই সে নিজেকে দেহ ধাম প্রভৃতির দ্বারা বৈশিষ্ট্যসম্পন্নরূপেই প্রাপ্ত হয়। এই ভাবে তাহার আত্মপ্রকাশ না হইলে সে স্বকীয় শুদ্ধ বাসনার উপযোগী বিরাট কর্ম ও বিরাট ভোগ সম্পাদনে সমর্থ হয় না। এমন কি, যেটি প্রকৃত লয়াবস্থা, যাহা শিবত্বের বা পরা মুক্তির পূর্বাভাস, তাহাও ঐ জ্ঞান সুষুপ্তিরূপ কৈবল্য হইতে প্রাপ্ত হওয়া যায় না।

কারণ ঐ কৈবল্যে অর্থাৎ বিজ্ঞান কৈবল্যে আত্মার পশুভাব বিনষ্ট হয় না। কিন্তু শিব কৈবল্যে উহার পশুভাব মোটেই থাকে না। পূর্বাবস্থা হইতে দ্বিতীয়াবস্থায় উপনীত হইবার জন্য সমগ্র বৈন্দব জগতের চক্রটি আবর্তন করিতে হয়। কারণ অশুদ্ধ বাসনা তো দূরের

কথা, শুদ্ধ বাসনা লইয়াও পূর্ণত্ব লাভ করা যায় না। শুদ্ধ বাসনারও চরিতার্থতা আবশ্যক।

দীক্ষার প্রভাবে সকল অভাব নিবৃত্ত হইলে শুদ্ধ বাসনার পূর্ণ তৃপ্তি স্বভাবতঃই সিদ্ধ হয়। বৈন্দব জগতের অন্তর্গত কোন ধামে স্থান লাভ করিতে হইলে দীক্ষা এবং তদ্‌ধামের অধিষ্ঠাতার আরাধনা, এই দুইটিই উপায়। যখন আদি সৃষ্টিতে পরমেশ্বর পরিপক্কমল বিজ্ঞানাকল অণু সকলকে দীক্ষা দিয়া বৈন্দব দেহে ভূষিত করেন তখন উহার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহাদের ধাম প্রভৃতিও বৈন্দব উপাদানে রচিত হইয়া প্রকাশিত হয়। ঐ সকল আত্মা বা অণু স্ব স্ব যোগ্যতা অনুসারে উচ্চ অথবা নিম্নস্তরের ধাম সকল প্রাপ্ত হন। বলা বাহুল্য, ঐ সকল আত্মা বিদ্যা অথবা বিদ্যাধিপতিরূপে ঐ সকল ধামের অধিষ্ঠাতা হইয়া কেন্দ্র মধ্যে অবস্থিত হন। অন্যান্য যে সকল আত্মা ভক্ত অথবা সেবক-রূপে পূর্বোক্ত অধিকারিবর্গের আশ্রিত হইয়া ধামে প্রবেশ লাভ করেন তাঁহারা কেহ বা দীক্ষার প্রভাবে এবং অপর কেহ আরাধনার দ্বারা ঐ অবস্থা লাভ করিয়া থাকেন। যাঁহারা আরাধনার প্রভাবে ধামে স্থিতি লাভ করেন তাঁহারা ঐ স্থানে আরাধনার ফলরূপে অধিকার অথবা ভোগ প্রাপ্ত হইয়া পুনরায় স্বীয় স্থিতিতে প্রত্যাবর্তন করেন। কিন্তু যাঁহারা দীক্ষিত হইয়া গুরু কর্তৃক উক্তধামে যোজিত হন তাঁহারা ঐ ধাম হইতে আর কখনও ফিরিয়া আসেন না! ঐ স্থান হইতে অধিকার ও ভোগের অবসানে তাঁহারা নিষ্কল পদ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।

এবার সংক্ষেপে অপ্রাকৃত জগতে অন্তর্মণ্ডলের কথা বলা যাইতেছে। বস্তুতঃ এই মণ্ডলকে আন্তর না বলিয়া ঊর্দ্ধ বা লোকোত্তরও বলা যাইতে পারে। কারণ বৈন্দব জগতের পর বিশ্ব-রচনার অন্তর্গত কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। সুতরাং যাহাকে মণ্ডল বলা হইতেছে তাহা এক হিসাবে বিশ্বাতীত। যদি বিশ্ব সাকার ও সগুণ বলিয়া বর্ণিত হইবার যোগ্য হয় তাহা হইলে বিশ্বাতীত সত্তা এক হিসাবে নিরাকার ও

নির্গুণ বলিয়া বর্ণিত হইবার যোগ্য। কিন্তু বস্তুতঃ অখণ্ড সত্তা নিরাকার হইয়াও সাকার এবং নির্গুণ। কারণ উহাতে বিশ্ব ও বিশ্বাতীতের কোন ভেদ নাই।

এই রহস্য অত্যন্ত দুর্ভেদ্য। ভগবানের বিশেষ অনুগ্রহ ব্যতিরেকে ইহা ভেদ করা সম্ভবপর নহে। বস্তুতঃ শুদ্ধ চৈতন্যসত্তা বিন্দুর অতীত। বিন্দু জাগতিক দৃষ্টিতে তাহার অধিষ্ঠান হইতে পারে, কিন্তু পারমার্থিক দৃষ্টিতে বিন্দু তাহার অধিষ্ঠান নহে। কারণ তাহা নিরালম্ব স্বতন্ত্র সত্তা। সেখানে আসন-আসীন ভেদ নাই। চৈতন্য বস্তু স্ব-শক্তি প্রভাবে অনন্ত আকারে নিত্য স্পন্দমান। এই অনন্ত আকার গুণময় প্রতীত হইলেও বাস্তবিক পক্ষে জাগতিক গুণ হইতে সর্বপ্রকারে বিলক্ষণ। অতএব বিশ্বাতীত সাকার নিরাকারকে আশ্রয় করিয়াই আত্মপ্রকাশ করিয়া থাকে। মৃন্ময় ঘট ও মৃন্ময় শরাব যেমন বিভিন্ন নাম ও রূপ বিশিষ্ট হইয়াও মৃত্তিকা ভিন্ন অপর কিছুই নহে, অথবা মৃত্তিকা যেমন মৃত্তিকা থাকিয়াও ঘট ও শরাব এই বিভিন্ন নাম রূপ লইয়া প্রকাশিত হয়, ঠিক সেইপ্রকার নিরাকার ও শূন্য সত্তা নিরাকার থাকিয়াও অনন্ত নাম ও অনন্ত আকারে ফুটিয়া উঠে। নাম ও আকার যেমন অনন্ত তেমনি গুণ-ক্রিয়া-ভাব প্রভৃতিও সব অনন্ত। এই জন্যই অপ্রাকৃত জগতের আন্তর মণ্ডল বা লোকোত্তর মণ্ডলের স্বরূপ বোধগম্য করা এত কঠিন। মহাশূন্যে আসীন না হইলে এই ঊর্দ্ধ মণ্ডলের কোন সন্ধান পাওয়া যায় না। মহাশূন্যে প্রতিষ্ঠিত হইয়া স্বীয় স্বাতন্ত্র্যবলে মহাযোগিগণ এই সকল ঊর্দ্ধ মণ্ডল প্রকাশিত করিয়াছেন। ইহাদেরও প্রকারগত অনেক বৈচিত্র্য আছে।

বৌদ্ধগণের বুদ্ধক্ষেত্র বস্তুতঃ এই মণ্ডলেরই একটি প্রকার বিশেষ। জৈন মতে সিদ্ধশিলার পরে কেহ কেহ ইহার আভাস প্রাপ্ত হন। সন্তগণ বিভিন্ন দ্বীপ নামে এই সকল ঊর্দ্ধধামকেই লক্ষ্য করিয়া থাকেন। বৈষ্ণবগণের বৈকুণ্ঠও স্বরূপতঃ ইহারই নামান্তর।

বর্ত্তমান আলোচনাতে অন্যান্য সম্প্রদায়ানুগত চিন্তার ধারা অনুসরণ

না করিয়া আগমানুমোদিত বৈষ্ণব সিদ্ধান্তের ধারাই আলোচ্যরূপে গ্রহণ করা যাইতেছে। এই সকল লোকত্তোর ধাম সংখ্যাতে অনন্ত। গুণ আকার ও শক্তির বিকাশ, ঐশ্চর্য্য-মাধুর্য্য প্রভৃতি ভাবের প্রকর্ষগত তারতম্য, প্রকৃতির বৈলক্ষণ্য—এই সকল কারণে উহারা অনন্ত বৈচিত্র্য সম্পন্ন। এইগুলি সংখ্যা প্রভিতিতে অনন্ত হইলেও চতুষ্পাদ ভগবানের ত্রিপাদ বিভূতির অন্তর্গত। তাঁহার একপাদ বিভূতিতে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড সম্বলিত প্রাকৃত জগৎ বিদ্যমান রহিয়াছে। যাহাকে অপ্রাকৃত জগৎ বলিয়া পূর্বে বর্ণনা করিয়াছি তাহা বস্তুতঃ এই ত্রিপাদ বিভূতিরই নামান্তর। কেহ কেহ ব্যাপী বৈকুণ্ঠ বলিয়াও ইহাকে নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

এই ব্যাপী বৈকুণ্ঠে পৃথক্ ভাবে অনন্ত প্রকারের অনন্ত ধাম বর্ত্তমান রহিয়াছে। জরা, মৃত্যু অথবা অন্যান্য প্রাকৃতিক বিকার এবং মায়া ও কালের প্রভাব ইহাদের মধ্যে কোনটিতেই নাই। এক হিসাবে ব্যাপী বৈকুণ্ঠ ও ভগবদ্ ধাম সমানার্থক, কিন্তু অন্তরতম ভগবৎ সত্তার সান্নিধ্যের তারতম্য বশতঃ ইহার মধ্যেও স্তর বর্ত্তমান রহিয়াছে। যে সকল বৈকুণ্ঠ এই ব্যাপী বৈকুণ্ঠের অভ্যন্তরে অনন্ত আকাশে নক্ষত্রপুঞ্জের ন্যায় অথবা অসীম সমুদ্র বক্ষে দ্বীপ মালিকার ন্যায় শোভা পাইতেছে, এই সকল ধাম গুণ, শক্তি, ভাব, ঐশ্বর্য্য, লীলা প্রভৃতির উৎকর্ষের আপেক্ষিক তারতম্য অনুসারে কোনটি অন্তরতম ভগবৎস্বরূপের অধিক নিকটবর্ত্তী এবং কোনটি বা অল্পাধিক ব্যবহিত। গোলক ও দিব্য বৃন্দাবনের কথা আপাততঃ উঠাইব না। ইহাদের বিশেষ আলোচনা পরে করা যাইবে।

এই যে ব্যাপী বৈকুণ্ঠের কথা বলা হইল ইহাকে পরব্যোম বা পরমব্যোম বলিয়াও কেহ কেহ নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। বৈদিক সাধকগণের পরমব্যোমও ইহারই নামান্তর। ইহা অক্ষর এবং চিদাকাশরূপী। ব্যাপী বৈকুণ্ঠের অন্তর্গত কোন কোন ধাম প্রয়োজন অনুসারে ভগবদিচ্ছায় যুগভেদে অংশতঃ পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয়।

ভগবানের অর্থাৎ পরমাত্মার স্বাংশরূপে যেমন অবতারগণ ভগবৎস্বরূপ হইতে অভিন্ন হইয়াও কিঞ্চিৎ ভিন্নরূপে তৎকার্য্য সাধনের জন্য নির্দিষ্ট আছেন, তদ্রূপ ঐসকল ধামও ভগবদ্ধামের অভিন্ন অংশরূপে পরিগণিত হইয়া থাকে। ভগবানের স্বাংশগণ যেমন প্রপঞ্চে কখনও কখনও অবতীর্ণ হন তদ্রূপ ঐ সকল স্বাংশের নিজ নিজ ধামও কখনও কখনও প্রপঞ্চে অবতীর্ণ হয়। অংশের অবতরণের সঙ্গে সঙ্গেই ধাম পরিকর প্রভৃতির ও অবতরণ হইয়া থাকে। অবশ্য এই অবতরণ পূর্ণভাবে হইতে পারে অথবা অপূর্ণভাবেও হইতে পারে এবং ইহা ভগবানের স্বাংশ সম্বন্ধে যেমন সত্য তেমনি ভগবানের স্বরূপ সম্বন্ধেও সত্য। কারণ কখনও কখনও প্রপঞ্চের মধ্যে ভগবানের অবতরণ হয়, এবং ঐ সময় তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার ধামও অবতীর্ণ হয়।

এই অবতরণও পূর্ণ ও অপূর্ণ এই উভয় রূপ হইতে পারে। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে অংশীরই হউক অথবা অংশেরই হউক, অবতরণ হইলেও মূলস্থান রিক্ত হয় না। পূর্ণের অংশও পূর্ণ এবং স্বরূপের বা অংশের পূর্ণাবতরণ হইলেও মূলধামে স্বরূপ ও অংশ পূর্ণরূপেই বর্তমান থাকে। কারণ "পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবা বশিষ্যতে।" প্রাপঞ্চিক ভূমিতে অর্থাৎ ভূলোকে প্রকটিত হইয়া নির্দ্দিষ্ট কাল পর্য্যন্ত উহা বিদ্যমান থাকে। জগতে তীর্থ মহিমা ইহারই উপর নির্ভর করে। পৃথিবীতে একদিকে যেমন স্বর্গাদি উৰ্দ্ধলোকের অবতরণ হয় অপরদিকে তেমনি মায়াতীত অপ্রাকৃত শুদ্ধ ধামেরও অবতরণ হয়। সাধারণতঃ তীর্থ শব্দে উভয় প্রকার স্থানকেই নির্দ্দেশ করা হইয়া থাকে। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে তীর্থ মাত্রই ধাম নহে। উৰ্দ্ধ প্রাকৃত লোক অথবা অথবা অপ্রাকৃত লোক পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়া তত্তদংশে অর্থাৎ ক্ষেত্রবিশেষে পৃথিবীর সহিত অভিন্নরূপে বর্তমান থাকে। ভগবান অবতীর্ণ হইলেও যেমন সাধারণ লোক তাঁহাকে প্রাকৃত মনুষ্য বলিয়াই মনে করে, কারণ লৌকিক দৃষ্টি দ্বারা ভগবৎ স্বরূপ গৃহীত হয় না, তদ্রূপ উৰ্দ্ধলোক পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়া পৃথিবীর সহিত অভিন্নরূপে বর্তমান

থাকিলেও সাধারণ মনুষ্য ঐ সকল স্থানের বৈশিষ্ট্য অথবা মাহাত্ম বাহ্য দৃষ্টিতে অনুভব করিতে পারে না। কিন্তু যাঁহাদের দৃষ্টি খুলিয়া গিয়াছে তাঁহারা ঐ সকল ক্ষেত্রে দৃষ্টিপাত করিলে পার্থিব ঐ সকল আকার ব্যতিরিক্ত দিব্য আকার সকল প্রত্যক্ষ দেখিতে পান। এই ভাবেই পৃথিবীতে যে সকল তীর্থ অথবা ধাম লুপ্ত হইয়া গিয়াছে শুদ্ধ দৃষ্টি সিদ্ধ সাধকবর্গের দ্বারা তাহাদের পুনরুদ্ধার হইয়া থাকে।

এই প্রসঙ্গে আরও একটি বিষয়ের উল্লেখ করা আবশ্যক মনে হইতেছে। ইহা অত্যন্ত গুহ্য হইলেও ইহার তত্ত্বাংশ জানিয়া রাখা উচিত। ধাম অথবা ক্ষেত্র এক আধার হইতে অন্য আধারে সঞ্চারিত হইতে পারে, অথবা এক আধারে অপ্রকট হইয়া অন্য আধারে প্রকট হইতে পারে। ইহা হইতে বুঝা যাইবে যেমন ভগবৎ স্বরূপ এক হইলেও তাহার অনন্ত প্রকাশ আছে আবার শুধু প্রকাশ নয়—তাহার বিলাস মূর্ত্তিও ভিন্ন ভিন্ন আছে—এবং শুধু বিলাস নহে তাহার স্বাংশ মূর্ত্তিরও পার্থক্য আছে ঠিক, সেই প্রকার তাঁহার ধাম সম্বন্ধেও বুঝিতে হইবে। অর্থাৎ দৃষ্টান্তস্বরূপ নারদের দ্বারকাতে ভগবদ্ দর্শনের কথা বলা যাইতে পারে। নারদ দ্বারকার অভ্যন্তরে ভগবৎপ্রাসাদের অন্তর্গত প্রতি গৃহেই শ্রীকৃষ্ণের দর্শন পাইয়াছিলেন। এই সকল মূর্ত্তি সংখ্যাতে বহু হইলেও মূলে একই এবং ইহারা একেরই বহু প্রকাশ। ঠিক সেই প্রকার ভগবদ্ ধামও প্রকটিত অবস্থায় এক থাকা সত্বেও বহুরূপে প্রকাশমান হইতে পারে।

শুধু তাহাই নহে। ভগবৎ স্বরূপের যেমন বিলাস আছে ও পরমাত্মার স্বাংশ আছে—ভগবদ্ ধাম সম্বন্ধেও তেমনি বিভিন্ন আবির্ভাবের মধ্যে জ্ঞান ও শক্তিগত ন্যূনতা থাকিতে পারে। এই সকল বিভিন্ন প্রকারের প্রকাশ আবির্ভাব প্রভৃতির মধ্যে নিত্য ও নৈমিত্তিক ভেদও রহিয়াছে। যাহা নিত্য তাহা অবশ্যই সহজ বোধ্য, তাহার বিবরণ অনবাশ্যক। কিন্তু কোন বিশেষ নিমিত্ত বশতঃ ধাম প্রভৃতির স্থান বিশেষে এবং কাল বিশেষে অস্থায়ী প্রাকট্য হইতে পারে। অর্থাৎ সাধারণ কোন

স্থানেও কিছুক্ষণের জন্য শ্রীবৃন্দাবন প্রকট হইতে পারেন। সকল ধাম, তাহাদের অংশ এবং তীর্থ প্রভৃতি সম্বন্ধে ঐ একই নিয়ম বুঝিতে হইবে। ধামের অবতরণ প্রসঙ্গে আরও একটি বিষয় অনুধাবন করার যোগ্য। আমরা স্থূল দৃষ্টিতে কোন ক্ষেত্রকে যেরূপ বা যতটুকু দেখিয়া থাকি তাহা বাস্তবিক সেইরূপ এবং সেই পরিমাণ সব সময় থাকে না। অর্থাৎ আমরা বাহিরে লৌকিক দৃষ্টিতে যে স্থানটিকে বৃন্দাবন বলিয়া গ্রহণ করিতেছি তাহা আভ্যন্তরীণ বৃন্দাবন ধাম সংশ্লিষ্ট হইলেও বস্তুতঃ ঐ ধামটি বাহ্য বৃন্দাবনের সর্বথা অনুরূপ হয় না অর্থাৎ একহস্ত পরিমিত প্রদেশে সহস্র কোটি যোজন পরিমিত বৃন্দাবন ভূমি প্রকট হইতে পারে। আবার উহা সংকুচিত হইয়া এত ক্ষুদ্রায়তন হইতে পারে যে যাহাকে বাহ্য চক্ষুতে বৃন্দাবন বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইতেছে তাহাতে যথার্থ অপ্রাকৃত বৃন্দাবন হয়ত একটি পরমাণু মাত্র। ধামের সংকোচ এবং প্রসার স্বভাবসিদ্ধ ধর্ম। বৃন্দাবনে যমুনাতটে যখন রাসোৎসব হইয়াছিল তখন অনন্তকোটি গোপী সেখানে সম্মিলিত হইয়াছিল। এ যমুনাতট যে স্থূল দৃষ্টির গোচরীভূত যমুনাতটের সহিত সমপরিমাণ নহে তাহা বলাই বাহুল্য। মনুষ্যের আত্মা যেমন বিভু হইয়াও ক্ষুদ্র ভৌতিক দেহে আবদ্ধ থাকে তদ্রূপ অনন্তব্যাপী বৃন্দাবন ক্ষুদ্র পার্থিব ক্ষেত্রের মধ্যে অসীম থাকিয়াও যেন সীমাবদ্ধ থাকে। ধাম সকলের এই বৈশিষ্ট্য বিশেষ-ভাবে প্রণিধান যোগ্য।

পূর্বে যে ব্যাপী বৈকুণ্ঠের কথা বলা হইয়াছে তৎসম্বন্ধে আনুষঙ্গিক ভাবে আরও বহু বিষয় জানা আবশ্যক। এই ব্যাপী বৈকুণ্ঠ চতুষ্পাদ ব্রহ্মের ত্রিপাদ বিভূতি। অর্থাৎ তাঁহার মহা বিভূতির তিন পাদই ব্যাপী বৈকুণ্ঠরূপে নিত্য বিরাজমান। শুধু একপাদ অবিদ্যা দ্বারা আক্রান্ত। এইজন্য মহাবিভূতি ত্রিপাদ এবং একপাদ এই দুইয়ের সমষ্টি স্বরূপ। একপাদ বিভূতি যেমনি সাকার ত্রিপাদ বিভূতিও তেমনি সাকার। অথচ প্রথমটি অনিত্য এবং দ্বিতীয়টি নিত্য। কারণ

একপাদ বিভূতি সাবয়ব। অবয়ব-সমূহের সংঘটন ও বিঘটনের উপর উহার উৎপত্তি ও বিনাশ নির্ভর করে। সাবয়ব বলিয়াই ইহা অনিত্য। বস্তুতঃ ইহা শুধু সাবয়ব নহে সোপাধিকও বটে। কারণ বিশুদ্ধ ব্রহ্ম চৈতন্যের উপর অবিদ্যারূপ উপাধির আরোপ এই একপাদ বিভূতিতেই হইয়া থাকে।

পক্ষান্তরে ত্রিপাদ বিভূতি সাকার হইলেও নিরবয়ব। ইহা নিরুপাধিক ব্রহ্ম চৈতন্য স্বরূপ। ইহা যে নিত্য তাহা পূর্বেই বলা হইয়াছে। নিরবয়বতাবশতঃ অবয়বসমূহের সংঘটন-বিঘটনের সম্ভাবনা নাই বলিয়া জন্ম-মৃত্যুর প্রশ্নই ত্রিপাদ বিভূতিতে উঠিতে পারে না।

একপাদ বিভূতি স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণ এই তিন ভাগে বিভক্ত হইবার যোগ্য। প্রণবের অকার, উকার ও মকারকে আশ্রয় করিয়া একপাদ বিভূতি অবস্থান করে। ত্রিপাদ বিভূতি অর্দ্ধমাত্রার অন্তর্গত। বস্তুতঃ সমগ্র ত্রিপাদই তুরীয় অবস্থার দ্যোতক। ইহার মধ্যে যে পাদত্রয় কল্পনা করা হইয়াছে, তাহা ত্রিপাদ বিভূতির স্বরূপগত অভেদের বিরোধী নহে। অর্থাৎ পাদত্রয়ই স্বরূপের এবং স্বরূপশক্তির দিক্ হইতে অভিন্ন হইলেও শক্তির বিলাসের তারতম্য অনুসারে তিনটি পৃথক্ পাদরূপে কল্পিত হইয়াছে। তার মধ্যে প্রথম পাদটি বিদ্যারূপ, দ্বিতীয় পাদটি আনন্দরূপ এবং তৃতীয় পাদটি বিদ্যা ও আনন্দ উভয়ের অতীত অথচ উভয়াত্মক রূপ। মহাবিভূতির দিক্ হইতে ইহাই তুরীয় পাদ। ত্রিপাদ বিভূতির ঠিক মধ্যস্থানে অর্থাৎ আনন্দপাদের কেন্দ্র-স্থানে বৈকুণ্ঠ নগর—যাহা আদি নারায়ণের বিলাস নিকেতন—প্রতিষ্ঠিত। অবিদ্যাপাদে যেমন অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ড বর্তমান রহিয়াছে, তেমনি উর্দ্ধতন পাদত্রয়েও অনন্ত কোটি বৈকুণ্ঠ চিন্ময় উজ্জ্বল আলোকে বিরাজ করিতেছে। কিন্তু এই সকল বৈকুণ্ঠ শুধু বিদ্যা, আনন্দ প্রভৃতি পাদ ভেদে যে পৃথক্ তাহা নহে—প্রতিপাদেও পরস্পর পৃথক্। অবিদ্যাপাদেও বৈকুণ্ঠ আছে। ইহার বিবরণ পরে বলা যাইবে।

তবে তাহা মূল বৈকুণ্ঠের প্রতিবিম্ব স্বরূপ। ত্রিপাদ বিভূতিতে নিত্য এবং মুক্ত এই দুই প্রকার পুরুষ অধিষ্ঠান করেন। নিত্যগণ অনাদি কাল হইতেই মায়া এবং অবিদ্যা দ্বারা অস্পৃষ্ট। তাঁহাদের অপ্রাকৃত দেহ অনাদি সিদ্ধ। মুক্তগণ পূর্বে অবিদ্যা পাদে অবস্থিত থাকিলেও সাধনার উৎকর্ষ, ভগবদ্ ভক্তির বিকাশ এবং লোকোত্তর ভগবৎ করুণার প্রভাবে মায়ামুক্ত হইয়া অপ্রাকৃত বিগ্রহ গ্রহণপূর্বক ভক্তরূপে ভগবদ্ধামে বিরাজ করিয়া থাকেন। নিত্য ও মুক্ত উভয় প্রকার পুরুষই ভগবদ্ ভক্ত। দেহাদির ন্যায় নিত্য গণের ভগবদ্ ভক্তিও অনাদি অনন্ত। মুক্তগণের দেহ প্রভৃতি এবং ভগবদ্ ভক্তি সাদি ও অনন্ত। উভয়ের মধ্যে পার্থক্য ইহাই। মুক্ত ও নিত্য উভয় প্রকার পুরুষেরই স্থিতি সম্বন্ধে সালোক্য হইতে সাযুজ্য পর্য্যন্ত অবস্থা ভেদে বহু বৈচিত্র্য দেখিতে পাওয়া যায়। তন্মধ্যে মুক্তগণের অতিরিক্ত বৈশিষ্ট্য এই যে অবস্থা বিশেষে তাঁহাদের মধ্যে কাহারও কাহারও দেহধারণ ইচ্ছাকৃত এবং বৈকল্পিক ভাবে হইয়া থাকে। অর্থাৎ তাঁহারা যখন দেহ প্রভৃতি গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করেন তখন দেহ-বিশিষ্ট রূপে আবির্ভূত হন, এবং যখন তাহা না করেন তখন বিদেহ রূপে বর্তমান থাকেন। বস্তুতঃ বিদেহরূপে স্থিতি ভগবদ্ধামে স্থিতি নহে। তাঁহাদের দেহাদি পরিগ্রহ বাসন্তিক উৎসব নিবন্ধন, বেশভূষাদি গ্রহণের ন্যায় ঐচ্ছিক ও বৈকল্পিক। এই সকল দেহাদির আবির্ভাব আধ্যাত্মিক বিকাশের তারতম্য অনুসারে কোন স্থলে ভগবদ্ ইচ্ছামূলক ভক্তের ইচ্ছা সাপেক্ষ —আবার এমন স্থলও আছে যেখানে ইচ্ছার উদয় না হইলেও মহা ইচ্ছা অথবা স্বভাব হইতেই কখনও কখনও ঐ প্রকার দেহাদি পরিগ্রহ হইয়া থাকে।

এই সকল দেহের আবির্ভাব ও তিরোভাব বাস্তবিক পক্ষে উৎপত্তি ও বিনাশ নহে। কারণ নিত্য জগতে উৎপত্তি বিনাশ থাকিতে পারে না—এই কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। এই আবির্ভাব ও তিরোভাব এক হিসাবে সংকোচ ও প্রসারণ ক্রিয়ার ফল মাত্র। বস্তুতঃ যে সকল

ভক্তের দেহ কখনও নিত্যধামে প্রকট হয় ও কখনও অপ্রকট হয়—তাহারা দুই শ্রেণীতে বিভক্ত হইবার যোগ্য। কাহারও কাহারও দেহসিদ্ধি নিবন্ধন নিত্যদেহ প্রাপ্তি হইলেও ঐ দেহের সহিত তাঁহাদের সম্বন্ধ সংরক্ষণ তাঁহাদের স্বীয় ইচ্ছার উপর নির্ভর করে। এইজন্য যখন তাঁহারা ঐ দেহ গ্রহণ করেন তখন তাঁহারা প্রকট হন আর যখন তাঁহারা ঐ দেহ পরিহার করেন তখন তাঁহারা অপ্রকট হন। বলা বাহুল্য, দেহের গ্রহণ ও পরিহার থাকিলেও দেহ কিন্তু নিত্যই থাকে, তাহা নষ্ট হয় না। কেবল পরিগ্রহ ও পরিহার এই দুইটি ব্যাপার-বশতঃ কখনও উহা আবির্ভূত হয়, কখনও হয় না। কিন্তু আর এক শ্রেণীর ভক্ত আছেন, তাঁহারা আধ্যাত্মিক উৎকর্ষের অনেক উর্দ্ধে উঠিয়া গিয়াছেন—বস্তুতঃ তাঁহারা নিত্যজগৎ ভেদ করিয়া গিয়াছেন। নিত্য জগতে তাঁহাদেরও আবির্ভাব ও তিরোভাব হইয়া থাকে। ইঁহাদের পক্ষে নিত্যদেহের গ্রহণ ও পরিহার রূপ দুইটি ব্যাপার নাই। কারণ দেহসিদ্ধির পর এবং ঐ দেহের সহিত ইহাদের সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর যখন ইহারা উচ্চতর স্তরের সত্তা প্রাপ্ত হন,তখন সেই মহাশক্তিময়ী সত্তার দ্বারা নিত্যদেহ আচ্ছন্ন হইয়া যায়। ঐ অবস্থায় তাঁহারা নিত্যজগতে নিত্য প্রকট থাকিলেও নিত্যলোকবাসী তাঁহাদিগকে সমভাবে নিত্য দেখিতে পান না। কখনও তাঁহাদের আবির্ভাব এবং কখনও তাঁহাদের তিরোভাব নিত্যজগতে লক্ষিত হয়। এইস্থলে আবির্ভাবের কারণ নিত্যদেহের উপর হইতে তাঁহাদিগের দ্বারা ঐ মহাশক্তিময়ী সত্তার অবগুণ্ঠন উন্মোচন। অন্য সময়ে যখন ঐ অবগুণ্ঠন নিত্যদেহের উপর আসিয়া পড়ে তখন উহা অপ্রকট হইয়া যায়। প্রথমোক্ত ভক্তের স্থলে দেহ নিত্য হইলেও, ভক্ত ইচ্ছা করিলে তাহাকে গ্রহণ করিতে পারেন ও ইচ্ছা হইলে তাহাকে পরিহারও করিতে পারেন। এইজন্য ভক্ত কখনও সদেহরূপে নিত্যধামে প্রকট হন, কখনও মোটেই প্রকট থাকেন না। দ্বিতীয় ভক্তের স্থলে শুধু দেহ নিত্য নহে, দেহের সহিত ভক্তের সম্বন্ধও নিত্য। সুতরাং তাঁহার

পক্ষে দেহ গ্রহণ করা সম্ভবপর নহে, দেহ ত্যাগ করাও সম্ভবপর নহে। কারণ ঐ সম্বন্ধ ভাঙ্গিতে পারে না। তবে এই অবস্থায় একটি প্রবল শক্তির মধ্যে ভক্ত প্রবেশ লাভ করেন। এইজন্য নিত্যধামে তাঁহার শরীর দৃষ্টিগোচর হয় না। যখন সেই শক্তির আবেশ কিঞ্চিদ্‌ন্যূন হয় তখন তাঁহার সেই নিত্য শরীর লক্ষিত হয়—এই ভাবেই তাঁহার আবির্ভাব ও তিরোভাব ঘটিয়া থাকে।

ব্যাপী বৈকুণ্ঠরূপী চিদাকাশে অনন্ত বৈকুণ্ঠের সত্তা বিদ্যমান রহিয়াছে—একথা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। এই সকল বৈকুণ্ঠ এক হিসাবে ভগবদ্‌ধামরূপে পরিগণিত হইবার যোগ্য হইলেও যথার্থ ভগবদ্ ধাম নহে। ভগবানের যেটি পরমরূপ, যাহা স্বয়ংরূপ হইতে সর্বপ্রকার অভিন্ন অথচ যাঁহাকে সমগ্র ভগবৎস্বরূপের মূল আশ্রয় রূপে গ্রহণ করা হয় তাঁহার ধাম ব্যাপী বৈকুণ্ঠের মধ্যপ্রদেশে অবস্থিত। মণ্ডল এবং মণ্ডলের মধ্যবিন্দু যে প্রকার পরস্পর সম্বন্ধ ঠিক সেই প্রকার অসংখ্য ভগবদ্‌ধাম সমন্বিত ব্যাপী বৈকুণ্ঠ এবং মধ্যবর্ত্তী মুখ্য ভগবদ্‌ধাম পরস্পর সম্বন্ধ। এই মুখ্য ভগবদ্‌ধামকেই মহাবৈকুণ্ঠ বলিয়া অনেকে বর্ণনা করিয়া থাকেন। ত্রিপাদ বিভূতির অন্তর্গত বিদ্যাপাদ আনন্দপাদ এবং তদতীত পাদ সর্বত্রই ভিন্ন ভিন্ন বৈকুণ্ঠ বিরাজমান। কিন্তু মহাবৈকুণ্ঠ অথবা পরম বৈকুণ্ঠ ভগবানের যেটি পরম রূপ তাহারই স্ব-ধাম। বিদ্যা ও অবিদ্যা পাদের সন্ধিস্থলে যে বৈকুণ্ঠ নগর পরিদৃষ্ট হয় তাহা ব্যাপী বৈকুণ্ঠে প্রবিষ্ট হওয়ার মুখে প্রথম দ্বার স্বরূপ। ইহাকে বিষ্বক্‌সেন বৈকুণ্ঠ বলিয়াও কেহ কেহ বর্ণনা করিয়া থাকেন। আনন্দ পাদ ও বিদ্যাপাদের সন্ধিস্থলে একটি দিব্য স্রোতঃ প্রবাহিত হইতেছে দেখিতে পাওয়া যায়। এই স্রোতঃ আনন্দের ধারা বলিয়া ইহাকে আনন্দ তরঙ্গিণী নামে বর্ণনা করা হয়। ইহার পর নিত্য বৈকুণ্ঠ আনন্দ পাদের মধ্যস্থলে অবস্থিত। এই স্থানেই আদি নারায়ণের অবস্থিতি লক্ষিত হয়। ইহার পর আনন্দপাদ ও অতীত-পাদের সন্ধিস্থলে সুদর্শন বৈকুণ্ঠ অবস্থিত। সুদর্শন বৈকুণ্ঠে সুদর্শন

পুরুষ প্রতিষ্ঠিত আছেন। সুদর্শন বৈকুণ্ঠ ভেদ করিয়া আরও ঊর্দ্ধে উত্থিত হইতে পারিলে মহা-বৈকুণ্ঠের সাক্ষাৎকার হয়। ইহাই পরম বৈকুণ্ঠ। এই খানেই মহাযন্ত্র অবস্থিত, যাহার বিশেষ বিবরণ পরে দিবার চেষ্টা করিব। এই মহাবৈকুণ্ঠ ব্যাপী বৈকুণ্ঠ অথবা পরব্যোমের মধ্যেপ্রদেশে অবস্থিত।

আমরা পূর্বেই বলিয়াছি ভগবান্ ও পরমাত্মা একই প্রকাশের পূর্ণ এবং আংশিক এই দুইটি অবস্থার নাম। ষোলকলা শক্তির বিকাশ থাকিলে ভগবান্ এই শব্দের প্রয়োগ হয়। ভগবান্ এবং স্বয়ং ভগবান্ একই বস্তু। ভগবানে ঐশ্বর্য্যভাবের বিকাশ প্রধান রূপে থাকে। স্বয়ং ভগবানে থাকে মাধুর্য্যের বিকাশ। কিন্তু মাধুর্য্য থাকিলেও অবস্থা ভেদে তাহার সঙ্গে ঐশ্বর্য্যের মিশ্রণও থাকে। ঐশ্বর্য্য ভাবের মিশ্রণ শূন্য বিশুদ্ধ মাধুর্য্যভাব স্বয়ং ভগবানের অন্তরতম রূপ। ইহার বর্ণনা শ্রীকৃষ্ণ তত্ত্ব এবং শ্রীবৃন্দাবন রহস্য আলোচনা প্রসঙ্গে করা যাইবে। বৈষ্ণবাচার্য্যগণ স্বয়ং ভগবানে (৬৪) চৌষট্টিটি গুণের সত্তা ও ক্রিয়া স্বীকার করিয়াছেন, যাহার মধ্যে চারিটি গুণ তাঁহার অসাধারণ। ভগবানের পূর্ণ প্রকাশে (৬০) ষাটটি গুণ থাকা আবশ্যক। কিছু কিছু ন্যূনতা থাকিলেও ভগবত্তার হানি হয় না। ন্যূনতার আধিক্য হইলেই পরমাত্মভাবের সাক্ষাৎকার হয়। পরমাত্মাই পুরুষ। এক হিসাবে এই পুরুষই ভগবানের সর্বপ্রথম অবতার, এমনকি একমাত্র অবতারও বলা চলে। পরমাত্মভাব বিশ্লেষণ করিলে ক্রমশঃ ব্যূহ বিভব অন্তর্য্যামী এবং অর্চ্চা এই কয়েকটি ভগবদ্ ভাবের পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। স্বরূপশক্তির উন্মেষের তারতম্য নিবন্ধন এই সকল ভগবদ্ ভাবের মধ্যেও তারতম্য লক্ষিত হয়। অর্থাৎ ইহাদের মধ্যে কোনটি অংশিরূপে এবং কোনটি অংশরূপে পরিগণিত হইয়া থাকে। এই যে অংশ বলা হইল ইহা স্বাংশ ও ভিন্নাংশ ভেদে দুই প্রকার, একথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। অবতারাদি যাবতীয় ভগবদ্ বিভূতি নিত্য এবং স্বাংশ-রূপে গণ্য হয়। জীব ভিন্নাংশরূপে পরিগণিত হইয়া থাকে। অবশ্য কেহ

কেহ জীবকেও স্বাংশ মনে না করেন এমন নহে। নিত্যলীলার অবসরে এই স্বাংশ ও ভিন্নাংশবাদের মর্ম্মকথা বুঝিতে পারা যাইবে। অন্তরতম ভগবদ্‌ধামে ভগবানের পরমরূপ অধিষ্ঠিত আছেন। এই স্থান হইতে মায়ার সহিত সাক্ষাদ্‌ভাবে কোন প্রকার সম্বন্ধ হয় না—ইহাও এক হিসাবে বলা চলে। বস্তুতঃ শুধু মায়া নহে, মায়া কাল এবং অশুদ্ধ জীব ভগবদ্‌ধামে প্রবেশ পথ পায় না। সুতরাং ভগবানের পরমরূপ মায়ার অধিষ্ঠাতা হইতে পারে না। পরমাত্মারূপে ভগবানের যে আংশিক প্রকাশ তাঁহার সহিত মায়ার সম্বন্ধ আছে। পরমাত্মা ভগবানেরই বিলাস, সুতরাং স্বরূপতঃ ভগবান্ হইতে অভিন্ন। পরমাত্মা ভগবানেরই ন্যায় চিৎশক্তি সম্পন্ন তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু তথাপি চিৎশক্তির স্ফূর্তি ভগবত্তা হইতে কিঞ্চিন্ন্যূন থাকার দরুণ পরমাত্মা মায়ার অধিষ্ঠান করিতে পারেন এবং করিয়া থাকেন। মায়া বহিরঙ্গা শক্তি, সুতরাং এই অধিষ্ঠান তাঁহার দৃষ্টি দ্বারাই সিদ্ধ হইয়া থাকে।

পরমাত্মতত্ত্ব বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে একদিকে চতুর্ব্যূহ এবং অপর দিকে অবতার আদির তত্ত্ব আলোচ্য। ভগবৎস্বরূপ অর্থাৎ ভগবানের অপ্রাকৃত বিগ্রহ ছয়টি অপ্রাকৃত গুণ বা শক্তির দ্বারা রচিত। অর্থাৎ এই ছয়টি অপ্রাকৃত গুণের সমষ্টিকেই অপ্রাকৃত ভগবদ্ বিগ্রহ বলিয়া বর্ণনা করা হয়। ইহার দুইটি অবস্থা আছে—একটি নিত্যোদিত এবং একটি শান্তোদিত। যে রূপ সর্ব্বদাই প্রকাশমান, যাহার তিরোধান কখনই হয় না, তাহাই নিত্যোদিত রূপ; কিন্তু তিরোধান হইয়া পুনরাবির্ভাব হইলে ঐ রূপটিকে শান্তোদিত বলে। ভগবানের পরম রূপটি নিত্যোদিত। ইহাকে দিব্য সুরিগণ নিরন্তর সাক্ষাৎকার করিয়া থাকেন—"সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ।" ইহার উদয়ও নাই, অস্তও নাই। ইহা স্বয়ং-প্রকাশ চৈতন্যস্বরূপ। কিন্তু তাঁহার যেটি শান্তোদিত রূপ তাহাও ষাড়্‌গুণ্য বিগ্রহ, কারণ তাহাও ঐ ছয়টি অপ্রাকৃত গুণময়। কিন্তু উহার আবির্ভাব ও তিরোভাব আছে বলিয়া উহাকে শান্তোদিত বলা হয়। উহাতে স্বরূপ শক্তির বিকাশের

কিঞ্চিন্ন্যূনতা আছে। এইজন্য উহা পরমরূপ হইতে কিঞ্চিৎ ন্যূন বলিয়া পরিগণিত হয়। এই ছয়টি গুণ চারিটি ব্যূহের প্রত্যেকটিতেই বিদ্যমান আছে।

তবে প্রথম ব্যূহে উহা সমষ্টিরূপে এবং সমভাবে বিদ্যমান আছে এবং অন্যান্য তিনটি ব্যূহে দুইটি দুইটি করিয়া প্রধানরূপে বিদ্যমান আছে। অর্থাৎ দ্বিতীয় ব্যূহে প্রথম ও দ্বিতীয় গুণ পূর্ণরূপে বিদ্যমান এবং অন্যান্য চারিটি গুণ কিঞ্চিন্ন্যূন ভাবে। তৃতীয় ব্যূহে তৃতীয় ও চতুর্থ গুণ পূর্ণভাবে বিদ্যমান, অপর চারিটি গুণ কিঞ্চিন্ন্যূন ভাবে। চতুর্থ ব্যূহে পঞ্চম ও ষষ্ঠ গুণ পূর্ণভাবে বিদ্যমান এবং আর চারিটি ন্যূন ভাবে। মোটের উপর প্রত্যেকটি ব্যূহেতেই ছয়টি গুণ বিদ্যমান থাকে, তবে গুণ-প্রধান ভাবে। এইজন্য চারিটি ব্যূহের প্রত্যেকটিই ভগবৎ-স্বরূপ তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। ইহাদের সহিত মায়া অথবা প্রকৃতির সম্বন্ধ কি প্রকার তাহা এই স্থলে উল্লেখযোগ্য নহে।

বিভব অথবা অবতার মুখ্য ও গৌণ ভেদে দুই প্রকার। মুখ্য অবতার সাক্ষাৎ ভগবদংশ। গৌণাবতার—ভগবৎস্বরূপ অথবা শক্তি দ্বারা আবিষ্ট জীব। এইজন্য পরব্যোমে—মুখ্যাবতারের স্থান আছে, গৌণাবতারের স্থান নাই। পুরুষ অন্তর্যামিরূপে কাহারও কাহারও মতে অবতার পদবাচ্য। ব্যষ্টি জীবের অন্তর্যামী, সমষ্টি জীবের অন্তর্যামী এবং মহাসমষ্টি জীবের অন্তর্যামী এই ভাবে অন্তর্যামীও তিন শ্রেণীতে বিভক্ত হইবার যোগ্য। ব্যষ্টি হিসাবে এবং সমষ্টি হিসাবে অন্তর্যামী অসংখ্য। ইহারা হৃদয়াকাশে মুখ্য অন্তর্যামী পুরুষের প্রতিবিম্ব মাত্র। বলা বাহুল্য, বদ্ধজীব প্রকৃতির অন্তর্গত ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্গত পিণ্ড বিশিষ্ট হইলেও তাহার অন্তর্যামী আত্মা পরমাত্মার স্বাংশ ভিন্ন অপর কিছু নহে। ব্রহ্মাণ্ড অনন্ত বলিয়া ব্রহ্মাণ্ডা-ভিমানী জীবও অনন্ত। সুতরাং তাহাদের অন্তর্যামীও অনন্ত। বস্তুতঃ তাহারা এক অন্তর্যামীরই অনন্ত আভাস মাত্র। ব্যষ্টিপিণ্ড অনন্ত বলিয়া তদভিমানী জীবও অনন্ত। এই জন্য ব্যষ্টি জীবের অন্তর্যামীও

অনন্ত বলিয়াই গৃহীত হয়। কিন্তু বস্তুতঃ এই অনন্ত অন্তর্য্যামী একই অন্তর্য্যামীর অনন্ত আভাস মাত্র। ব্যাপী বৈকুণ্ঠে আন্তর্য্যামীরও স্থান আছে,—অবতারবর্গেরও স্থান আছে এবং চারিটি ব্যূহেরও স্থান আছে। ব্যাপক বৈকুণ্ঠের মধ্যে প্রত্যেকেরই নিজ নিজ ধাম আছে। এই সকল খণ্ড ধামও বৈকুণ্ঠ পদবাচ্য। ভূলোক প্রভৃতি স্থানে ভক্তগণ স্বীয় ভাবের অনুরূপ মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া এবং প্রতিষ্ঠিত করিয়া তাহাকে যথাবিধি সংস্কার করিলে—মন্ত্রশক্তি এবং ভক্তি প্রভৃতির প্রভাববশতঃ তাহাতেও ভাবানুরূপ ভগবৎ সত্তা ও শক্তির সান্নিধ্য হইয়া থাকে; এবং এইজন্য ঐ সকল মূর্ত্তিও ভগবদ্ বিগ্রহরূপে পরিগণিত হইয়া থাকে। পৃথিবীতে কেহ এইপ্রকার ভগবানের বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করিলে তাহা বাস্তবিক পক্ষে অপ্রাকৃত জগতে অর্থাৎ পরব্যোমেই প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকে। পৃথিবী হইতে তাহা লুপ্ত হইয়া গেলেও ব্যাপী বৈকুণ্ঠ হইতে তাহা লুপ্ত হয় না। কারণ তাহা ভগবদরূপ এবং অপ্রাকৃত। প্রাকৃতিক বিপর্য্যয়ে তাহার কোন বিকার বা পরিবর্ত্তন সম্ভবপর নহে। ব্যাপী বৈকুণ্ঠে ভগবানের এই সকল রূপও দেখিতে পাওয়া যায়। অর্থাৎ সিদ্ধ ভক্তগণ পৃথিবীতে ভগবানের যে রূপ স্থাপন করেন তাহা ব্যাপী বৈকুণ্ঠে বিরাজ করিয়া থাকে। মহাসমুদ্রে যেমন অসংখ্য অসংখ্য দ্বীপপুঞ্জ পরিদৃষ্ট হয়, নৈশ আকাশে যেমন অগণিত সংখ্যক নক্ষত্রমালা দৃষ্টিগোচর হয়, ঠিক সেই প্রকার পরমাকাশরূপ ব্যাপী বৈকুণ্ঠে খণ্ড খণ্ড অনন্ত বৈকুণ্ঠ ভগবদধামরূপে বিরাজমান রহিয়াছে। চারিদিকে এই প্রকার অসংখ্য বৈকুণ্ঠ দ্বারা পরিবৃত হইয়া ভগবানের পরম স্বরূপের পরমধাম—মহাবৈকুণ্ঠ মধ্যস্থলে বিরাজিত রহিয়াছে। ক্রমশঃ মহাবৈকুণ্ঠের প্রসঙ্গে কিছু বলা যাইবে।

পরব্যোমের কথা সংক্ষেপে কিছু কিছু বলা হইয়াছে। পরব্যোম অথবা ব্যাপী বৈকুণ্ঠ শ্রীভগবানের সাম্রাজ্য। ইহারই রাজধানী মহাবৈকুণ্ঠ পরব্যোমরূপ মহামণ্ডলের মধ্যস্থলে অবস্থিত। পরব্যোম

হইতে ঊর্দ্ধে স্বয়ং ভগবানের নিজধাম গোলোক বিরাজমান রহিয়াছে। পরব্যোমের বহিরঙ্গ ভাবে অর্থাৎ অধঃপ্রদেশে ব্রহ্মধাম অথবা মুক্তিপদ অবস্থিত। কোন কোন স্থানে ইহাকেই সিদ্ধলোক বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। ইহা জ্যোতিঃস্বরূপ ব্রহ্মের ধাম অথবা লোক। এইজন্য ইহাকে ব্রহ্মলোক বলিলেও এক হিসাবে সত্যের অপলাপ হয় না। ইহা বিশুদ্ধ চিদাত্মক। অনেকে ইহাকেই শ্রীভগবানের অঙ্গকান্তি বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। ভগবদ্ বিগ্রহ, ভগবৎ পার্ষদগণের ও নিত্যমুক্তগণের বিগ্রহ এবং ভগবদ্ ধাম—এই সকলের সমষ্টিভূত প্রভা জ্যোতির্ব্রহ্মরূপে সিদ্ধ সমাজে পরিচিত। কেবলাদ্বৈতিগণের নির্বিশেষ ব্রহ্ম ও পূর্বোক্ত জ্যোতির্ব্রহ্ম সর্বাংশে অভিন্ন নহে। কারণ কেবলাদ্বৈতীর ব্রহ্ম নির্বিশেষ, ধর্মবর্জ্জিত ও অদ্বিতীয়, কিন্তু জ্যোতির্ব্রহ্ম প্রকাশময়ত্বাদি ধর্ম বিশিষ্ট বলিয়া সর্বথা নির্বিশেষ নহে। এবং উহা অদ্বিতীয়ও নহে। কারণ দ্বিতীয়রূপ কারণ সত্তা এবং কার্য্য সত্তায় ইহা অধিষ্ঠানরূপে নিত্য প্রতিষ্ঠিত থাকে। যে সকল সাধক জীব ভগবৎ তত্ত্বের অনাদর না করিয়া ব্রহ্ম চিন্তাতে লিঙ্গ শরীর ধ্বংস পূর্বক সিদ্ধিলাভ করেন এবং ঐ সিদ্ধির ফলে বাসনা মুক্ত হইয়া ব্রহ্মাণ্ড ভেদ পূর্বক স্থিতি লাভ করেন তাঁহাদের চরম গতি এবং আপেক্ষিক দৃষ্টিতে পরম স্থিতি এই ব্রহ্মধাম বা সিদ্ধলোক। তাঁহারা প্রাকৃত দেহ হইতে মুক্ত হইয়া বিদেহ অবস্থা অবলম্বন পূর্বক স্বয়ং জ্যোতিঃস্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হন এবং ঐ মহাজ্যোতিঃতে অভিন্নরূপে স্থিতিলাভ করেন। বলা বাহুল্য, শুদ্ধ জ্ঞানের ফলে ঐ অবস্থা লাভ হইয়া থাকে। এক হিসাবে ইহাকেও পরমপদ বলা যায় এবং শ্রীমদ্ভাগবতে কোন কোন স্থলে তাহা বলাও হইয়াছে। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে শ্রীভগবানের প্রতি অবজ্ঞা অনাদরের ভাব হৃদয়ে পোষণ করিয়া ব্রহ্ম চিন্তায় রত হইলে তাহার ফলে পুনরাবৃত্তি রহিত শাশ্বত পদ লাভ হয় না। অবশ্য ঐ সকল সাধকগণও ব্রহ্মধামে উপনীত হন—তাহাতে সন্দেহ নাই, কিন্তু পূর্বোক্ত অপরাধ নিবন্ধন ব্রহ্মলোক হইতে তাঁহারা অধঃপতিত হন।

ব্রহ্মলোকে তাঁহাদের নিত্যস্থিতি হয় না। স্বয়ং ভগবান অথবা তাঁহার কোন অংশ অবতাররূপে প্রপঞ্চে প্রকটিত হইয়া সাক্ষাদ্‌ভাবে যে সকল দৈত্য অথবা রাক্ষসাদি শত্রুগণকে নাশ করেন তাহারাও জ্যোতিঃস্বরূপ এই ব্রহ্মধামে স্থিতিলাভ করে। শুদ্ধজ্ঞানী যেমন ভগবদ্ধামে প্রবিষ্ট হইতে পারে না—ভগবান কর্তৃক নিহত ভগবদ্‌দ্বেষিগণও সেই প্রকার ভগবদ্ধামে প্রবেশ করিতে পারে না। উভয়েরই গতি ভগবানের অঙ্গজ্যোতিঃস্বরূপ ব্রহ্মধামে। এই ব্রহ্মধাম বা সিদ্ধলোক ভগবদ্‌ধামেরই ন্যায় মায়াতীত। ব্রহ্মাণ্ড পুরাণে মহাতমসার পরপারে সিদ্ধিলোকের অবস্থিতি বর্ণিত হইয়াছে। এই ব্রহ্মলোকের একটি আভাস আছে, যাহা ঠিক ইহারই অনুরূপ অথচ ইহা হইতে ভিন্ন। যে সকল সাধক ব্রহ্মলোকে আসিয়াও ব্রহ্মলোক হইতে অধঃপতিত হয় বস্তুতঃ তাহারা অকৃত্রিম ব্রহ্মলোকে স্থান পায় না। এই আভাস লোকেই কিছুকালের জন্য অবস্থান করে। এই আভাসলোক মায়ার পরপারে নহে—মায়ার ঊর্দ্ধে অথচ মায়ারই অন্তর্গত।

পূর্বে যে বৈন্দব জগতের কথা বলা হইয়াছে উহা অপ্রাকৃত জগতেরই অন্তর্গত, কিন্তু বাহ্যমণ্ডল—অন্তর্মণ্ডল নহে, ইহা মনে রাখিতে হইবে। এইখানে যে সিদ্ধলোকের কথা বলা হইল ইহার অনেক প্রকার স্থিতি আছে। বিজ্ঞানের বিভিন্ন স্থিতি অনুসারে এই স্থিতি নিরূপিত হয়। ইহাকে এক হিসাবে কৈবল্য সমুদ্র বলিয়াও মনে করিলে ক্ষতি হয় না। কিন্তু ইহা বিজ্ঞান কৈবল্য, প্রলয় কৈবল্য নহে। প্রকৃতি ও মায়া উভয় হইতে পুরুষ নিজের বিবেক প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিলে এই প্রকার কৈবল্য প্রাপ্তি হয়। বলা বাহুল্য, ইহা শুদ্ধ কৈবল্য নহে। বৈন্দব জগৎ হইতে নির্গত হইয়া শাক্ত জগতে প্রবেশের পূর্ব্বে মধ্যাবস্থায় শুদ্ধ কৈবল্য হইয়া থাকে। প্রলয় কৈবল্য অবিদ্যা পাদের অন্তর্গত। এমন কি পরব্যোমের বহিঃপ্রকাশে তাহার কোনও স্থান নাই।

এই যে ব্রহ্মধামের কথা বলা হইল সাধারণতঃ ইহাকে মুক্তিপদ

বলা হয়, কিন্তু ইহা পরামুক্তি নহে। ভগবদ্‌ধামের নীচে অথবা বাহিরে যেখানে মহেশধাম বা শিবধামের বর্ণনা পাওয়া যায়, সেখানে এই কৈবল্যধামই লক্ষিত হইয়াছে বুঝিতে হইবে। এই স্থানটি ক্ষোভ-হীন, স্থির, শান্ত এবং সম্যকরূপে সমভাবাপন্ন—ইহা নিস্তরঙ্গ মহা-সমুদ্রের ন্যায় আপনাতেই আপনি প্রকাশমান। এই মুক্তিধামও পরব্যোমের আভা বলিয়া বিরজার পরপারে অবস্থিত।

সিদ্ধ ধামের অধঃপ্রদেশে অথবা বাহিরের দিকে কারণ সলিল-ময়ী বিরজা বর্ত্তমান। কারণ সমুদ্র অথবা বিরজা নদী বস্তুতঃ পরব্যোমকে মণ্ডলাকারে ঘেরিয়া রহিয়াছে। বাহির হইতে দেখিতে গেলে ইহা ঠিক দুর্গপ্রাকারের চতুর্দ্দিকে বেষ্টমান পরিখার ন্যায় প্রতিভাত হয়। ইহাকে কেহ কেহ শ্রীভগবানের অঙ্গের স্বেদ সলিল বলিয়া বর্ণনা করিয়া থাকেন, কেহ কেহ বলেন ইহা বেদরূপী শব্দব্রহ্মের অঙ্গনিঃসৃত সলিল। বস্তুতঃ শব্দব্রহ্ম পরব্রহ্মের অধিষ্ঠান। শব্দব্রহ্মেরই তরল অবস্থা এই কারণ সলিল। এইখান হইতেই কার্য্যরূপী জগতের সৃষ্টির সূচনা হইয়া থাকে। পক্ষান্তরে এইখানেই জগতের উপসংহারও হয়। কারণ ইহার পরে আর মায়িক সত্তা নাই। ইহারই একটি পরম শুদ্ধরূপ মহাকারণ সলিলরূপে বৈন্দব জগৎ ও শাক্ত জগতের মধ্যপ্রদেশে শুদ্ধ কৈবল্যের সন্নিহিত ভাবে প্রাপ্ত হওয়া যায়। শুদ্ধ কৈবল্যের পরই ভগবদ্‌ধাম এবং শুদ্ধ কৈবল্যের বহিঃপ্রদেশে মহাকারণ সলিলের ধারা উপলব্ধ হয়। মহাকারণ সলিলের বাহিরে মহাকারণ জগৎ বা বৈন্দব জগৎ। বলা বাহুল্য, উহাও অপ্রাকৃত রাজ্যেরই অন্তর্গত। মহাকারণ সলিলকে মহাবিরজা বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে। আমি যতটুকু বুঝিতে পারিয়াছি তাহাতে উভয়কেই কালিন্দী বা যমুনা বলিয়া স্বীকার করা চলে।

বিরজার বাহিরে অবিদ্যাপাদ। এই পাদে মায়ারাজ্য অবস্থিত। লঘু ব্রহ্ম সংহিতাকার ইহাকেই দেবীধাম বলিয়া ইঙ্গিত করিয়াছেন। শিশু হইতে ব্রহ্মাণ্ডে প্রবিষ্ট হইয়া ব্রহ্মাণ্ড ভেদপূর্বক, বিভিন্ন সূক্ষ্ম স্তর

অতিক্রমপূর্ব্বক, কারণ সলিলের নিকট উপস্থিত হইতে হয়। এক একটি ব্রহ্মাণ্ডে উর্দ্ধ এবং অধঃ উভয় দিকে সমষ্টিভাবে চতুর্দ্দশ ভুবন বিদ্যমান আছে। সূর্যমণ্ডলকে কেন্দ্র করিয়া ভুবনকোষ বিদ্যমান। ব্রহ্মাণ্ড সংখ্যায় এক নহে—বহু, অনন্ত। অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড যে মহা-সবিতার চারিদিকে বিরাজমান থাকিয়া প্রতি ব্রহ্মাণ্ড স্ব স্ব সূর্যমণ্ডলকে প্রদক্ষিণ করিতেছে তিনিই আদি সূর্য্য। সমগ্র অবিদ্যাপাদে ভগবৎ-শক্তি অবিদ্যা লক্ষ্মী রূপে অবিদ্যারাজ্যের অধিষ্ঠাত্রী স্বরূপ বিরাজ করিতেছেন। মায়াশক্তি ইঁহাকে আশ্রয় করিয়াই স্বীয় কার্য সাধন করিয়া থাকে। এই অবিদ্যা লক্ষী মহালক্ষ্মীর অথবা শ্রীভগবানের বহির্নিসৃত দৃষ্টিরশ্মি মাত্র। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে পরমাত্মরূপী শ্রীভগবানের স্বরূপশক্তিময়ী চিদ্‌রূপা দৃষ্টি হইতেই মায়া ক্ষুব্ধ হইয়া বিশ্ব প্রসব করিয়া থাকে। ব্রহ্মাণ্ড জননী মায়া স্বরূপের আবরণ-কারিণী, তিরস্করিণী বিদ্যারূপা মহাযোগমায়া অবিদ্যাপাদের উর্দ্ধপাদে অবস্থিত। এই যোগমায়ার আবরণবশতঃই মায়িক জীব ভগবানের স্বরূপ বৈভব দর্শন করিতে পারে না। অর্থাৎ এই যোগমায়াই জীবকে ত্রিপাদ বিভূতি দর্শন করিতে দেয় না।

কারণ সলিলের কথা পুর্বে বলা হইয়াছে। কারণসলিলের ন্যায় গুণ সলিল এবং ক্ষীর সলিলও রহিয়াছে। মূল পুরুষ প্রতিবিম্বরূপে প্রতি সলিলে প্রতিফলিত হইয়াছেন। এইজন্য পরব্যোমে যে তিনটি পুরুষ পরম পুরুষের ব্যূহাত্মক বিভূতিরূপে নিত্য প্রতিষ্ঠিত, অবিদ্যাপাদে তাঁহারাই অংশরূপে এই তিনটি সলিলে শয়ান অবস্থায় প্রকাশমান। যিনি কারণ সমুদ্রে ভাসিতেছেন তাঁহাকে কারণার্ণব-শায়ী বলিয়া, যিনি গুণ সলিলে প্রতিবিম্বিত হইতেছেন তাঁহাকে গর্ভোদশায়ী বলিয়া এবং যিনি ক্ষীর সলিলে প্রকাশিত হইতেছেন তাঁহাকে ক্ষীরোদশায়ী বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে। দৃষ্টি ও বাসনার তারতম্য অনুসারে ইঁহাদের মধ্যে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ পার্থক্য হইতে পারে এখানে তাহার উল্লেখ অপ্রাসঙ্গিক।

যিনি কারণশায়ী পুরুষ তিনি মহাসমষ্টি-অভিমানী ব্যাপক জীবের অন্তর্য্যামী। যিনি গর্ভোদশায়ী তিনি ব্রহ্মাণ্ডাভিমানী সমষ্টি জীবের অন্তর্য্যামী, যিনি ক্ষীরোদশায়ী তিনি পিণ্ডাভিমানী ব্যষ্টি জীবের অন্তর্য্যামী। ব্যষ্টি ও সমষ্টি ভাবে জগতের সৃষ্টি ও জাগতিক কার্য্য পরিচালনার জন্য ইঁহাদের আবশ্যকতা রহিয়াছে। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে সকল পুরুষই মূলে একই পুরুষ—তিনিই পরম পুরুষ। পরম পুরুষ ভগবানেরই অবস্থা বিশেষ। উভয়ই অভিন্ন।

ভগবান্ যেমন স্বীয় ধামে নিত্য বিরাজ করেন তেমনি তাঁহার অভিন্ন অংশগণও স্ব স্ব নিত্যধামে নিত্য বিরাজ করেন। অবতরণ কালে ভগবানের স্বধাম যেমন প্রপঞ্চে অবতীর্ণ হয় তেমনি জগৎ ব্যাপার নির্বাহ কালে অন্তর্যামী পুরুষগণের স্বধামও ব্যষ্টি সমষ্টি ও মহাসমষ্টি জীবের হৃদয়কোষে প্রকটিত হয়। এই জন্যই হৃদয়কে ব্রহ্মপুর বলা হয়। তবে ইহা ব্যাপী বৈকুণ্ঠের অন্তর্গত নহে, তাই ইহা দহর। যাঁহারা বৈদিক দহরবিদ্যার মর্মকথা বুঝিতে ইচ্ছা করেন তাঁহারা এই অন্তর্য্যামীর ধাম সকলের মানব-হৃদয়ে বিরাজিত থাকার রহস্য-বিশ্লেষণ করিতে পারিলে গুহ্যতত্ত্বটি ধরিতে পারিবেন।

কারণোদক, গর্ভোদক এবং ক্ষীরোদক এই তিন প্রকার সলিল এবং তদাশ্রয় তিনটি মহাসমুদ্র ভগবানের পুরুষরূপে আত্মপ্রকাশের ক্ষেত্র। পিণ্ডাভিমানী জীব যখন পিণ্ড হইতে বহির্গত হইয়া পিণ্ডের সাক্ষিরূপে পিণ্ডকে দর্শন করে তখন বাস্তবিক পক্ষে সে পিণ্ডের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া পিণ্ডস্থ শূন্য অর্থাৎ হৃদয় কোষে প্রতিষ্ঠিত হইয়া সাক্ষিরূপে পিণ্ডকে দর্শন করে। পিণ্ড হইতে বাহির হওয়া, পিণ্ড হইতে পৃথক্ হওয়া এবং পিণ্ডের মধ্যস্থ বিন্দুতে প্রবেশ করা বস্তুতঃ একই কথা। যে শূন্যকে আশ্রয় করিয়া পিণ্ড রচনা হইয়াছে ঐ শূন্য পিণ্ডের ভিতরে এবং বাহিরে সমরূপে বিদ্যমান। কিন্তু ভিতর এবং বাহিরের মধ্যস্থলে উহা বিদ্যমান থাকিলেও পিণ্ডাভিমান থাকিবার জন্য উহার সত্তা অনুভূত হয় না। দেহ হইতে বহির্গত হইয়া দেহের দ্রষ্টা হইতে

পারিলে দেহাভিমান বিগলিত হয়। কারণ ঐ সময়েই শূন্যে স্থিতি হয়। তদ্রূপ দেহের অন্তঃপুরে অর্থাৎ হৃদয় গুহাতে প্রবেশ করিতে পারিলেও তদ্রূপ দ্রষ্টা হইয়া দেহকে দৃশ্যরূপে দেখিতে পাওয়া যায়। ঐ অবস্থাতেও কর্তৃত্ব ও ভোক্তৃত্ব অভিমান থাকে না। এই দুইটি শূন্য বস্তুতঃ একই শূন্যের দুইটি প্রদেশ—মধ্যে দেহাত্মক পিণ্ডের ব্যবধান। এই খানেই কর্তা এবং ভোক্তা রূপে জীব কর্ম করিয়া থাকে এবং তদনুরূপ ফলও ভোগ করিয়া থাকে। ইহাই ব্যষ্টি জীবের সংসার মণ্ডল। বস্তুতঃ এ সংসার মধ্যেও শূন্য ওতপ্রোত রূপে বিদ্যমান রহিয়াছে। তবে তাহার প্রতীতি হয় না। যে শূন্যে এই পিণ্ডরূপী ব্যষ্টি দেহটি ভাসিতেছে তাহাকেই ক্ষীর সমুদ্র বলে। ইহা জ্ঞান নেত্রে শুভ্র আকাশের ন্যায় দেদীপ্যমান বলিয়া এই সত্তাকে ক্ষীর সলিল বলিয়া বর্ণনা করা হয়। পিণ্ডবৎ ব্রহ্মাণ্ডও শূন্যমধ্যে বিরাজ করিতেছে। এই শূন্যও বাস্তবিক শূন্য নহে—ইহাও সলিলাত্মক। পৃথিবী সপ্তদীপ-ময়ী—জম্বু দ্বীপ হইতে আরম্ভ করিয়া পুষ্কর দ্বীপ পর্য্যন্ত সাতটি দ্বীপ পর পর মণ্ডলাকারে অবস্থিত। প্রত্যেকটি দ্বীপই এক একটি সমুদ্র দ্বারা বেষ্টিত। সর্বপ্রথম 'লবণ সমুদ্র' এবং সর্বান্তিম 'অমৃত সমুদ্র' অথবা শুদ্ধ বারি। এই প্রকারে সপ্তদ্বীপ ও সপ্ত সমুদ্র বলয়াকারে অবস্থিত। অমৃত সমুদ্রের পর অর্থাৎ তাহার বাহিরে দেবতাদের ক্রীড়াস্থল বিরাজমান। এই স্থান সর্বদা সুবর্ণময় জ্যোতিতে উদ্ভাসিত থাকে বলিয়া ইহাকে সুবর্ণময়ী ভূমি বলে। ইহার পর লোকালোক পর্বত। ইহার আটদিকে আটটি রুদ্র এবং লোকপাল সকল বিদ্যমান রহিয়াছেন। লোকালোকের ভিতর দিকটা আলোকে আলোকিত হয় এবং বাহির দিকটা চির অন্ধকারময়। লোকালোক ও মেরুর অন্তরালে সূর্যের গতির বৈচিত্র আছে। এখানে তাহার উল্লেখ অনাবশ্যক।

লোকালোকের বাহিরে সূর্য্যের প্রকাশ পায় না। ঐ স্থানটি ঘোর অন্ধকারময়। বস্তুতঃ এই লোকালোকের আলোক অংশ বা

ভিতরের দিকটা লোকাংশ। এই স্থানে কোন জীব থাকিতে পারে না। এই অন্ধকারকে বেষ্টন করিয়া যে মহাসমুদ্র বিদ্যমান রহিয়াছে তাহারই নাম গর্ভোদক। ইহার পর ব্রহ্মাণ্ড কটাহ। কাহারও কাহারও দৃষ্টিতে গর্ভোদকের তটদেশে কৌশেয় মণ্ডল নামে একটি সিদ্ধ-মণ্ডল বিদ্যমান আছে। ইহাই বস্তুতঃ পক্ষিতীর্থ। এইখানে বহু-বহুসংখ্যক সিদ্ধ পক্ষিগণে পরিবৃত হইয়া পক্ষিরাজ গরুড় বাস করিতেছেন।

ব্রহ্মাণ্ডের ন্যায় ব্রহ্মাণ্ড সমষ্টিও একটি শূন্যে অবস্থিত। ব্রহ্মাণ্ডসমষ্টি প্রকৃতিরূপী কারণ সত্তা। যে শূন্যে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডময় সত্তা ভাসিতেছে তাহাই কারণ সমুদ্র নামে অভিহিত। ইহা হইতে বুঝা যাইবে কারণ জগৎকে বেষ্টন করিয়া যে সলিল বিদ্যমান তাহাই কারণ সলিল। এই সলিলের উপরই মহাসমষ্টি অর্থাৎ সমগ্র মায়িক জগৎ ভাসিয়া থাকে। গর্ভোদ সলিলের উপর সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডটি ভাসিয়া থাকে। তদ্রূপ ক্ষীর সলিলের উপর প্রত্যেকটি ব্যষ্টিপিণ্ড ভাসিয়া থাকে। ভগবানের অর্থাৎ পরমাত্মার নিত্যসিদ্ধ স্বাংশ যথাক্রমে অন্তর্যামিরূপে এই তিনটি সলিলে প্রকাশিত থাকেন। ইহারা সকলেই নারায়ণ। কারণ আদি নর হইতে উদ্ভূত বলিয়া সলিলকে নার বলা হয়। তাঁহাকে আশ্রয় করিয়া বিরাজ করেন বলিয়াই পুরুষের নাম নারায়ণ। এই জন্য সৃষ্টির আদি সলিল Primeval Waters, "যা সৃষ্টিঃ স্রষ্টুরাদ্যা।" ব্যষ্টি সমষ্টি ও মহাসমষ্টিভেদে এই সত্তাও ত্রিবিধভাবে প্রকাশিত হইয়া থাকে। সত্তা ত্রিবিধ বলিয়া তাহার অধিষ্ঠান পুরুষও ত্রিবিধরূপে বর্ণিত হন। এই তিনটি পুরুষই ভগবানের চতুর্ব্যূহের মধ্যে চতুর্থ, তৃতীয় এবং দ্বিতীয় ব্যূহের প্রতিভাস।

কারণ সত্তায় ন্যায় মহাকরণ সত্তাও সলিল দ্বারা বেষ্টিত। ইহাই মহাকারণ সলিল। যিনি এই সলিলে অধিষ্ঠিত আছেন তাঁহাকে আদি ব্যূহ বলিয়া গ্রহণ করিলে অসঙ্গত হইবে না। মহাকারণ সলিলের পর আর সলিল নাই। তাহার পর শুদ্ধ আকাশ। শুদ্ধ আকাশ

ভেদ করিতে পারিলে চিন্ময়ী ভূমির অর্থাৎ দিব্য বৃন্দাবনের প্রকাশ উপলব্ধি করা যায়।

যাহাকে পূর্বে মহাবৈকুণ্ঠ বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে তাহাকেই কেহ কেহ অযোধ্যা অথবা নিত্যসাকেতধাম বলিয়াও উল্লেখ করিয়াছেন। 'দেবানাং পূরযোধ্যা' এই শাস্ত্র বাক্যে বস্তুতঃ মহা-বৈকুণ্ঠেরই নির্দ্দেশ হইয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। এই মহাপুরী আকৃতিতে চতুরস্র অথবা চতুর্ভূজ। ইহা দিব্য রত্নখচিত প্রাকার ও তোরণ বেষ্টিত এবং মণিকাঞ্চনের চিত্রদ্বারা বিশেষরূপে অলংকৃত। নগরীতে প্রবেশ করিবার জন্য চারিদিকে চারটি মুখ্য দ্বার আছে। এই সকল দ্বার বিভিন্ন প্রকার অধিকারীর নগর প্রবেশের জন্য উদ্দিষ্ট। অর্থাৎ যে সকল ভক্তলোক লোকান্তর হইতে শ্রীভগবানকে দর্শন করিবার জন্য বৈকুণ্ঠে আগমন করেন তাঁহারা সকলেই একই দ্বার অবলম্বন করিয়া নগরে প্রবেশ করেন না। যাঁহার যে প্রকার অধিকার তিনি তদনুসারেই চারিটি দ্বারের মধ্যে কোন বিশিষ্ট দ্বার দ্বারা নগরে প্রবেশ করিতে সমর্থ হন। দ্বার এবং সুবৃহৎ গোপুর অত্যন্ত উজ্জ্বল এবং সুদৃশ্য মণিমুক্তার দ্বারা খচিত। প্রত্যেকটি দ্বারে দ্বাররক্ষকরূপে দুইজন করিয়া নিত্যপুরুষ নিযুক্ত রহিয়াছেন। চণ্ড, প্রচণ্ড প্রভৃতি দ্বারপালগণ ভগবানের নিত্য ভক্তশ্রেণীর অন্তর্গত। ইঁহারা অনাদি কাল হইতে এই কার্য্যেই নিযুক্ত রহিয়াছেন। চণ্ড ও প্রচণ্ড যেমন পূর্বদ্বারের রক্ষক তেমনি পশ্চিমদ্বারের রক্ষক—জয় ও বিজয়। ইহাদের বিবরণ প্রাচীন আখ্যায়িকাতে পুরাণাদিতে বহু স্থানে উপলব্ধ হয়। দ্বার রক্ষকের নগর রক্ষকও অনাদি কাল হইতে তত্তৎ অধিকার কর্মে নিযুক্ত আছেন। কুমুদ, কুমুদাক্ষ প্রভৃতি দশটি নগর রক্ষকই বৈকুণ্ঠ-ধামের দশ দিক্‌পাল নামে প্রসিদ্ধ। পুরীর অন্তর্গত গৃহ, প্রাসাদ, আরাম, উপবন প্রভৃতি সবই অত্যন্ত রমণীয়। গৃহ সকল অগ্নির ন্যায় উজ্জ্বল জ্যোতির্ময় এবং উদ্যান প্রভৃতি স্নিগ্ধ জ্যোতিতে সদা উদ্ভাসিত। ব্যাপী বৈকুণ্ঠের ন্যায় বৈকুণ্ঠ পুরীতেও রাত্রি দিনের ভেদ নাই। ঐ স্থানে

অন্ধকার প্রবিষ্ট হইতে পারে না। এক অখণ্ড স্বয়ং প্রকাশ জ্যোতিঃ সর্ব্ববস্তুর স্বরূপভূত ভাবে কোথাও স্নিগ্ধ, কোথাও তীব্র কোথাও মিশ্রভাবে নিরন্তর শোভা পাইতেছে। যে সকল ভক্ত নরনারী এই নিত্যধামে বাস করিতেছেন তাঁহারা সকলেই দিব্যদেহ বিশিষ্ট। ঐ দেহ জরা দ্বারা বিকৃত হয় না। এবং মৃত্যু দ্বারাও আক্রান্ত হয় না। উহা নিত্য নবযৌবন সম্পন্ন। উহার সৌন্দর্য্য ও সুষমা মায়িক জগতে অতুলনীয়। ইঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ অনাদি কাল হইতেই এইখানে বিরাজমান আছেন। কেহ কেহ নির্দ্দিষ্ট কালে এইখানে প্রবিষ্ট হইয়া থাকেন। যাঁহারা অনাদি কাল হইতে আছেন তাঁহাদের দেহও অনাদি, কিন্তু যাঁহারা নির্দিষ্ট কালে এইখানে প্রবেশ লাভ করেন তাঁহাদের দেহ সাদি। এই দৃষ্টিতে উভয় প্রকার বৈকুণ্ঠবাসীদের মধ্যে দেহগত কিঞ্চিৎ ভেদ থাকিলেও ঐ সকল দেহ তুল্যরূপেই অনন্ত। কারণ উহাদের তিরোভাব নাই। মহাপ্রলয়েও ঐ সকল দেহের তিরোভাব হয় না। কাহারও কাহারও মতে মহাপ্রলয় কালে ধামের সহিত ঐ সকল দেহও সংকুচিত হয় মাত্র, কিন্তু বিনষ্ট হয় না। যে সকল ভক্ত মধ্যে মধ্যে পুরীতে প্রবেশ করিয়া ঐ স্থানে নিত্যস্থিতি লাভ করেন তাঁহাদের সকলেরই দেহ ঔপপাদিক একথা বলাই বাহুল্য। তাঁহাদের আবির্ভাব থাকিলেও অন্যান্য উর্দ্ধলোকের ন্যায় বৈকুণ্ঠেও তাঁহারা অযোনিজ ভাবে আবির্ভূত হন। এই সকল ভক্ত দুই শ্রেণীতে বিভক্ত ইঁহাদের মধ্যে একশ্রেণীর ভক্ত অধলোক হইতে, বিশেষতঃ ভূর্লোক হইতে, ভক্তি সাধনার প্রভাবে উর্দ্ধগতি লাভ করিয়া বৈকুণ্ঠে স্থান লাভ করেন। অপর শ্রেণীর ভক্ত মহাসৃষ্টির উন্মেষ কালেই স্বাভাবিক ধারাতে অন্যান্য উর্দ্ধলোকের ন্যায় বৈকুণ্ঠেও আবির্ভূত হন। অর্থাৎ ঐ সকল জীব অন্য কোন লোক হইতে কর্ম, ভক্তি, জ্ঞান কিংবা অন্য কোন সাধনার ফলে বৈকুণ্ঠে আগমন করেন না। পক্ষান্তরে সৃষ্টি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই বৈকুণ্ঠেই আবির্ভূত হন। এইরূপ সৃষ্টি নিরন্তর চলিতেছে। ইঁহাদের মধ্যে অধিকাংশ স্বভাবসিদ্ধ অধিকার সম্পন্ন।

অবশ্য অন্য প্রকারও যে না আছেন তাহা নহে।

বিশাল নগরীর ঠিক মধ্যপ্রদেশে ভগবানের অন্তঃপুর। নগরীর ন্যায় অন্তঃপুরও মণিপ্রাকারে বেষ্টিত। এই অন্তঃপুরে অনন্তপ্রকার অতুলনীয় ঐশ্বর্য্য শোভা পাইতেছে। দিব্য বিমান দিব্য ভোগ সম্পদ এবং তদুপযোগী যাবতীয় উপকরণ সুসামঞ্জস্য ভাবে বিদ্যমান আছে। অন্তঃপুরের ঠিক মধ্যদেশে বিশাল মণিময় মণ্ডপ সহস্র সূর্য্যের ন্যায় দেদীপ্যমান হইতেছে। এই মণ্ডপ যে কত বিশাল তাহা ভাষা দ্বারা প্রকাশ করা যায় না। সহস্র সহস্র দিব্য রত্নময় মাণিক্য স্তম্ভ দ্বারা এই মণ্ডপ অথবা সভাগৃহটি বিধৃত। ঐ মণ্ডপে ভগবানের অনাদি সিদ্ধ নিত্য ও মুক্ত ভক্তগণ বিরাজ করিতেছেন। চারিদিকে নিরন্তর সুমধুর সামগান ধ্বনিত হইতেছে। মণ্ডপের ঠিক মধ্যস্থলে ভগবানের সিংহাসন। এই সিংহাসন সর্ববেদময়। অর্থাৎ অবিভক্ত বেদ বা অখণ্ড শব্দব্রহ্মই পরব্রহ্ম বা শ্রীভগবানের সিংহাসন স্বরূপ। এই সিংহাসনের চারটি পাদ যথাক্রমে ধর্ম, জ্ঞান, বৈরাগ্য ও ঐশ্বর্য্য নামে খ্যাত। অর্থাৎ ধর্মাদি পাদ চতুষ্টয় দ্বারা বিধৃত বেদরাশিতে শ্রীভগবান্ প্রকাশিত হন—অন্যত্র নহে। এই সিংহাসনের ঠিক মধ্যস্থলে দিব্য যোগপীঠ। এই যোগপীঠটি মাতৃকাময়। অর্থাৎ অকারাদি ক্ষকারান্ত বর্ণমালা দ্বারা এই পীঠটি রচিত। এই সকল মাতৃকাই বেদের সার। এইজন্য বেদময় সিংহাসনের মধ্যে বেদের সারভূত মাতৃকাময় পীঠ অবস্থিত। এই সকল মাতৃকা বা অক্ষর অপ্রাকৃত অগ্নি সূর্য্য ও চন্দ্রের রশ্মি হইতে প্রকাশমান। যোগপীঠের ঠিক মধ্য স্থলে দিব্য অষ্টদল কমল। এই কমলের যেটি কর্ণিকা তাহাই গায়ত্রীর স্বরূপ। কমলটি অনন্তকোটি সূর্য্যের সমষ্টিভূত তেজের দ্বারা উদ্ভাসিত। গায়ত্রীরূপা কর্ণিকাতে পরম পুরুষ ও পরমা প্রকৃতি নিত্য বিহার করিয়া থাকেন। পুরুষ এবং প্রকৃতি অর্থাৎ শ্রীভগবান এবং শ্রীভগবতী মহালক্ষ্মী। উভয়ই নবযৌবন সম্পন্ন এবং কোটি কন্দর্পের ন্যায় লাবণ্য বিশিষ্ট অপ্রাকৃত চিদানন্দের ঘনীভূত বিগ্রহ।

দুই পার্শ্বে ভূদেবী ও লীলাদেবী নামে দুই সখী বিরাজ করিতেছেন। আটদিকে কমলের আটটি দলের অগ্রভাগে আটটি শক্তি দিব্য দম্পতিকে বেষ্টন করিয়া শোভা পাইতেছেন। বিমলা উৎকর্ষিণী প্রভৃতি আটটি শক্তি শ্রীভগবানেরই মহিষীরূপে ভক্ত সমাজে গৃহীত হইয়া থাকেন। ইহারা সকলেই দিব্য চামরের দ্বারা শ্রীভগবান ও মহালক্ষ্মীকে ব্যজন করিতেছেন। অনন্ত, গরুড়, বিষ্বক্সেন, এবং অন্তরঙ্গ নিত্য মুক্তগণ ভগবানকে চারিদিকে বেষ্টন করিয়া রাখিয়াছেন।

কোন কোন স্থানে এই নগরীর অষ্ট আবরণ এবং কোন কোন স্থানে দ্বাদশ আবরণের উল্লেখ দৃষ্ট হইয়া থাকে। যে অন্তপুরের মধ্যে মহামণিমণ্ডপ নামক সভা অবস্থিত আছে বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে উহার নাম "আনন্দ"। সহস্র ফণার তেজে উদ্দীপ্ত তেজোময় "অনন্ত নাগ" সভা মণ্ডপের উপর বিরাজ করিতেছেন। ভগবানের দিব্য সিংহাসন এই অনন্তের উপরই প্রতিষ্ঠিত, এইজন্য ইহার নাম অনন্তাসন।

যে আটটি আবরণের কথা উল্লেখ করা হইয়াছে মূল প্রাকার ব্যতিরেকে তাহাদিগের স্বরূপ নির্দ্দেশ এই প্রকার—বৈকুণ্ঠ নগরের পূর্বাদি চারিদিকে বাসুদেব সঙ্কর্ষণ প্রদ্যুম্ন অনিরুদ্ধ এই চারিটি ব্যূহের ধাম। চারিকোণে তাঁহাদের চারিটি শক্তি বিরাজিত। এই হিসাবে আবরণ দেবতার সংখ্যা আট। ইহাই প্রথম আবরণ। ইহার বাহিরে যে স্তর তাহাতে কেশব প্রভৃতি চতুর্বিংশতি বিষ্ণু মূর্ত্তি পূর্বদিক হইতে আরম্ভ করিয়া স্ব স্ব ধামে বিরাজ করিতেছেন। ইহাই দ্বিতীয় আবরণ। এই আবরণে দেবতার সংখ্যা চব্বিশ। ইহার বাহিরে পূর্বদিক হইতে আরম্ভ করিয়া মৎস্যাদি দশ অবতারের স্থান। ইহাই তৃতীয় আবরণ। এখানকার দেবতার সংখ্যা দশ। ইহার বাহিরে চতুর্থ আবরণে পূর্বাদি চারিদিকে সত্য, অচ্যুত, অনন্ত ও দুর্গা এবং অগ্নি প্রভৃতি চারিটি কোণে বিষ্বক্সেন গণেশ শঙ্খ এবং পদ্ম এই আটটি অবস্থিত। ইহার বাহিরে

পঞ্চমাবরণ, তাহাতে পূর্বাদি দিকে ঋক্ প্রভৃতি চারি বেদ এবং অগ্নি প্রভৃতি কোণে সাবিত্রী, গরুড়, ধর্ম এবং যজ্ঞ এই আটটি দেবতা অবস্থিত। ষষ্ঠাবরণে ভগবানের আয়ুধ সকলের স্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। পূর্বাদি চারদিকে শঙ্খ, চক্র, গদা ও পদ্ম এবং অগ্নি প্রভৃতি চারিকোণে খড়্গ, শারঙ্গ, হল ও মুষল অবস্থিত। অন্তিমাবরণে ইন্দ্রাদি দিক্‌পাল অষ্টদিক রক্ষা করিতেছেন। ইহার পরে আর আবরণ নাই।

শক্তি—ধাম—লীলা—ভাব (খ)

বৈকুণ্ঠ ধামের ঊর্দ্ধে বৈকুণ্ঠের সারভূত সত্তা আশ্রয় করিয়া চিদানন্দময় গোলোকধাম বিরাজমান। স্বয়ং ভগবানের যে সকল মুখ্য ধাম আছে তাহারা দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। এই বিভাগের মূল সূত্র লীলাগত বৈশিষ্ট্য। তন্মধ্যে দেবলীলার উপযোগী সর্বপ্রধান ধামই গোলোক ধাম নামে প্রসিদ্ধ। নর লীলার উপযোগী ধাম দ্বারকা, মথুরা এবং গোকুল অথবা শ্রীবৃন্দাবন এই ত্রিবিধ। এই সম্বন্ধে বিশেষ বিবরণ যথা সময়ে দিতে চেষ্টা করিব।

গোলোক ধাম শ্রীভগবানের ঐশ্বর্য্যের পূর্ণ বিকাশের পরম ক্ষেত্র। বৈকুণ্ঠ ধাম চতুর্ভুজ নারায়ণের লীলা নিকেতন, কিন্তু গোলোকধাম দ্বিভুজ শ্রীকৃষ্ণের নিত্য বিহার ভূমি। যদিও একই শ্রীভগবান শ্রীকৃষ্ণ এবং শ্রীনারায়ণ উভয় রূপেই প্রকাশমান, তথাপি স্বরূপ বিগ্রহ লীলা প্রভৃতির মাধুর্য্যগত উৎকর্ষের দৃষ্টিতে শ্রীকৃষ্ণই স্বয়ং রূপ এবং নারায়ণ তাঁহার বিলাস বলিয়া তাঁহার সহিত একাত্ম-রূপ। গোলোক ধামের অপর নাম শ্বেতদ্বীপ। বৈকুণ্ঠ ভেদ করিয়া এই মহাদ্বীপে প্রবেশ করিতে হয়। অবশ্য সাক্ষাদ্‌ভাবে ঐ ধামে উপনীত হইবার মার্গও রহিয়াছে। যাঁহারা ক্রম মার্গ আশ্রয় করিয়া প্রতিধামের ঐশ্বর্য ও আনন্দ উপভোগ করিতে করিতে চরমাবস্থায় গোলোক ধামে উপনীত হন তাঁহাদিগকে বৈকুণ্ঠ ভেদ করিয়াই গোলোকে যাইতে হয়। এই মহাদ্বীপ চতুরস্র। দেবর্ষি নারদ যে শ্বেতদ্বীপে গমন করিয়াছিলেন বলিয়া মাহাভারতে বর্ণনা আছে তাহা এই মূল শ্বেতদ্বীপেরই ছায়া বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। কারণ মূল শ্বেতদ্বীপ দ্বিভুজ শ্রীকৃষ্ণের বিহারভূমি গোলোকের নামান্তর। কিন্তু যে শ্বেতদ্বীপে দেবর্ষি উপস্থিত হইয়াছিলেন সেখানে চতুর্ভুজ নারায়ণ অধিষ্ঠিত ছিলেন।

নারায়ণ মূর্ত্তি যে প্রকার শ্রীকৃষ্ণ মূর্ত্তির বিলাস স্বরূপ তদ্রূপ নারায়ণের আবাসভূত শ্বেতদ্বীপ মূল শ্বেতদ্বীপের বিলাস রূপে পরিগণিত হইবার যোগ্য। কিন্তু কাহারও কাহারও মতে মহাভারত বর্ণিত শ্বেতদ্বীপ ছায়ারূপ নহে। উহাই মূল শ্বেতদ্বীপ অথবা গোলকধাম।

আমরা বৈকুণ্ঠ ধামের মধ্য ভূমিতে বিরাজমান মূল বৈকুণ্ঠ-পুরীকে মহাবৈকুণ্ঠ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছি। কেহ কেহ গোলোক-ধামকেও মহাবৈকুণ্ঠ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। যাহা বৈকুণ্ঠের সারভূত তাহাকে মহাবৈকুণ্ঠ বলা অসঙ্গত নহে। তবে বুঝিবার সৌকর্য্যের জন্য দুইটি ধামকে পৃথক্ নামে নির্দ্দেশ করাই অধিকতর যুক্তি সঙ্গত।

এই গোলোকধাম শ্রীবৃন্দাবনের বিভূতি স্বরূপ। শ্রীবৃন্দাবনের অনন্ত প্রকার বিভূতির মধ্যে কতকগুলি প্রকাশময় এবং অপর কতক-গুলি প্রকাশময় নহে। তাহাদের মধ্যে বিলাসময় স্বাংশময় প্রভৃতি বহু প্রকার অবান্তর ভেদ রহিয়াছে। প্রকাশময় বিভূতিও প্রকট ও অপ্রকট ভেদে দুই প্রকার। গোলোক নামে যে মূল-শ্বেত দ্বীপটির কথা বলা হইল তাহা শ্রীবৃন্দাবনের অপ্রকট প্রকাশময় বৈভব। উহার প্রকট প্রকাশময় বৈভব পার্থিব বৃন্দাবন রূপে কখনও কখনও আবির্ভূত হইয়া থাকে।

এই চতুরস্র শ্বেতদ্বীপের অভ্যন্তরে আরও একটি চতুরস্র দৃষ্টিগোচর হয়। তাহার নাম মহাবৃন্দাবন। মহাবৃন্দাবনের মধ্যস্থলে যে সহস্রদল কমলাকার ভূমি লক্ষিত হয় তাহার নাম গোকুল। গোকুলের ঠিক মধ্যস্থলে অর্থাৎ কমলের কর্ণিকাতে স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণের নিজধাম বিরাজ করিতেছে।

মহাবৃন্দাবন ও শ্বেতদ্বীপের অন্তরালে অসংখ্য দিব্যলোক সমুদ্র মধ্যস্থিত দ্বীপপুঞ্জের ন্যায় শোভা পাইতেছে। এই সকল লোক দেখিতে ঠিক পৃথিবীরই অনুরূপ। এই সকল লোকের মধ্যে অনন্ত প্রকার বৈচিত্র্য রহিয়াছে। পৃথিবীতে যেমন বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন প্রকার মনুষ্য বিভিন্ন প্রকার সমাজ বিভিন্ন প্রকার প্রকৃতি ও ভাব

লক্ষিত হয় এই সকল দিব্যলোকেও তদ্রূপ অনন্ত প্রকার বৈশিষ্ট্য দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। এই সকল যে ভাবময় এবং ভাবের বৈচিত্র্য অনুসারে রসাস্বাদন সম্বন্ধে বিচিত্রতা সম্পন্ন তাহা বলাই বাহুল্য। এই সকল লোকের প্রত্যেকটিই বস্তুতঃ গোলোক অর্থাৎ মহা-গোলোকের অন্তর্গত খণ্ড গোলোক। প্রাচীন গ্রীকদের সাহিত্য 'Isles of the Blessed' নামে যে আনন্দময় নিত্য বিরাজমান মুক্ত পুরুষগণের বসতি স্থল দ্বীপ বা ভূমিখণ্ডের উল্লেখ পাওয়া যায় এই সকল খণ্ডগোলোকও কতকটা সেইপ্রকার। আমাদের দেশে মধ্যযুগের সন্তগণের সাহিত্যেও এই জাতীয় আনন্দময় দ্বীপমালার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। গোলোকধামের মধ্য বিন্দুতে শ্রীভগবানের মহাসিংহাসন বিরাজ করিতেছে। ঐ সিংহাসনোপরি সমাসীন রাধাকৃষ্ণ নামক যুগল বিগ্রহ দর্শন করিবার জন্য সিংহাসনের চতুর্দিকে বিরাজমান অসংখ্য দ্বীপবাসী অর্থাৎ গোলোকবাসী ভক্তগণ অন্তর্মুখভাবে দৃষ্টি প্রসারিত রাখিয়াছেন। ইঁহারা নিরন্তর প্রেমময়ী দৃষ্টি দ্বারা স্বয়ং ভগবানের স্বরূপের ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্য পান করিতেছেন। এই ধামে জরা, মৃত্যু, শোক, তাপ, বিরহ প্রভৃতি কিছুই নাই। ইহা বৈকুণ্ঠেরই ন্যায় ত্রিগুণের অতীত জ্যোতির্ময়, নিত্যানন্দময় অপ্রাকৃতধাম। ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্য এই দিব্য লীলাময় পরমধামে নিত্য বিরাজমান। এই স্থানে শ্রীকৃষ্ণই একমাত্র কান্ত এবং ধামবাসিগণ সকলই লক্ষ্মীস্বরূপা কান্তা। যাঁহারা অন্তরঙ্গ না হওয়ার দরুণ ভাবগত কিঞ্চিৎ ব্যবধানে অবস্থিত তাঁহারাও পরম্পরাতে কান্তভাবেরই রস স্ব স্ব স্বভাবানুসারে আস্বাদন করিয়া থাকেন ব্রহ্মলোক যেমন ব্রহ্ম নির্ঘোষে অর্থাৎ প্রণবের ঝঙ্কারে নিত্য মুখরিত, বৈকুণ্ঠধাম যেমন মহাশঙ্খের ধ্বনিতে নিত্য ধ্বনিময়ী গোলোকধামও সেই প্রকার নিরন্তর শ্রীকৃষ্ণের বংশীনাদে প্রতিধ্বনিত হইতেছে। এইজন্য এই ধামে বংশীধ্বনি প্রিয় সখীরূপে ধামবাসী, ভক্তবৃন্দের নিকট পরিচিত। সখী যেমন দূতীরূপে প্রেমিককে প্রেমাস্পদের সন্ধান দেয়, ঠিক সেই প্রকার মুরলী-নিঃস্বন হইতেই

গোলোকবাসী ভক্তগণ ভগবানের সন্ধান পাইয়া থাকেন এবং প্রেম-ভক্তির উৎকর্ষ অনুসারে এই বংশীধ্বনি অনুসরণ করিয়া স্বয়ং ভগবানের সাক্ষাৎকার লাভ করেন। সঙ্গীত এবং নাট্য এখানকার সহজ সম্পত্তি। এই ধামে সর্বদা এবং সর্বত্রই বিভিন্ন রাগ ও রাগিণী তত্তৎ ভাবানুসারে ধ্বনিত হইতেছে। নাট্যকলা এখানে স্বাভাবিক রূপেই স্ফুরিত হইয়া থাকে। এখানকার বৃক্ষ মাত্রই কল্পতরু, তাহার নিকট যখন যাহা চাওয়া যায় তখনই তাহা প্রাপ্ত হওয়া যায়। এখানকার সমগ্র ভূমিই চিন্তামণি। এখানে যাহা চিন্তা করা যায় তাহাই অবিলম্বে অবাধিত ভাবে দিব্য উজ্জ্বল রূপে স্ফুরিত হইয়া থাকে। ভাব মূর্ত্ত হইয়া ভাবনার সঙ্গে সঙ্গে আত্মপ্রকাশ করে। এখানকার জলমাত্রই অমৃত। জলের অমৃতময় স্বরূপ এইখানেই ঠিক ঠিক উপলব্ধি হয়। এইখানে নিত্য বসন্ত বিরাজমান। গ্রীষ্মের উৎকট তাপ এবং শিশিরের তীব্র হিম উভয়েই বসন্তের অনুষ্ণ ও অশীত স্পর্শরূপে ভক্তগণের আনন্দবর্দ্ধন করিয়া থাকে। সুতরাং এখানে একদিকে যেমন জরা ও মৃত্যুরূপ কালের বিকার নাই অপরদিকে তেমনি বিভিন্ন ঋতু রূপেও উহা পরিদৃষ্ট হয় না। যে মহাজ্যোতিতে এই মহাদ্বীপ সর্বদা প্রকাশ পাইতেছে তাহা চিদানন্দময় স্নিগ্ধ জ্যোতিঃ হ্লাদিনী শক্তি হইতে নির্গত জ্যোৎস্নারাশি, জ্ঞানের প্রখর আলোক নহে। এই স্নিগ্ধ জ্যোতিই রসরূপে ভক্তগণ আস্বাদন করিয়া থাকেন। সেখানে গোরূপে অর্থাৎ কামধেনু রূপে চিন্ময় কিরণ ধারা অনবরত অমৃতরূপে ক্ষীর বর্ষণ করিতেছে। এই স্থানে কালের গতি অবরুদ্ধ। কাল এখানে অচল। নিমেষার্দ্ধ কালও এখানে অতীত হয় না। অর্থাৎ এখানে নিমেষ একই থাকে—তাহা খণ্ডিত হইয়া অর্দ্ধ নিমেষরূপে পরিণত হয় না। দৃষ্টি অর্থাৎ লক্ষ্য পূর্ণরূপে নির্নিমেষ না হওয়া পর্য্যন্ত এই পরমধাম প্রত্যক্ষগোচর হয় না। নিমেষ পতিত হইলেই অর্থাৎ অচল কাল চঞ্চল হইলেই বর্ত্তমান অতীতে পরিণত হয়। সুতরাং যেখানে কালের চাঞ্চল্য নাই সেখানে বর্ত্তমান রূপ এক মহাকালই নিত্য বিদ্যমান

থাকে। এইটি বিশুদ্ধ বর্তমান—ইহার একদিকে অতীত এবং অন্যদিকে অনাগত নাই। ইহাই যোগিগণের মহাক্ষণ—যাহা কল্পনার উর্দ্ধে—মনোময় বিকল্প রাজ্যের উর্দ্ধে—নিত্য সিদ্ধ ও স্বয়ং প্রকাশরূপে বিদ্যমান। যেখানে দৃষ্টি অর্থাৎ ইন্দ্রিয় মাত্র নিস্পন্দ, প্রাণ গতিহীন এবং মন স্তম্ভিত সেখানে একমাত্র চিৎশক্তি চিৎস্বরূপে প্রতিষ্ঠিতভাবে নিত্য খেলা করিয়া থাকেন। এই চিৎশক্তির খেলাই ভগবানের নিত্য বিহার যাহার বিশেষ বর্ণনা বৃন্দাবন লীলাতে করা যাইবে।

মহাগোলোকের মধ্যস্থানে শ্রীকৃষ্ণের অন্তঃপুর অবস্থিত। অন্তঃপুরের বহির্দেশে চারিদিকে অসংখ্য সভাগৃহ বিদ্যমান রহিয়াছে। গোকুল পদ্মের পত্ররূপ বন এবং উপবনের বহির্দেশে অসংখ্য পুর কমলের চারিদিকে উজ্জ্বল দ্বীপপুঞ্জের ন্যায় শোভা পাইতেছে। এই সকল পুর হইতে মহাবৃন্দাবন ও কেলিবৃন্দাবনে যাতায়াতের উপযোগী বিভিন্ন মার্গ রহিয়াছে। কেলি বৃন্দাবন অনন্ত কিন্তু তাহাদের সমষ্টি-ভূত মহাবৃন্দাবন এক। যে সকল পুরোগামী মার্গের কথা বলা হইল তাহাদের প্রত্যেকটি মার্গ কমলের এক একটি দল সন্ধিতে আসিয়া যুক্ত হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণের গোষ্ঠ বা গোচরণ ভূমি এই কমলকে ঘেরিয়া চারিদিকে অবস্থিত।

যে মধ্যভূমিতে অন্তঃপুরের কথা বলা হইয়াছে তাহার সাতটি কক্ষ। তন্মধ্যে যে কক্ষটি সকলের অন্তরতম প্রদেশে অবস্থিত তাহার অন্তর্গত প্রাঙ্গন অতি বিশাল। ঐ কক্ষেতেই মহামন্দির প্রতিষ্ঠিত। এই বিশাল প্রাঙ্গণের চারিদিকে চারিটি কক্ষ রহিয়াছে। প্রতি কক্ষেতে একটি করিয়া অঙ্গন আছে। অঙ্গনের চতুর্দিকে গৃহরাজি শোভা পাইতেছে। প্রতি গৃহেই সম্মুখ ও পশ্চাৎ উভয় দিকে দ্বার আছে। প্রথম কক্ষটি মহাপ্রাঙ্গণের পূর্ব দিকে ব্রজরাজ নন্দের আবাসভূমি। ঠিক তাহার সমসূত্রে মহাপ্রাঙ্গণের পশ্চিম দিকে যে কক্ষ অবস্থিত তাহাই দ্বিতীয় কক্ষ। ইহাতে শ্রীকৃষ্ণের জননী যশোদারাণী অবস্থিতি করেন। মহাপ্রাঙ্গণের উত্তর দিকে তৃতীয় কক্ষ অবস্থিত। ইহা রোহিণীমাতার

আবাসস্থল। উহারই সমসূত্রে দক্ষিণ দিকে চতুর্থ কক্ষে যে সকল গৃহ রহিয়াছে, তাহা আত্মীয়গণের সৎকারের জন্য নির্দিষ্ট। ভোজনের ও দানের সামগ্রী দ্বারা ঐ সকল গৃহ পরিপূর্ণ। তৃতীয় ও চতুর্থ কক্ষায় অন্যান্য গৃহের সঙ্গে শিল্পশালা রহিয়াছে। শিল্পশালাতে সখীগণ শৃঙ্গার উপযোগী নানাপ্রকার শিল্প রচনা করিয়া থাকেন। ইহার মধ্যে উত্তর দিকে যে সকল শিল্পশালা আছে তাহাতে বলরামের অনুগত সখীগণ কার্য্য করেন। তদ্রূপ দক্ষিণ দিকের শিল্পশালাতে শ্রীকৃষ্ণের বর্গস্থ সখীগণ আপন আপন যূথেশ্বরীর অনুগত। এবং তাঁহারা যূথেশ্বরী-গণের অনুরাগ প্রভৃতি বিষয় অবলম্বন করিয়া নিরন্তর পদগান করিয়া থাকেন। শুধু তাহাই নহে রসোদ্বোধের উপযোগী সকল কার্য্যই ঐ সকল কলাভবনে সম্পন্ন হয়। বলরামের ও শ্রীকৃষ্ণের প্রেয়সীবর্গ যথাক্রমে মহাপ্রাঙ্গণের উত্তর ও দক্ষিণ দিকে অবস্থান করেন। বলরামের লীলাস্থল যাহা রামঘাট নামে প্রসিদ্ধ উত্তর দিকেই অবস্থিত। গোবর্দ্ধনধারী শ্রীকৃষ্ণের ক্রীড়াভূমি দক্ষিণ দিকে অবস্থিত। এতদ্ব্যতীত উত্তরে বলরামের এবং দক্ষিণে শ্রীকৃষ্ণের উপবেশনের জন্য দুইটি পৃথক্ কক্ষ নির্দিষ্ট আছে। প্রতি কক্ষেই অসংখ্য গৃহ বর্ত্তমান। কোন গৃহ একতালা, তদনন্তর কোন গৃহ দুই-তালা, এইপ্রকার ক্রমশঃ তিনতলা, চারতালা, সাততালা পর্য্যন্ত গৃহ শোভা পাইতেছে। গৃহ রচনার কারুকার্য্য অতি অদ্ভুত, একদিকে যে প্রকার গৃহ অবস্থিত তাহার বিপরীত দিকেও ঠিক উহারই অনুরূপ গৃহ বিন্যস্ত হইয়াছে। অর্থাৎ একতালা গৃহের সমান্তরাল ভূমিতে বিদ্যমান গৃহটিও তাহারই অনুরূপ একতালা। এইপ্রকার ক্রমোর্দ্ধ অন্যান্য গৃহ সম্বন্ধেও বুঝিতে হইবে। প্রতি কক্ষে ঐ একই ব্যবস্থা। বলা বাহুল্য যে গৃহটি মহাপ্রাঙ্গণের যত সন্নিকটে তাহা তত উচ্চ। এইভাবে মহাপ্রাঙ্গনের চতুর্দিকে যাবতীয় কক্ষ বিন্যস্ত রহিয়াছে। মহাপ্রাঙ্গনের ঠিক মধ্যস্থলে ক্রমোত্থিত সোপানবলী ভূষিত বিরাট মন্দির। ইহাই শ্রীভগবানের মুখ্য প্রাসাদ। ইহা সমগ্র গোলকধামের মুকুটের ন্যায়

অত্যন্ত মনোহর। চারিদিকে যে সকল সোপান শোভা পাইতেছে ঐগুলি প্রাসাদের উর্দ্ধে উত্থিত হইবার উপায় স্বরূপ। এই সকল সোপান চারিদিক হইতেই উর্দ্ধদিকে উত্থিত হইয়া মধ্যস্থলে পরিসমাপ্ত হইয়াছে। সেইখানে একটি রন্ধ্র স্বরূপ অবকাশ স্থান রহিয়াছে যাহার উর্দ্ধভাগে শুক্লবর্ণ দ্বার স্বপ্রকাশ জ্যোতিতে উদ্ভাসিত। এই প্রাসাদটি দেখিতে ঠিক সুমেরুর ন্যায় নয়নরঞ্জন। চারিদিকে অসংখ্য স্তম্ভ মণিময় কুট্টিমকে ধারণ করিয়া রহিয়াছে। প্রতি স্তম্ভে এক একটি পতাকা ঝুলিতেছে। সর্বোপরি নিরালম্বভাবে যেন কিছুকে স্পর্শ না করিয়াই স্বয়ং ভগবানের শ্রীবিগ্রহ শোভা পাইতেছে। ঐ দেহের কান্তিতেই শুধু অন্তঃপুর নহে, চারিদিককার বনরাজি ও লীলাকুঞ্জ সকল, অসংখ্য পুর বা দ্বীপপুঞ্জ, এমন কি সমগ্র মহাগোলকধাম বা শ্বেতদ্বীপ উজ্জ্বল জ্যোতিতে প্রকাশ পাইতেছে। এই মহাজ্যোতি কিঞ্চিৎ মন্দীভূত হইয়া ব্যাপী বৈকুণ্ঠ ও মহাবৈকুণ্ঠকে উদ্ভাসিত করিয়াছে। ইহা হইতে নিঃসৃত কিরণমালা শ্রীভগবানের অঙ্গ কান্তি রূপ জ্যোতির্ময় ব্রহ্মস্বরূপে সিদ্ধলোক আখ্যায় প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। সেই জ্যোতি কারণবারিকে স্পর্শ করিয়া তাহা হইতে সাক্ষাৎ ও পরম্পরাভাবে অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ড উদ্ভাসিত ও প্রতিভাসিত করিতেছে।

মহাবৃন্দাবনের মধ্যে কুঞ্জবহুল কেলিবন সকল বিদ্যমান রহিয়াছে। এই সকল বন অত্যন্ত গুপ্ত এবং ভগবানের ভিন্ন অন্যের দৃষ্টির অগোচর। অন্তরঙ্গগণ, এমন কি ভগবানের মহিষীবর্গও, এই সকল স্থানের সন্ধান জানেন না। মহিষীবর্গ লক্ষ্মী স্বরূপ, তাঁহাদের ভক্তিতে ঐশ্বর্য্যভাবের প্রাধান্য রহিয়াছে। এইজন্য তাঁহারা ঐশ্বর্য্যময় রাজ-প্রাসাদে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া ঐশ্বর্য্যময় ভগবানকেই উপাসনা করিয়া থাকেন। মাধুর্য্য লীলার নিকেতন স্বরূপ বনস্থলীর সন্ধান তাঁহারা জানেন না। বস্তুতঃ এই সকল কুঞ্জময় বনরাজি ভগবানের সেই সকল প্রেয়সীবর্গের জন্য অভিপ্রেত যাঁহারা সমর্থারতির অধিকার লাভ

করিয়া উহার ক্রমবিকাশের পথে ভগবানের সহিত মাধুর্য্যময় বিলাসে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। এই বিলাসের পূর্ণ পরিণতি মহাভাবময়ী শ্রীরাধাতে। মহিষীগণ সমঞ্জসা রতির প্রতিমূর্ত্তি বলিয়া এই সকল কুঞ্জে প্রবেশ লাভ করিতে পারেন না। বনভূমির খেলা অত্যন্ত গুপ্ত এবং গোপনীয়। পৌর্ণমাসী রূপিণী যোগমায়ার অন্তরালে এই রহস্য লীলা বা রসবিলাস নিরন্তর সংঘটিত হইতেছে।

গোকুল পদ্মের এক একটি দলে যে সকল কেলিবন রহিয়াছে তাহাতে ভগবানের সেই সকল ভক্ত বাস করেন যাঁহারা স্বয়ং কান্তাভাবে কান্তরূপী ভগবানকে রাগমার্গে উপাসনা করেন। এই কমলে কিঞ্জল্ক প্রদেশে উক্ত প্রেয়সীবর্গের অংশস্বরূপ ভক্তগণ অবস্থিতি করেন।

শ্রী অথবা মহালক্ষ্মী, ভূ এবং লীলা ভগবানের এই তিনটি মুখ্য শক্তির কথা প্রসিদ্ধ আছে। শ্রী অথবা মহালক্ষ্মীর নামান্তর রমা। ইনি জ্ঞানানন্দস্বরূপ এবং ভগবানের পরমা শক্তি। ইহা হইতে আধার শক্তি এবং লীলাশক্তি এই দুইটি আবির্ভূত হয়। আধার শক্তির নামান্তর ধরা অথবা ধরণী। ইহাকেই সাধারণতঃ ভূদেবী বলিয়া বর্ণনা করা হয়। এই ধরা রূপ মূল প্রকৃতি হইতে মহত্তত্ত্ব প্রভৃতি যাবতীয় তত্ত্ব আবির্ভূত হয়। এই শক্তি দ্বারাই অখিল বিশ্ব বিধৃত রহিয়াছে। ধরা অথবা পৃথিবী শুধু যে একটি ব্রহ্মাণ্ডের আধার তাহা নহে। ইহা অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ডের একমাত্র আধার। এই সকল ব্রহ্মাণ্ড ভগবানের রোমকূপে বিদ্যমান রহিয়াছে। ভগবান বরাহরূপে এই ধরারূপ ভূশক্তিকেই উদ্ধার করিয়াছিলেন। ইহা গোরূপে এবং ভূমিরূপে যুগপৎ আবির্ভূত হয়। এই গো কামধেনুস্বরূপা এবং এই ভূমি চিন্তামণিস্বরূপা। ভগবান যখন স্বরূপভূতা মহাশক্তি লক্ষ্মীর সহিত খেলা করিতে ইচ্ছা করেন তখন মহালক্ষ্মী গোপীরূপে, ভগবান গোপরূপে এবং ভূদেবী গোলোকরূপে আত্মপ্রকাশ করেন। তাঁহার লীলাশক্তি ভগবৎস্বরূপের আত্মভূত আনন্দকে অনন্ত প্রকারে উচ্ছলিত করিতে

থাকে। এই লীলা আত্মলীলা। ইহা অত্যন্ত রহস্যময় এবং দুর্লক্ষ্য। যোগিগণ, ঋষিগণ এবং দেবগণও ধ্যানের দ্বারা ইহার সন্ধান পান না।

শ্রীভগবান্ ধরা শক্তি দ্বারা আত্মলীলার উপযোগী একটি মহাপীঠ বিনোদের জন্য পৃথক্‌ভাবে গোলোক মধ্যেই প্রকাশিত করেন। এই পীঠই সহস্রদল কমলাকার মাথুর মণ্ডল। ইহার অন্তর্বর্ত্তী বিভাগটি গোকুল নামে প্রসিদ্ধ। এই পীঠই শ্রীবৃন্দাবন তত্ত্বের রহস্য। ইহা ভক্তের জন্য অনাদি কাল হইতে ভগবানের অনাদি ইচ্ছায় রচিত হইয়া রহিয়াছে। জ্ঞানী অথবা কর্ম্মী এইখানে প্রবেশ পথ পায় না। এই পীঠে নিরন্তর গন্ধর্বগণ ও অপ্সরাগণ চারিদিকে বেষ্টন করিয়া নৃত্য ও গীতের দ্বারা পূর্ণানন্দ বিধান করিতেছে। এইখানকার পুরুষ ও নারী সকলেই কিশোর বয়স্ক। তাঁহারা সকলেই ভগবানের স্বরূপশক্তি হইতে প্রকটিত বলিয়া ভগবানেরই অংশ। সুখময় বসন্ত এখানে নিত্য বিরাজ করিতেছে। বনভূমি নিরন্তর সুকণ্ঠ বিহঙ্গমকুলের কাকলী দ্বারা মুখরিত। মন্দ মন্দ সমীরণের সহিত পদ্মরেণু বিকীর্ণ হওয়ায় সমগ্র যোগপীঠটি নিরন্তর মাধুর্য্যময় পদ্মগন্ধে সুরভিত। এইস্থানে শোক অথবা দুঃখ, জরা অথবা মৃত্যু, ক্রোধ, মাৎসর্য্য অথবা অহংকার কিছুই বিদ্যমান নাই। ইহা গুণাতীত প্রেমভক্তিস্বরূপ বৃন্দাদেবী দ্বারা সতত সংরক্ষিত থাকে। বৃন্দাবনস্থ এই পীঠই রাধা-গোবিন্দের লীলাভূমি। ইহা গুহ্য হইতেও গুহ্যতর এবং বাহ্য ও আন্তরভাবে গোলোকে নিত্য প্রতিষ্ঠিত। ইহা পর পর সাতটি আবরণের দ্বারা বেষ্টিত। এই মহাপীঠের মধ্যে ধ্বজবিতানমণ্ডিত মাণিক্যময় মণ্ডপ শোভা পাইতেছে যাহার কেন্দ্রস্থলে নানা রত্নখচিত দর্পণ সন্নিভ অষ্ট কোণ যোগপীঠ প্রতিষ্ঠিত আছে। ইহা সহস্র স্তম্ভ দ্বারা বিধৃত এবং অসংখ্য তোরণাবলী শোভিত। ইহার উপর মাণিক্যময় সিংহাসনে অষ্টদল কমল—যাহার কর্ণিকাতে ও কেশর-রাজিতে শ্রীগোবিন্দ প্রিয়তম ভক্ত সঙ্গে বিহার করেন। উক্ত কর্ণিকায় বীরাসনে গৌর-শ্যামাত্মক, অদ্বৈত তেজ প্রকাশমান। অর্থাৎ রাধা-

গোবিন্দের যুগলমূর্ত্তি ঐ কর্ণিকার উপরে পরস্পর জড়িত ভাবে ভুবন-মোহন সৌন্দর্য্যে দিক্ দিগন্তর আলোকিত করিয়া প্রকাশ পাইতেছেন। এই গৌরতেজ রাধা এবং শ্যামতেজ শ্রীকৃষ্ণ। জলে মাধুর্য্যের ন্যায় বায়ুতে স্পর্শের ন্যায়, চন্দ্রে চন্দ্রিকার ন্যায়, অগ্নিতে দাহিকা শক্তির ন্যায়,—শ্রীকৃষ্ণস্বরূপে রাধারূপ স্বরূপশক্তি অভিন্নরূপে বিরাজ করিতে-ছেন। মেঘের কোলে যেমন সৌদামিনী প্রকাশ পায়—ইহাও ঠিক সেইরূপ। কমলের অষ্টদলে ললিতাদি অষ্ট সখী আপন আপন স্বভাবে অবস্থিতি করিতেছেন। পূর্বে বিশাখা, পশ্চিমে ললিতা,উত্তরে শ্রীমতী এবং দক্ষিণে পদ্মা। অগ্নিকোণে শৈব্যা, নৈঋ‌র্তকোণে ভদ্রা, বায়ু-কোণে শ্যামলা এবং ঈশানকোণে হরিপ্রিয়া। এই অষ্টশক্তির পার্শ্বদেশে আরও আটটি শক্তির প্রকাশ আছে, যথা চন্দ্রাবলী (চন্দ্ররেখা), বৃন্দা, বদনসুন্দরী, শ্রীপ্রিয়া, মধুমতী, শশিলেখা, কুঞ্জরী এবং সুমুখা। এই ষোড়শ শক্তিই প্রধান। এই সকল শক্তির নাম এবং সন্নিবেশ বহু প্রকারের আছে এবং হইতে পারে। তাহাতে তত্ত্বগত কোন পার্থক্য হয় না।

পূর্ব বর্ণিত যোগপীঠটি চারিদিকে মহারত্নের কিরণের দ্বারা বেষ্টিত। সংবৎসরের অবয়ব স্বরূপ এক একটি ঋতুতে এই পীঠটি এক একটি বিশিষ্ট আভাতে উদ্ভাসিত হয়। তদনুসারে একটি বর্ষ চক্রের আবর্ত্তনের সমকালে ইহাতে ছয় প্রকার আভা পর পর দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। শুধু তাহাই নহে, প্রত্যেক ঋতুতে যদিও ব্যাপক আভা ঐ ঋতুর অবসান কাল পর্য্যন্ত একই থাকে, তথাপি এই ব্যাপক আভার অন্তর্গত রূপে প্রতি অহোরাত্রে পর পর ছয় বার এই পীঠের বর্ণের পরিবর্তন ঘটে। এই যোগপীঠের যে সকল বিভিন্ন সংজ্ঞা সিদ্ধ সমাজে প্রচলিত আছে—তন্মধ্যে আনন্দমণ্ডপ,সাম্রাজ্যমণ্ডপ, সৌভাগ্য-মণ্ডপ, শৃঙ্গারমণ্ডপ, সুরতমণ্ডপ, শ্রীরত্নমণ্ডপ, মহামাধুর্য্যমণ্ডপ ও রাধা-সৌভাগ্য মণ্ডপ—এই আটটি প্রধান। এই পীঠে রাধাগোবিন্দের গুহ্যলীলা দিব্য ও অদিব্য সমগ্র জগতের দৃষ্টির অগোচরে অনুষ্ঠিত

হইতেছে। এই লীলার অবসানে রাধা-গোবিন্দ অদ্বয় আত্মস্বরূপে বিশ্রাম করেন। তখন রাধা অথবা গোবিন্দ কাহারও বিগ্রহ প্রতিভাত হয় না। এক অখণ্ড ও অনন্ত চিন্ময় রসের সত্তায় বিগ্রহদ্বয় অস্তমিত হয়। এই অদ্বয় রসঘন ভাব আশ্রয় করিয়াই মহাচৈতন্যের উন্মেষ হইয়া থাকে। কিন্তু ইহা সকলের জন্য নহে।

গোকুলে সপ্তকক্ষাময় যে গোলাকার অন্তরঙ্গ ভগবদ্‌ধামের বর্ণনা করা হইয়াছে তাহাকে বেষ্টন করিয়া চারিদিকে অনন্তকোটি গোপী-গণের বাসস্থল রহিয়াছে। সভাগৃহের কথা পূর্বেই বলা হইয়াছে। এই সকল অসংখ্য সভাগৃহের পঞ্চকক্ষাত্মক সন্নিবেশ উপলব্ধ হয়। অর্থাৎ সর্বত্রই পঞ্চকক্ষাত্মক সমষ্টিরূপে সভাগৃহগুলি বিন্যস্ত। চারিদিকে চারি কক্ষা, মধ্যে মহাপ্রাঙ্গণ। প্রতি কক্ষাতেও তেমনি চারিদিকে গৃহ পংক্তি, মধ্যে খণ্ড প্রাঙ্গণ। মহা-প্রাঙ্গণ কিন্তু মূলে একটি। খণ্ড প্রাঙ্গণ—অনন্ত। যদিও আপাতদৃষ্টিতে প্রতি পঞ্চ কক্ষার মধ্যস্থলেই মহাপ্রাঙ্গণ আছে ইহা সত্য, তথাপি পারমার্থিক দৃষ্টিতে একই মহাপ্রাঙ্গণ প্রতি পঞ্চ কক্ষার মধ্যস্থলবর্তিরূপে তত্তৎ কক্ষানিবাসী ভক্তগণের নিকট প্রতীতিগোচর হয়। ইহা হইতেই বুঝিতে পারা যাইবে যে যদিও গৃহসংখ্যা অনন্ত, কক্ষাসংখ্যাও অনন্ত, এমন কি খণ্ড প্রাঙ্গণের সংখ্যাও অনন্ত, তথাপি প্রতি খণ্ড প্রাঙ্গণ হইতে বা প্রতিকক্ষা হইতে, এমন কি প্রতি গৃহ হইতে মহাপ্রাঙ্গণে যাইবার সাক্ষাদ মার্গ রহিয়াছে। ইহা অত্যন্ত গুহ্য তত্ত্ব।

পিণ্ডমধ্যে প্রতিচক্রের কেন্দ্রে যে বিন্দু উপলব্ধ হয়, সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড-রূপী চক্রের কেন্দ্রে মহাবিন্দুরূপে সেই বিন্দুটিকেই পাওয়া যায়। বিন্দুর মধ্যেই মহাবিন্দুর দর্শন হয় এবং মহাবিন্দুতেও বিন্দুর স্থিতি বিদ্যমান আছে বুঝিতে পারা যায়। স্ব স্ব প্রাঙ্গণ আশ্রয় করিয়া প্রসিদ্ধ মার্গ যোগে মহাপ্রাঙ্গণে প্রবেশ করা যায়, এইরূপ গুপ্ত পথও আছে। এই সাক্ষাদ উপলব্ধিতে কোন অন্তরায় থাকে না।

মহাবৃন্দাবনে যে সকল ক্রীড়াবন রহিয়াছে তাহাদের

প্রত্যেকটিতে নানাপ্রকার কুঞ্জ বিরাজ করিতেছে। অন্তরঙ্গ ভক্তগণের তৃপ্তির জন্য শ্রীরাধাগোবিন্দের কুঞ্জলীলা এই সকল কুঞ্জে অনুষ্ঠিত হয়। সকল কুঞ্জই স্বতঃসিদ্ধ ও আপনাতে আপনি বিশ্রান্ত। অর্থাৎ কোন বিশিষ্ট কুঞ্জের লীলায় অন্য কুঞ্জের সহিত কোন প্রকার সম্পর্ক থাকে না, আবার কুঞ্জ সকলের পরস্পর সম্বন্ধ রূপেও ভগবল্লীলা হইয়া থাকে।

এইজন্য যদিও বাহ্যদৃষ্টিতে একটি কুঞ্জের সহিত অপর কোন কুঞ্জের কোন সম্পর্ক নাই, তথাপি প্রতি কুঞ্জের সহিতই প্রতি কুঞ্জের গুপ্ত সম্বন্ধ রহিয়াছে এবং অত্যন্ত গুপ্ত সঞ্চারণ মার্গও রহিয়াছে। এক একটি বন ভাবানুযায়িনী প্রকৃতির এক একটি প্রতীক। ভাব অনন্ত বলিয়া কেলি কাননের বাস্তবিক সংখ্যাও অনন্তই। কিন্তু দৃষ্টিভেদে ভাবের যেরূপ শ্রেণীবিভাগ সম্ভবপর ঠিক সেই প্রকার কেলিবনেরও শ্রেণী-বিভাগ হইতে পারে। রসিক ও ভাবুকগণ আপন আপন দৃষ্টিকোণ হইতে ঐরূপ বিভাগ করিয়াও থাকেন। একই প্রকৃতি মূলে অভিন্ন থাকিলেও বিলাসের বৈশিষ্ট্য অনুসারে তাহাতে আস্বাদনের বৈচিত্র্য হইয়া থাকে। এইজন্যই বন এক হইলেও তাহাতে বিভিন্ন কুঞ্জ অন্তর্গত থাকে। একই বনের অন্তর্গত বিভিন্ন কুঞ্জে বিভিন্ন প্রকার মাধুর্য্য রসের আস্বাদন হইয়া থাকে। বৈজ্ঞানিকগণ যেমন মস্তিষ্কের বিভিন্ন কেন্দ্রের সহিত বিভিন্ন প্রকার চিন্তা ও ভাবের বিকাশের সম্বন্ধ প্রদর্শন করিয়া থাকেন তদ্রূপ বিভিন্ন কুঞ্জের সহিত মাধুর্য্য রসের বিভিন্ন প্রকার আস্বাদনের সম্বন্ধ রহিয়াছে জানিতে হইবে। সখীভেদে কুঞ্জভেদ, রসভেদে কুঞ্জভেদ—সবই সত্য। ইহার আলোচনা লীলা প্রসঙ্গে করা যাইবে।

গোষ্ঠ সকল দলান্তর্বর্ত্তী প্রদেশকে বলা হয় অর্থাৎ গোকুল পদ্মের বিভিন্ন দলের মধ্যবর্ত্তী প্রদেশই গোচারণ ও গোষ্ঠ লীলার ক্ষেত্র। এই ক্ষেত্রও গোকুল পদ্মকে চারিদিকে ঘেরিয়া রহিয়াছে।

দাস্য-সখ্য-বাৎসল্য এই তিন প্রকার ভক্তি রসের আস্বাদনের

উপযোগী স্থান সকল মহাধামের অন্তর্গত বলিয়া জানিতে হইবে। এই সকল অবান্তর ধামে তত্তৎ ভক্তগণ অবস্থান করেন। সর্বত্রই মধ্যবর্ত্তী ভূমিতে ভক্তগণের উপাস্য ভগবদ্রূপ প্রকাশিত হয়। এই সকল ধামও উজ্জ্বল রসের ক্ষেত্র স্বরূপ কুঞ্জকাননের ন্যায় মহাবৃন্দাবন মধ্যে নিত্য বিরাজমান। গোকুল পদ্ম হইতে পুরগামী মার্গের কথা বলা হইয়াছে। মাথুর মণ্ডলে অথবা গোলোকাখ্য শ্বেত দ্বীপের মধ্যে মণ্ডলাকারে অসংখ্য পুর বা নগর বিদ্যমান রহিয়াছে। প্রতি নগরের সহিতই গোকুল পদ্মের সম্বন্ধ আছে। যে পথের দ্বারা এই সম্বন্ধ স্থাপিত হয় তাহা অসংখ্য। সূর্য্যের রশ্মি যেমন ছটারূপে চারিদিকে বিকীর্ণ হয় ঠিক তেমনি গোকুল পদ্ম হইতে ছটা নির্গত হইয়া বহিরঙ্গ স্বরূপ পুরমণ্ডল পর্য্যন্ত প্রসারিত রহিয়াছে। লূতাতন্তুর ন্যায় এই প্রকার অসংখ্য পথ চারিদিকে বিদ্যমান।

শ্রীবৃন্দাবনের বর্ণনা প্রসঙ্গে শ্যামকুণ্ড, রাধাকুণ্ড, গোবর্দ্ধন পর্বত এবং যমুনা এই কয়টি বিষয়েও সংক্ষেপে কিছু বলা আবশ্যক। শ্যামকুণ্ড ও রাধাকুণ্ড স্বরূপতঃ পরস্পর পৃথক্ ভাবে অবস্থিত হইলেও উভয়ের মধ্যে সংযোগ রহিয়াছে। পূর্বে শ্যামকুণ্ড এবং পশ্চিমে রাধাকুণ্ড অবস্থিত। উভয়কুণ্ডের যোজনাকারী সেতু এক কুণ্ড হইতে অন্য কুণ্ডে জল সঞ্চারের জন্য বিদ্যমান রহিয়াছে। রাধাকুণ্ড চতুষ্কোণ একটি সরোবর যাহাতে স্বচ্ছ জলরাশি নিরন্তর শোভা পাইতেছে। ইহার চারিদিকে চারিটি ঘাট এবং মণিময় মন্দির স্থাপিত। প্রতি ঘাটের দুই পার্শ্বে রত্নময় কুটীর। চারিদিকে ভূমি হইতে জলে অবতীর্ণ হইবার জন্য মণিরত্নময় সোপান শ্রেণী স্তরে স্তরে বিন্যস্ত রহিয়াছে। রাধাকুণ্ডের আটদিকেই আটটি কুঞ্জ রহিয়াছে। ইহার পূর্বে কদমকুঞ্জ, পশ্চিমে আম্রকুঞ্জ, দক্ষিণে চম্পক কুঞ্জ এবং উত্তরে গোকুল কুঞ্জ। তদ্রূপ অগ্নি, নৈর্ঋত, বায়ু ও ঈশান এই চারি কোণেও চারিটি পৃথক্ পৃথক্ মাধবীকুঞ্জ শোভা পাইতেছে। চতুঃশালা উহার প্রান্তভূমিতে বিস্তারিত রহিয়াছে। বাধাকুণ্ডের পূর্বদিকে শ্যামকুণ্ড—সেতুযোগে

উভয় কুণ্ডের সঙ্গম, একথা পূর্বেই বলা হইয়াছে। কুণ্ডের চতুর্দিকে এবং প্রতি কুঞ্জকে বেষ্টন করিয়া পুষ্পবন বিরাজ করিতেছে। এই সকল উদ্যানে অসংখ্য বর্ণের নানাপ্রকার গন্ধবিশিষ্ট সুন্দর সুন্দর পুষ্প প্রস্ফুটিত হইয়া থাকে। ছয় ঋতুর পুষ্পই সমরূপে এই সকল উদ্যানে সর্বসময়ে উপলব্ধ হয়। পুষ্পবনের সঙ্গে সঙ্গে অসংখ্য উপবন চারিদিকে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে যাহাতে সব সময় ছয় ঋতুর ফল শোভা পাইতেছে। ঐ সকল বন ও উপবনে নানা জাতীয় পক্ষী সকল নিরন্তর ভগবানের গুণগান করিতেছে। পুষ্প ও ফলের ন্যায় অসংখ্য প্রকারের লতার বিতানও উচ্চ নিম্ন আবৃত এবং উন্মুক্ত প্রভৃতি ভিন্ন ভাবে শোভা পাইতেছে। কুণ্ড সলিলে বিভিন্ন বর্ণের অর্থাৎ শ্বেত, নীল, রক্ত, পীত প্রভৃতি নানা বর্ণের পদ্ম ফুটিয়া রহিয়াছে। হংস, হংসী, চক্রবাক, চক্রবাকী, ডাহুক, ডাহুকী প্রভৃতি ক্রীড়া করিতেছে। উত্তর দিককার ঘাটে অনঙ্গমঞ্জরীর কুঞ্জ। তাহার সন্নিকটেই ললিতার কুঞ্জ। এই কুঞ্জটিকে রাজপাটধাম কুঞ্জ বলে। এই কুঞ্জে মধ্যাহ্নকালে রাধাকৃষ্ণ বিশ্রাম করেন। ঐ স্থানে সেবার উপযোগী যাবতীয় দ্রব্য-সম্ভার সর্বদা প্রস্তুত থাকে। উহার সংলগ্নরূপে একটি চিত্রশালা আছে। নানাপ্রকার চিত্র এবং বেশভূষা উহাতে সর্বদাই উপস্থিত থাকে। এই কুঞ্জের অপর নাম—যাহা ভক্ত সমাজে বিশেষরূপে প্রসিদ্ধ—ললিতা-নন্দদা কুঞ্জ। ইহার বাহিরে আট দিকে আটটি কুঞ্জ আছে। এক একটি কুঞ্জের বর্ণ এক এক প্রকার। এইজন্য আট দিকে নিরন্তর আট প্রকার বর্ণ খেলা করিতেছে। যে কুঞ্জে যে বর্ণ প্রতিভাসিত হয়, সেখানকার তরুলতা, পশুপাক্ষী সকলই সেই বর্ণ ধারণ করে। রাধাকৃষ্ণ ঐ কুঞ্জে প্রবেশ করিবার সময় সেই বর্ণে রঞ্জিত হইয়া প্রকাশিত হন। সিদ্ধ ভক্তগণের দৃষ্টি অনুসারে এই অষ্ট কুঞ্জের বিন্যাস এই প্রকার—পূর্বে চিত্রার কুঞ্জ, পশ্চিমে তুঙ্গবিদ্যার কুঞ্জ, উত্তরে ললিতার, দক্ষিণে চম্পকলতার, অগ্নিকোণে ইন্দুরেখার, নৈঋর্ত-কোণে রঙ্গদেবীর, বায়ুকোণে সুদেবীর এবং ঈশানকোণে বিশাখার

কুঞ্জ শোভা পাইতেছে। ললিতা ও বিশাখাকে বাদ দিয়া ছয়টি কুঞ্জের বর্ণ এই প্রকার—চিত্রার চিত্রবর্ণ, ইন্দুরেখার শ্বেতবর্ণ, চম্পকলতার পীতবর্ণ, রঙ্গদেবীর শ্যামবর্ণ, তুঙ্গবিদ্যার লোহিত বর্ণ, সুদেবীর হরিদ্বর্ণ।

রাধাকুণ্ডের ন্যায় শ্যামকুণ্ডেও আটটি নর্মসখার আটটি কুঞ্জ আছে। শ্যামকুণ্ডের বায়ুকোণে যে ঘাট আছে, তাহার নাম মানসপাবনঘাট, উহাতে স্বয়ং রাধা স্নান করেন। উত্তরদিককার ঘাটের নাম মধুরঘাট, উহাতে ললিতা স্নান করেন। ঈশানকোণের ঘাটের নাম উজ্জলঘাট, সেখানে বিশাখা স্নান করেন। ঠিক এই প্রকার অর্জ্জুন, গন্ধর্ব, কোকিল, বিদগ্ধ, সনন্দ প্রভৃতি সখার ঘাটে আপনাপন সখী স্নান করিয়া থাকেন। সখা ও সখীর বন্ধন সূত্রের রহস্য ইহা হইতে বুঝিতে পারা যাইবে।

গোবর্দ্ধন পর্বত অপ্রাকৃত লীলার একটি বিশিষ্ট ক্ষেত্র। ইহার সঙ্গে ইহা হইতে নিঃসৃত মানস গঙ্গার সবিশেষ সম্বন্ধ রহিয়াছে। বৃন্দাবন তলবাহিনী শ্রীযমুনার স্থানও বিশেষরূপে উল্লেখযোগ্য। বিরজা ভেদ না হইলে যেমন বৈকুণ্ঠধামে প্রবেশ লাভ হয় না ঠিক সেই প্রকার যমুনা ভেদ না করিতে পারিলে স্বয়ং ভগবানের ধামে প্রবেশ করিতে পারা যায় না। আধ্যাত্মিক দৃষ্টিতে যমুনা সুষুম্না স্থানাপন্ন, একথা বৃহৎ ব্রহ্মসংহিতাতে স্পষ্ট ভাবেই উল্লিখিত হইয়াছে। সুষুম্নাকে আশ্রয় না করিয়া যেমন যোগীর সঞ্চার সম্ভবপর হয় না—ঠিক সেই প্রকার যমুনাকে আশ্রয় না করিয়াও ভগবানের নিত্য লীলার স্থান আত্মপ্রকাশ করিতে পারে না। যমুনা সূর্যকন্যা বলিয়া প্রসিদ্ধ, কালাত্মক যমও সূর্যের তনয়। সুতরাং কালের অতীত নিত্যধাম কালশক্তি যমুনার পরপারে অবস্থিত—ইহা স্বাভাবিক।

বৈকুণ্ঠ অথবা গোলকাদিতে কোন্ কোন্ ভক্ত বাস করেন বা করিতে পারেন তাহা বিচারণীয়। বৈকুণ্ঠধামকে আপাতদৃষ্টিতে দুইটি পৃথক পৃথক অংশে বিভক্ত করা যাইতে পারে। তন্মধ্যে যেটি বাহ্যাংশ

তাহা পরমাত্মার অধিষ্ঠান ক্ষেত্র বলিয়া তাহার সহিত মায়ার সম্বন্ধ রহিয়াছে। যদিও ঐ ধাম মায়ার অতীত তথাপি পরমাত্মা মায়ার অধিষ্ঠাতা বলিয়া এবং তাঁহার ঈক্ষণে মায়া ক্ষুব্ধ হয় বলিয়া এক হিসাবে তাহার সহিত মায়ার সম্বন্ধ স্বীকার করিতে হয়। পরমাত্মা চিৎশক্তিসম্পন্ন হইলেও ঐ শক্তির পূর্ণ কলার বিকাশ তাঁহাতে থাকে না বলিয়া পরমাত্মা মায়ার অধিষ্ঠাতা হইতে পারেন। অবতার আদির স্থান বৈকুণ্ঠের এই বাহ্যাংশেই নির্দ্দিষ্ট আছে। যে সকল খণ্ড বৈকুণ্ঠের কথা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে তাহা পরমাত্মারই স্বাংশ সকলের ক্ষেত্র। এই সকল ক্ষেত্রে তত্তৎ ক্ষেত্রের অধিপতি এবং তাঁহার পরিবার মণ্ডল ব্যতিরেকে যোগী ভক্তগণ বিরাজ করেন। বলা বাহুল্য, ইঁহারা সকলেই মুক্ত পুরুষ। ইঁহারা সকলেই সাক্ষিস্বরূপ। ইঁহারা সকলেই ন্যূন বা অধিকভাবে পরমাত্মার সহিত তাদাত্ম্যসম্পন্ন হইয়া পরমাত্মভাবে ভাবিত। ইঁহাদের সকলেরই আত্মজ্ঞান সিদ্ধ হইয়াছে অথচ ইঁহারা সকলেই পরমাত্মার ভক্ত। এই ভক্তিই ইঁহাদের যোগ।

বৈকুণ্ঠের আন্তরমণ্ডলে দাস্য ভাবাপন্ন ভক্তগণের নিবাস। বাহ্য-মণ্ডলে যে সকল ভক্ত বাস করেন তাঁহারা ভক্ত হইলেও যোগী বলিয়া ঐশ্বর্যপ্রিয়। এই যোগ-ভক্তির পূর্ণ বিকাশ হইলে তাঁহারা পরমাত্মার সহিত অভেদ প্রাপ্ত হইয়া ঈশ্বর পদবাচ্য হন। যতক্ষণ ভগবচ্চরণে এই ঐশ্বর্য্যের সমর্পণ এবং পূর্ণ আত্মনিবেদন না হয়, ততক্ষণ তাঁহারা বৈকুণ্ঠের অন্তর্মণ্ডলে প্রবেশ করিতে পারেন না। অন্তর্মণ্ডলে প্রবেশ করিতে হইলে কৈঙ্কর্য্য অথবা দাস্য স্বীকার করিয়াই প্রবেশ করিতে হইবে। যে ঈশ্বর ভাবাপন্ন সে ভক্ত হইলেও যোগী, প্রকৃত ভক্ত নহে—বৈকুণ্ঠের অন্তর্মণ্ডলে তাহার স্থান নাই। মোট কথা, সেবক অথবা কিংকর ভিন্ন অন্য কেহই অন্তর্মণ্ডলে স্থান লাভ করে না। সেবাই ভক্তির যথার্থ স্বরূপ। এই অন্তর্মণ্ডলে সালোক্য, সামীপ্য, সারূপ্য, সার্ষ্টি এবং সাযুজ্য ভক্তগণের এই পাঁচ প্রকার অবস্থা আছে।

মণ্ডলাভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হওয়া মাত্রই সালোক্য অবস্থা সিদ্ধ হয়। সালোক্য বলিতে সমান লোকে নিবাস বুঝায় অর্থাৎ প্রভু যে লোকে বাস করেন যখন তাঁহার ভক্ত কিংকর সেই লোকেই স্থান লাভ করে তখন তাহার সালোক্য লাভ হইয়াছে বলা চলে। ভগবানের সবিশেষ প্রভাই তাঁহার স্বলোক—অর্থাৎ শুদ্ধ বৈকুণ্ঠ এবং নির্বিশেষ প্রভা ব্রহ্ম-জ্যোতিঃ ইহা মনে রাখিতে হইবে। উপাসনার ক্রম বিকাশে যখন ভক্ত ক্রমশঃ উপাস্যের অধিকতর নিকটবর্ত্তী হইতে থাকে তখন তাহার অবস্থা সামীপ্য বলিয়া কথিত হয়। এই অবস্থায় নিত্যই ভগবানের রূপ সন্নিহিত ভাবে সে অনুভব করে। সালোক্য অবস্থায় এই সান্নিধ্যটা প্রকট হয় না। সামীপ্যের পূর্ণ বিকাশে নিজের স্বরূপটি উপাস্য ভগবানের স্বরূপে পরিণত হয়। ইহাই সারূপ্যাবস্থার উন্মেষ। এই অবস্থায় ভক্ত ভগবদ্-আকার প্রাপ্ত হইলেও বস্তুতঃ ভগবানের কিংকর অথবা দাস ভাবাপন্নই থাকে। ইহার পর ভক্তির মহিমাতে ভগবৎ-কৃপায় সার্ষ্টি অবস্থার অভিব্যক্তি হইলে ভক্তের মধ্যে ভগবানের শক্তি ফুটিয়া উঠে। এই শক্তিরও একটি ক্রমিক বিকাশ আছে। তাহার পূর্ণতা সিদ্ধ হইলে সাযুজ্যাবস্থা অনাহূতভাবেই আসিয়া পড়ে। তখন ভক্ত শুধু ভগবানের ন্যায় শক্তিসম্পন্ন নহেন, নিত্যই ভগবৎস্বরূপে যুক্ত থাকেন। ভগবৎসত্তাতেই তাঁহার সত্তা, ভগবৎশক্তিই তাঁহার শক্তি, ভগবানের রূপই তাঁহার রূপ, এইরূপ অবস্থার উদয় হয়। বস্তুতঃ ইহা ভগবৎস্বরূপের সহিত অভেদভাব।

ভগবদ্ধামের বহির্মণ্ডলে পরমাত্মার অধিষ্ঠানভূমিতে যোগিগণ বাস করেন, একথা পূর্বেই বলা হইয়াছে। ইঁহারা মুক্ত ও ভক্ত তাহাতে সন্দেহ নাই। তবে প্রকৃতি ভেদে ইঁহাদের মধ্যে অনেক বৈচিত্র্য আছে। পরমাত্মদর্শন ও ভগবদ্দর্শনের মধ্যে পার্থক্য আছে। তদ্রূপ পরমাত্মদর্শনের মধ্যেও অন্তর্ভেদ রহিয়াছে। নির্বিশেষ অবস্থার অন্তরালে পরিমিত সবিশেষ ভাবের যে স্ফুরণ তাহাই পরমাত্মার স্ফুর্ত্তি। পরমাত্মদর্শন যোগীর হইয়া থাকে। যোগী মাত্রই শান্ত ভক্তের

অন্তর্গত। এই ভক্তির উন্মেষে অর্দ্ধোন্মেষ ও পূর্ণ বিকাশ প্রভৃতি ভেদে নানা প্রকার অবস্থা আছে। তদনুসারে পরমাত্ম সাক্ষাৎকারেও একটি স্বভাব সিদ্ধ ক্রম রহিয়াছে। প্রথমে জ্যোতির উন্মেষ হয়, তাহার পর ক্রমশঃ ঐ উন্মেষ প্রাপ্ত জ্যোতিঃ ঘনীভূত এবং বলয়াকারে পরিণত হইতে হইতে চরমাবস্থায় মণ্ডলাকারে প্রকাশমান হয়। আদিত্য-মণ্ডলের ন্যায় এই মণ্ডলই পরমাত্মা। এই অবস্থাতেও শান্ত ভক্তির পূর্ণ বিকাশ হয় নাই। যখন তাহা হয় তখন মণ্ডলমধ্যে আকারের দর্শন হয়। মণ্ডলটি ঐ আকারকে বেষ্টন করিয়া তাহার আধাররূপে প্রকাশমান থাকে। ঐ আকার ঐশ্বর্য্যপ্রধান ভগবানের হইতে পারে অথবা মাধুর্য্য প্রধান ভগবানের ঐশ্বর্য্যাংশের অভিব্যক্তিও হইতে পারে। এইজন্যই শান্ত ভক্তগণ কখনও জ্যোর্তিমণ্ডলরূপে, কখনও নারায়ণরূপে কখনও বা দ্বিভূজ মুরলীধররূপে অথবা তাদৃশ অন্য কোন রূপে আত্মার দর্শন পাইয়া থাকেন। শান্ত ভক্তির পূর্ণ বিকাশের পূর্বে প্রকৃতি বিশেষে ক্রিয়াশক্তির বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে ঐশ্বর্য্যের অভিব্যক্তি হইয়া থাকে। মুক্তাবস্থা বলিয়া সাক্ষিরূপে জ্ঞানশক্তির অভিব্যক্তি নিত্যসিদ্ধ। কিন্তু ক্রিয়াশক্তি সাধারণতঃ ক্রম অবলম্বন করিয়া প্রকাশিত হয়। এই ক্রম প্রকাশের পরাকাষ্ঠা পূর্ণ পরমাত্মভাবের প্রতিষ্ঠা। প্রকৃতি বিশেষে অথবা বিশেষ কারণে ক্রিয়াশক্তির বিকাশ নাও হইতে পারে। তখন তটস্থ দশাই বিদ্যমান থাকে। আবার কাহারও কাহারও প্রকৃতি অনুসারে ক্রিয়াশক্তির পূর্ণ বিকাশ থাকিলেও তটস্থ ভাব চ্যুত হয় না, পক্ষান্তরে আশ্রিত ভক্তভাবের উন্মেষ হইয়া থাকে। যাঁহাদের ঐরূপ হয় তাঁহারা এবং যাঁহারা ঐশ্বর্যের পূর্ণ বিকাশের পর উহাকে সমর্পণ করিয়া অগ্রসর হইতে পারেন তাঁহারা সহজেই বৈকুণ্ঠের অন্তর্মণ্ডলে প্রবেশ করিতে পারেন।

সনক, সনন্দন, সনৎকুমার ও সনাতন এই চারিজন পরমহংস শান্ত ভক্তের প্রসিদ্ধ উদাহরণ। কিন্তু ব্রজলীলাতে ইঁহাদের প্রবেশ নাই। কারণ একদিকে ব্রহ্মানন্দ এবং অপরদিকে লীলারস এই উভয়ের মধ্য-

রেখাতে শান্তরসের অবস্থিতি। ইহা ঠিক ব্রহ্মানন্দ নহে, কারণ ইহা রসাত্মক, অথচ ইহা লীলারসও নহে, কারণ ইহাতে ভগবানের সঙ্গে ভক্তের মমত্ব মূলক কোনপ্রকার সম্বন্ধ নাই। শান্ত ভক্তগণের অন্তরাকাশে পরমাত্মার সাক্ষাৎকার হয়। পরমাত্মা বিভু, করুণাময়, নিত্য স্বরূপস্থিত, আত্মারামগণের আদর্শ স্বরূপ। সচ্চিদানন্দের সাকার আবির্ভাব পরব্রহ্ম স্বরূপ। ইঁহারা নিরন্তর নির্নিমেষ নেত্রে পরব্রহ্মের সাক্ষাৎকার করিয়া থাকেন। ইহাই ইঁহাদের পক্ষে সেবা। ইহার নাম রূপসেবা। ইঁহারাই দিব্যসূরি এবং রূপসেবক ভক্ত।

বৈকুণ্ঠধামের অন্তর্মণ্ডলে এই প্রকার রূপসেবক ভক্ত আছেন। এতদ্ব্যতীত দাস্যভাবই বৈকুণ্ঠের প্রধান ভাব। দাসগণের নানা প্রকার শ্রেণীবিভাগ আছে। তন্মধ্যে অধিকারী পুরুষের একটি মণ্ডল আছে। ইঁহারা সকলেই দিব্য ভাবাপন্ন এবং ভগবানের জগদ্ব্যাপারে নিত্য সহায়ক। অর্থাৎ এই সকল অধিকারী ভক্ত ভগবানের দাসরূপে জগতের যাবতীয় কার্য্যের শৃঙ্খলার সহিত ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। বস্তুতঃ ইঁহারা পরমাত্মার স্বাংশরূপেই জগতের কার্য্য করিয়া থাকেন। কিন্তু ইঁহাদের একটা স্থিতির দিক আছে, তাহাতে ইঁহারাও অন্যান্য রূপ সেবকের ন্যায় ভগবানের রূপসেবক। শুধু তাহাই নহে, ইঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ সবিশেষ ভাগ্যোদয়বশতঃ ভগবানের সহিত অন্তরঙ্গ সম্বন্ধে সম্বদ্ধ। সুতরাং আপন স্বভাবোচিত একটা লীলার দিকও ইঁহাদের রহিয়াছে। বৈন্দব জগতে যে অধিকারিমণ্ডলের কথা বলা হইয়াছে তাহাকে ইহার ছায়ারূপ মনে করা যাইতে পারে।

বৈকুণ্ঠ এবং গোলোক এই দুইটি ধাম বস্তুতঃ এক ও অভিন্ন। ষোড়শ কলা পূর্ণ না হইলে বৈকুণ্ঠ হইতে গোলোক ধামে প্রবিষ্ট হইবার অধিকার জন্মে না। বৈকুণ্ঠ নাথ ভগবান ষোড়শ বর্ষ বয়স্ক পূর্ণ কিশোর মূর্ত্তি। ভক্ত ক্রমশঃ আরাধনা প্রভাবে স্বকীয় কলার বিকাশ সাধন করিতে সমর্থ হইলে মহালক্ষ্মী স্বরূপে স্থিতি লাভ করে। বৈকুণ্ঠের ভক্ত মণ্ডলী সকলেই বস্তুতঃ মহালক্ষ্মীরই অংশ। এই সকল

অংশ ক্রমশঃ উপাসনার প্রভাবে অংশিস্বরূপে স্থিতি লাভ করে—নারায়ণরূপী ভগবানের পূর্ণ সেবার অধিকার একমাত্র মহালক্ষ্মীর। সুতরাং সাক্ষাদ্‌ভাবে ভগবানের সেবা-অধিকার প্রাপ্ত হইতে হইলে তাঁহার স্বরূপভূতা শক্তির সহিত তাদাত্ম্যলাভ করিতেই হইবে। যখন ষোলকলার পূর্ণ বিকাশ হয় তখন লক্ষ্মী ও নারায়ণের অভেদ সিদ্ধ হয়। ইহাই পূর্ণত্ব। ভক্ত পূর্ণত্ব লাভ করিয়া মহাজ্যোতিঘন অদ্বৈত স্বরূপে স্থান লাভ করে—একসঙ্গে দ্বাদশ সূর্য্য প্রজ্জ্বলিত হইয়া মহাসবিতারূপ ধারণ করে। এই মহাজ্যোতির্ম্মণ্ডলই গোলোক-ধাম। তখন সপ্তদশী কলারূপা ষোড়শী আপনাতে আপনি বিশ্রান্ত থাকেন এবং আপনার সহিতই আপনি খেলা করেন। ইহাই রাধা-কৃষ্ণ লীলা। রাধা ও কৃষ্ণ যুগল মূর্ত্তি। রাধা কৃষ্ণ ব্যাতিরেকে এবং কৃষ্ণ রাধা ব্যতিরেকে—অপূর্ণ! একই আত্মার যেন দুইটি অঙ্গ নিজের সহিত নিজে খেলা করিবার জন্য এই প্রকার বিগ্রহ ভেদ যোগমায়ার প্রভাবে প্রকট করিয়া থাকেন। উদ্দেশ্য লীলারসের আস্বাদন। বস্তুতঃ ইহা নিত্য—অনাদি ও অনন্ত। কিন্তু একদিক দিয়া দেখিলে ইহারও একটি পরাবস্থা আছে, তাহা লীলাতীত। নিত্য লীলা হইতে লীলাতীতস্বরূপে নির্গত হইবার জন্যই কুঞ্জ ও নিকুঞ্জলীলার ক্রমবিন্যাস রহিয়াছে। নিত্য লীলা এবং লীলাতীত এই উভয় অবস্থার অন্তরালে একটি মহাবিশ্রাম রহিয়াছে। ইহাই রাধা-গোবিন্দের সুষুপ্তি। ইহার পরবর্ত্তী যে জাগরণ তাহাই মহাচৈতন্য রূপে স্ব-স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হওয়া।

পঞ্চদশ কলা পূর্ণ হইলেই মহামণ্ডল প্রকাশিত হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে মধ্যবিন্দুরূপে অমৃতস্বরূপ ষোড়শী কলা আত্মপ্রকাশ করেন। ষোড়শ-কলার বিকাশই পূর্ণত্ব লাভ। যতক্ষণ পঞ্চদশ কলা মণ্ডলাকার ধারণ না করিয়াছে ততক্ষণ কালচক্রের আবর্তন হইতে থাকে। এই কালচক্রে পঞ্চদশ নিত্যা সদা বর্ত্তমান। যিনি ষোড়শী তিনি কালচক্রের অন্তঃপাতী না হইলেও কালচক্রের আধারভূত বলিয়া তাঁহাকেও নিত্যা

মধ্যে পরিগণিত করা হয়। ষোড়শী অমৃতরূপা, পঞ্চদশী বস্তুত কালরূপা। পঞ্চদশী হইতে ষোড়শীতে প্রবেশ এবং ষোড়শী হইতে ছটারূপে নির্গত হইয়া সপ্তদশীরূপে আবির্ভাব—অধ্যাত্ম জগতের ইহা অতি গভীর রহস্য।

পূর্বে যে গোলোকধামের কথা বলা হইয়াছে তাহা বস্তুতঃ ষোড়শীর পরাবস্থার কথা। ষোড়শী পূর্ণ হইলে সেই পূর্ণতার সাক্ষিরূপে সপ্তদশী নিত্য জাগরূক ভাবে বিরাজ করিয়া থাকে। ষোড়শী যে পূর্ণ তাহা সপ্তদশী জানে, কিন্তু ষোড়শী তাহা জানে না অথবা উপলব্ধি করিতে পারে না। অল্পবয়স্ক শিশু যেমন পবিত্র এবং নির্মল চরিত্র অথচ শিশু নিজের পবিত্রতা নিজে উপলব্ধি করিতে পারে না, ঠিক সেই প্রকার ষোড়শী পূর্ণ হইলেও নিজের পূর্ণত্ব নিজে উপলব্ধি করিতে পারে না। অথচ এই উপলব্ধি স্বয়ং প্রকাশ চৈতন্যের পক্ষে একান্ত আবশ্যক। কারণ প্রকাশতত্ত্ব বিশুদ্ধতম প্রকাশরূপ হইয়াও প্রকাশমান না হইলে অপ্রকাশ বা জড়ই থাকিয়া যায়। এইজন্য শক্তি ভিন্ন শিব যেমন শবমাত্র, ঠিক সেই প্রকার বিমর্শ ব্যতিরেকে প্রকাশও অপ্রকাশ বা জড় মাত্র। অর্থাৎ প্রকাশ প্রকাশাত্মক হইলেও তাহাকে প্রকাশরূপে যিনি চিনাইয়া দেন তিনিই বিমর্শ—ইহা প্রকাশেরই অন্তরঙ্গা শক্তি। ষোড়শী ও সপ্তদশী সম্বন্ধেও ঠিক এই প্রকারই বুঝিতে হইবে। সপ্তদশী ব্যতিরেকে ষোড়শী পূর্ণ হইয়াও অপূর্ণ কল্প।

লক্ষ্মী ও নারায়ণ পরস্পর মিলিত হইয়া ব্রহ্মরূপে, অদ্বৈত চিদানন্দময় মহাসত্তারূপে, প্রতিষ্ঠিত হন। এই মহাসত্তাতে যে মহাশক্তি খেলা করে—ভিন্নরূপে নহে, ভিন্নাভিন্ন রূপেও নহে—অভিন্ন-রূপে খেলা করে এবং অদ্বৈতরূপে যাহা নিত্য মিলিত থাকে তাহাই সপ্তদশী কলা। বস্তুতঃ অমাকলা ইহারই স্বরূপ। ইহাকেই ভক্তগণ রাধাতত্ত্বরূপে অর্থাৎ স্বয়ং ভগবানের মহাভাবরূপা নিজ শক্তি রূপে বর্ণনা করিয়া থাকেন। বস্তুতঃ গোলোকাখ্য অদ্বৈত মহাসত্তা এক ও

অনন্ত। তথাপি মহাশক্তি নিত্য লীলাময়ী বলিয়া এই অখণ্ড অদ্বৈত সত্তার বক্ষঃস্থলে নিরন্তর লীলা-বিলাস চলিতেছে। এই লীলাই রাধাকৃষ্ণের যুগললীলা। রাধা বলিতে আধা বুঝিতে হইবে—অর্থাৎ আধা কৃষ্ণ আধা রাধা। উভয়ের সম্মিলনে একটি অখণ্ড রসময় তত্ত্ব বিগ্রহরূপে নিত্য প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। রাধা ও কৃষ্ণ বস্তুতঃ এক হইলেও লীলার জন্য পরস্পর পৃথক্-বৎ প্রতিভাসমান হন। অর্থাৎ জাগতিক ভাষায় বলিতে গেলে যাহাকে অদ্বৈত রসতত্ত্ব বলা হয় তাহা এক পক্ষে রাধাকৃষ্ণের সুষুপ্তাবস্থা। এই অবস্থায় রাধায় স্ফুর্তি নাই এবং কৃষ্ণেরও স্ফুর্তি নাই। উভয়ে যাবতীয় বিশেষ পরিহার করিয়া মহা-সুষুপ্তিতে নিমগ্ন। যখন এই সুষুপ্তি ভঙ্গ হয়, যখন গোবিন্দের অঙ্গ হইতে রাধা বিশ্লিষ্ট হইয়া জাগিয়া উঠেন এবং যখন রাধার জাগরণের সঙ্গে সঙ্গে স্বভাবতঃ গোবিন্দও প্রবুদ্ধ হন, তখন অনন্ত লীলাময়, বিচিত্র মাধুর্যময়, সংখ্যাতীত বিলাসময়, অনন্ত ভাবময় এবং অনন্ত রসের অনন্ত প্রকার আস্বাদময় ব্রজধাম ফুটিয়া উঠে, এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে তাহার বৈভবরূপী গোলোকধামও বিকাশ প্রাপ্ত হয়।

ইহা হইতে বুঝা যাইবে, সমগ্র গোকুল, বৃন্দাবন, এমন কি গোলোকধাম এই দৃষ্টিতে রাধার আত্মপ্রসারণ হইতে সমুদ্ভূত। সুবর্ণ যেমন কেয়ূর, অঙ্গদ, হার প্রভৃতি বিবিধ আভূষণ রূপে প্রকাশিত হইলেও সর্বত্রই অক্ষুণ্ণ নিজ স্বরূপে বিদ্যমান থাকে, ঠিক সেই প্রকার শ্রীমতী রাধা ঠাকুরাণী সমগ্র লীলাভূমি এবং তাহার অন্তর্গত যাবতীয় পুরবর্গ, কুঞ্জাদি, কক্ষ গৃহাদি নানা ভাবের নানা প্রকার ভক্তমণ্ডলী, পশু পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, ধেনুবৎস, বৃক্ষলতা, ফল, পুষ্প, কুণ্ড ও নদীরূপে অনন্ত বৈচিত্র্য সহকারে প্রকাশিত হইলেও সর্বত্রই তাঁহার নিজ স্বরূপে অক্ষুণ্ণই থাকেন। ব্রজবাসী প্রেমনেত্রে সর্বত্র রাধাকেই দেখিয়া থাকে। কারণ ব্রজের প্রতি বস্তুই রাধা উপাদানে গঠিত। রাধাকে সম্যক্ প্রকারে চিনিবার সামর্থ্য রাখেন একমাত্র শ্রীগোবিন্দ। ব্রজবাসিগণ রাধার সম্যক্ পরিচয় প্রাপ্ত হইতে পারেন না। এইজন্য

শ্রীকৃষ্ণ নিত্য লীলাভূমির প্রতি অণুপরমাণুতে রাধার সৌন্দর্য্য দর্শন করেন এবং রাধার অঙ্গ গন্ধ প্রাপ্ত হন।

রাধা-স্বরূপের পরণামরূপে ব্রজভূমির আবির্ভাব হয়। স্বরূপ শক্তির তত্ত্বান্তর পরিণাম হয় না। কিন্তু শক্তি-বিক্ষেপরূপ পরিণাম হইতে বাধা নাই। এই পরিণাম রাধার অঙ্গীভূত যোগমায়ার দ্বারা নিষ্পন্ন হয়। যোগমায়া লীলাভূমির রচনার অধিষ্ঠাত্রী শক্তি। রাধাঙ্গের সদংশ হইতে অন্তরঙ্গ ধাম সকল এবং লীলাস্থল সকল প্রকটিত হইয়া থাকে। আনন্দাংশ কায়ব্যূহ দ্বারা অন্তরঙ্গ ভক্তগণের স্বরূপে আত্মপ্রকাশ করে।

বস্তুতঃ সন্ধিনী, সংবাদ ও হ্লাদিনী এই তিনটি শক্তি এবং তদ্রূপ আরও অবান্তর শক্তির সমষ্টিভূত স্বরূপ শক্তি অমাকলা বা রাধা। এই সকল শক্তি মধ্যে হ্লাদিনীর প্রাধান্য বলিয়া এবং অন্যান্য শক্তি তাহার অঙ্গীভূত বলিয়া কেহ কেহ হ্লাদিনী রূপেই শ্রীরাধাকে বর্ণনা করিয়া থাকেন। বস্তুতঃ এই শক্তিপুঞ্জই শ্রীরাধানামে প্রসিদ্ধ এবং ইহাই শ্রীকৃষ্ণের বিগ্রহ। তাত্ত্বিকদৃষ্টিতে বৈকুণ্ঠনাথ শ্রীভগবান্ যেমন ষড়্-গুণবিগ্রহ অর্থাৎ ছয়টি অপ্রাকৃত গুণ (জ্ঞান, বীর্য্য, বল ঐশ্বর্য্য—ইত্যাদি) সমষ্টিভাবে তাঁহার দেহস্বরূপ, ঠিক সেই প্রকার পারমার্থিক দৃষ্টিতে সন্ধিনী, সংবিদ্ হ্লাদিনী প্রভৃতি স্বরূপ শক্তি এবং গুণ প্রধান ভাবে বিচার করিলে বলা যায় অনন্ত স্বরূপ শক্তি বিশিষ্ট হ্লাদিনী শক্তিই শ্রীরাধার বিগ্রহ। এই জন্যই শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গ হইতে নিশান্ত লীলাতে অর্থাৎ মহাসুষুপ্তি ভঙ্গের সময় শ্রীরাধার অঙ্গ পৃথকভাবে নিঃসৃত হইয়া থাকে, শ্রীরাধার অঙ্গ হইতে শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গ নিঃসৃত হয় না। কিন্তু তাহাও যে হয় না তাহা নহে, তবে তাহা বিভিন্ন দৃষ্টি অনুসারে বুঝিতে হইবে। এখানে সে প্রসঙ্গের আলোচনার প্রয়োজন নাই।

সাম্য ভাবাপন্ন অবস্থাই শ্রীকৃষ্ণের বিগ্রহ।

পূর্বোক্ত বিবরণ হইতে প্রতীত হইবে যে এই নীত্য লীলাভূমি জাগ্রৎ অবস্থা। আমরা মায়িক আবরণে অচ্ছন্ন হইয়া এখন যে

অবস্থায় আছি—ইহা জাগ্রৎ নামে আমাদের নিকট পরিচিত হইলেও বস্তুতঃ ইহা স্বপ্নাবস্থা। আমরা যাহাকে স্বপ্ন বলি বা সুষুপ্তি বলি তাহা এই মহাস্বপ্নেরই অন্তর্গত অবান্তর অবস্থা মাত্র। যেটিকে ব্রহ্মাবস্থা বলা হয়—যাহা নির্বিশেষ চিন্মাত্র ও বৈচিত্র্যহীন তাহাই বাস্তবিক সুষুপ্তি। অর্থাৎ পারমার্থিক দৃষ্টিতে ঐ নিত্যলীলাময় শ্রীবৃন্দাবনের বিলাসই আমাদের জাগ্রৎ অবস্থা। ব্রাহ্মীস্থিতিরূপ চিৎপ্রতিষ্ঠাই আমাদের সুষুপ্তি অবস্থা এবং এই সংসার পর্য্যটন বা লোকলোকান্তরে সঞ্চরণরূপ অবস্থাই স্বপ্নাবস্থা। লীলাতীত এবং ভাবাতীত পরমপদে প্রবেশ করিতে পারিলে তাহাই আমাদের তুরীয় অবস্থারূপে পরিগণিত হইবে।

মায়িক জগৎ অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড সম্বলিত মায়া এবং তাহার অন্তর্গত যাবতীয় দৃশ্য ও ভোগরাশি এবং সকল প্রকার ঘটনা, এক কথায় কালের অনন্ত লীলা, সবই সুষুপ্তিরূপী ব্রহ্মে মায়ার প্রভাবে স্বপ্নবৎ আরোপিত হইয়াছে। বস্তুতঃ ইহা ব্রহ্মের বিবর্ত। অর্থাৎ সমগ্র মায়িক জগৎ এই জন্যই কাহারও কাহারও দৃষ্টিতে ব্রহ্মের বিবর্ত বলিয়া শ্রীরাধার বিবর্ত দেহ। তাই রজ্জুর বিবর্ত্ত সর্পে যেমন তন্ন তন্ন অনুসন্ধান করিলেও রজ্জুকে পাওয়া যায় না, তদ্রূপ সমগ্র মায়িক জগতে তন্ন তন্ন অনুসন্ধান করিলেও শ্রীরাধাকে পাওয়া যায় না। কারণ বিবর্ত্তে উপাদান কারণ এবং কার্য্যের সম-সত্তা থাকে না। কিন্তু ব্রজভূমি অথবা গোলোক সেরূপ নহে। কারণ উহা রাধারূপ উপাদানের পরিণামাত্মক কার্য্য। এই পরিণাম অবিকৃত পরিণাম, ইহা মনে রাখিতে হইবে অর্থাৎ ইহা পরিণাম কিন্তু বিকার নহে। কারণ রাধা নির্বিকার। এই জন্যই ব্রজভূমির প্রতি বস্তুতেই রাধাকে চিনিতে পারা যায়। মৃণ্ময় ঘটে যেমন মৃত্তিকা অনুস্যূত থাকে—তদ্রূপ ব্রজভূমির প্রতি বস্তুতেই রাধা অনুস্যূত আছেন।

নিত্য লীলারূপ যে জাগরণ অবস্থা তাহাও প্রকৃত জাগরণ নহে। লীলাতীত অবস্থাই প্রকৃত জাগরণ বা মহাজাগরণ অর্থাৎ তুরীয়—

উহাই চৈতন্যস্বরূপ। উহা অনন্ত। উহার পর আর সুষুপ্তি নাই, স্বপ্নও নাই।

এবার ভাবরাজ্য সম্বন্ধে কিছু বলা যাইতেছে।

অমা অথবা সপ্তদশী কলার কথা প্রসঙ্গতঃ কিছু বলা হইয়াছে। ইহাই পরাশক্তি, ইহা অনুত্তর পরম প্রকাশের সহিত অভিন্নরূপে বিদ্যমান থাকে। ঐ প্রকাশই মহাসত্তা। মহাসত্তার সহিত মহাশক্তির স্বরূপগত কোন ভেদ নাই। এই জন্যই এই শক্তিকে স্বরূপশক্তি বলিয়া বর্ণনা করা হয়। ইহা স্বাতন্ত্র্য শক্তিরই নামান্তর। এই শক্তিই নিজে ইচ্ছারূপ হইতে ক্রিয়ারূপ পরিগ্রহ করিলে ইহাকেই বিসর্গ বলিয়া উল্লেখ করা হয়। তখন পূর্ব বর্ণিত অনুত্তর প্রকাশ বিন্দু নামে পরিচিত হন। স্বাতন্ত্র্যশক্তি চিদ্‌রূপা বলিয়া প্রচলিত পরিভাষা অনুসারে চিৎশক্তি নামে অভিহিত হয়। যখন ইহা বিন্দুর সহিত অভিন্নরূপে বর্তমান থাকে, তখন ইহা স্বয়ং অনুত্তর নিষ্ক্রিয় এবং নিস্পন্দ ভাবে অবস্থান করে। ক্ষোভের ফলে যখন ইহা বিসর্গরূপ ধারণ করে তখন ইহা ক্রিয়াত্মিকা হয়! একই শক্তি একদিকে নিষ্ক্রিয়স্বরূপ এবং অপর দিকে ক্রিয়াস্বরূপ। ইহা এক অদ্ভুত রহস্য। যে দুইটি বিন্দু অবলম্বন করিয়া বিসর্গ আত্মপ্রকাশ করে তাহা এই দুইটি বিরুদ্ধ কোটির সমন্বয়ের প্রতীক। এই বিসর্গ শক্তিই পরমাকুণ্ডলিনী যাহা একপ্রান্তে শক্তিকুণ্ডলিনীরূপে এবং অপর প্রান্তে প্রাণকুণ্ডলিনী রূপে প্রকাশিত হয়। শক্তিভূমি হইতে প্রাণভূমি পর্যন্ত সঞ্চার অব্যক্ত ভাবে হইয়া থাকে। ইহাই স্বরূপশক্তির উন্মেষ। এই উন্মেষ নিত্যই নব নব রূপে সংঘটিত হইতেছে। নিত্য লীলার মূলসূত্র ইহাই। অর্থাৎ অনুত্তর মহাপ্রকাশ হইতে স্পন্দনাতীত শক্তি নিরন্তর অভিনব রূপে স্পন্দিত হইতেছেন। ইহার কোন হেতু নাই, কোন নিমিত্ত নাই, কোন প্রয়োজন নাই। তাই ইহা শুধু লীলারূপেই বর্ণিত হইয়া থাকে। এই নিত্য নব নব উন্মেষ ভাষা দ্বারা অথবা মানসিক

চিন্তা দ্বারা আয়ত্ত করা সম্ভবপর নহে। বিসর্গশক্তি উন্মেষরূপে নিরন্তর প্রসব করিতেছেন। এই প্রসবকার্য্য বিভিন্ন প্রকার বলিয়া বিসর্গ-শক্তিকেও বিভিন্ন নামে আখ্যাত করা হয়—পর বিসর্গ পরাপর বিসর্গ এবং অপর বিসর্গ। বিসর্গের এই তিনটি মৌলিক ভেদ প্রসবের তারতম্য অনুসারেই কল্পিত হইয়াছে। অভেদ ভেদাভেদ এবং ভেদ প্রসবগত এই তিনটি ভাবের উপর পর বিসর্গাদি তিনটি ভেদ প্রতিষ্ঠিত। পরাপর এবং অপর বিসর্গের আলোচনা বর্ত্তমান প্রসঙ্গে করিবার প্রয়োজন নাই। শুধু পর বিসর্গের কথাই এখানে বলিব। কিন্তু ইহা মনে রাখিতে হইবে বিসর্গ হইতেই সমগ্র বিশ্ব উদ্ভূত হইয়া থাকে। ভেদ সৃষ্টির মূলে যেমন বিসর্গশক্তির খেলা তেমনি অভেদ সৃষ্টির মূলেও ঐ শক্তিরই খেলা জানিতে হইবে। ভেদ সৃষ্টি অপর বিসর্গ হইতে, ভেদাভেদ সৃষ্টি পরাপর বিসর্গ হইতে এবং অভেদ সৃষ্টি পর বিসর্গ হইতে হইয়া থাকে। যে নিত্য লীলায় চিন্ময় রাজ্যের আলোচনা প্রসঙ্গে আমরা গোলোক অথবা বৃন্দাবনের প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছি তাহা পর বিসর্গ হইতেই স্ফুরিত হইয়া থাকে। পর বিসর্গ স্ফুরণের বৈশিষ্ট্য এই যে সমগ্র সৃষ্টিটি উহার অনন্ত বৈচিত্র্য সহিত কায়াভূত চিৎশক্তি-রূপে নিত্য প্রতীতি গোচর হয়। অথচ স্ব-স্ব ব্যক্তিগত বিচিত্রতা কণামাত্রও ক্ষুণ্ণ হয় না। একই বস্তুকে সত্তাগত অভিন্নতা রক্ষা করিয়া ভিন্নবৎ প্রতীতি গোচর করা, ইহাই পরা বিসর্গ শক্তির কার্য্য। এই শক্তির প্রভাবে যাহা অতিরিক্ত নয় তাহা অতিরিক্তবৎ প্রতীয়মান হয়। আগমের এই বৈসর্গিক রহস্যই প্রাচীন ভক্তগণের পরিভাষাতে 'বিশেষ' নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। যে অচিন্ত্যশক্তি ভেদ না থাকিলেও ভেদ কার্য্যের নির্বাহ করিতে সমর্থ হয় তাহার নাম 'বিশেষ'। স্বয়ং ভগবানের অথবা অনুত্তর প্রকাশের এই অঘটন ঘটন-পটীয়সী অচিন্ত্যশক্তিই 'বিশেষ' নামে বৈষ্ণবশাস্ত্রে পরিচিত। বলা বাহুল্য, ইহা বিসর্গশক্তির পরাবস্থারই ব্যাখ্যা মাত্র।

যখন কোন শক্তি ক্ষুব্ধ হইয়া কার্য্যরূপে কোন আকার গ্রহণ করে

তখন ঐ আকার স্বরূপতঃ শক্তিময় হইয়াও তদতিরিক্ত ভাবেও প্রকাশমান হয়। অর্থাৎ জ্ঞান হইতে যাহার স্ফুরণ হয় তাহা শুধু জ্ঞানাত্মক নহে, জ্ঞানবানও বটে। সত্তা হইতে যাহার স্ফুরণ হয় তাহা শুধু সত্তা নহে, সৎও বটে। তদ্রূপ যাহা আনন্দ হইতে প্রাকট্য লাভ করে তাহা স্বরূপতঃ আনন্দ হইয়াও আনন্দের আশ্রয়ও বটে। এইরূপ সর্বত্রই বুঝিতে হইবে। পতঞ্জলি পুরুষতত্ত্ব সম্বন্ধে একটি সূত্রে বলিয়াছেন—'দ্রষ্টা দৃশিমাত্রঃ শুদ্ধোহপি প্রত্যয়ানুপশ্যঃ'—অর্থাৎ যিনি নির্মল দৃক্‌শক্তি এবং তদ্ভিন্ন অপর কিছুই নহেন তিনিই দ্রষ্টৃস্বরূপ। অর্থাৎ দ্রষ্টা এবং দৃক্‌শক্তি দুইটি পৃথক বস্তু নহে। চৈতন্য ও চেতন দুইটি পৃথক্ বস্তু নহে। তদ্রূপ জ্ঞাতা ও জ্ঞান একই অভিন্ন বস্তু জানিতে হইবে। বেদান্তে 'জ্ঞোতএব' এই সূত্রেও ইহারই ইঙ্গিত পাওয়া যায়। প্রাচীন বৈষ্ণবগণ যে ধর্মভূত জ্ঞান এবং ধর্মিভূত জ্ঞান বলিয়া একই জ্ঞানের ধর্মরূপতা এবং ধর্মিরূপতার নির্দেশ করিয়াছেন তাহা হইতেও এই সত্যই প্রমাণিত হয়।

উপর্যুক্ত বিবরণ হইতে বুঝিতে পারা যাইবে, স্বরূপশক্তির যে অংশ হইতে যে কার্য্যের স্ফুরণ হয় তাহা যে শুধু সেই শক্তিরূপ তাহা নহে। তাহা সেই শক্তির আশ্রয়রূপেও প্রকাশিত হয়। সন্ধিনী, সংবিদ্ এবং হ্লাদিনী এই তিনটি ভগবানের অনন্ত স্বরূপ-শক্তির মধ্যে আপাততঃ প্রধান রূপে গ্রহণ করা যাইতে পারে। কারণ এই তিনটিই তাঁহার সত্তাগত অনন্তাংশের অন্তর্গত যথাক্রমে সৎ, চিৎ, ও আনন্দ এই তিনটি প্রধান অংশের সহিত সম্বন্ধ। ইহার মধ্যে হ্লাদিনী শক্তিরই প্রাধান্য, যদিও অঙ্গরূপে অন্যান্য শক্তি ইহারই অন্তর্ভুক্ত রহিয়াছে। আনন্দরাজ্যের রচনায় হ্লাদিনী শক্তির প্রাধান্য থাকা স্বাভাবিক। এই রচনা প্রণালীতে পূর্বোক্ত নিয়মের ব্যাভিচার নাই। অর্থাৎ যখন গোবিন্দের আলিঙ্গন হইতে রাধারাণী বহির্মুখ হন, তখন তাঁহা হইতে পর বিসর্গের নিয়মানুসারে যে স্ফুরণ নিরন্তর হইতে থাকে তাহা স্বভাবতঃ শুধু যে আনন্দাত্মক হয় তাহা নহে, তাহা

আনন্দের আশ্রয় রূপেও পরিগণিত হয়। যদি হ্লাদিনী শক্তিকে অর্থাৎ শ্রীরাধাকে পরাভক্তির প্রতীক বলিয়া গ্রহণ করা যায় তাহা হইলে ঐ শক্তি হইতে নির্গত প্রত্যেকটি কণাই যে ভক্তিরূপ এবং ভক্তির আশ্রয় তাহাতে সন্দেহ নাই। অর্থাৎ হ্লাদিনী শক্তিরূপা ভক্তিদেবী হইতে ভক্তমণ্ডলের আবির্ভাব হইয়া থাকে। এই সকল ভক্ত স্বরূপতঃ হ্লাদিনী শক্তির অংশ এবং তাহা শুধুই যে হ্লাদিনী শক্তিরূপ তাহা নহে, হ্লাদিনী শক্তির আশ্রয় ভাব ও তাহাদের মধ্যে প্রকাশিত। শ্রীরাধা যেমন হ্লাদিনী শক্তি স্বরূপ হইয়াও হ্লাদিনী শক্তিসম্পন্ন—তাঁহা হইতে নিঃসৃত প্রতি ভক্তও ঠিক সেই প্রকার। অধ্যাত্ম জগতের ইহা অতি গভীর রহস্য।

স্বরূপতঃ হ্লাদিনী শক্তি হইয়াও তাঁহারা হ্লাদিনী শক্তি বিশিষ্ট। অর্থাৎ তাঁহারা একধারে ভক্তি এবং ভক্ত উভয়ই। এই জন্যই তাঁহাদিগকে ব্রহ্মসংহিতাকার 'আনন্দ চিন্ময় রস প্রতিভাবিত কলা' বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। ব্রজধামের অথবা গোলোকধামের নিত্য ভক্তমণ্ডলের সৃষ্টি হ্লাদিনী শক্তি হইতে এই ভাবেই হইয়া থাকে। অবশ্য ইহার মধ্যে ক্রম আছে, প্রকারভেদ আছে এবং ভক্তির আস্বাদগত বৈলক্ষণ্য আছে। তদনুসারে কান্তাবর্গ, সখীবর্গ, পিতামাতা ও অন্যান্য গুরুজন, সখা, নর্মসখা, প্রিয় নর্মসখা প্রভৃতি সখাগণ এবং বিভিন্ন প্রকারের সেবাতে নিরত দাসগণ আবির্ভূত হইয়া থাকেন।

পূর্বে রাধাগোবিন্দের বিশ্রাম অথবা নিদ্রার কথা বলা হইয়াছে। এই বিশ্রামটিকে মধ্যবিন্দু করিয়া রাধাগোবিন্দের নিত্যলীলা অনাদি কাল হইতে চলিতেছে এবং অনন্ত কাল পর্যন্ত চলিবে। এই লীলা বস্তুতঃ রাধাশক্তিরই লীলা। ইহা অমাকলার খেলা একথাও প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা হইয়াছে।

এই উপলক্ষ্যে প্রাসঙ্গিক ভাবে কয়েকটি রহস্যময় তত্ত্বের সংক্ষিপ্ত আলোচনা আবশ্যক মনে হইতেছে। এই যে নিত্য লীলার কথা

বলা হইল ঠিক এই প্রকার একটি নিত্য সংসার অবস্থাও রহিয়াছে। শুধু তাহাই নহে। এই জাতীয় অন্যান্য অবান্তর অবস্থাও আছে—যাহাকে নিত্য না বলিয়া পারা যায় না। 'নিত্য শব্দের অর্থ প্রবাহরূপে নিত্য অর্থাৎ যাহা পুনঃ পুনঃ আবর্ত্তমান হয়, নিরন্তর ঘুরিতে থাকে, যাহার আদি নাই এবং যাহার অবসানও নাই।

নিত্যলীলার মধ্যবিন্দুরূপে যেমন একটি সুষুপ্তি আছে ঠিক সেই প্রকার নিত্য সংসারের মধ্যবিন্দুরূপেও একটি সুষুপ্তি আছে। ঐ সুষুপ্তি অবস্থাতেই সংসার অস্তমিত হয়। আবার ঐখান হইতেই নূতন করিয়া সংসারের প্রবৃত্তি হয়। এই প্রকার একবার সংসার নিবৃত্ত হইয়া বিশ্রান্তি লাভ করে এবং পুনর্বার ঐ অবস্থা হইতেই উহার প্রবৃত্তি হয়। এইভাবে সংসারের নিত্য আবর্তন অনাদি কাল হইতেই চলিয়াছে। ঠিক সেই প্রকার নিত্যলীলাও নিকুঞ্জ মধ্যে মহাবিন্দুতে বিশ্রাম প্রাপ্ত হয়, আবার ঐ বিন্দু ক্ষুব্ধ হইলে উহা পুনর্বার ফুটিয়া উঠে। এই প্রকারে অনাদি কাল হইতে এই আনন্দময়ী লীলা পুনঃ পুনঃ আবর্ত্তিত হইতেছে। নিত্য সংসারের সাময়িক বিশ্রাম যেমন চিরবিশ্রাম নহে, তদ্রূপ নিত্য লীলার সাময়িক উপশমও চির উপশম নহে। কারণ উভয়ত্রই শক্তির প্রবাহটি অনাদি এবং অনন্ত।

নিত্য সংসার বলিতে ইহা বুঝায় না যে কোন জীব ইহাতে আবদ্ধ থাকিয়া চিরদিন মুক্তি অথবা পরমানন্দের সন্ধান লাভ হইতে বঞ্চিত থাকে। জীব প্রকৃতিক নিয়মানুসারে যথাসময়ে যোগ্যতা অর্জনপূর্বক সংসার ভেদ করিতে সমর্থ হয় তাহাতে সন্দেহ নাই। প্রতি জীবের সম্বন্ধেই এই একই নিয়ম। কিন্তু তাহাতে সংসার খালি হয় না। সংসারের ধারা প্রবাহ যেমন চলিতেছিল তেমনি চলিতে থাকে। নবজাত প্রত্যেকটি শিশু অকালে কালের কবলে পতিত না হইলে বাল্য, পৌগণ্ড কৈশোর প্রভৃতি অবস্থা ভেদ করিয়া যৌবনে পদার্পণ করে এবং যৌবন হইতে প্রৌঢ় অবস্থার মধ্য দিয়া বার্দ্ধক্যে উপনীত

হয়। কেহই চিরদিন শিশু অথবা কিশোর অথবা যুবক অবস্থায় আবদ্ধ থাকে না। সকলই কালের স্রোতে অগ্রসর হইতে থাকে। জগতের কোন মনুষ্যের সম্বন্ধেই এই নিয়মের ব্যভিচার নাই। তথাপি ইহা সত্য যে শিশু, কিশোর এবং যুবক জগতে নিত্যই বিদ্যমান আছে। ইহার অর্থ এই যে শৈশব ভাবটি নিত্য। ভাবের যে একটি আশ্রয় তাহাও নিত্য। সুতরাং কোন নির্দ্দিষ্ট ব্যক্তি চিরদিন শিশু থাকে না ইহা সত্য, কিন্তু নিত্য শিশু চিরদিনই আছে। এই নিত্য শিশু যখন যাহাকে আশ্রয় করিয়া অভিব্যক্ত হয় তখন সেই ব্যক্তি জগতের নয়নের সমক্ষে শিশুরূপে পরিচিত হয়। সুতরাং এক হিসাবে ইহা যেমন সত্য যে কোন ব্যক্তিরই শিশুভাব অথবা অন্য কোন ভাব স্থায়ী নহে, অপর দিকে ইহাও সত্য যে ব্যক্তি-সম্বন্ধ বিরহিত ভাবে প্রত্যেকটি ভাবই স্থায়ী। অর্থাৎ স্থায়ী ভাবটি যখন যে অভিব্যঞ্জক আধারে আত্মপ্রকাশ করে তখন ঐ আধার ঐ ভাবের পরিচায়ক হইয়া সকলের প্রতীতি গোচর হয়। অর্থাৎ যেমন ইন্দ্র পদটি নিত্য, কিন্তু যে জীব স্বপুণ্য ফলে ঐ পদটি প্রাপ্ত হয় সে সর্ব্বদা ঐ পদে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া ইন্দ্ররূপে পরিচিত হইলেও পরে ঐ পদ অতিক্রম করিয়া তাহাকে অগ্রসর হইতে হয়। তখন আর সে ইন্দ্র থাকে না, কিন্তু মনে রাখিতে হইবে যে তখনও ইন্দ্রপদ রিক্ত থাকে না। অন্য কোন ব্যক্তি তখন ঐ পদে অধিরূঢ় হয়। এইজন্য ব্যক্তিগত ভাবে কাহারও পক্ষে ইন্দ্রত্ব স্থায়ী না হইলেও বাস্তবিক পক্ষে ইন্দ্রত্ব একটি স্থায়ী ভাব। যেমন নিত্য ভাব আছে তেমনি এই ভাবের একটি নিত্য আশ্রয়ও আছে। তাহাকেই যথার্থ ইন্দ্র বলে। ঐ ইন্দ্র এবং তাহার পদ ইন্দ্রত্ব উভয়ই অভিন্ন। ইহার ধ্বংস নাই, বিনাশ নাই—এমন কি নিবৃত্তিও নাই বুঝিতে হইবে।

মায়িক জগতের যে নিয়ম চিদানন্দময় লীলা জগতেরও ঠিক সে নিয়ম। মায়িক জগতে যেমন নিত্য সংসারের খেলা আবর্ত্তিত হইতেছে অথচ ব্যক্তিগত ভাবে কোন জীব তাহাতে আবদ্ধ নহে,

সেইপ্রকার নিত্য জগতেও বুঝিতে হইবে। মায়িক জগতে প্রত্যেকটি ভাবের একটি নিত্য আকার আছে। তাহাকে আশ্রয় করিয়াই জীব সকল মায়ার খেলা খেলিতেছে। জীব সকল মায়াতীত হইয়া গেলেও মায়িক জগতের ঐ খেলার অবসান হয় না। ইহার একমাত্র কারণ ঐ নিত্যভাবের নিত্য আশ্রয় এবং আশ্রয়টির এবং ঐ ভাবটির পরস্পর অভেদ।

যখন হ্লাদিনী শক্তি হইতে প্রকাশরূপে বিলাসরূপে এবং স্বাংশ-রূপে অনন্ত ভক্ত-মণ্ডলের আবির্ভাব হয় তখন ঐ সকল ভক্ত শুধু হ্লাদিনী শক্তির অংশরূপে নিত্য বলিয়া পরিগণিত হয় না, ঐ সকল অংশের আশ্রয় রূপেও তাহারা নিত্য। অথচ উভয়েই এক এবং অভিন্ন। ভাবটিও নিত্য এবং ভাবের আশ্রয়টিও নিত্য। ইহারাই নিত্য লীলার উপকরণ। যে সকল জীব মায়া রাজ্যে আবদ্ধ রহিয়াছে যখন গুরু গোবিন্দের কৃপায় তাহারা প্রবুদ্ধ হইয়া নিত্য বৃন্দাবনে স্বধামে প্রতিষ্ঠিত হইবে, তখন তাহারাও পূর্বোক্ত কোন না কোন ভাবকে আশ্রয় করিয়াই ঐ প্রতিষ্ঠা লাভ করিবে। ঐ ভাবটিই তাহাদের স্বভাব বা আপন ভাব। পূর্বেই বলা হইয়াছে ঐ ভাবটি নিত্য এবং ঐ ভাব নিজেই নিজের আশ্রয় ও আশ্রয়টিও নিত্য, কারণ উভয়ই অভিন্ন। মায়াবদ্ধ জীব মায়ামুক্ত হইয়া ভগবৎ কৃপায় অথবা ভক্ত কৃপায় প্রাপ্ত ভক্তির প্রভাবে ঐ ধামে স্থান প্রাপ্ত হয়। এই ভক্তিই ভাব রূপা ভক্তি। ইহাই উক্ত জীবের স্বভাব। কোনও জীব ব্রজধামে স্বকীয় ভাবকে প্রাপ্ত হইলে তাহার ঐ স্বভাবই তাহার আনন্দ লীলার নিয়ামক হয়। শিশু যেমন গর্ভধারিণী জননীকে স্নেহ করে স্বভাবে, জননীও তেমনি আপন শিশুকে স্নেহ করেন স্বভাবে। উভয়ত্র স্বভাবই নিয়ামক। বিধি নিষেধের কোন শাসন এই স্বভাবের উপর কার্য্য করিতে পারে না।

———

৪

শক্তি—ধাম—লীলা—ভাব (গ)

পূর্ব্বোক্ত বিবরণ হইতে রাগাত্মিকা ভক্তি এবং রাগানুগা ভক্তির বিবরণটি বুঝিতে পারা যাইবে। রাগাত্মিকা ভক্তি রাগ স্বরূপ। ইহা স্বভাব সিদ্ধ, বস্তুতঃ ইহাই স্বভাব। ইহা কাহাকেও শিখিতে হয় না অথবা শিখাইতেও হয় না—ইহার প্রবৃত্তি আপনা আপনিই হইয়া থাকে। কিন্তু রাগানুগা ভক্তি ইহার প্রতিবিম্ব। জীব তটস্থ শক্তি হইতে প্রকট হয় বলিয়া এবং তটস্থ শক্তি স্বচ্ছ দর্পণের ন্যায় প্রতিবিম্ব গ্রাহী বলিয়া জীব ভগবদুন্মুখ হইলেই এই স্বভাব ভূতা রাগাত্মিকা ভক্তি তাহাতে প্রতিবিম্বিত হয়। এই প্রতিবিম্বই স্বচ্ছ জীবহৃদয়ে আবির্ভূত রাগানুগা ভক্তি। ইহা কিন্তু ভাব নহে। যতদিন জীব মায়িক জগতে মায়িক দেহকে আশ্রয় করিয়া বর্তমান থাকে ততদিন এই রাগানুগা ভক্তি তাহার একমাত্র অবলম্বন। রাগানুগা ভক্তির সাধনা করিতে করিতে ভাগ্যক্রমে ভাবের উদয় হইয়া থাকে। ইহাই স্বভাব বা আপন ভাব। ইহা রাগাত্মিকা ভক্তিরই অর্থাৎ হ্লাদিনী শক্তিরূপা শ্রীরাধিকারই শ্রীঅঙ্গ নিঃসৃত একটি কিরণ। এই ভাবকে প্রাপ্ত হইলে জীব ভাবরূপা অর্থাৎ স্বভাব সিদ্ধা ভক্তিকে উপলব্ধি করিতে পারে এবং তাহার দেহ তখন ভাবদেহরূপে পরিণত হয়। এই দেহ ব্রজের দেহ। ভাব দেহ ভাবরাজ্যের বস্তু, মায়ারাজ্যের বস্তু নহে। কিন্তু মায়ারাজ্যে থাকিলেও ইহার উদ্ভব এবং বিকাশ হইতে পারে।

বস্তুতঃ এই ভাব দেহের অভিব্যক্তি না হওয়া পর্য্যন্ত ভাব জগতে প্রবেশের অধিকার হয় না এবং প্রকৃত ভগবৎ সাধনার আরম্ভই হয় না। অশুদ্ধ মায়িক দেহে ভগবৎ সাধনা হয় না, ইহা বলাই বাহুল্য। প্রবর্ত্তক অবস্থার পরিসমাপ্তি এবং সাধক অবস্থার উদয় এই ভাবের বিকাশের দ্বারাই নিরূপিত হইয়া থাকে।

ভাবদেহের আকার এবং প্রকার স্বভাবেরই অনুরূপ। ইহা চিদানন্দময় দেহ। ইহাতে পুরুষ প্রকৃতি কোন ভেদ নাই। কিন্তু লীলারসের আস্বাদনের জন্য ইহার মধ্যে রসাস্বাদনের উপযোগী সকল বৈচিত্র্যই সংঘটিত হইয়া থাকে। তাহাতে ভাব ক্ষুন্ন হয় না। ব্রজ-ভূমিতে বা তাহার বিভূতি স্বরূপ গোলোকধামে বা ঐশ্বর্যময় পরব্যোমে-ভক্তমাত্রেরই স্বরূপ ভাবময়। এই ভাব নিত্যসিদ্ধ, ও ভাবাশ্রয় ভক্তও নিত্যসিদ্ধ। কিন্তু যে ভক্ত এই ভাবের অনুগত হইয়া রাগানুগা ভক্তির প্রভাবে ভাবদেহ লাভ করিয়াছেন তিনি পূর্ব্বোক্ত নিত্যসিদ্ধ ভক্তের অনুগত, স্বতন্ত্র নহেন।

এই সকল ভক্ত ব্রজধামে আগন্তুক। বস্তুতঃ ইহাদেরই জন্য নিত্যলীলা। ইহারা ভাব অবস্থা হইতে প্রেমের অবস্থা পর্য্যন্ত উন্নীত হইলে ইহাদের নিকট সাক্ষাদ্ ভাবে ভগবানের প্রাকট্য হয়। কারণ প্রেমের আবির্ভাব না হওয়া পর্যন্ত ভগবদ্ দর্শন হয় না। তখন এই ভাবভক্তি প্রেম ভক্তি রূপে প্রসিদ্ধি লাভ করে। প্রেম ভক্তির পূর্ণ বিকাশই সাধনার পরিসমাপ্তি মনে করিতে হইবে। ব্রজেও সাধক আছে, গোলোকেও সাধক আছে, বৈকুণ্ঠেও সাধক আছে। এই সকল ভক্ত অর্থাৎ প্রেম ভক্ত ভগবদ্দর্শনের অধিকারী হইয়া ভগবানের নিত্য লীলায় যোগদান করেন। ইহা সিদ্ধাবস্থা। এই অবস্থায় অর্থাৎ লীলানুভূতির ক্রম বিকাশে প্রেম ভক্তি রস রূপে পরিণতি লাভ করে। প্রেম ভক্তির পূর্ণ অভিব্যক্তি মহাভাব। যিনি মহাভাবরূপা তিনিই ভক্তকুলের চূড়ামণি। তিনিই হ্লাদিনী সারভূতা স্বয়ং শ্রীরাধা। এইজন্য প্রেম ভক্তির পরাকাষ্ঠা লাভ করিয়া অর্থাৎ রাধাভাব প্রাপ্ত হইয়া গোবিন্দের সহিত অন্তর্লীলায় প্রবিষ্ট হওয়ার সামর্থ্য জন্মে। প্রেমভক্তির পূর্ণতা সিদ্ধ হইলেই কুঞ্জলীলার অবসান হয়। তখন রাধাকৃষ্ণের নিকুঞ্জলীলা অত্যন্ত গুপ্ত ভাবে, এমন কি সখীগণেরও অগোচরে, অনুষ্ঠিত হয়। এই লীলার পর্য্যবসানেই রসের অভিব্যক্তি হয়। রসের অভিব্যক্তি এবং অমৃত পান একই কথা। ইহার ফলে রাধাগোবিন্দ লীলাবসানে বিশ্রাম সুখ লাভ করেন।

ইহার পর পূর্ববৎ কুঞ্জভঙ্গের সঙ্গে সঙ্গে নিত্যলীলার পুনরাবর্ত্তন হইতে থাকে।

যাহা বলা হইল তাহা হইতে বুঝিতে পারা যাইবে যে ভগবানের নিত্য লীলা বাস্তবিকই নিত্য। শুধু নিত্য নহে, প্রতিনিয়ত অভিনব এবং প্রতিক্ষণে নব নবরূপে আস্বাদ্যমান। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে লীলা অনাদি এবং অনন্ত বলিয়া নিত্য হইলেও, রাধা এবং গোবিন্দ উভয়েই নিত্য হইলেও, রাধার অংশভূত আনন্দস্বরূপ ভাবময় অনন্ত ও বিচিত্র ভক্তবৃন্দ নিত্য হইলেও, যাহার জন্য এই লীলার অনুষ্ঠান সেই জীব, মায়া মুক্ত ভগবদ্‌ভক্ত রূপে অপ্রাকৃত ভাবময় দেহ সম্পন্ন নিত্যলীলার অন্তর্ভুক্ত সেই জীব, চিরদিনই যে এই লীলায় আবদ্ধ থাকিবে এমন কোন কথা নাই। বৈকুণ্ঠাদি নিত্যধামে, এমন কি ব্রজভূমিতেও, ভক্তগণের ক্রম বিকাশ রহিয়াছে। কারণ যাহারা সাধক তাহারা ক্রমশঃ ভক্তির বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে সিদ্ধাবস্থা লাভ করিয়া থাকে। যে কোন ভক্ত যখন মহাভাবের পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হন তখন তিনি রাধা তত্ত্বের সহিত তাদাত্ম্য লাভ করেন। তারপর নিকুঞ্জলীলার অবসানে তিনি রস নিষ্পত্তি রূপে পূর্ণ সিদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া মহাকৃপার ফলে যুগলের নিদ্রা হইতে উত্থিত হইয়া অনাদি মহাসুষুপ্তি ভেদ করিতে সমর্থ হন। ইহাই প্রকৃত মহাজাগরণ বা বিশুদ্ধ চৈতন্যাবস্থা। ইহাই অদ্বৈত আত্মস্বরূপের সাক্ষাৎকার। এই অনাদি মহা সুষুপ্তির কথা পরে বর্ণনা করা যাইবে।

ব্রজলীলার তত্ত্ব ভাল করিয়া বুঝিতে হইলে সুষুপ্তি রহস্যটি বিশ্লেষণ করা আবশ্যক। যেখানে সুষুপ্তি নাই অথচ যেখানে স্বপ্নও নাই তাহাই প্রকৃত জাগ্রৎ অবস্থা। তাহাকেই মহাজাগরণ অথবা পরম চৈতন্য বলিয়া নির্দ্দেশ করা চলে। বস্তুতঃ জাগিয়া থাকাই চেতন থাকা। তাহাই চৈতন্য। সুষুপ্তি অচেতন ভাব অথবা জড়ত্ব। যাহা চেতন তাহা বস্তুতঃই চেতন, অচেতন নহে। অথচ স্বাতন্ত্র্য বশতঃ তাহা অংশিক ভাবে অচেতন হইতে পারে। এই অচেতন হওয়াই সুষুপ্ত হওয়া অথবা নিদ্রিত হওয়া। ইহারই নামান্তর আত্ম-

বিস্মৃতি। কিন্তু এ আত্মবিস্মৃতি স্বাতন্ত্র্য মূলক অথবা স্বেচ্ছামূলক, অতএব ইহাও একটি অভিনয়। বস্তুতঃ চৈতন্যের নাট্যলীলা এই সুষুপ্তি রূপ অথবা আত্মবিস্মৃতি রূপ যবনিকা গ্রহণ হইতেই প্রারব্ধ হয়।

চৈতন্যের স্বেচ্ছাগৃহীত এই সুষুপ্তভাব আভাস মাত্র। ইহা দ্বারা বস্তুতঃ চৈতন্য বিকৃত না হইলেও প্রতিভাস রূপে অভিনয়ের ন্যায় মহা চৈতন্যের কিঞ্চিৎ অংশ মাত্র এই সুষুপ্তি বা অচৈতন্য দ্বারা গ্রস্ত হয়। অর্থাৎ মহা চৈতন্য জাগিয়াই আছেন অথচ অতি ক্ষীণ অংশে যেন সুষুপ্ত বা আত্মবিস্মৃত হইয়া পড়েন। ইহা তাঁহার স্বভাবের খেলা। এই খেলাটিকে—স্বভাব, লীলা, অবিদ্যা অথবা মহেচ্ছা যাহাই বলা হউক না কেন—ইহাকে অস্বীকার করে যায় না। যেন মহা চৈতান্যর ১৫ টি কলারও অধিক পরিমাণে চৈতন্যস্বরূপেই প্রতিষ্ঠিত থাকেন। কিঞ্চিদ্‌ন্যূন এক কলা আভাসরূপে সুষুপ্ত হইয়া পড়েন। লীলাময়ী সৃষ্টির ধারা এই কলার মধ্য হইতেই ফুটিয়া উঠে।

এই যে সুষুপ্তি ইহা বস্তুতঃ অনাদি সুষুপ্তি, অথচ চৈতন্যের স্বেচ্ছাকৃত বলিয়া প্রতিক্ষণেই ইহার আদি আছে বলা চলে। কারণ মহেচ্ছা নিত্য বর্ত্তমান। উহাতে অতীত অথবা অনাগতের সম্বন্ধ থাকে না। এই মহাসুষুপ্তির মধ্যে চৈতন্যময় পুরুষ স্বপ্নবৎ ভাসিয়া উঠেন। যে স্বাতন্ত্র্য শক্তি মহাচৈতন্যের স্বরূপভূতরূপে সদা প্রকাশমান তাহা এই স্থলেও বিদ্যমান থাকে। মহাচৈতন্য হইতে সুষুপ্তির অন্তরালে যে বিশিষ্ট চৈতন্যের আবির্ভাব হয় তাহাই পরম পুরুষ। এই আবির্ভাবের ধারা অনন্ত এবং প্রণালী মূলতঃ এক হইলেও কার্য্যতঃ বিভিন্ন। বর্ত্তমানে আমরা এই অনন্ত ধারার একটি ধারা লইয়াই লীলাময়ী সৃষ্টির রহস্য বুঝিতে চেষ্টা করিব।

যখন পরমপুরুষ আবির্ভূত হইলেন তখন তিনি স্বরূপভূত শক্তির দ্বারা বিশিষ্ট হইয়াই আর্বিভূত হইলেন। মহাচৈতন্য ও পরম পুরুষে পার্থক্য এই যে, যে স্বাতন্ত্র্য মহাচৈতন্যে নিরবচ্ছিন্ন তাহা পরমপুরুষে অতি ক্ষীণ অবচ্ছেদ বিশিষ্ট রূপেই প্রকট হইয়া থাকে। এই কিঞ্চিন্মাত্র

অবচ্ছিন্নতা বশতঃ পরম অদ্বৈত তত্ত্ব যুগল রূপে প্রকাশমান হয়। পূর্ববর্ণিত এই পরম পুরুষই শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব এবং তাঁহার স্বরূপভূতা শক্তিই শ্রীরাধা। পরমস্বরূপের যে স্বভাব তাঁহার স্বরূপভূতা শক্তিরও সেই স্বভাবই থাকে। অনাদি সুষুপ্তির অতীত মহাচৈতন্য বিশুদ্ধ চৈতন্য মাত্র। কিন্তু যিনি পরমপুরুষরূপে আবির্ভূত হন তিনি আনন্দস্বরূপ —নিত্য চিন্ময় স্ব-প্রকাশ আনন্দস্বরূপ—তাঁহার স্বরূপভূতা শক্তিও এই আনন্দরূপা অর্থাৎ হ্লাদিনী। সন্ধিনী সংবিৎ প্রভৃতি শক্তিপুঞ্জকে নিজের অঙ্গীভূতরূপে ধারণ করিয়া আনন্দাংশের প্রাধান্যবশতঃ হ্লাদিনী রূপে প্রকটিতা।

এই প্রথম আবির্ভাবে শ্রীকৃষ্ণেই তত্ত্ব, রাধা শুধু শক্তি মাত্র। এই জন্য এই স্থলে শ্রীকৃষ্ণ হইতে রাধার স্ফুরণ হয় এবং অন্তর্মুখ গতিতে শ্রীকৃষ্ণ অঙ্গেই রাধার লয় হয়। স্বতন্ত্র রূপে রাধার কোন স্থিতি নাই। রাধা যে মহাভাবস্বরূপা এই কথা পূর্বে প্রসঙ্গতঃ বলা হইয়াছে এবং পরে বিশেষরূপে আলোচিত হইবে। শ্রীকৃষ্ণ পরমানন্দময় রসরাজ স্বরূপ। শ্রীকৃষ্ণ বিন্দু, রাধা বিসর্গ। একটি বিন্দু হইতেই অন্তর্লীন অপর একটি বিন্দু ক্ষোভ বশতঃ ক্রমশঃ নির্গত হইয়া প্রকাশমান হয়। পুনর্বার ক্ষোভ নিবৃত্তির সঙ্গে সঙ্গেই দ্বিতীয় বিন্দু আদি বিন্দুতে প্রবিষ্ট হইয়া উপসংহৃত হয়। বিন্দুর আত্মপ্রসারণে বিসর্গ ভাবের উদ্ভব। বিসর্গের আত্মসঙ্কোচনে অর্থাৎ অন্তর্মুখ গতির প্রভাবে বিন্দুরূপে স্থিতি। বিসর্গের স্থিতি নাই, শুধু গতি আছে। বিন্দু হইতে বহির্মুখ গতিতে বিসর্গের উদ্ভব এবং বিন্দু হইতে অন্তর্মুখ গতিতে বিসর্গের তিরোভাব। উভয় অবস্থাতেই বিন্দু গতিহীন। বিসর্গের স্থিতি-ভাবটাই বিন্দু, বিন্দুর গতিভাবটাই বিসর্গ।

এই যে শ্রীকৃষ্ণ তত্ত্বের কথা বলা হইল ইহারও একটা সুষুপ্তাবস্থা আছে। মহাচৈতন্যের যেমন ক্ষুদ্রতম অংশেই সুষুপ্তি হয় পরম পুরুষ-রূপ শ্রীকৃষ্ণ তত্ত্বেও অতি ক্ষুদ্রতম অংশেই সুষুপ্তি হয়। সেই সুষুপ্তির ফলেই কৃষ্ণ হইতে স্বপ্নবৎ মহাভাব রূপ রাধার স্ফূর্তি হইয়া থাকে—

যাহার উল্লেখ উপরে করা হইল। যতক্ষণ পরমপুরুষের সুষুপ্তি না হয় ততক্ষণ কৃষ্ণ অন্তর্লীন-শক্তি, রাধাহীন।

ঠিক ঐ প্রকারে মহাভাবরূপী রাধাতত্ত্বে আভাসরূপে সুষুপ্তি অথবা আত্মবিস্মৃতির উদয় হয়। সুষুপ্তি অথবা আত্মবিস্মৃতি ভিন্ন কোন অবস্থাতেই ক্ষোভ উৎপন্ন হইতে পারে না, কারণ চৈতন্যাংশ নিত্য ক্ষোভশূন্য এবং অচেতনাংশ বা সুষুপ্তাংশ সদা ক্ষোভময়।

মহাভাবের সুষুপ্তিতে স্বপ্নবৎ ভাবময় জগতের আবির্ভাব হয়। ইহাই অনন্ত ভাবরাজ্য বা বহিরঙ্গ নিত্য লীলার অনন্ত ক্ষেত্র। এই ভাবরাজ্য বিরাট মণ্ডলস্বরূপ। ইহার অন্তরঙ্গতম অংশ শ্রীবৃন্দাবন, মধ্যাংশ গোলক এবং বহিরংশ বৈকুণ্ঠ বা পরব্যোম। এই ভাবরাজ্যের আভাটি ভাবরাজ্যকে বেষ্টন করিয়া অনন্ত জ্যোতির্ম্ময় ব্রহ্মধামরূপে বিরাজ করিতেছে।

মহাভাবের সুষুপ্তির ন্যায় ভাবময়ী সত্তাতেও একটা সুষুপ্তি আছে। বলা বাহুল্য, ইহাও ভাবসত্তার অতি ক্ষীণাংশেই প্রকাশ পায়। এই সুষুপ্তি মধ্যে স্বপ্নবৎ অভাবের জগৎ আবির্ভূত হয়। এই অভাবের জগৎই মায়িক জগৎ। ভেদজ্ঞান এই জগতের পরিচায়ক ধর্ম। ভাব-জগতের কিঞ্চিৎ আভাস লইয়া বিপর্যায় ক্রমে নিদ্রিত মনুষ্যের স্বপ্ন-দর্শনের ন্যায় মায়িক জগতের দর্শন হইয়া থাকে। জাগ্রৎ অবস্থা ব্যতিরকে যেমন স্বপ্নাবস্থার উপপত্তি হয় না—ঠিক সেই প্রকার নিত্য লীলাময় ভাবরাজ্যের আশ্রয় না করিয়া নিত্য কর্ম্মময় অভাবজগৎ অর্থাৎ সুখদুঃখময় খণ্ড জগৎ আবির্ভূত হইতে পারে না।

অবতরণ মুখে সর্বত্রই আত্মসংকোচস্বরূপ বিস্মৃতি এবং সুষুপ্তিরূপ স্বেচ্ছাগৃহীত আবরণের ক্রিয়া বিদ্যমান রহিয়াছে। সৃষ্টিমুখে প্রত্যেকটি স্তরে তত্ত্বের স্ফুরণ হইয়া অবরোহক্রমে অনন্ত তত্ত্বের প্রাকট্য হইয়া থাকে। অখণ্ড মহাচৈতন্যই স্বাতন্ত্র বলে স্বেচ্ছাধৃত আবরণরূপ পরিগ্রহ করিয়া অনন্তরূপ ধারণ করিয়া থাকেন। যিনি তত্ত্বাতীত তিনিই যেন ক্রমশঃ পর পর অনন্ত তত্ত্বের আকারে স্ফুরিত হন। কিন্তু ইহা অর্থাৎ এই অনন্ত অভিনয় নিজের জন্য নহে। একই বহু সাজিয়াছেন এবং

সাজিতেছেন—এই সকলই তাঁহার তাত্ত্বিক রূপ, এইগুলি নিত্য সিদ্ধ এবং তাঁহার অনাদি অনন্ত লীলার নিত্য সিদ্ধ উপকরণ। কিন্তু ইহা তাঁহার লীলার উদ্দেশ্যে, নিজের জন্য নহে। ইহার দ্রষ্টা জীব ভোক্তা জীব—ইহার আস্বাদন কর্ত্তা জীব। এই লীলার উদ্দেশ্য জীবকে ক্রমশঃ এই মহালীলার ভিতর দিয়া তাহার কলার ক্রমিক বিকাশের ফলে একসময়ে তাহাকে অনন্ত কলা সম্পন্ন মহা চৈতন্যস্বরূপে প্রতিষ্ঠিত করা। এইজন্যই প্রতি স্তরেই লীলার দুইটি দিক্ আছে: একটি ঐ লীলার গণ্ডীতে আবদ্ধ থাকিয়া নিরন্তর উহারই অনুবর্ত্তন করা আর একটি লীলা দর্শন করিতে করিতে ও লীলার আস্বাদন করিতে করিতে পুষ্টিলাভ করিয়া লীলার উদ্দেশ্য প্রাপ্ত হইয়া লীলাতীত অবস্থায় স্ব স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হওয়া। ভোজন করিয়া তৃপ্তিলাভ করিলে যেমন ভোজনের আবশ্যকতা থাকে না, তেমনি লীলার ফলে আত্মবিকাশ সম্পূর্ণ হইলে লীলার আবশ্যকতা থাকে না। তখন স্বভাবই জীবকে লীলা মণ্ডল হইতে বাহিরে আকর্ষণ করিয়া লইয়া যায়। কিন্তু যতক্ষণ লীলার উদ্দেশ্য পূর্ণ না হয়, যতক্ষণ অতৃপ্তি বিদূরিত না হয়, যতক্ষণ কলার সম্যক্ বিকাশ সিদ্ধ না হয়, ততক্ষণ লীলাতে স্থিতি অবশ্যম্ভাবী।

বাস্তবিক পক্ষে যেমন সংসার লীলা বা মায়িক জগতের লীলা নিত্য, তদ্রূপ সংসারের অতীত মায়াদ্বারা অস্পৃষ্ট বিশুদ্ধ ভাবরাজ্যের লীলাও নিত্য। কিন্তু জীব কোন লীলাতেই আবদ্ধ থাকিতে বাধ্য নহে। লীলাতীত অবস্থার সন্ধান না পাওয়া পর্য্যন্ত লীলামধ্যে পুনঃ পুনঃ আবর্ত্তন অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু এই নিরন্তর আবর্তনের ফলে যখন একটু একটু করিয়া কলার ক্রমিক বিকাশ সম্পন্ন হয় তখন লীলাতীতের সন্ধান আপনিই ফুটিয়া উঠে। তখন লীলানিবৃত্তি হয়। লীলাতে পুনরাবৃত্তি আর হয় না। এই লীলানিবৃত্তি স্থায়ী। ইহা নিত্যলীলার অন্তর্গত সাময়িক নিবৃত্তি নহে। নিত্যলীলায় সংকোচ এবং বিকাশের খেলা নিরন্তর চলিতেছে। ইহা বিসর্গের ব্যাপার। ইহাতে প্রকৃত প্রস্তাবে স্থিতি হয় না। প্রত্যেক আবর্তনের পরেই

একটি আভাসরূপ স্থিতির অবস্থা আছে বটে, কিন্তু তাহা স্থায়ী হয় না। তাহা প্রকৃত স্থিতি নহে। ঐ স্থিতিটিই বিন্দু তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু জীব উহাকে ধরিয়া থাকিতে পারে না, তাহাকে পুনর্ব্বার লীলার আবর্তে অথবা বিসর্গের তরঙ্গে ফিরিয়া আসিতে হয়।

ইহার কারণ কি? বিসর্গ বিন্দুকে দুই ভাবে প্রাপ্ত হইতে পারে। এক, না জানিয়া অর্থাৎ অজ্ঞাতসারে প্রকৃতির নিয়মের অনুসরণ করিয়া সাময়িক রূপে কিঞ্চিৎ কালের জন্য বিন্দুতে বিশ্রাম করা এবং ক্লান্তি অপনোদনের পর পুনর্বার লীলাভূমিতে ফিরিয়া আসা। দ্বিতীয়, জ্ঞানপূর্বক অর্থাৎ জ্ঞাতসারে সাধনার পরিপাক নিবন্ধন স্বীয় স্বরূপ সত্তার ক্রমবিকাশের ফলে বিন্দুস্বরূপে প্রতিষ্ঠালাভ করা। এই অবস্থায় বিসর্গ আর বিসর্গ থাকে না। কলা বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে তাহা পূর্ণত্ব লাভ করে এবং বিন্দুস্বরূপ ধারণ করে। ইহাই বিন্দুর স্বরূপে স্থিতি। এই অবস্থা লাভ করিলে বিসর্গের আর পুনরাবর্তন হয় না। ইহার পর পরাবস্থালাভের সূত্রপাত হয়।

মায়িক জগৎ সৃষ্টি হইতে প্রলয় পর্য্যন্ত অনন্ত কর্মে বিক্ষুব্ধ থাকে, এবং প্রলয়ের পরে যাবতীয় বৈচিত্র্যের উপশমের ফলে কারণ সলিলে অব্যক্ত একাকার ধারণ করে এবং বিশ্রাম লাভ করে। কিন্তু ইহা অজ্ঞানপূর্ব্বক হইয়া থাকে। এই জন্যই এই বিশ্রাম চিরবিশ্রাম রূপে পরিণত হইতে পারে না। জগতের ও জীব মণ্ডলীর অতৃপ্ত অংশ কর্ম পথে অভিনব সৃষ্টিতে প্রত্যাবর্ত্তন করে। চক্রের আবর্তনের ন্যায় নিরন্তর এই প্রকার চলিতেছে। জ্ঞানের উদয় না হওয়া পর্য্যন্ত এই আবর্ত্তনের বা ঘূর্ণির হাত হইতে অব্যাহতি পাওয়ার কোন উপায় নাই। ভাব জগতে নিত্য লীলাও ঠিক এই প্রকার। কারণ সমগ্র ভাব জগৎ অথবা ব্রজভূমি অনন্ত বৈচিত্র লইয়া দৈনন্দিন লীলাবসানে একবার মহাভাবে উপসংহৃত হয়। ইহা সাময়িক বিশ্রান্তির অবস্থা। কিন্তু তাহার পর আবার ঐ মহাভাব হইতে অনন্ত ভাবরাশি অভিনব লীলা রসের আস্বাদনের জন্য বাহির হইয়া পড়ে। পূর্বোক্ত বিশ্রান্তি সকলের পক্ষে চির বিশ্রান্তি হয় না। কারণ

ভাবজগতেও জীবের ক্রম বিকাশ রহিয়াছে। ভাবের উদয় হইলে ভাব জগতে প্রবেশ হয়, ইহা সত্য—কিন্তু প্রেমের বিকাশ হইলেও লীলার সম্যক্ স্ফূর্তি হইতে পারে না।

কারণ প্রেমের অভিব্যক্তির পথে পরপর অনেক অবস্থা লাভ করিতে হয়, যাহার পরিসমাপ্তিতে মহাভাবের পরাকাষ্ঠা রাধা তত্ত্বে স্থিতি হয়। প্রেম, স্নেহ, প্রণয়, মান, অনুরাগ প্রভৃতি প্রেমভক্তি বিলাসের এক একটি পৃথক পৃথক ভূমি রহিয়াছে। ভক্তি বিকাশের তারতম্য অনুসারে লীলারসের আস্বাদনের তারতম্য রহিয়াছে। জীবকে পরপর সবই আস্বাদন করিতে হইবে নতুবা চিৎ কলার পুষ্টি সম্পন্ন হইবে না। প্রেমভক্তির অভিব্যক্তি জীব হৃদয়ে রাধাতত্ত্ব পর্য্যন্ত নিষ্পন্ন হইলে ঐ জীব রাধাভাবাপন্ন হইয়াছে বলিতে পারা যায়। উহাকে আর ভাবরাজ্যের বহিরঙ্গ লীলায় পুনরাবর্ত্তন করিতে হইবে না। কিন্তু যতদিন জীবের ক্রমবিকাশ এই প্রকার না হয় ততদিন বাধ্য হইয়াই তাহাকে পুনঃ পুনঃ লীলায় আবর্ত্তন করিতে হয়। ব্রহ্মকে জানা যেমন ব্রহ্ম হইয়া যাওয়া, ঠিক সেই প্রকার রাধাকে তখনই ঠিক জানা যাইবে যখন ভক্ত ক্রমবিকাশের ফলে রাধা ভাবে স্থিতিলাভ করিবে।

এক কথায় বলিতে গেলে ভাবকে মহাভাব হইতে হইবে। ইহাই ব্রজলীলার উদ্দেশ্য। ইহা না হওয়া পর্য্যন্ত ভাব দৈনিক আবর্তনে মহানিশাক্ষণে একবার মহাভাবে প্রবিষ্ট হইয়া কিঞ্চিৎ কালের জন্য বিশ্রাম লাভ করিলেও তাহাতে থাকিতে পারে না। তাহা হইতে চ্যুত হইয়া পড়ে, এবং আবার বাহ্য লীলা রস আস্বাদনের জন্য ব্যাকুল হইয়া পড়ে। কলা অপূর্ণ থাকা পর্য্যন্ত এই প্রকার অতৃপ্তি স্বাভাবিক—এবং অতৃপ্তি থাকিলে পুনরাবর্তনও স্বাভাবিক এবং ইহাই উচিত।

ভাবের ন্যায় মহাভাবেরও একটি অন্তরঙ্গ লীলা আছে। ভাব যেমন মহাভাবে যায় এবং সেখান হইতে বাহির হইয়া পড়ে, ঠিক সেই প্রকার মহাভাবও অনন্ত ভাবনিচয়কে গর্ভে ধারণ করিয়া পুষ্ট হইয়া

রসরাজকে স্পর্শ করিতে ধাবমান হয়। ইহাই মহাভিসার। এই মহাভিসারে মহাভাব রসতত্ত্বে যাইয়া আত্মবিসর্জন করে, অর্থাৎ মহাভাব রসরাজ রূপে সাময়িক বিশ্রান্তি লাভ করে। কিন্তু ইহা স্থায়ী বিশ্রান্তি নহে। কারণ ঐ রসরাজের স্বরূপ হইতে স্খলিত হইয়া মহাভাবকে আবার বাহির হইয়া আসিতে হয়। এই প্রকার পুনঃপুনঃ হইতে থাকে। বলা বাহুল্য, এই মহাভাবের লীলাটিও নিত্যলীলা। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে লীলা নিত্য হইলেও যখন মহাভাব অর্থাৎ রাধা অর্থাৎ রাধাভাবাপন্ন ভক্ত কলার সম্যক্ বিকাশে রাধাভাব পরিহার করিয়া কৃষ্ণস্বরূপে স্থিতি লাভ করে তখন সে কৃষ্ণই হইয়া যায়, আর সে রাধারূপে ফিরিয়া আসে না। কিন্তু যতক্ষণ এই অবস্থায় সিদ্ধি না হয় ততক্ষণ পুনঃ পুনঃ কৃষ্ণে প্রবেশ এবং কৃষ্ণ হইতে নির্গম অবশ্যম্ভাবী। মহাভাবের এই লীলাকেই নিকুঞ্জ লীলা বলে। ইহা অতি গুপ্ত রহস্যময় এবং গুহ্যতত্ত্ব। ইহাই কামকলা বিলাস যাহার বিশেষ বিবরণ পরে দিতে চেষ্টা করা যাইবে।

শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব পর্যন্ত প্রতিষ্ঠা লাভ করিলে মহাচৈতন্যরূপ পরমাবস্থায় যাইবার পথ পরিষ্কার হইয়া যায়। শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব রসরাজ স্বরূপ। ইহা অপ্রাকৃত নিত্য নবীন কামতত্ত্বের স্বরূপ। এই অবস্থায় প্রতিষ্ঠিত হইতে না পারিলে সেই মূল অথবা অনাদি সুষুপ্তি বা মহাসুষুপ্তি ভেদ করার পথ পাওয়া যায় না। ঐ মূল অবিদ্যা অথবা আত্মবিস্মৃতি অবগত না হইলে মহাচৈতন্য স্বরূপে স্থিতি কি প্রকারে সম্ভবপর হয়?

মহাভাবের বাহিরে ভাবরাজ্যের কথা পূর্বে বর্ণনা করা হইয়াছে। মহাভাবের ক্রিয়া হইতেই ভাবরাজ্যের বিকাশ হইয়া থাকে। মহাভাবের ক্রিয়া রাধাকৃষ্ণের নিত্য নিকুঞ্জ লীলার নামান্তর। এই ক্রিয়া নিবন্ধন মহাভাবের বাহ্য প্রদেশে একটি আলোক মণ্ডল সৃষ্ট হয়। এই মণ্ডলই ভাবরাজ্যের আশ্রয়। মহাভাব নিষ্ক্রিয় হইয়া গেলে আলোক মণ্ডলের বিকাশ থাকে না, তখন ভাবরাজ্য অস্তমিত হয়।

মহাভাব অন্তর্মুখে অগ্রসর হইতে হইতে কোন এক মহাক্ষণে

রসস্বরূপে আত্মসমর্পণ করে। পুনর্বার ঐ স্বরূপ হইতে নির্গত হইয়া পূর্বস্থানে প্রত্যাবর্তন করে। এই যে একবার অন্তর্মুখ ও একবার বহির্মুখ গতি ইহাই মহাভাবের ক্রিয়া। এই ক্রিয়া বিদ্যমান থাকিতে আলোক মণ্ডল আবির্ভূত না হইয়া থাকিতে পারে না। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে মহাভাব অন্তর্মুখ গতিতে মহারসের দিকে ক্রমশঃ অগ্রসর হইতে থাকিলে বহির্মুখ গতি মন্দ হয় বলিয়া উক্ত আলোক মণ্ডলের হ্রাস হইয়া আসে।

এই প্রকার প্রতি স্তর সম্বন্ধেই বুঝিতে হইবে। সুতরাং ভাবজগৎ পুনঃ পুনঃ মহাভাবে প্রবিষ্ট হয় এবং উহা হইতে নির্গত হয় বলিয়াই ভাবজগতের বাহ্য প্রদেশ একটি আলোক মণ্ডল রচিত হয়। ইহাই ব্রহ্মধাম বা ব্রহ্মলোক নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে। সমগ্র অভাবের জগৎ এই আলোককে আশ্রয় করিয়া বিদ্যমান থাকে। পূর্বের ন্যায় অভাবের জগৎ সংকুচিত হইয়া একবার ভাবজগতে প্রবিষ্ট হয় এবং পুনর্বার ভাব হইতে উত্থিত হইয়া স্বীয় অভাবরূপে প্রত্যাবর্তন করে। এই অভাব জগৎই মায়িক জগৎ। যে আলোকে বা প্রভামণ্ডলে মায়িক জগৎ উদ্ভাসিত হয় তাহাকে ব্রহ্মালোক বা ব্রহ্মলোক বলে। যে আলোকে সমস্ত ভাবরাজ্য উদ্ভাসিত হয় তাহাকে ভাবের আলোক বা ভাবলোক বলে। এই দুইটি আলোক পরস্পর পৃথক্। প্রথম আলোকটি জ্ঞানের আলোক তাহাতে সন্দেহ নাই, কিন্তু ইহা মায়িক জ্ঞান। এই আলোক অভাব নিবৃত্ত হয় না। যদিও ইহার অভাবে সাময়িক বিশ্রাম লাভ ঘটিয়া থাকে, তথাপি ইহা স্থায়ী হয় না। কারণ পুনর্বার অভাবের তরঙ্গ জাগিয়া উঠে। ভাবের আলোক প্রাপ্ত না হইলে সংসারে শ্রান্ত জীব স্থায়ী বিশ্রাম লাভ করিতে পারে না। ভাবের আলোক প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গেই স্বভাবে স্থিতি হয় বলিয়া অভাবের তাড়না আর থাকে না। থাকে না ইহা সত্য, কিন্তু মহা অভাবের উদয় হয়—জাগতিক অভাব ছাড়িয়া যায় কিন্তু মহা অভাব জাগে। ইহা না হইলে ভক্তি রাজ্যের বিকাশই হইত না। এ সম্বন্ধে পরে বলিব।

আলোর পূর্ণ বিকাশ মহাভাব পর্যান্ত। যে আলোকে ভাবরাজ্য প্রকাশমান থাকে তাহারই পূর্ণ পরিণতি মহাভাব। সুতরাং মহাভাব পর্যন্ত উত্থিত হইলে আর আলোর বিকাশ থাকে না। ভাবের আলোক ক্রমশঃ ক্ষীণ হইয়া আসিতে থাকে। কারণ ভাবের ক্ষয় না হইলে রসের উদ্গম হইতে পারে না। সুতরাং রাধাকৃষ্ণের নিকুঞ্জ লীলা অন্ধকারের লীলা। অবশ্য এই অন্ধকার জাগতিক অন্ধকার নহে, ভাবরাজ্যের অন্ধকারও নহে। প্রকৃত প্রস্তাবে ব্রহ্মলোকের পর অন্ধকার বলিয়া কোন বস্তুই থাকে না। সুতরাং ব্রহ্মলোক বা ভাবলোকে জাগতিক অন্ধকার নাই। আলোকের চরম সীমাতে বাস্তবিক অন্ধকার কোথা হইতে আসিবে? অতএব বুঝিতে হইবে যে, যে নিকুঞ্জে রাধাকৃষ্ণের মিলন সংঘটিত হয় তাহা মহাভাবের আলোকের প্রকাশ-শক্তিরও অতীত অবস্থা।

ক্রমশঃ মহাভাবের ক্ষয়ের সঙ্গে সঙ্গে রসরাজের ক্রমিক আত্মপ্রকাশ সিদ্ধ হয়। রাধার আত্মসমর্পণের পূর্ণতায় কৃষ্ণস্বরূপে স্থিতি লাভ— ইহাই নিকুঞ্জ লীলার প্রকৃত রহস্য। অমকলার ক্রীড়া এই প্রকারেই হইয়া থাকে।

জীব রাধাভাব হইতে পূর্ণ আত্মসমর্পণের ফলে কৃষ্ণস্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হইলে ক্ষণিকের জন্য মহাচৈতন্যের উন্মেষ হয়। কৃষ্ণস্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হওয়াই পরমপুরুষের অবস্থা। এই অবস্থায় পরমা প্রকৃতি তাহার অঙ্গীভূত। সমগ্র ভাবরাজ্য পরমা প্রকৃতির অঙ্গীভূত এবং সেই প্রকার অভাবরাজ্য অর্থাৎ মায়ারাজ্য ভাবরাজ্যের অঙ্গীভূত। সুতরাং অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড সমন্বিত সুবিশাল মায়ারাজ্যকে এক অংশে ধারণ করিয়া বিরাট ভাবরাজ্য মহাভাবরূপা শ্রীরাধার অঙ্গের এক প্রান্তে স্থান প্রাপ্ত হয়। এই প্রকার রাধাকে গ্রাস করিয়া এক অঙ্গে স্থাপন করিতে পারিলে পরমপুরুষ শ্রীকৃষ্ণ মহাচৈতন্যরূপী আত্মস্বরূপের ক্ষণিক সাক্ষাৎকার লাভ করিতে সমর্থ হন। প্রকৃতি বিরহিত অর্থাৎ সুষুপ্ত প্রকৃতিবিশিষ্ট পরমপুরুষ মহাচৈতন্যের দর্শন লাভ করিতে পারেন না।

এই ক্ষণিক দর্শন স্থায়ী হইলেই জীব পরমপুরুষ এবং পরমা

প্রকৃতি উভয়ের অতীত মহাচৈতন্য স্বরূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। ইহাই তাহার আত্মস্থিতি বা মহাজাগরণ। এই অবস্থায় স্বপ্ন নাই এবং সুষুপ্তিও নাই। ইহাই পূর্ণত্ব।

সৃষ্টি প্রক্রিয়ার দিকে লক্ষ্য করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে এক স্তর হইতে অন্য স্তরের আবির্ভাবের সময় প্রথম স্তরের ক্রিয়ার ফলে যে প্রভামণ্ডল আবির্ভূত হইয়া ঐ স্তরকে বেষ্টন করে দ্বিতীয় স্তর ঐ মণ্ডল মধ্যেই প্রকটিত হয়। দ্বিতীয় স্তরের সংহারের সময় উহা ঐ প্রভামণ্ডলেই উপসংহৃত হয়। তদনন্তর প্রভামণ্ডল প্রথম স্তরে অনুপ্রবিষ্ট হয়। এই নীতি অনুসারে মহাভাবকে ঘেরিয়া যে মহান্ আলোক নিকুঞ্জলীলার প্রভাবশতঃ আত্মপ্রকাশ করে সমগ্র ভাবরাজ্য ঐ মহান আলোক মধ্যেই ভাসিয়া উঠে, এবং ভাবরাজ্যের উপশমও সাক্ষাৎভাবে ঐ আলোকের মধ্যেই হইয়া থাকে। ঐ অলোকটি ঠিক তখনই মহাভাবে প্রত্যোবর্তন করে যখন মহাভাব অন্তর্মুখ গতিতে মহারসের দিকে অগ্রসর হয়। এইজন্য যাঁহারা ক্রমবিকাশের ফলে ভাব হইতে মহাভাবে উন্নীত হন তাঁহারা সাক্ষাৎ ভাবে মহাভাবের সহিত তাদাত্ম্য লাভ করেন। কিন্তু যাঁহারা আত্ম বিকাশ পূর্ণ না হইলেও দৈনন্দিন লীলার অবসানে বিশ্রামের জন্য মহাভাবে ফিরিয়া যান তাঁহারা মাহাভাবের সহিত তাদাত্ম্য লাভ করেন না কিন্তু মহাভাবের ঐ পূর্বোক্ত অলোতে লীন হইয়া সুষুপ্তবৎ থাকেন। তাঁহাদের পক্ষে ঐ আলোক অস্তমিত হয় না। উহা মহাভাবকে বেষ্টন করিয়া বিদ্যমান থাকে এবং তাঁহারা উহাতেই লীন থাকেন। ইহা সুষুপ্তিরই নামান্তর। মায়িক জগতের সম্বন্ধেও ঠিক এই প্রকার বিধানই কার্য করিয়া থাকে জানিতে হইবে। কারণ ভাব জগৎকে বেষ্টন করিয়া যে আলোক বিদ্যমান রহিয়াছে এবং যাহা নিরন্তর ভাবরাজ্যের অভ্যন্তরীন ক্রিয়ার ফলে স্ফুরিত হইতেছে, মায়িক জগৎ প্রলয়কালে ঐ আলোকের মধ্যেই বিশ্রাম প্রাপ্ত হয়। আবার নূতন সৃষ্টিতে ঐখান হইতেই উহা বাহির হইয়া আসে, ভাবজগতে প্রবেশ লাভ হয় না যদিও ইহা সত্য যে ঐ আলোক ভাব জগতের আভা ভিন্ন অপর

কিছু নহে। কিন্তু যাঁহাদের মায়িক জগতের উপযোগী আত্মবিকাশ সম্পূর্ণ হইয়াছে তাঁহারা ঐ আলোক ভেদ করিয়া ভাবরাজ্যে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন অর্থাৎ আপন আপন ভাব স্বরূপে স্থিতি লাভ করেন। তাঁহাদিগকে ঐ আলোকে লীন হইয়া থাকিতে হয় না।

ঠিক এইপ্রকার মহাভাব ও রস এবং রস ও মহাচৈতন্য ইহাদের পরস্পর সম্বন্ধও বুঝিতে হইবে। আর একটি কথা এই প্রসঙ্গে স্মরণ রাখার যোগ্য। তাঁহা এই—নীচের স্তর উপসংহৃত হইলেও উহার উপরের স্তর তখনই উপসংহৃত হইবে এমন কোন কথা নাই। উহা জাগিয়াই থাকে। কিন্তু উহারও একটি উপসংহারের সময় আছে। যখন নির্দ্দিষ্ট সময় সমাগত হয় তখন এই উর্দ্ধ জগৎও উপসংহৃত হইয়া পড়ে। এইভাবে উর্দ্ধ এবং অধঃ স্তর ভেদে উপসংহারের ক্রম লক্ষিত হয়। সর্বত্রই ক্রমাত্মক কালের প্রভাব স্পষ্ট উপলব্ধি করিতে পারা যায়। কিন্তু যথার্থ উপসংহার কালে হয় না। তাহা ক্ষণের মধ্যেই নিষ্পন্ন হইয়া থাকে। কালে ক্রম আছে, তাই পূর্বাপর ভাব আছে, সম্বন্ধ আছে এবং সঞ্চার আছে। কিন্তু ক্ষণে এই সকল ধর্মের কোনটিই লক্ষিত হয় না। এইজন্য যথার্থ স্থিতি কালকে অতিক্রম করিতে না পারিলে অর্থাৎ ক্ষণে প্রবিষ্ট না হইতে পারিলে সিদ্ধ হয় না।

পূর্বোক্ত বিবরণ হইতে বুঝিতে পারা যায় যে প্রকৃত স্থিতি বিন্দুরূপী ক্ষণ এক ও অভিন্ন। প্রতি স্তরের উপশমের সময় উহাকে আপেক্ষিক-রূপে প্রাপ্ত হওয়া যায়। কিন্তু ঐ প্রাপ্তি যথার্থ প্রাপ্তি নহে। কারণ তাহা হইলে, অর্থাৎ ক্ষণকে সত্য সত্য প্রাপ্ত হইলে ক্রম থাকিতে পারে না বলিয়া কাল থাকে না এবং কালের ধর্ম ক্রমের বিকাশও থাকে না। এইজন্য যদিও প্রতি স্তরের উপশম ক্ষণরূপী মহাউপশমের অন্তর্গত তাহাতে সন্দেহ নাই, তথাপি উহা প্রকৃত উপশম নহে। কারণ ঐ অবস্থা হইতে পুনরাবর্ত্তন হইয়া থাকে।

লীলাতীত পরমশান্তি প্রাপ্ত হইতে হইলে নিত্যলীলা ভেদ করা একান্তই আবশ্যক। লীলাতে প্রবেশ করিতে হইবে এবং ভাব-

ক্ষয়ের সঙ্গে সঙ্গে লীলাকে অতিক্রম করিতে হইবে। ইহাই স্বভাবের নিয়ম। ভাব অথবা মহাভাবের লীলাতে প্রবিষ্ট না হইয়া অভাবের জগৎ হইতে অর্থাৎ মায়ারাজ্য হইতে সাক্ষাৎভাবে ভাবাতীত ও লীলাতীত মহাচৈতন্যকে সাক্ষাৎকার করা সাধারণ জীবের পক্ষে দুরাশা মাত্র। কারণ অভাবকে ভাবের দ্বারা পূরণ করিয়া লইতে না পারিলে ঋণ মুক্তি হয় না বলিয়া প্রাকৃতিক আকর্ষণ বিকর্ষণের জাল হইতে অব্যাহতি লাভ করা যায় না।

শ্রীকৃষ্ণ তত্ত্বটি কামতত্ত্ব। শ্রীকৃষ্ণ বীজ কামবীজ এবং শ্রীকৃষ্ণের গায়ত্রী কামগায়ত্রী। কিন্তু এই কাম প্রাকৃতিক কাম নহে। ইহা অপ্রাকৃত কাম। প্রাকৃতিক কাম ও অপ্রাকৃতিক কাম উভয়ই স্বরূপতঃ এক হইলেও একটি মলিন ও অপরটি নির্মল, ইহাই উভয়ের ভেদ নিরূপক ধর্ম। প্রাকৃত কামকে অতিক্রম করিতে না পারিলে যেমন ভাব বা মহাভাব অবস্থা লাভ করা যায় না, তেমনি অপ্রাকৃত কামকে ভেদ না করিয়া কেহ মহা-চৈতন্য লাভ করিতে পারে না। প্রকৃতিক কামের ক্রিয়া হইতে মায়িক জগতের সৃষ্টি হয়। এই কামকে জয় না করিতে পারিলে মায়ারাজ্য অতিক্রম করিয়া নিত্য ভাব রাজ্যে স্থিতি লাভ হয় না ; ঠিক সেই প্রকার অপ্রাকৃত কাম আয়ত্ত না হইলে মহাচৈতন্যে স্থিতি লাভ হয় না ;

রাধাকৃষ্ণের রহস্য লীলা বস্তুতঃ কামকলারই বিলাস। ইহার কিঞ্চিৎ আভাস পরম তত্ত্বের বিশ্লেষণ মুখে যথাস্থানে দেওয়া যাইবে। কিন্তু ইহা স্মরণ রাখিতে হইলে যে শ্রীকৃষ্ণ পরম পুরুষ হইলেও মহা-চৈতন্য সাক্ষৎকার করিতে সমর্থ হন না যদি তিনি রাধার সঙ্গে যুক্ত না থাকেন। শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে রাধার যোগ ততক্ষণ সম্ভবপর হয় না যতক্ষণ রাধা সমগ্র ভাবরাজ্যকে আকর্ষণ করিয়া এবং স্বীয় অঙ্গে স্থাপন করিয়া একাকী পরমপুরুষের দিকে অভিসার না করেন এবং এই অভিসারের পথে ক্রমশঃ নিজেকে শ্রীকৃষ্ণ চরণে বিসর্জন না করেন। রাধার আত্ম সমর্পণ দ্বারাই শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ মধ্যে তাঁহার স্থিতি সিদ্ধ হইয়া থাকে। তখনই শ্রীকৃষ্ণকে রাধাযুক্ত বা রাধা-

বিশিষ্ট বলিয়া বর্ণনা করা চলে, তৎপূর্বে নহে। অন্য সময় অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ হইতে রাধার ব্যবধান কালে শ্রীকৃষ্ণ শক্তি বিরহিত বলিয়া অপূর্ব এবং এইজন্য কামজয়ে অসমর্থ। "রাধাসঙ্গে যদা ভাতি তদা মদনমোহনঃ। অন্যথা বিশ্বমোহোঽপি স্বয়ং মদনমোহিতঃ।" অর্থাৎ রাধাযুক্ত শ্রীকৃষ্ণ মদনকে মোহিত করিতে সমর্থ! ইহাই স্বরূপশক্তির মহিমা। বিকশিত স্বরূপশক্তির প্রভাবে কামতত্ত্বের পরাজয় অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু কৃষ্ণ যখন একাকী, অর্থাৎ যখন তাঁহাতে স্বরূপশক্তির যোগ নাই, তখন তাঁহাকে দর্শন করিয়া সমগ্র বিশ্ব বিমোহিত হইলেও তিনি নিজে মোহের অতীত নহেন। কারণ কাম তাঁহাকে মোহিত করিয়া থাকে।

অতএব কাম জয়ের জন্য স্বরূপশক্তির সাহচর্য্য এবং লীলা অত্যাবশ্যক। এই সাহচর্য্য লাভ করিবার জন্য স্বরূপশক্তির জাগরণও আবশ্যক। কারণ ঐ শক্তি সুষুপ্তাবস্থায় থাকিলে উহা থাকিয়াও না থাকার সমান। উহা দ্বারা কোন কার্য্যই নিষ্পন্ন হয় না। মহারাসের রহস্য বিশ্লেষণ কালে এই তত্ত্বই স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। রাস লীলাকে যে মহাজনগণ কন্দর্পের দর্পদলন বলিয়া বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন তাহা অত্যন্ত সমীচীন। কিন্তু সে আলোচনা এখানে অপ্রাসঙ্গিক।

যদিও "লোকবৎ তু লীলা কৈবল্যম" ইহা প্রসিদ্ধই আছে, তথাপি মহাচৈতন্য লাভের পূর্ব পর্য্যন্ত জীবের দৃষ্টি অনুসারে বলিতেই হইবে যে লীলারও উদ্দেশ্য আছে। মায়িক জগৎ যেমন কর্মক্ষেত্র, এবং কর্মের অতীত হইলে যেমন মায়ারাজ্যের কোন সার্থকতা থাকে না, ঠিক সেই প্রকার ভাবরাজ্য অথবা মহাভাব মণ্ডল ক্রমশঃ বহিরঙ্গ ও অন্তরঙ্গ লীলা নিকেতন। লীলার অতীত হইলে ভাব ও মহাভাবের কোন সার্থকতা থাকে না।

ভগবানের ধাম রূপ গুণ নাম ও লীলা সবই অপ্রাকৃত এবং চিদানন্দময়—একথা পূর্বেই বলা হইয়াছে। তাঁহার স্বরূপ শক্তির প্রভাবে এই সকল নিত্যই অভিব্যক্ত হইয়া থাকে। মায়িক সৃষ্টি

ও প্রলয়ের ন্যায় ইহাদের সৃষ্টি ও লয় নাই। তথাপি আকুঞ্চন এবং প্রসারণ এই দুইটি ধর্ম শক্তির স্বভাব সিদ্ধ গুণ বলিয়া নিত্যধামেও ইহাদের ক্রিয়া দেখিতে পাওয়া যায়। মায়িক জগতে প্রলয় কালে কার্য্যবস্তু মাত্রই বিশ্লিষ্ট হইয়া উপাদান কারণে লয় প্রাপ্ত হয়, নূতন সৃষ্টিতে অভিনব রূপেই কার্য্য সকলের পুনরুৎপত্তি হয়। কিন্তু নিত্যধামে যে সংকোচ হয় তাহাতে বস্তুর স্বরূপ ক্ষুণ্ণ হয় না। এবং প্রসারণের সময়েও পূর্ব স্বরূপেরই পুনরাবির্ভাব হয় বলিয়া অভিনব সৃষ্টির কোন কথাই উঠে না। বস্তুতঃ সংকোচ অবস্থাটি সুষুপ্তিরই নামান্তর এবং প্রসারণটি সুষুপ্তি ভঙ্গের পর জাগরণের পর্য্যায় মাত্র। নিদ্রাকালে যেমন দেহবোধ বা আত্মবোধ না থাকিলেও দেহের সত্তা অবিচ্ছিন্নই থাকিয়া যায় তদ্রূপ দৈনন্দিন লীলার উপশমে সুষুপ্তি কালে আত্মস্মৃতি না থাকিলেও স্বরূপের অনুবৃত্ত বিচ্ছিন্ন হয় না। এইজন্যই নিত্য ধাম মৃত্যু অথবা প্রলয়ের অতীত বলা হইয়া থাকে।

মায়ারাজ্য কৃত্রিম এবং ভাবরাজ্য স্বভাব সিদ্ধ। মায়া রাজ্য অহন্তা এবং মমতাবোধের আশ্রয় স্বরূপ। এই অহন্তা ও মমতা উভয়ই কল্পিত, কোনটিই স্বাভাবিক নহে। কিন্তু ভাবরাজ্যে ও মমতার ক্রিয়া দেখিতে পাওয়া যায়। তাহা অকৃত্রিম এবং স্বভাবসিদ্ধ বলিয়া বন্ধনের হেতু হয় না।

ভাবরাজ্যে কোন বিষয়েই কৃত্রিমতা থাকে না বলিয়াই সেখানে যাহা কিছু প্রকাশিত হয় তাহার কোনটিতেই চেষ্টা বা উদ্যম অথবা পুরুষকারের প্রভাব লক্ষিত হয় না। যাহা পুরুষকার বলিয়া মনে হয় তাহাও বস্তুতঃ প্রকৃতিরই খেলা। বস্তুতঃ ভাবরাজ্যই প্রকৃতির রাজ্য। ঐ রাজ্যের কেন্দ্রে একটিই মাত্র পুরুষ আছেন। তদ্ভিন্ন সকলেই প্রকৃতি। যে সকল রূপ পুরুষ বলিয়া প্রতীত হয় তাহাও বাস্তবিক পক্ষে প্রকৃতিরই রূপ। লীলারসের আস্বাদনের জন্য প্রকৃতিই অনন্ত রূপসম্ভার তৎ তৎ ভাবের অভিব্যক্তির জন্য অনাদি কাল হইতে গ্রহণ করিয়া রহিয়াছে। এই লীলাভিনয়ের অধিষ্ঠাত্রী শক্তি যোগমায়া।

বস্তুতঃ যোগমায়া রাধা বৃন্দা লীলাশক্তি প্রভৃতি এক অদ্বিতীয়

স্বরূপশক্তিরই কার্য্যাভেদানুরূপ বিভিন্ন নাম মাত্র।

ভাব ও রস এই দুইটির তত্ত্ব সম্যক্ প্রকারে ধারণা করিতে না পারিলে নিত্য লীলার রহস্য হৃদয়ঙ্গম হইতে পারে না। ভাবের পরাকাষ্ঠা মহাভাব এবং রসের পরাকাষ্ঠা রসরাজ। ভাবের সহিত রসের সম্বন্ধ বুঝিতে পারিলেই মহাভাবের সহিত রসরাজের সম্বন্ধ বুঝিতে ক্লেশ পাইতে হইবে না। লৌকিক জগতের দৃষ্টান্ত আশ্রয় করিয়া লোকোত্তর নিত্যধামের তত্ত্বজ্ঞান অর্জন করিতে হয়। যাঁহারা নিত্যধামে এখনও প্রবেশ করিতে সমর্থ হন নাই। তাঁহাদের পক্ষে উহা জানিবার অন্য কোন উপায় নাই।

জীব তটস্থ শক্তিস্বরূপ অণুভাবাপন্ন সত্তা। ইহা স্বরূপতঃ জ্ঞানাত্মক হইলেও ইহার একটি স্বরূপভূত ধর্মও আছে। ঐ ধর্মের সংকোচ ও বিকাশ হইয়া থাকে, কিন্তু ধর্মীয় সংকোচ বিকাশ হয় না। ঐ জ্ঞান-রূপী ধর্ম দ্রব্যাত্মক বলিয়া অবস্থা অনুসারে উহাতে ক্ষোভের উৎপত্তি হইয়া থাকে। শান্ত গঙ্গাবক্ষে যেমন মৃদু মারুত হিল্লোল তরঙ্গ ভঙ্গ হয় ঠিক সেই প্রকার চিদণুর স্বরূপধর্ম জ্ঞানেও অবস্থা বিশেষে হিল্লোল উৎপন্ন হয়। ইহাই ক্ষোভ। ক্ষোভ না হইলে পরিণাম হইতে পারে না। কারণ যাহা নিষ্কম্প ও অক্ষুব্ধ তাহা অপরিণামী। এই যে স্বরূপভূত জ্ঞানের কথা বলা হইল ইহারই নামান্তর চিত্ত। ইহার ক্ষোভ বা ক্ষোভোন্মুখ অবস্থাটি চিত্তবৃত্তি নামে আখ্যাত হইয়া থাকে। এই বৃত্তি চিত্তের অবয়বগত সন্নিবেশ তারতম্যের জন্য নানাপ্রকার হইয়া থাকে। যাহাকে আমরা বৃত্তিজ্ঞান বলিয়া থাকি তাহা ইহারই একটি প্রকার মাত্র। তদ্রূপ যাহাকে ইচ্ছা বলিয়া বর্ণনা করা হয় তাহাও ইহারই আর একটি প্রকার। এইভাবে দৃষ্টির তারতম্য নিবন্ধন্ চিত্তের ক্ষোভ বিভিন্ন নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে। চিত্তে যে প্রকার ক্ষুব্ধতা বা তরঙ্গ উৎপন্ন হইলে আনন্দের অনুভূতি সম্ভবপর হয় তাহাই "ভাব" নামে পরিচিত। বীজ অঙ্কুরিত হইয়া ক্রমশঃ বিকাশ প্রাপ্ত হইতে হইতে যেরূপ বৃক্ষ, পুষ্প, ফল এবং রস রূপে পরিণত হয় ঠিক সেই প্রকার ভাবও অঙ্কুরিত হইয়া ক্রমশঃ অভিব্যক্ত হইলে চরমাবস্থায়

রস বা আনন্দরূপে পরিণতি লাভ করে। সুতরাং ভাবকে আনন্দাত্মক রসের বীজ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

পূর্ব বর্ণিত দৃষ্টান্ত হইতে লৌকিক ভাবের কিঞ্চিৎ পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া গেলেও ইহার যথার্থ স্বরূপের পরিচয় লাভ হয় না। কারণ চিত্তের ক্ষোভ মাত্রেই ভাব নহে। চিত্ত এক প্রকারে ক্ষুব্ধ হইলে জ্ঞানরূপ বৃত্তির উদয় হয়। সেই চিত্তই অন্য প্রকারে ক্ষুব্ধ হইলে ইচ্ছার উদয় হয়। এই প্রকার প্রত্যেকটি বৃত্তির উদয় সম্বন্ধেই বুঝিতে হইবে! ভাব ও চিত্তের বৃত্তি। এই জন্য বিশিষ্ট প্রকারে চিত্ত ক্ষুব্ধ না হইলে চিত্ত মধ্যে ভাবরূপ বৃত্তি বা পরিণামের উদ্ভব হয় না। এখন প্রশ্ন এই—একই চিত্ত বিভিন্ন প্রকারে ক্ষুব্ধ হয় কেন? একই উপাদানকে বিভিন্ন প্রকার কার্য্যে পরিণত হইতে হইলে নিমিত্তগত ভেদের আশ্রয় গ্রহণ অনিবার্য। অর্থাৎ উপাদান এক হইলেও নিমিত্ত-ভেদবশতঃ কার্য্যের ভিন্নতা উপপন্ন হইতে পারে। নিমিত্তের পার্থক্য না থাকিলে অথচ উপাদান এক ও অভিন্ন হইলে কার্য্যের পার্থক্য নিরূপণের কোনই উপায় থাকে না। অতএব যে নিমিত্তের সংঘটন বশতঃ চিত্তরূপী উপাদান জ্ঞানরূপী কার্য্যে পরিণত হয় তাহা হইতে ভিন্ন নিমিত্তের সংঘর্ষ না হইলে ঐ উপাদান হইতে ইচ্ছা অথবা ভাবরূপী অন্য কার্য্যের উদ্ভব হইতে পারে না। ইহা হইতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে যদিও রসরূপী আনন্দের বীজ ভাবরূপে চিত্তমধ্যে প্রথমে অভিব্যক্ত হয় তথাপি এই ভাবের মূল চিত্তে নিহিত নাই। ইহা চিত্তের বাহির হইতে আগন্তুক ধর্মরূপে চিত্তকে স্পর্শ করিয়া থাকে। এই আগন্তুক ধর্মরূপী নিমিত্তই যথার্থ ভাব। চিত্তের ক্ষোভ এই নিমিত্তরূপী ভাবের স্পর্শ জন্য চিত্তের আন্দোলন মাত্র।

মায়ারাজ্যের ন্যায় আত্মরাজ্যেও ঠিক এই ব্যাপারই লক্ষিত হয়। ভগবৎ স্বরূপের সহিত অভিন্নরূপে বিদ্যমান শক্তিই ভগবানের স্বরূপ শক্তি। এই শক্তিতেও তরঙ্গ উদগম হয় অর্থাৎ ক্ষোভ জন্মে। ইহাই ভাবের আবির্ভাব। চিত্ত যেমন বাহ্য নিমিত্তের সম্বন্ধ বশতঃ বিভিন্ন প্রকার বৃত্তিরূপে পরিণত হয়, ভগবৎ শক্তি সেই প্রকার স্ব নিরপেক্ষ

বাহ্য নিমিত্তের সম্বন্ধ বশতঃ পরিণাম প্রাপ্য হয় না। ভগবৎতত্ত্ব অদ্বৈত স্বরূপ। এইজন্য উহাতে নিমিত্ত ও উপাদানের কোন পার্থক্য নাই। অর্থাৎ স্বরূপ শক্তি উপাদান রূপে জ্ঞান ভাব প্রভৃতি বিভিন্ন আকারে স্ফুরিত হয়। কিন্তু এই স্ফুরণের জন্য উহা বাহ্য নিমিত্তের অপেক্ষা করে না। অর্থাৎ স্বরূপ শক্তি আপন স্বভাবেই অনন্ত বিলাস রূপে প্রসৃত হইয়া থাকে। অতএব নিত্যধামেও জ্ঞান প্রভৃতি বিভিন্ন আকারে স্বরূপ শক্তির ক্রিয়া দেখিতে পাওয়া যায়। এই সকল আকারের যাহা মূলভূত, যাহা অভিব্যক্ত হইতে হইতে চরমাবস্থায় লোকোত্তর রস রূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করে, তাহাই ভাব। এই ভাবই স্বভাব, আপন ভাব। এই স্বভাবে কৃত্রিমতা নাই বলিয়া পরভাব নাই, বাহ্য নিমিত্তও নাই। ভাবরাজ্যই স্বরূপ শক্তিরূপ মহাভাব হইতে অনন্ত ভাবের অভিব্যক্তি। রস এক হইলেও তাহার আস্বাদন অনন্ত প্রকার বলিয়া মহাভাব এক হইলেও খণ্ডভাব অনন্ত। পক্ষান্তরে অনন্ত প্রকারের আস্বাদন একই মহা আস্বাদনের অঙ্গীভূত—শুধু অঙ্গীভূত নহে, উহার সহিত অভিন্ন। তদ্রূপ ভাব অনন্ত হইলেও, প্রত্যেকটি ভাব স্বভাবরূপী হইলেও, এবং সকল ভাবের মধ্যে পরস্পর পার্থক্য থাকিলেও, মূলে সব ভাবই একই ভাব। তাহাই মহাভাব। অতএব অনন্ত ভাব হইতে অনন্ত কাল অনন্ত প্রকার রসের অভিব্যক্তি হয় ইহাই স্বভাবের খেলা। ইহাও বস্তুতঃ মহাভাবের পক্ষে রসরাজকে প্রাপ্ত হইবার জন্য যে অকৃত্রিম বিলাস তাহারই নিত্য অভিব্যক্তি মাত্র।

বিম্ব ভিন্ন যেমন প্রতিবিম্ব হয় না এবং প্রতিবিম্ব থাকিলেই যেমন বিম্বের সত্তা অঙ্গীকার করিতে হয় ঠিক সেই প্রকার ভাবরাজ্যের অলৌকিক ভাব এবং জগতের অর্থাৎ মনুষ্য চিত্তে লৌকিক ভাব এই উভয়ের সম্বন্ধ বুঝিতে হইবে। অর্থাৎ ভাবরাজ্যের অন্তর্গত বিশিষ্ট ভাবই তৎতৎ কারণবশতঃ মনুষ্য চিত্তেও প্রতিফলিত হইয়া ক্ষোভ উৎপন্ন করে। তখন ঐ ক্ষোভই জাগতিক দৃষ্টিতে ভাবরূপে পরিচিত

হয়। বস্তুতঃ উহা প্রকৃত ভাব নহে, শুদ্ধ ভাবের প্রতিবিম্ব মাত্র। শুদ্ধ ভাব প্রতিবিম্বিত হইয়া বিপরীত ধর্মে আক্রান্ত হয় এবং আধারের মলিনতা বশতঃ মালিন্য প্রাপ্ত হয়। এই শুদ্ধ ভাবই চিত্তরূপ উপাদানের ক্ষোভক বাহ্য নিমিত্ত।

যে ভাবরূপী বীজ অভিব্যক্ত হইয়া আনন্দ চিন্ময় রস রূপে পরিণত হয় তাহাই স্থায়ী ভাব। যে ভাব স্থায়ী না হইয়া সঞ্চারী অথবা ব্যভিচারী অবস্থায় বিদ্যমান থাকে তাহা রসরূপ ধারণ করিতে পারে না। রসের অভিব্যক্তিই অভিনয় অথবা নাট্যলীলার প্রধান উদ্দেশ্য। ভাবরাজ্যটি অনন্ত প্রকার রসাস্বাদনের উদ্দেশ্যে আয়োজিত বিরাট রঙ্গমঞ্চ স্বরূপ। অতএব—আস্বাদনের যত প্রকার বৈচিত্র্য আছে সবই কোন না কোন আকারে ভাবরাজ্যে স্থান প্রাপ্ত হইয়াছে।

ভাব রসাভিব্যক্তির মূল তত্ত্ব তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু যতক্ষণ ভাব প্রেমরূপে পরিণত না হয় ততক্ষণ রস বিকাশের কোনই সম্ভাবনা থাকে না। কারণ ভাবকে আস্বাদ্য রূপে ফুটাইয়া তুলিতে হইলে যে সকল অভিব্যঞ্জক সামগ্রী আবশ্যক ভাব প্রেমাবস্থা পর্য্যন্ত অভিব্যক্ত না হইলে উহা উপলব্ধ হয় না।

ভাবের সজাতীয় এবং বিজাতীয় ভেদ আছে। তা ছাড়া স্বগত ভেদও অবশ্যই আছে। এক ভাবের সঙ্গে অন্য ভাবের পার্থক্য উভয় ভাবের জাতিগত পার্থক্য নিবন্ধন হইতে পারে। পক্ষান্তরে দুইটি ভাব এক জাতির অন্তর্গত হইলেও দুইটির মধ্যে পরস্পর বৈয়ক্তিক পার্থক্যও থাকিতে পারে। জাতিগত পার্থক্য না থাকিলেও এই প্রকার সজাতীয় ভেদ সম্ভবপর। আবার একই ভাবে ব্যক্তিগত স্বরূপগত বহুপ্রকার অবান্তর ভেদ থাকিতে পারে। এই সকল স্বগত ভেদ ক্ষণ ভেদে অভিব্যক্ত হইয়া থাকে। একই অবিচ্ছিন্ন ভাব প্রতিক্ষণে নব নব রূপে প্রতীতিগোচর হইতে পারে। ইহা একই ভাবের ক্ষণগত বৈশিষ্ট্যের নিদর্শন। এই প্রকার ভাবের সাধারণ বর্গীকরণ হইয়া থাকে।

ইহা ছাড়া একই ভাব আশ্রয়গত এবং বিষয়গত ভেদবশতঃ

ভিন্নবৎ প্রতীত হয়। শুধু যে প্রতীত হয় তাহা নহে তাহাকে ভিন্ন বলিলেও ক্ষতি নাই। অর্থাৎ একই মাতৃত্ব এক আধারে অভিব্যক্ত হইলে যে মাতৃরূপের অভিব্যক্তি হয় অন্য আধারে অভিব্যক্ত হইলে পূর্বরূপ হইতে পৃথক্ অন্য মাতৃরূপের অভিব্যক্তি হয়। মাতৃভাব মূলতঃ এক হইলেও যেমন আঁধারের পার্থক্যবশতঃ পৃথক্ পৃথক্ মাতৃরূপ ফুটিয়া উঠে, ঠিক সেই প্রকার কোন বিশিষ্ট ভাব এক ও অভিন্ন হইলেও উহা আধার ভেদে অভিব্যক্ত হইলে আধারের পার্থক্য নিবন্ধন উহার অভিব্যক্ত রূপের পার্থক্য অবশ্যম্ভাবী।

ভাবের অভিব্যক্তির জন্য অন্যান্য কারণের মধ্যে আলম্বন মুখ্য। নিরালম্ব ভাব অবাস্তব। আলম্বন প্রাপ্ত হইলেই অব্যক্ত ভাব ব্যক্ত হইয়া উঠে। যাহাতে ভাব অভিব্যক্ত হয় এবং অভিব্যক্ত হইয়া যাহাকে অবলম্বন করিয়া বর্তমান থাকে তাহাই ভাবের আশ্রয় (subject)। ইহাই আলম্বন। যাহার উদ্দেশ্যে অব্যক্ত ভাব ফুটিয়া উঠে তাহা উক্ত ভাবের বিষয় (object)। ইহা ভাবের দ্বিতীয় আলম্বন। অব্যক্ত ভাব অভিব্যক্ত হইলেই এইজন্য ত্রিপুটী রূপে পরিণত হয়। অর্থাৎ ভাব স্বয়ং, ভাবের অনুযোগী বা আশ্রয় এবং ভাবের প্রতিযোগী বা বিষয়। অব্যক্ত ভাব হইতে রস নিরূপিত হয় না তাহা সত্য, কিন্তু ভাব ব্যক্ত হইলেই যে সঙ্গে সঙ্গে রসের উদয় হইবে—তাহাও সম্ভবপর নহে, কারণ ভাবের একটা ক্রমিক বিকাশ আছে। এই বিকাশের পথে আবর্তন করিতে করিতে পূর্বোক্ত প্রকারে অভিব্যক্ত ভাব রসরূপ ধারণ করিয়া সহৃদয়গণের আস্বাদনীয় হয়।

এই যে অভিব্যক্ত ভাবের কথা বলা হইল ইহা বস্তুতঃ ভাবের স্বরূপ প্রাপ্তি, কারণ আশ্রয় ও বিষয় এই উভয় প্রান্তে নিবদ্ধ না হইতে পারিলে কোন ভাবই নিরূপিত হইতে পারে না, অর্থাৎ তাহার স্পষ্টরূপ প্রতিভান হয় না। সুতরাং আশ্রয় এবং বিষয় একই ভাবের স্বরূপ নিষ্পত্তির প্রথম ও প্রধান উপকরণ। স্বরূপ নিষ্পন্ন হইলে ক্রমবিকাশ সিদ্ধ হইয়া থাকে।

ভাব সমুদ্রে অনন্ত ভাব অভিন্ন রূপে অব্যক্তাবস্থায় বিদ্যমান

রহিয়াছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ ক, খ, গ, ঘ প্রভৃতিকে যদি ভাব বলিয়া ধরা যায় তাহা হইলে ভাব সমুদ্রের মধ্যে পৃথক্ ভাবে ইহাদের কোনটিকেই পাওয়া যাইবে না। যেমন বিশাল মৃৎপিণ্ডে ঘটকে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না অথচ ঘট তাহাতে আছে। দণ্ড চক্রাদি দ্বারা ঐ মৃৎপিণ্ডই যখন ঘটাকারে পরিণত হয় তখন ঐ ঘট দৃষ্টিগোচর হয়। বস্তুতঃ ঐ ঘট পূর্বেও ঐ মৃৎপিণ্ডে অব্যক্ত ভাবে ছিল, কিন্তু নিমিত্ত কারণের দ্বারা অভিব্যক্ত না হওয়া পর্যন্ত উহা অনুভবগোচর হয় নাই। ঠিক সেই প্রকার অব্যাকৃত ভাবসমুদ্রে ক খ গ ঘ প্রভৃতি সকল ভাবই রহিয়াছে কিন্তু কোন ভাবই প্রতীতগোচর হয় না, কারণ উহারা অব্যক্ত। ভাব অভিব্যক্ত হইয়া ক খ প্রভৃতি বিভিন্নরূপ প্রতীতিগোচর হয়। তাহাই ঐ ভাবের উদ্দীপন। সুতরাং উদ্দীপিত না হওয়া পর্য্যন্ত ক খ প্রভৃতি ভাবের পৃথক্ সত্তা গৃহীত হয় না। কিন্তু উদ্দীপনের পর প্রত্যেকটি ভাবই পৃথগ্‌রূপে ফুটিয়া উঠে অর্থাৎ মহাভাব সমুদ্র হইতে পৃথক্ পৃথক্ ভাবধারা আপন আপন বৈশিষ্ট্যে লইয়া ক খ প্রভৃতি রূপে প্রবাহিত হইতে থাকে।

এই প্রসঙ্গে একটি গুহ্যতত্ত্বের অবতারণা আবশ্যক হইয়া পড়িতেছে। সংক্ষেপে তাহার বিবরণ এই। অব্যক্ত মহাসত্তা হইতে সকল খণ্ড সত্তারই উদয় হয়। এক দৃষ্টিতে এই উদয় সাক্ষাৎ ভাবে হয়, অপর দৃষ্টিতে এই উদয় ক্রমিক ভাবে হয়। ইহাই পরম্পরা। এ স্থলেও বিভিন্ন ক্রম সম্ভবপর। প্রথম দৃষ্টিতে মহাসত্তা হইতে ক সাক্ষাদ্‌ভাবে ফোটে, ক, খ, গ, চ, ট সবই সাক্ষাদ্‌ভাবে ব্যক্ত হয়। দ্বিতীয় দৃষ্টিতে ক্রম আছে। দৃষ্টান্ত রূপে বলা যায় অব্যক্ত হইতে ক হয়, ক হইতে খ হয়, খ হইতে গ হয় ইত্যাদি। মূল কারণ অব্যক্ত উভয়ত্র স্বীকৃত। দ্বিতীয় দৃষ্টিটাই জগতে প্রচলিত। কিন্তু প্রথম দৃষ্টিও আছে। প্রথম দৃষ্টি অনুসারে যে কোন খণ্ডভাব মহাভাব হইতে সাক্ষাৎ উদ্‌ভূত, এবং যখন ভাব সংহার হয় তখনও সাক্ষাৎ ভাবে উহার উপসংহার মহাভাবে হয়। দ্বিতীয় দৃষ্টিতে একটি অবরোহ ক্রম আছে —তদ্‌রূপ খণ্ডভাবে হইতে মহাভাবে গতিরও একটি নির্দ্দিষ্ট ক্রম

আছে। বলা বাহুল্য, এই নির্দ্দিষ্ট ক্রমও পৃথক্ পৃথক্ হইতে পারে।

এইখানে প্রশ্ন এই—ভাবেই স্বরূপ সিদ্ধি যে আশ্রয় ও বিষয়ের দ্বারা নিয়মিত হয় তাহাদিগের নিরূপণের জন্য উদ্দীপনের আবশ্যকতা আছে কি না। ইহার উত্তর এই—উদ্দীপন ভাবগত স্বরূপকে প্রতিষ্ঠা করিতে পারে না ইহা মানিতেই হইবে। ইহা শুধু মগ্ন ভাবকে উম্মজ্জিত করিয়া অনুভব পথে আনয়ন করিতে পারে। বস্তুতঃ ভাবের স্বরূপ নিয়ামক আশ্রয় ও বিষয় ভাবের সঙ্গে নিত্যযুক্তই থাকে। উদ্দীপন আশ্রয় অথবা বিষয়ের উপর কোন ক্রিয়া করে না, করিতে পারে না কিন্তু না করিলেও উহার প্রভাবে ভাব অভিব্যক্ত হইলে আপন বৈশিষ্ট্য লইয়াই অভিব্যক্ত হয়। এই বৈশিষ্ট্যের নিয়ামক আশ্রয় এবং বিষয় উভয়ই।

পূর্বোক্ত বিবরণ হইতে বুঝিতে পারা যাইবে যে ভাব যেমন নিত্য তেমনি তাহার বিষয়ও নিত্য। প্রকৃতিক নিয়মে ইহা না হইয়া পারে না। কারণ আশ্রয় ও বিষয় অনিত্য হইলে ভাবের নিত্যতা সম্ভবপর হয় না। কারণ ঐ ক্ষেত্রে মহাভাব সমুদ্রে বিশিষ্ট ভাবের স্থিতি অঙ্গীকার করিবার কোন উপায় থাকে না। উন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে নবীনভাবের উৎপত্তি স্বীকার করিতে হয়। এই ভাবে আশ্রয় ও বিষয়ের অনিত্যতার সঙ্গে সঙ্গেই ভাবের নিত্যতা ভঙ্গ অপরিহার্য্য হইয়া পড়ে। অতএব ভক্তি নিত্য এবং ভক্ত ও ভগবান্‌ও নিত্য। ভক্তির আশ্রয় ভক্ত এবং বিষয় ভগবান্। ভক্তি বা ভাব নিত্য হইলে তাহার স্বরূপ সিদ্ধির জন্য তাহার আশ্রয় রূপী ভক্ত এবং বিষয় রূপী ভগবান্ নিত্য বর্ত্তমান থাকা অবশ্যক।

ভাবের অনন্ত প্রকার সজাতীয় বিজাতীয় ও স্বগত ভেদ আছে বলিয়া ভাবরাজ্যে প্রত্যেকটি বিশিষ্ট ভাবের বিশিষ্ট আশ্রয়ও বিষয়ও নিয়তই রহিয়াছে। ভাব জগতের স্তর বিন্যাস ভাবের ক্রম বিকাশের উপর নির্ভর করে বলিয়া ভক্তের ও তদ্ভাবানুরূপ ভগবানের বৈচিত্র্যও বাস্তবিক পক্ষে অনন্ত।

পূর্বেই বলা হইয়াছে ভাব অনন্ত—সংখ্যায় অনন্ত, জাতিতে

অনন্ত, প্রকৃতিতে অনন্ত এবং আস্বাদনেও অনন্ত। কিন্তু অনন্ত হইলেও সাধক ভাবগ্রাহী শক্তির বিশ্লেষণ করিয়া তদনুসারে ভাব সকলের একটি শ্রেণী বিভাগ করিয়া থাকে। এই শ্রেণী বিভাগ বিভিন্ন দৃষ্টিকেন্দ্র হইতে করা হয় বলিয়া আপাত দৃষ্টিতে ভিন্ন ভিন্ন প্রকার প্রতীয়মান হয়। ইহার কিঞ্চিৎ বিবরণ পরে দেওয়া যাইবে। কিন্তু এই শ্রেণী বিভাগে যেমন ভাবের জাতিগত ভেদ ধরিতে পারা যায় তেমনি উহার প্রকৃতিগত ভেদ অথবা অভিব্যক্তির মাত্রাগত ভেদও ধরা যায়। কিন্তু এই জাতীয় শ্রেণী বিভাগ হইতে ভাবের উৎকর্ষ বা অপকর্ষ নিরূপণ করা চলে না। কারণ আপন আপন ভূমিতে প্রত্যেকটি ভাবই শ্রেষ্ঠ! কোন বিশিষ্ট ভাব হইতে অন্য কোন বিশিষ্ট ভাবের উৎকর্ষ অথবা অপকর্ষ স্বীকার করিবার কোন হেতু নাই। কিন্তু তটস্থ দৃষ্টিতে কোন না কোন সূত্র ধরিয়া ভাবের মধ্যেও একটি ক্রমিক উৎকর্ষের ধারা অবশ্যই আছে বলিতে হইবে। তাহা না হইলে ভাবজগতের ক্রম বিকাশর কোন অর্থ থাকিত না।

যাহার যে ভাব তাহার নিকট তাহাই শ্রেষ্ঠ। ঐ ভাবের বিকাশ হইতেই সে রসতত্ত্ব পর্যান্ত উপনীত হইতে পারে। যদি ঐভাব তাহার প্রকৃতির অনুগত হয় তবে তাহার পক্ষে উহাই রস সাধনার ধারা। অন্যের ধারা তাহার ধারা হইতে পৃথক বলিয়া উহার যে কোন মর্য্যাদা নাই এমন নহে। অন্যের পক্ষে তাহার নিজের ধারাই স্বভাবের ধারা। এই প্রসঙ্গে মনে রাখিতে হইবে প্রত্যেকটি আস্বাদন পৃথক্ হইলেও যে আস্বাদনে অন্য আস্বদেনের বৈশিষ্ট্য অন্তর্ভুক্ত থাকে তাহাই শ্রেষ্ঠ। এই দৃষ্টিতে রসগত তারতম্যও স্বীকার করিতে হয়। বলা বাহুল্য, ইহা তটস্থ দৃষ্টির কথা। কিন্তু তটস্থ হইলেও আস্বাদন শূন্য নহে।

পঞ্চভূতের মধ্যে যেমন আকাশের গুণ শুধু শব্দ কিন্তু বায়ুর গুণ শব্দ ও স্পর্শ। বায়ুর স্পর্শগুণ তাহার নিজস্ব কিন্তু শব্দগুণ উত্তরাধিকার সূত্রে আকাশ হইতে প্রাপ্ত, ঠিক এই প্রকার তেজের রূপ নামক গুণ নিজস্ব কিন্তু শব্দও স্পর্শ পূর্বভূত বায়ু হইতে প্রাপ্ত। এই প্রকার

পৃথিবী পর্যন্ত নামিয়া আসিলে বুঝিতে পারা যায় যে পৃথিবীর স্ব-ধর্ম একমাত্র গন্ধ। কিন্তু রস রূপ স্পর্শ ও শব্দ জলতত্ত্ব হইতে সংক্রান্ত হয়। এইভাবে প্রত্যেকটি ভূতেরই একটি বিশেষ গুণ আছে। কিন্তু অন্যান্য গুণ কারণ হইতে কার্য্যে সঞ্চারিত হইয়া আসে। ঐ গুলি সাধারণ গুণ, বিশেষ গুণ নহে। এই প্রকার ভাব রাজ্যেও ভাব সকল ক্রম বিন্যস্ত ভাবেই অভিব্যক্ত হয়। একটি ভাবের সহিত অন্য ভাবের জাতিগত ও ব্যক্তিগত যতই ভেদ থাকুক, মনে রাখিতে হইবে উভয় ভাবই একই মূল হইতে উৎপন্ন অর্থাৎ অভিব্যক্ত। ভাব রাশির মধ্যে এই ব্যাপ্য ব্যাপক ভাব নির্ণয় করিতে হইলে ভাবের অন্তঃস্থিত কলার পূর্ণতার বিচার অত্যন্ত আবশ্যক। যে ভাবে যতটা কলার বিকাশ সম্ভবপর ততটা বিকাশ সম্পন্ন হইলেই ঐ ভাবের পূর্ণতা হইল বলা চলে। এই ভাবে দেখিতে গেলে ভাব জগতে ভাব সকল উর্দ্ধ এবং অধোরূপে বিন্যস্ত রহিয়াছে ইহা স্বীকার করা আবশ্যক। আত্ম কলার পূর্ণ বিকাশ সম্পন্ন হইলে মহাভাবে স্থিতি লাভ হয়। এই অবস্থায় প্রতিষ্ঠা লাভ না করা পর্য্যন্ত ভাব রাজ্যের উত্থান পতনের সঙ্গে সঙ্গে জীবকেও একবার মহাভাবে প্রবেশ করিতে হয় এবং আর একবার উহা হইতে বহির্গত হইতে হয়। বিকশিত কলার মাত্রানুসারে বিশুদ্ধ ভাব সকলকে উর্দ্ধে এবং অধোভাবে বিন্যস্ত করা হয়। এই জন্যই যদিও স্বরূপতঃ ভাবের তুলনা চলে না তথাপি কলার বিকাশের দিক্ দিয়া উৎকর্ষ এবং অপকর্ষ অবশ্যই বলা চলে।

এই প্রসঙ্গে মনে রাখিতে হইবে যে যে ভাবে সাধনা করে তাহার পক্ষে সেই ভাব ব্যতিরেকে অন্য ভাবের সাধনা, এমন কি তাহার পরিচয় গ্রহণ পর্য্যন্ত, অর্থহীন; এবং চেষ্টা করিলেও এক ভাবের সাধক নিজের গণ্ডী ত্যাগ না করিয়া অন্যভাবের সাধকের গুণ গ্রহণ করিতে সমর্থ হয় না। বস্তুতঃ প্রত্যেকটি ভাব স্বতঃ পূর্ণ বলিয়া এবং প্রত্যেকটি ভাব হইতেই মহাভাবে যাইবার সরল মার্গ রহিয়াছে বলিয়া ভাব হইতে ভাবান্তরে সঞ্চারের কোন প্রসঙ্গই উঠে না। কিন্তু যে জীব সাধন বলে ও ভগবৎ কৃপায় ভাবজগতে স্থান লাভ করিয়াছে

তাহার পক্ষে এ নিয়ম নহে। এক হিসাবে সে স্বীয় প্রকৃতি অনুযায়ী ভাবে নিবদ্ধ থাকিতে বাধ্য। শুধু তাহাই নহে, ঐ নির্দিষ্ট ভাবে থাকিয়াই সে নিজ রস আস্বদন করিতে বাধ্য। উহাই তাহার নিয়তি নির্দিষ্ট ধারা। কিন্তু অন্যদিকে ক্রমবিকাশের ধারা ধরিয়া স্তরবিন্যাস অনুসারে জীবকে নিম্নতম ভাব হইতে ক্রমশঃ উর্দ্ধতর ভাবে আরোহণ করিয়া আত্মকলার বিকাশ সাধন করিতে হয়। ভাবজগতের স্বভাবসিদ্ধ ক্রম এবং এই ক্রমের অনুরূপ মার্গ ইহারই নিকট প্রকাশিত হয়।

আশ্রয় ও বিষয়ের নিত্যতা এবং ভাবের নিত্যতা অনুভবে আরূঢ় হইলে ভাবরাজ্যে নিত্য সিদ্ধ ভক্তের স্থিতি রহস্য কিঞ্চিদ্ উদঘাটিত হইবে। এই সকল নিত্য ভক্ত অনাদিকাল হইতেই ভাবরাজ্যে বিদ্যমান আছেন। বস্তুতঃ ইহারা সকলেই ভাবরাজ্যের অংশস্বরূপ। এই সকল নিত্যভক্ত বিভিন্ন প্রণালী অনুসারে স্ব স্ব প্রকৃতি প্রভৃতি ধর্ম আশ্রয় করিয়া বিভিন্ন প্রকার যুথ অথবা গণ অথবা ঐ প্রকার কোন সমুদায় বা সঙ্ঘ আকারে বর্ত্তমান। এই সকল ভক্ত ব্যষ্টিভাবে যেমন অনন্ত তেমনি তাঁহাদের সংঘ প্রভৃতিও অনন্ত। প্রতি স্তরেই ঐ একই কথা। কিন্তু ভাবরাজ্য শুধু এই সকল নিত্য ভক্তের দ্বারা গঠিত নহে। ভাব রাজ্যের বাহির হইতে অসংখ্য জীবরূপী সুকৃতিসম্পন্ন চিদণু মায়াপাশ হইতে মুক্ত হইয়া সময় সময় নিত্য সিদ্ধ ভাবের আশ্রয় প্রাপ্ত হইয়া ভাবরাজ্যে প্রবেশ করিয়া থাকে। ইহারা ভাবরাজ্যে আগন্তুক অতিথি। এই সকল জীব যে ভাব অর্থাৎ স্বভাবকে আশ্রয় করিয়া ভাবরাজ্যে প্রবেশ লাভ করে চিরকাল তাহাতে নিবদ্ধ থাকে। অথবা ভাবের ক্রমবিকাশের ফলে আপন আপন ভাবে পূর্ণতা লাভ করিলে স্বভাবতঃই ইহার পরবর্ত্তী অর্থাৎ উর্দ্ধদেশবর্ত্তী অর্থাৎ অধিকতর মাত্রাতে বিকাশসম্পন্ন ভাবে সঞ্চার-লাভ করে। ইহাই ইহাদের ভাবগত ক্রমিক উৎকর্য। ভাব হইতে মহাভাব পর্য্যন্ত ক্রমবিকাশের পথ বিস্তৃত রহিয়াছে। ঐ মুক্ত পথ ধরিয়াই আগন্তুক জীব মাত্র ভাব হইতে ভাবান্তরে সংক্রমণ করে।

সূর্য্য যেমন একরাশি ভোগ করিয়া তদনন্তর অন্য রাশিতে সংক্রান্ত হয় এবং দ্বিতীয় রাশি ভোগ করিয়া তৎপরবর্ত্তী অন্য রাশিতে আরোহণ করে ঠিক সেই প্রকার ভাবমার্গের পথিক ভাবের সাধনা পূর্ণ হইলেই তৎপরবর্ত্তী অন্যভাবের সাধনায় প্রবিষ্ট হয়। ইহা বৃত্তাকার গতি। ইহার পর সরল গতিতে মহাভাব পর্য্যন্ত পৌঁছিতে না পারা পর্য্যন্ত এই নিয়ম অব্যাহত থাকে।

কিন্তু সকলেই যে মহাভাব পর্য্যন্ত পৌঁছিবে এমন কোন কথা নাই। কারণ মহাভাব পর্য্যন্ত পৌঁছিবার স্বরূপ যোগ্যতা প্রত্যেকটি ভাবে নিহিত আছে ইহা সত্য হইলেও কার্য্যক্ষেত্রে তাহা অনেক সময় দৃষ্ট হয় না। যাহার যে প্রকার রতি তাহার গতি ও স্থিতিও ঠিক তাহারই অনুরূপ। কোনও ভাব প্রেম পর্য্যন্ত রূপান্তর লাভ করে এবং ঐখানেই স্থিত হইয়া স্বীয় যোগ্যতানুসারে রসের আস্বাদন করে। কোন ভাব স্নেহ পর্য্যন্ত, কোনটি প্রণয়, কোনটি অনুরাগ এবং মহাভাব পর্য্যন্ত উত্থিত হইতে সমর্থ হয়। ভাবের প্রকৃতি নিহিত সামর্থ্য হইতেই এইরূপ ঊর্দ্ধগতি ও বিকাশ নিয়ন্ত্রিত হয়।

—ঃ০ঃ—

৫

শক্তি—ধাম—লীলা—ভাব (ঘ)

ভাবসকল সংবেগ অথবা গুণগত বৈশিষ্ট্যবশতঃ মহাভাবের নৈকট্য অথবা ব্যবধানের তারতম্যানুসারে বাহ্য অথবা আন্তর রূপে নির্দিষ্ট হয় অর্থাৎ যে ভাব মহাভাবের যত নিকটবর্ত্তী তাহা ততটা অন্তরঙ্গ এবং যাহা মহাভাব হইতে অধিকতর ব্যবহিত তাহা পূর্বোক্ত ভাবের তুলনায় বহিরঙ্গ। এই অন্তরঙ্গ ভাব ও বহিরঙ্গ ভাব আপেক্ষিক। সমগ্র ভাবজগৎ মহাভাবেরই আত্মপ্রকাশ একথা পূর্বেই বলা হইয়াছে। মহাভাব ও মহারসের সংঘর্ষণের ফলে মহাভাবকে বেষ্টন করিয়া যে আলোক প্রকাশিত হয় তাহাতেই মহাভাবরূপী বিন্দু হইতে স্তরে স্তরে ভাবরাজ্য গঠিত হইয়া উঠে। বিন্দুকে পরিবেষ্টিত করিয়া একটি স্তর সর্বপ্রথম প্রকাশিত হয়। এই প্রথম স্তরকে বেষ্টন করিয়া তাহার বাহ্য প্রদেশে আর একটি স্তর আত্মপ্রকাশ করে। প্রতি স্তরের কেন্দ্রে ঐ একই বিন্দু বিদ্যমান থাকে। এই প্রকারে বুঝিতে পারা যাইবে যে এক মহাভাব রূপী বিন্দু হইতেই পরপর বিভিন্ন ভাবস্তরের আবির্ভাব হয়। এই ব্যাপারটি ঠিক একটি মুকুলিত কমল কোরকের উন্মীলিত হওয়ার অনুরূপ। কমলটি বিকশিত হইলে দেখিতে পাওয়া যায় মধ্যস্থ কর্ণিকাকে বেষ্টন করিয়া পর পর বিভিন্ন স্তর অর্থাৎ দল-সমষ্টি বিদ্যমান রহিয়াছে। এই দৃষ্টান্ত হইতে ভাব সকলের পরস্পর সম্বন্ধ এবং মহাভাবের সহিত সম্বন্ধ বুঝিতে পারা যাইবে। কমলের এক একটি দল যদি এক একটি ভাবের প্রতিনিধি হয় তাহা হইলে দল সমষ্টিরূপ এক একটি স্তর এক একটি জাতীয় ভাবের প্রতিরূপক বলিয়া গ্রহণ করিতে পারা যায়। যে সকল দল কর্ণিকার অধিকতর সন্নিহিত তাহারা মহাভাব পর্য্যন্ত বিকাশ অপেক্ষাকৃত অল্প সময়ে সম্পন্ন করিবে। দূরবর্ত্তী দলসমষ্টির পূর্ণ বিকাশ সাধনে অধিকতর কাল বিলম্ব আবশ্যক। ইহাই সাধারণ নিয়ম।

সেনা-রচনাতে যেমন ব্যূহ নির্মাণ আবশ্যক তদ্রূপ ভাবরাজ্যের সংগঠনেও ব্যূহ সন্নিবেশের প্রয়োজন আছে। কর্ণিকার চারিদিক-কার স্তরগুলি বস্তুতঃ মহাভাবেরই কায়ব্যূহ তাহাতে সন্দেহ নাই। যে সকল দল ক্রমবদ্ধ ভাবে কর্ণিকাতে বিলীন ছিল বহির্মুখ স্পন্দনের সঙ্গে সঙ্গে উহারা নিজ নিজ স্থানে স্থিত হইয়া প্রকাশিত হয়।

পূর্বেই বলা হইয়াছে প্রতি ভাব হইতেই রসাস্বাদনের উপায় প্রাপ্ত হওয়া যায়। কারণ প্রত্যেকটি ভাব, উহা যে স্তরেই হউক না কেন, পূর্ণ হইলে মহাভাবেরই অঙ্গ রূপে স্থিতি লাভ করে। সুতরাং স্বীয় ভাবানুরূপ রসের আস্বাদন সে অবশ্যই প্রাপ্ত হয়। কিন্তু এই রসাস্বাদনকে রসরাজের পূর্ণতম আস্বাদন বলিয়া গ্রহণ করা চলে না। ভাবের বিকাশ পূর্ণ হইলেও তাহা কোন বিশিষ্ট জাতীয় ভাবের বিকাশ বলিয়াই মনে করিতে হইবে। সুতরাং অপেক্ষাকৃত উৎকর্ষ সম্পন্ন ভাবান্তরের বিকাশের প্রয়োজনীয়তা তখনও থাকিয়া যায়। চতুর্থ শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করিলেই যে সব হইল এমন নহে। পঞ্চম শ্রেণীর জ্ঞান লাভের প্রয়োজনীয়তা তখনও থাকে। ঠিক এই প্রকার ভাব সাধক একটি ভাব হইতে আর একটি ভাবে উন্নীত হইয়া থাকে। এই প্রকারে ভাব জগতের প্রত্যেকটি স্তর অতিক্রান্ত হইলে সাধক স্বয়ং মহাভাব রূপে পরিণত হয়। তখন ভাবরাজ্যের পূর্ণ বিকাশ সম্পূর্ণ হইয়া যায়। এই অবস্থায় রসরাজের পূর্ণতম আস্বাদন লাভ করা চলে। প্রকারান্তরে বলা যাইতে পারে এক একটি ভাব সাধনা পূর্ণ হইলে অখণ্ড মহাভাবের এক একটি বিশিষ্ট অঙ্গ রচিত হয় এবং অভিব্যক্ত হয়। যখন সকল ভাবের সাধনাই সম্পূর্ণ হইয়া যায় তখন সর্বাঙ্গ সম্পন্ন মহাভাবের আকার আবির্ভূত হয়। এইখানেই ভাব রাজ্যের ক্রমবিকাশ সিদ্ধ হইয়া থাকে। এই পর্য্যন্ত সম্পন্ন হইলে ভাবরাজ্যের লীলার পুনরাবর্ত্তন পূর্বোক্ত সাধক জীবের পক্ষে আবশ্যক হয় না। তখন তাহার নিকুঞ্জ লীলায় প্রবেশ হয়। সমগ্র

ভাব জগৎ রাধাতত্ত্বে অধিষ্ঠিত ঐ সাধকের অঙ্গীভূত হইয়া পড়িয়া থাকে।

পূর্বেই অনন্ত ভাবের কথা বলা হইয়াছে। ভাব যেমন অনন্ত তেমনি প্রত্যেক ভাবের বৃত্তি অনুবৃত্তি এবং উপবৃত্তি প্রভৃতিও অনন্ত অন্তর্মুখগতিতে অনুবৃত্তি উপবৃত্তিতে পরিণত হয়, উপবৃত্তি বৃত্তিতে পরিণত হয় এবং বৃত্তি ভাবে পরিণত হয়। তখন বাহ্যবৃত্তিহীন হওয়ার দরুণ ভাব তীব্র বেগে অন্তর্মুখ প্রবাহে চলিতে চলিতে মহাভাবের দিকে অগ্রসর হইতে থাকে।

একটি বৃক্ষ হইতে যেমন শাখা নির্গত হয়। আবার প্রত্যেকটি শাখা হইতে যেমন প্রশাখা বাহির হইয়া থাকে ঠিক সেই প্রকার যে কোন ভাব একাগ্র অবস্থায় প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্য্যন্ত চারিদিকে বিক্ষিপ্ত থাকে। প্রদীপ হইতে যেমন কিরণ বিকীর্ণ হয় সেই প্রকার প্রত্যেকটি ভাব হইতে কিরণবৎ যে সকল ধারা বিকীর্ণ হয় তাহাই ঐ বৃত্তি। উহা ঠিক ভাব নহে, তাহার আভাস মাত্র। কোনও স্বচ্ছ আধারে সূর্য্যের আলোক প্রতিফলিত হইলে যেমন উহা হইতে ঐ আলোক পুনর্বার প্রতিফলিত হইয়া থাকে ঠিক সেই প্রকার বাহ্য-উন্মুখ ভাব নিবৃত্ত না হওয়া পর্য্যন্ত প্রত্যেকটি ভাব ও চারিদিকে বৃত্তিরূপে ছড়াইয়া থাকে। ভাবগত বৈশিষ্ট্য ঐ সকল বৃত্তিতেও থাকে। তবে উহাতে তীব্রতা কম। ঐ সকল বৃত্তি হইতে পুনর্বার সূক্ষ্মতম বৃত্ত্যন্তরের উদগম হয়। অত্যন্ত সূক্ষ্ম-দর্শী ভিন্ন সাধারণ মানুষের বুদ্ধিতে ঐ সকল সূক্ষ্ম বৃত্তি ধরা পড়ে না।

এইভাবে কতদূর পর্য্যন্ত যে বহিঃপ্রসার ব্যাপ্ত হইতে পারে তাহা বলা যায় না। বৃত্তি, অনুবৃত্তি, উপবৃত্তি প্রভৃতি উপলক্ষণ মাত্র। সাধকের প্রথম কর্ত্তব্য এই সকল ছড়ান কিরণরাশিকে গুটাইয়া লইয়া, উহাদিগকে পুনর্বার গুটাইয়া লইয়া এবং পুনঃ পুনঃ এইরূপ করিয়া মূলভাবে স্থিতি লাভ করা। যতক্ষণ ভাব বৃত্তিহীন না হয় ততক্ষণ উহা বিশুদ্ধ হইতে পারে না। ভাব সাধনার পক্ষে ভাবশুদ্ধি একান্ত আবশ্যক। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যাইতে পারে যদি কোন সাধক

বাৎসল্য ভাবের সাধনা করে তাহা হইলে যতক্ষণ তাহার ভাব বিশুদ্ধ বাৎসল্যরূপে পরিণত না হইবে ততক্ষণ উহা বিশুদ্ধ ভাবরূপে পরিগণিত হইবার যোগ্য নহে। বাৎসল্যভাব বিক্ষিপ্ত থাকিলে উহার সঙ্গে দাস্য বা সখ্য প্রভৃতি ভাব আভাসরূপে মিশ্রিত হইতে পারে এবং হইয়াও থাকে। লৌকিক সাধক ইহাকে ভাল মনে করিলেও বিশুদ্ধ ভাবসাধক এই মিশ্রণ ব্যাপারকে ভাব সাধনার অন্তরায় বলিয়া মনে করে। একনিষ্ঠতা ব্যতীত ভাব সিদ্ধ হইতে পারে না এবং ভাব সিদ্ধ না হইলে রসাস্বাদন সুদূর পরাহত। সুতরাং ভাবসাধনার দ্বারা রসসিদ্ধির পক্ষে ভাব শুদ্ধি আবশ্যক। ভাব শুদ্ধ না হইলে, ভাবে অবান্তর ভাব মিশ্র থাকিলে, উহাতে বলাধান হয় না। যাঁহারা ভাবুক এবং রসিক তাঁহারা এই জাতীয় ভাবকে স্বচ্ছ ভাব বলিয়া মনে করিয়া থাকেন। ইহা ভাবের বিকলতা নিবন্ধন হইয়া থাকে। দর্পণ স্বীয় ধর্ম স্বচ্ছতা বশতঃ সন্নিহিত সকল বস্তুকেই যথাবৎ গ্রহণ করিয়া থাকে। কোন বস্তু বিশেষের প্রতি তাহার আগ্রহ থাকে না। দর্পণের নিকট নীল অথবা পীত ত্রিকোণ অথবা চতুষ্কোণ একই কথা। যখন যে বস্তু উহার সন্নিহিত হয় তখনই ঐ বস্তু অবাধিত ভাবে উহাতে প্রতিবিম্বিত হয়। দর্পণ স্বচ্ছ বলিয়াই ঐরূপ হইয়া থাকে। ভাবরূপী চিত্ত যখন স্বচ্ছ থাকে তখনও উহা এইরূপই হইয়া থাকে। যখন যেরূপ সংসর্গ লাভ হয় উহাতে তখন সেইরূপ ভাবই প্রতিফলিত হইয়া থাকে। উহা কোন বিশিষ্ট ভাবে অভিনিবিষ্ট থাকে না। এই প্রকার চিত্তে বাৎসল্য প্রভৃতি কোন ভাবই স্থায়ী হইয়া থাকিতে পারে না! চিত্ত স্বচ্ছ বলিয়া বাৎসল্য ভাবের সঙ্গ বশতঃ বা আলোচনা নিবন্ধন উহাতে বাৎসল্য ভাবের উদয় হয়। দেশান্তরে বা কালান্তরে দাস্য ভাবের সঙ্গ এবং চর্চা হইলে ঐ চিত্তে দাস্য ভাবেরই আবির্ভাব হইয়া থাকে। এইরূপ অন্যান্য ভাব সম্বন্ধেও বুঝিতে হইবে। এই জাতীয় চিত্ত অত্যন্ত শিথিল এবং দুর্বল, কারণ ইহায় একনিষ্ঠা নাই। ব্যভিচারী ভাব এবং স্থায়ী ভাব উভয়ের মধ্যে ইহাই পার্থক্য যে স্থায়ীভাব হইতে রসেরউৎপত্তি হয়। এবং ব্যভিচারী ভাব হইত

তাহা হয় না। এইজন্য চিত্ত একভাবনিষ্ঠ না হইতে পারিলে মহাভাবের প্রাপ্তি এবং রসাস্বাদ নিতান্তই অসম্ভব। যাহার যেটা আপন ভাব বা স্বভাব তাহাতে নিষ্ঠা রাখিতে হইবে, এবং এই নিষ্ঠার সম্যক্‌সিদ্ধির জন্য ভাবান্তরের আক্রমণ হইতে তাহাকে বাঁচাইয়া রাখিতে হইবে। বলা বাহুল্য ইহাতে রাগদ্বেষের কোন ব্যাপার নাই। আপনাপন স্বভাবে অকম্প স্থিতিলাভ করাই ইহার উদ্দেশ্য। ভাব সাধনার উদ্দেশ্য আকার সিদ্ধি, কিন্তু স্বচ্ছ চিত্তে আকার প্রতি-বিম্বিত হইয়াও স্থির থাকে না। যাহাতে কোন নির্দ্দিষ্ট আকার প্রতিবিম্বিত হইয়া স্থিরভাবে বিদ্যমান থাকে এবং ঐ আকার অন্য কোন আকারের দ্বারা মিশ্রিত না হয় সর্বপ্রথম ইহাই কর্ত্তব্য। বৃত্তি অনুবৃত্তি উপবৃত্তি প্রভৃতি ভাব নিঃসৃত কিরণমালা নিরুদ্ধ হইলে ভাবের বহির্মুখ গতি থাকে না বলিয়া উহার সহিত অন্যভাবের মিশ্রণের সম্ভাবনাও থাকে না। তখন স্বভাব স্বভাবই থাকে। এই দৃঢ়ভূমি হইতেই ভাবসাধনার সূত্রপাত হয়। যোগীর পক্ষে একাগ্রতার যে স্থান রস সাধনায় ভাবশুদ্ধির সেই স্থান। ভাব শুদ্ধ হইলেই সিদ্ধ হয় এবং এক হইলেই স্থির হয়। ভাব স্থির হইলেই উপযুক্ত অভিব্যঞ্জক সামগ্রীর প্রভাবে সহৃদয় কর্ত্তৃক তাহার আস্বাদন হয়। ইহাই রস নিষ্পত্তি।

ভাবরাজ্যের গঠন সম্বন্ধে কিছু বলিবার পূর্বে রাজ্য রচনার সাধারণ নীতি সম্বন্ধে দুই একটি কথা বলা আবশ্যক। জগতে গ্রাম নগর অথবা প্রাসাদ প্রভৃতি সন্নিবেশ করিতে হইলে সর্বপ্রথম ভূমি আবশ্যক যাহার উপরে সন্নিবেশ করিতে হইবে, তাহার পর যাবতীয় সামগ্রী সম্ভার এবং উপাদান আবশ্যক যাহা সংকল্পিত আকারে নগরাদি রূপে পরিণত হইবে। সর্বশেষে ভাবের সত্তা আবশ্যক যাহা উপাদানের সহিত যুক্ত হইয়া উপাদানকে অভিলষিত কার্য্য রূপে পরিণত করিবে। ভাবরাজ্য রচনাতেও সামান্যতঃ এই নীতি অনুসৃত হইয়া থাকে—জাগতিক রচনায় যাহা ভিত্তি বা ভূমি ভাব-রাজ্যের রচনায় তৎস্থানাপন্ন ভাবলোক যাহা মহাভাব হইতে নিরন্তর

নিঃসৃত হইয়া মহাভাবকে বেষ্টন করিয়া বর্ত্তমান রহিয়াছে। অর্থাৎ মহাভাব যেন একটি বিন্দু। এই বিন্দুটি নিরন্তর স্পন্দিত হওয়ার দরুণ একটি নিত্য প্রভামণ্ডল ইহার চারিদিকে অভিব্যক্ত হইয়া রহিয়াছে। এই প্রভামণ্ডলই ভবিষ্যৎ ভাবরাজ্যের ভিত্তিস্বরূপ। যে উপাদান হইতে ভাবরাজ্যের অনন্ত বৈচিত্র্য সম্পন্ন দেহ ও দৃশ্যাবলী রচিত হয় তাহার নাম বিশুদ্ধ সত্ত্ব। ইহা নিত্য সিদ্ধ বস্তু এবং বিক্ষুব্ধ হওয়ার পূর্বাবস্থায় ইহা মহাভাবরূপী মহাবিন্দুর সহিত অভিন্নরূপেই বর্ত্তমান থাক। এই বিশুদ্ধ সত্ত্বই ক্ষুব্ধ হইয়া ভাবজগতের বিভিন্ন দৃশ্যরূপে পরিণত হয়। মায়িক জগতে যাহা কিছু আছে ভাবজগতে তাহার সবই বিদ্যমান রহিয়াছে। এক হিসাবে বলিতে গেলে বলা যায় প্রাকৃতিক সকল তত্ত্বই অপ্রাকৃত জগতে নিত্য বিদ্যমান। ভেদ শুধু ইহাই যে প্রাকৃত তত্ত্ব সকল মলিন এবং রজস্তমোগুণবিশিষ্ট, কিন্তু অপ্রাকৃত তত্ত্বসকল সর্বাংশে প্রাকৃতিক তত্ত্বের অনুরূপ হইলেও রজস্ত-মোগুণহীন বিশুদ্ধ সত্ত্বময় ও নির্ম্মল। এই সকল তত্ত্বের সমষ্টি শুদ্ধ সত্ত্বরূপে সদা বিদ্যমান। শুধু তাহাই নহে। উপাদান থাকিলেই তাহা হইতে কার্য্য উদ্ভূত হয় না যদি উহা নিমিত্তের প্রভাবে পরিণাম প্রাপ্ত না হয়। তদ্রূপ শুদ্ধ সত্ত্বময় তত্ত্বরাজি তখনই বিভিন্নাকারে পরিণাম প্রাপ্ত হইতে পারে যখন উহা ঐ পরিণামের উপযোগী নিমিত্তের দ্বারা ক্ষুব্ধ হয়। এই নিমিত্তই ভাব। ভাবই উপাদানে আকার সমর্পণ করে। ভাবের সহিত উপাদানের যোগ হইলে উপাদান ভাবানুরূপ আকার ধারণ করে। ভাব নিত্য, উপাদানও নিত্য। উভয়ের সম্বন্ধ হইতে লীলা বৈচিত্র্যের অভিব্যক্তি হইয়া থাকে। এই সম্বন্ধের অধিষ্ঠাত্রী শক্তি যোগমায়া। অনন্ত ভাব মহাভাবে নিত্য বর্ত্তমান। শুদ্ধ সত্ত্বও ঐ মহাভাবের সহিত অভিন্নরূপে বর্ত্তমান। কিন্তু যতক্ষণ মহাভাব ক্ষুব্ধ না হয়। ততক্ষণ ভাবের সহিত শুদ্ধ সত্ত্বময় উপাদানের সংঘর্ষ হয় না, এবং এই সংঘর্ষ ব্যতিরেকে ভাবরাজ্যের রচনা অসম্ভব।

ঊর্ণনাভি যেমন নিজেকে কেন্দ্র স্থানে রক্ষা করিয়া চারিদিকে

জাল বিস্তার করে মহাভাবও তেমনি নিজেকে কেন্দ্রস্থ বিন্দুরূপে রক্ষা করিয়া চারিদিকে স্তরে স্তরে ভাবময় সৃষ্টির আবির্ভাব করে। শুদ্ধ ভাব সূক্ষ্ম এবং অব্যক্ত। ভাবহীন শুদ্ধ সত্ত্বও তদ্রূপ অব্যক্ত। কিন্তু উভয়ের মিলনে অনন্ত সৌন্দর্য্য সম্পন্ন দিব্য জগতের উদ্ভব হয়।

তত্ত্ব সৃষ্টি এবং তত্ত্ব সমষ্টির বিভিন্ন একার সন্নিবেশ নিবন্ধন বিচিত্র জগতের সৃষ্টি, এই উভয় সৃষ্টি একপ্রকার নহে। ঠিক সেই প্রকার ভাবের ক্রমিক আবির্ভাব এবং উপাদান সংযোগে ঐ সকল ভাবের সাকারত্ব সম্পাদন এক জিনিষ নহে। এই দুইটি ধারা পৃথক্ পৃথক্ ভাবে আলোচনা যোগ্য।

মহাভাব হইতে ভাবরাজ্যের উন্মেষের সময় সর্বপ্রথম যে ভাবের স্ফূর্ত্তি হয় তাহাই মধুর ভাব। তদনন্তর ক্রমবদ্ধ ভাবে বাৎসল্য, সখ্য দাস্য এবং শান্ত ভাব স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হয়। প্রত্যেকটি ভাবের মধ্যে অবান্তর ভেদও যে না আছে এমন নহে! ইহাই ভাবের আবির্ভাবের ধারা। কিন্তু এই সকল বিভিন্ন প্রকার ভাবের মধ্যে যে গুহ্য কলার বিকাশ রহস্য নিহিত রহিয়াছে তাহা বিশেষ রূপে প্রণিধান যোগ্য। এই কলার আবির্ভাবের দিক্ হইতে দেখিতে গেলে বুঝিতে পার যাইবে যে বিভিন্ন প্রকার ভাবের মধ্য দিয়া একই ভগবৎ বৃত্তির ক্রমোৎকর্ষ জনিত বিকাশ সিদ্ধ হয়। বলা বাহুল্য, ভাব রাজ্যের সৃষ্টির সময় এই বিকাশের দিক্‌টা বিপরীত দিক হইতে প্রকাশ পায় অর্থাৎ যেটি মহাভাবের অধিরূঢ় অবস্থার অন্তর্গত মাদনভাব তাহাই ভাব রাজ্যের কেন্দ্রস্থলে বিদ্যমান থাকে। তাহার বাহিরে পর পর মোদন ভাব (অধিরূঢ়) এবং রূঢ় মহাভাব প্রকাশিত হয়। ইহাই বাহিরে অনুরাগ, তারপর রাগ, মান, স্নেহ, প্রণয়, প্রেম এবং রতি। এইগুলির বিশেষ পরিচয় প্রেম ভক্তির ক্রম বিকাশের বর্ণনা প্রসঙ্গে অন্তর্মুখ ধারার বিবরণ উপলক্ষে দেওয়া যাইবে। এই যে মধুর ভাবের অন্তরঙ্গ মণ্ডলের কথা উল্লেখ করা হইলে ইহার মধ্যেও মহা-ভাবের বহির্মুখ আবির্ভাবের দিক্ হইতে এক একটি ক্রম বিদ্যমান

রহিয়াছে ! দৃষ্টান্ত স্বরূপ সখী বর্গের শ্রেণী বিভাগের কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। মহাভাবকে বেষ্টন করিয়া পর পর পাঁচটি মণ্ডল বিদ্যমান রহিয়াছে। এই পাঁচটি মণ্ডল পঞ্চবিধ সখীর নামে পরিচিত। মহাভাবের অব্যবহিত নিকটতম মণ্ডলে যে আটজন সখী প্রকটিত হন তাঁহারা পরম শ্রেষ্ঠ সখী নামে অভিহিত। ইঁহারা সকলেই শ্রীরাধার কায়ব্যূহ। অন্যান্য সখী মণ্ডল সম্বন্ধেও ঐ একই সিদ্ধান্ত জানিতে হইবে। পরম শ্রেষ্ঠ সখীর বাহ্য প্রদেশে যে সকল সখীর স্থিতি তাঁহাদের নাম প্রিয় সখী। প্রিয় সখীর বাহ্য প্রদেশে পর পর প্রাণ সখী, নিত্যসখী এবং সখী মণ্ডলের সন্নিবেশ জানিতে হইবে। এইরূপ অন্যান্য স্থানেও অবান্তর বিভাগ রহিয়াছে। এই সকল বিভাগের মূলে মহাভাবের সহিত সখী প্রভৃতি ভাববর্গের সাদৃশ্যগত তারতম্য নিহিত রহিয়াছে।

ভাবরাজ্যে দুই প্রকার অধিবাসী দৃষ্টিগোচর হয়। এক শ্রেণী নিত্য সিদ্ধ ভাব রূপী ও আর এক শ্রেণী সাধন সিদ্ধ অথবা কৃপাসিদ্ধ ভাবরূপী। যে সকল ভাব নিত্য সিদ্ধ তাহারা স্বভাবিক, আগন্তুক নহে। কারণ তাঁহারা মহাভাব অথবা স্বরূপ শক্তিরই অংশ। স্বরূপ শক্তির স্বাংশরূপী এই সকল ভাবরাজী মহাভাব ক্ষুব্ধ হওয়ার পর আনুপূর্বিক ভাবে ক্রমশঃ মহাভাব হইতে নির্গত হইয়া থাকে। এইগুলি সবই বাস্তবিক পক্ষে স্বভাবাত্মক কিন্তু আর এক শ্রেণীর ভাব আছে তাহা স্বভাবসিদ্ধ নহে। কিন্তু হয় সাধনসিদ্ধ অথবা কৃপাসিদ্ধ। মায়িক জগতে অনাদি কাল হইতে যে সকল ভগবৎ বহির্মুখ জীব স্ব স্ব কর্মানুসারে বিভিন্ন যোনিতে ভ্রমণ করিতেছে তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ ভোগ্য ভাব অথবা ভগবদ্‌বিষয়িণী রতি প্রাপ্ত হইয়া ভাব-রাজ্যে প্রবেশাধিকার লাভ করিয়া থাকে। এই ভাব অথবা রতি সাধনা দ্বারাই যে প্রাপ্ত হইতে হইবে এমন কোন কথা নাই, কাহারও কাহারও কৃপা হইতে ইহার প্রাপ্তি হইয়া থাকে। ভগবৎ কৃপা এবং ভগবৎ ভক্তের কৃপা মূলতঃ একই পদার্থ। যে কৃপা বশতঃ ভাব প্রাপ্ত হয় তাহাকে সাধনা করিতে হয় না। তবে জন্মান্তরের সাধনা তাহার

ছিল কিনা এবং এই তথাকথিত কৃপার অভিব্যক্তি ঐ সাধনারই ফল কিনা এই প্রসঙ্গে তাহা আলোচ্য নহে!

ভাব লাভের সাধারণ নিয়ম এই যে বিধিমার্গেই হউক অথবা রাগ মার্গেই হউক সাধনার অনুষ্ঠান করিতে হইবে। এই সাধনা বস্তুতঃ সাধনভক্তির অনুষ্ঠান। শাস্ত্রের অনুশাসন অনুসারে অথবা গুরুর আজ্ঞানুসারে কর্ত্তব্য বোধে কেহ কেহ সাধন করিয়া থাকেন। পক্ষান্তরে কেহ কেহ শাস্ত্র গুরু বা মহাজন বাক্য দ্বারা চালিত না হইয়া আপন হৃদয়ের প্রেরণাতে সাধনায় প্রবৃত্ত হন। ইঁহারা ভাব জগতের আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া উহারই অনুকরণ-রূপে সাধন কার্যে অগ্রসর হন। কিন্তু সাধনা যে প্রকারেই হউক না কেন ভক্তি সাধনার ফল ভাবের উদয়। ভাবের উদয় না হওয়া পর্য্যন্ত সাধনা পূর্ণ হয় না। ভাবের উদয় হইলেই, অর্থাৎ সাধনা সিদ্ধাবস্থায় উপনীত হইলেই ভাবরাজ্যে স্থানলাভ হয়। শুধু তাহাই নহে কাহার কোন ভাব ইহা ও সিদ্ধাবস্থার সঙ্গে-সঙ্গেই ভক্তের নিকট ফুটিয়া উঠে। কে কোন ভাবে অথবা কোন মণ্ডলে স্থান প্রাপ্ত হইল তাহার প্রকৃত সন্ধান ভাবের বিকাশ না হওয়া পর্য্যন্ত পাওয়া যায় না, তবে সদ্‌গুরু গভীর অন্তর্দৃষ্টি দ্বারা শিষ্যের ভাবময় স্বরূপ দেখিতে পান বলিয়া উহার স্বভাবের অনুকূল রাগানুগা সাধনাপ্রণালী উহাকে উপদেশ করেন। বলা বাহুল্য, এই সাধনা কৃত্রিম, এবং ইহার রহস্য যথার্থ ভক্ত সাধক ভিন্ন অন্য কেহ ধারণ করিতে পারে না।

ভাবের বিকাশ হইলেই আভ্যন্তরীণ সত্তা ভাব জগতের সত্তারূপে পরিণত হয় বলিয়া রাগানুগা সাধন বস্তুতঃ রাগাত্মিকা সাধন প্রণালীর অনুরূপই হইয়া থাকে।

ভাবের বিকাশের মধ্যে একটি অদ্ভুত রহস্য নিহিত রহিয়াছে। তাহা এই—যেমন সূর্যের উদয় না হওয়া পর্য্যন্ত সূর্য্য কিরণ থাকে না বলিয়া উহার বিভিন্ন বর্ণ উপলব্ধিগোচর হয় না, কিন্তু সূর্য্যের উদয় হইলে প্রত্যেক স্থানের বর্ণই যথাবদরূপে প্রতিভাত হইয়া থাকে—সেইরূপ যখন ভাবের বিকাশ হয় তখন আধারগত বৈচিত্র্য

ঐ বিকশিত ভাবকে স্পর্শ করিয়া থাকে। এই স্পর্শের ফলে ভাবগত বৈচিত্র্য সিদ্ধ হইয়া থাকে। অতএব নরদেহে ভাবের বিকাশ পর্যান্ত নিষ্পন্ন হইলে ভাবদেহের বিশিষ্ট প্রকৃতিও জাগিয়া উঠে। অর্থাৎ সাধন ভক্তির পরিসমাপ্তির ফলে যখন কাহারও ভাব ভক্তির উদয় হয় তখন ঐ ভাব কোন্ শ্রেণীর অন্তর্গত হইবে অর্থাৎ শান্ত, দাস্য, সখ্য, প্রভৃতি কোন্ বর্গে ঐ ভাব স্থানলাভ করিবে তাহাও নিরূপিত হয়। অর্থাৎ প্রকৃতিগত বৈচিত্র্য হইতেই কোন সাধক সাধন ভক্তির পরিসমাপ্তিকালে শান্ত ভক্তিলাভ করিয়া থাকে। কেহ বা দাস্য, কেহ বা সখ্য, কেহ বা বাৎসল্য এবং অপর কেহ বা মাধুর্য্য লাভ করিয়া থাকে। এই সবগুলিই ভাবভক্তির অন্তর্গত।

রাগানুগা ভক্তি স্থলে রাগ বিশেষের অনুকরণ করিয়া ভাব বৈচিত্র্য সিদ্ধ হইতে পারে। কিন্তু বৈধীভক্তি স্থলে সেরূপ কোন হেতু দেখা যায় না। সুতরাং—জীবের প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্যই বাস্তবিক পক্ষে ভাব ভেদের নিয়ামক। ইহা স্বীকার না করিলে কোন বিশিষ্ট ভাবের প্রতি আকর্ষণ অমূলক হইয়া পড়ে। সিদ্ধ গুরুর অভাবস্থলে মায়িক জগতের অবস্থায় যে প্রকৃতি লক্ষিত হয় তাহাকে অবলম্বন করিয়া রাগানুগা ভাবসাধনার ব্যবস্থা হইয়া থাকে। কিন্তু ইহা যে কৃত্রিম তাহাতে সন্দেহ নাই। যদি ভাগ্য ক্রমে ইহা কোন কোন স্থলে সত্যও হয় তথাপি তাহা কাকতালীয় ন্যায়েই বুঝিতে হইবে। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে সদ্‌গুরু অন্তঃপ্রকৃতি লক্ষ্য করিয়াই তাহার ভাবের সহিত পরিচিত হইয়া তদনুরূপ রাগানুগা সাধন প্রণালী নির্দেশ করিয়া থাকেন।

যে কোন প্রকারেই হউক ভাবের স্থিতি হইলে ভাবজগতে আসন প্রাপ্ত হওয়া যায়। ভাবজগতে প্রবিষ্ট ভাবুক ভক্ত স্ব-স্বভাবের অনুসরণ করিয়াই চলিয়া থাকেন। ভাবগত শ্রেণী বিভাগ তাহাকে বিচলিত করিতে পারে না। ভাবজগতে ভাব দেহে ঠিক ঠিক ভজন হইয়া থাকে। মায়া জগতে মায়িক দেহে ভজন সম্পন্ন হয় না। ভজনের উদ্দেশ্য ভাব হইতে প্রেমের বিকাশ! সাধন

ভক্তির অনুষ্ঠানে সিদ্ধিলাভ করিয়াও প্রেম ভক্তি লাভ করা যায় না। তবে প্রেমভক্তির আলোক মণ্ডলের কিরণ স্বরূপে প্রবেশ করা যায়। যতক্ষণ প্রেমের উদয় না হয় ততক্ষণ পর্য্যন্ত ভজন স্বাভাবিক নিয়মেই চলিতে থাকে। বলা বাহুল্য, এই ভজনও স্বভাবেরই খেলা। উদ্দেশ্য প্রেমের অভিব্যক্তি। প্রেম পর্য্যন্ত বিকাশ পূর্ণ হইলে ভাবরাজ্য শান্ত হইয়া যায়। তখন ভক্ত মহাপ্রেমে প্রতিষ্ঠিত হইয়া হইয়া পরপর অবস্থা আস্বাদন করিতে করিতে মহাভাবের পরমাবধি রাধাতত্ত্ব পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়া থাকে। মহাভাবের উপলব্ধি হইলে রসরাজের সাক্ষাৎকার আপনা আপনি হয়।

অতএব ভাব জগতের অধিবাসীর মধ্যে মর্ত্যলোক হইতে প্রবর্ত্তক অবস্থা সম্পূর্ণ করিয়া ভাব ভক্তির বিকাশের পর অনেক জীব গমন করিয়া থাকে। ইহা ছাড়া অনাদিকালের নিত্য সিদ্ধ জীবও আছেন। তাঁহারাও স্বরূপশক্তির ন্যায় অনাদিকাল হইতেই ভাবজগতে বিদ্যমান রহিয়াছেন। কিন্তু মর্ত্যলোকের জীব আগন্তুক রূপেই ভাবজগতে প্রবেশ করে। ভাব এক হইলেও স্তর ভেদে বিভিন্ন প্রকার ভেদ রহিয়াছে দেখিতে পাওয়া যায়। এই ভেদ ভাবের স্বরূপগত নহে, কিন্তু বিকাশের যোগ্যতাগত। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যাইতে পারে শান্ত ভাব ভাবই থাকিয়া যায়, ভাবের পর প্রেম প্রভৃতি উচ্চতর অবস্থায় উপনীত হইতে পারে না। কিন্তু দাস্য ভাব প্রেম স্নেহ, এমন কি রাগ পর্যন্ত বিকাশ প্রাপ্ত হয়। বাৎসল্য ভাবও ঠিক তাহাই। সখ্যভাব এই সকল ব্যতিরেকে প্রণয় নামক অবস্থাও প্রাপ্ত হইয়া থাকে। কিন্তু এইগুলির মধ্যে কোন ভাবই ভাবের পরম বিকাশ পর্য্যন্ত প্রাপ্ত হইতে পারে না। ভাবের পরম বিকাশ মহাভাব। তাহাকে প্রাপ্ত হইতে হইলে পূর্ব বর্ণিত চতুর্বিধ অবস্থা ছাড়াও মান রাগ ও অনুরাগ এই তিনটি অবস্থার বিকাশ আবশ্যক। এই প্রকার পূর্ণ বিকাশ একমাত্র মধুর ভাবেই সম্ভবপর। কিন্তু তাহাও সর্বত্র নহে। কারণ সাধারণী সমঞ্জসা এবং সমর্থা এই ত্রিবিধ রতির পার্থক্য আছে। সাধারণী রতি যদিও ভগবদ্‌বিষয়ক ভক্তিরূপা তাহাতে সন্দেহ নাই

তথাপি উহাতে নিজের ভোগ্য আনন্দের দিকে অনেকটা লক্ষ্য থাকে বলিয়া এবং ভগবৎ প্রীতি অপেক্ষাকৃত গৌণ থাকে বলিয়া উহার ঊর্দ্ধ গতি একপ্রকার হয় না বলিলেও চলে। মধুর ভাব হওয়া সত্বেও প্রেমের ঊর্দ্ধে সাধারণী রতি উঠিতে পারে না। কিন্তু সমঞ্জসা রতি স্বার্থহীন বলিয়া যদিও তাহাতে উদ্দেশ্য রূপে ভগবৎ প্রীতির প্রাধান্য-ভাব না থাকুক এবং কর্তব্যের অনুশাসনের দ্বারা নিয়ন্ত্রণ থাকুক তথাপি উহা অনুরাগ পর্যন্ত ফুটিয়া উঠে। কিন্তু অনুরাগের পরবর্তী বিকাশ অর্থাৎ মহাভাব পর্যন্ত উৎকর্ষ লাভ একমাত্র গোপীজনসুলভ সমর্থা রতিরই হইতে পারে। কিন্তু সমর্থা রতিও সকল আধারে সমান নহে। এইজন্য মহাভাবের মধ্যেও ক্রমবিকাশের অবসর রহিয়াছে। মহাভাবের যেটি পরকাষ্ঠা অর্থাৎ মাদনভাব তাহাই হ্লাদিনী শক্তি স্বরূপ রাধাতত্ত্ব। এই অবস্থায় ভগবানের সহিত বিচ্ছেদ চিরতরে লুপ্ত হইয়া যায় এবং প্রতি ক্ষণে ক্ষণে নিত্য লীলার বিকাশ হইয়া থাকে। অখণ্ড শ্রীকৃষ্ণ তত্ত্বের সহিত অখণ্ড রাধাভাবের মিলন এই মাদন অবস্থাতে সম্ভবপর। এই অবস্থায় ভাব জগৎ সংকুচিত হইয়া মধ্যবিন্দুরূপে রাধাতত্ত্বে পর্যাবসিত হয়। আপন স্বরূপের বিস্তার পূর্ণভাবে গুটাইয়া লইয়া রাধা তখন সম্যক প্রকারে পুষ্টি লাভ করেন এবং নিকুঞ্জ লীলায় ক্রমশঃ আত্মবিসর্জন করিয়া বিশুদ্ধ মহারস তত্ত্বের প্রতিষ্ঠা করেন।

ভাবরাজ্যের রহস্য ভাল করিয়া বুঝিতে হইলে লীলারসের আস্বাদন প্রণালীটি সুন্দররূপে বিশ্লেষণ করিয়া দেখা আবশ্যক। লীলা-রসের আস্বাদনের পশ্চাতে তিনটি মহাসত্য রহিয়াছে—

১। প্রকৃতির অভিনয়।

২। দ্রষ্টারূপী পুরুষের সাক্ষিভাবে স্থিতি।

৩। ভাবের অভিব্যক্তি।

প্রকৃতির ক্রিয়া আপনা-আপনি হইয়া যাইতেছে। ইহার কোন কর্তা নাই। কর্তৃত্ব বিহীন ক্রিয়া. ইহাই প্রকৃতির ক্রিয়া বা প্রাকৃতিক ক্রিয়া, অর্থাৎ ক্রিয়া আছে কিন্তু কে করে তাহার কোন সন্ধান নাই। এই অবস্থায় পুরুষ বদ্ধাবস্থায় প্রকৃতির গুণে জড়িত

থাকে বলিয়া অহংকারের মোহে মুগ্ধ হইয়া এই ক্রিয়ার কর্তা বলিয়া নিজেকে অভিমান করে। প্রকৃতির ক্রিয়ার কর্তা নাই ইহা সত্য এবং মুক্ত পুরুষে অভিমান নাই ইহাও সত্য তথাপি অনাদি অবিদ্যার প্রভাবে অর্থাৎ অবিবেক বশতঃ প্রকৃতির বিকারের সহিত পুরুষের তাদাত্ম্য বোধ হয় বলিয়া পুরুষ নিজেকে কর্তা বলিয়া অভিমান করে। ইহা হইতে কর্মের সৃষ্টি হয়। সংসার বৃক্ষের ইহাই বীজ। সুতরাং যতক্ষণ এই কর্তৃত্বাভিমান জীবের স্বরূপ হইতে নিবৃত্ত না হয় ততক্ষণ জীব মুক্ত হইয়া দ্রষ্টারূপে পুরুষের স্বরূপে স্থিতিলাভ করিতে পারে না। যখন প্রকৃতির জালে জড়িত হইয়া পুরুষ অহংকার বদ্ধ জীবরূপে প্রকৃতির অভিনয়ে যোগদান করে তখন সে দ্রষ্টা নহে, অভিনেতা মাত্র। অভিনয়ের রস গ্রহণ করিতে হইলে অভিনয় হইতে নিজেকে পৃথক রাখিয়া অভিনয় দেখা আবশ্যক। এই জন্য যতক্ষণ পুরুষ বিবেক জ্ঞানের প্রভাবে অবিবেককে দূর করিয়া প্রকৃতি হইতে ভিন্নরূপে স্ব-স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়া প্রকৃতির খেলা দেখিতে না পারেন ততক্ষণ ঐ খেলার রসগ্রহণ অসম্ভব। প্রকৃতির খেলাই লীলা। কিন্তু ইহা কাহার নিকট? যে প্রকৃতি হইতে পৃথক্ হইয়া প্রেক্ষকরূপে দর্শন করিতেছে তাহার নিকট। যে প্রকৃতিতে লিপ্ত হইয়া অভিনয় করিতেছে তাহার নিকট নহে। যে প্রকৃতিতে লিপ্ত হইয়া রহিয়াছে অর্থাৎ যে প্রকৃতিতে কর্তৃত্বাভিমান বিশিষ্ট তাহার নিকট উহা কর্মজাল মাত্র। অতএব লীলারস আস্বাদনের জন্য সর্বপ্রথম পুরুষকে দ্রষ্টারূপে অবস্থিত হওয়া আবশ্যক। কারণ দ্রষ্টা না থাকিলে লীলা দেখিবে কে?

পক্ষান্তরে পুরুষ অর্থাৎ দ্রষ্টা স্বরূপে স্থিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যদি প্রকৃতির অভিনয় নিবৃত্ত হইয়া যায় তাহা হইলে দ্রষ্টার পক্ষে দৃশ্যের অভাব বশতঃ অভিনয় দর্শন জনিত রসাস্বাদের সম্ভাবনা থাকে না। অতএব পুরুষের মুক্ত হওয়াও যেমন আবশ্যক তেমনি প্রকৃতির অভিনয় বন্ধ না থাকাও আবশ্যক। বাস্তবিক পক্ষে প্রকৃতির অভিনয় বন্ধ থাকে না। কারণ প্রকৃতির ক্রিয়া স্বভাব সিদ্ধ, কৃত্রিম নহে। দ্রষ্টা পুরুষ এবং দৃশ্যরূপ প্রকৃতির খেলা এই দুইটি বিদ্যমান থাকিলেও ঐ

খেলা দেখিয়া দ্রষ্টা আনন্দ লাভ করিবেন এমন কোন কথা নাই। কারণ আনন্দ লাভ করার মূলে অর্থাৎ ভাল লাগার মূলে বিশুদ্ধ বাসনা রহিয়াছে। যাহার যে প্রকার বাসনা তদনুরূপই তাহার আনন্দ প্রাপ্তি হইয়া থাকে। কারণ বাসনার নিবৃত্তিই আনন্দ-প্রাপ্তির নামান্তর। সে বাসনাহীন উদাসীন দ্রষ্টা অর্থাৎ তটস্থ সাক্ষী সে সমদর্শী বলিয়া উপেক্ষক রূপে সমস্ত দৃশ্যকে দর্শন করিয়া থাকে। ইহাতে তাহার চিত্ত স্পৃষ্ট হয় না অর্থাৎ কোন বিশিষ্ট দৃশ্য দর্শন করিয়া তাহার ভাল বা মন্দ লাগে না অর্থাৎ অনুকুল বা প্রতিকুল বলিয়া প্রতীতি জন্মে না।

ইহা হইতে বুঝিতে পারা যাইবে ভাবহীন দ্রষ্টার নিকট অভিনয়ের দর্শন হইতে রসোৎপত্তি হয় না। রস আস্বাদন করিতে হইলে সহৃদয় হওয়া আবশ্যক। অর্থাৎ শুদ্ধ বাসনা অথবা ভাব থাকা আবশ্যক। কারণ এই ভাব হইতেই আস্বাদন উদ্ভূত হইবে।

ভাবরাজ্যের লীলা বিলাস বিশ্লেষণ করিলে এই তিনটি মহাসত্য স্পষ্ট উপলব্ধিগোচর হয়। সাধন ভক্তি অর্থাৎ কর্ম গুরুপদিষ্ট ক্রমে পরিসমাপ্ত করিতে সমর্থ হইলে যে সিদ্ধিলাভ হয় তাহাই কর্তৃত্ব অভিমানের নিবৃত্তি এবং আত্মজ্ঞানের বিকাশ। ইহারই নামান্তর দ্রষ্টা পুরুষের স্বরূপ স্থিতি। এই অবস্থায় ভাব জগতে প্রবেশাধিকার জন্মে। ভাবজগৎ নিরন্তর লীলা মারুত হিল্লোলে আন্দোলিত হইতেছে, পুরুষ দ্রষ্টারূপে ঐ হিল্লোলের পশ্চাদ্‌ভাগে অবস্থান করিয়া স্ব স্ব ভাবানুসারে উহা আস্বাদন করিতেছে। ভাবরাজ্যের সকলেই সাক্ষিভাবে প্রতিষ্ঠিত অথবা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার জন্য উন্মুখ। শুদ্ধ সত্ত্বময়ী পরমা প্রকৃতি নিরন্তর ক্রীড়া করিতেছেন এবং মহাভাবের অভিন্ন অংশরূপী শুদ্ধ ভাব সকল নির্মল বাসনারূপে দ্রষ্টা ও দৃশ্যের মধ্যপথে আসিয়া শুদ্ধ দ্রষ্টাকে আস্বাদনের প্রভাবে ভাবুক এবং রসিক-রূপে পরিণত করিতেছে।

অতএব ভাবরাজ্যে লীলা রস আস্বাদনের ত্রিবিধ সামগ্রী নিত্য

বর্তমান। কারণ ভাব নিত্য। ভাবের আশ্রয় দ্রষ্টারূপী মুক্ত পুরুষও নিত্য।

শুদ্ধ সত্ত্বময়ী প্রকৃতির খেলা নিত্য এবং ভাবের বিষয় যে চিদানন্দ স্বরূপ তাহাও নিত্য। এই অবস্থায় ভাব জগতের লীলা যে নিত্য লীলা হইবে তাহাতে আর কথা কি?

জীব বস্তুতঃ সাক্ষী বলিয়াই নিত্য লীলার দ্রষ্টা মাত্র। লীলা স্বরূপ-শক্তি হইতে হইয়া থাকে। বস্তুতঃ স্বরূপের সহিত স্বরূপশক্তির অনন্ত প্রকার খেলাই লীলা। এই খেলার মূলে ভাবের প্রেরণা রহিয়াছে, এবং সাধনসিদ্ধ অথবা প্রকারান্তরে ভাবপ্রাপ্ত মুক্ত জীব এই খেলা দেখিবার অধিকারী। সে দ্রষ্টা হইয়াই এই খেলায় যোগদান করিয়া থাকে। কারণ লীলানুরূপ সকল অভিনয়ও স্ব স্ব ভাবের প্রেরণায় জীব করিয়া থাকে। কিন্তু সে যে করে তাহা সে জানে না। অথবা জানিয়াও জানে না। কারণ ইহা স্বভাবতঃই হইয়া থাকে। এই অভিনয়ের মূলে অভিমান নাই বলিয়া ইহা অভিনয় হইয়াও অভিনয় নহে, এবং মুক্ত জীব দ্রষ্টা হইয়াও অভিনেতা। স্বচ্ছ স্ফটিকে যেমন রক্তবর্ণ কুসুমের প্রতিবিম্ব পতিত হইলেও উহা বাস্তবিক রক্ত নহে তদ্রূপ, মুক্ত জীব লীলাতে যোগদান করিয়াও শুদ্ধ সাক্ষী মাত্রই আছেন।

গুরু আজ্ঞা শাস্ত্রের শাসন এবং বেদ বিধি শুধু অহংকারী জীবের জন্য। বস্তুত সাধন মাত্রই তাহাই। কর্মরূপী সাধনা কর্তৃত্বাভিমানে না থাকিলে হয় না। সুতরাং ইহা অভিমানের কার্য্য তাহাতে সন্দেহ নাই। শাস্ত্রীয় বিধি-নিষেধের ব্যবস্থা এবং গুরুর আদেশ ততক্ষণ পর্য্যন্তই সত্য যতক্ষণ পর্য্যন্ত অহংকারে নিবৃত্ত হইয়া দ্রষ্টা স্বরূপে বা স্ব স্বরূপে স্থিতি না হইয়াছে। দ্রষ্টা হইতে সমর্থ হইলে অর্থাৎ অপরোক্ষ জ্ঞান লাভ সিদ্ধ হইলে উহাদের আবশ্যকতা থাকে না। তখন বাহিরের কোন বস্তুই আবশ্যক হয় না। বস্তুতঃ কর্তব্য বুদ্ধি হইতেই সাধনার প্রয়োজন। কিন্তু যতক্ষণ ভাবের বিকাশ না হয় ততক্ষণ

কর্তব্য বুদ্ধি লুপ্ত হইতে পারে না, এবং সেই জন্যই কর্তব্য নিরূপক বাহ্য উপায় অবলম্বন করিতে হয়।

কর্মপথে গুরুর স্থান অত্যন্ত অধিক। কিন্তু গুরু শিষ্যের অধিকার অনুসারে কর্মে প্রেরণা দিয়া থাকেন। এই প্রেরণা প্রকৃতি ভেদে ভিন্ন প্রকার হইতে পারে। কাহারও ভিতর ইহা "আমার কর্তব্য" এইরূপে অন্তঃপ্রেরণা রূপে উদিত হয়। অবশ্য ইহা সাক্ষাদ্‌ভাবেও হইতে পারে অথবা গুরু, সাধু, মহাজন, শাস্ত্র প্রভৃতির নির্দেশ অনুসারেও হইতে পারে। কিন্তু অন্য প্রকৃতির লোকের নিকট এই প্রেরণা আসে ইষ্ট সাধনতা জ্ঞান হইতে। অর্থাৎ কোন কর্ম বিশেষ করিলে তাহার ফলে ইষ্ট বস্তু প্রাপ্ত হওয়া যাইবে এরূপ বিশ্বাস হইতে ঐ কর্ম করিতে প্রবৃত্তি হয়। এই জন্য যদিও উভয় পথে কর্মের প্রাধান্য তুল্য রূপেই রহিয়াছে, তথাপি ইহা স্বীকার্য্য যে এক স্থলে বিধিই প্রবর্তক এবং অপর স্থলে আনন্দপ্রাপ্তির সাধনরূপে কর্ম বিষয়ক জ্ঞান প্রবর্তক। পূর্বোক্ত মার্গে সাক্ষাৎ বাহ্য কর্ম আবশ্যক হয়, যাহার মূল গুরু অথবা শাস্ত্রের বাক্য। কিন্তু দ্বিতীয় মার্গে শুধু স্মরণ অথবা ভাবনা হইতেই ফল লাভ হইয়া থাকে। প্রথমটি বিধিমার্গ, দ্বিতীয়টি রাগ মার্গ। হৃদয়ে রাগের আভাস উদিত না হওয়া পর্য্যন্ত বিধিপূর্বক কর্ম করিতেই হইবে।

কিন্তু রাগরঞ্জিত হৃদয়ে বৈধকর্মের প্রয়োজনীয়তা থাকে না। রাগ বিদ্ধ হৃদয় স্বীয় রাগ অনুসারে মনন প্রভৃতি করিয়া থাকেন। ভাবনাই তাহার পক্ষে মূল সাধন। বাহ্যকর্ম না হইলেও তাহার চলে। কিন্তু যাহার হৃদয় একেবারে শুষ্ক ও রাগাভাস বিবর্জিত তাহাকে বাহ্য কর্ম করিতেই হইবে। তাহা ছাড়া লোকসংরক্ষণের জন্য অনাবশ্যক স্থলেও বাহ্য কর্মের আবশ্যকতা রহিয়াছে।

আসল কথা এই। এতক্ষণ পর্যন্ত কর্ম দ্বারা চিত্ত শুদ্ধির ফলে স্বভাবের উদয় না হইতেছে ততক্ষণ পর্য্যন্ত অহংকারের মূল বিনষ্ট না হওয়ার দরুণ কর্ম করিতেই হইবে। ইহার পর সিদ্ধাবস্থায় স্বভাবের স্রোতে ভাসাইয়া লইয়া যায়। তখন করা অথবা না করা ইহার

কোনই অর্থ থাকে না। কারণ যে অবস্থায় কতৃত্বের বোধই থাকে না সে অবস্থায় করা এবং না করার কোন পার্থক্য থাকে না বস্তুতঃ এই অবস্থায় করা অথবা না করা কিছুই থাকে না। বলিয়া ক্রিয়াই থাকে না। যাহা পূর্বে ক্রিয়ারূপে পরিগণিত ছিল তাহা ভূতি বা স্বভাবের খেলা রূপে আত্মপ্রকাশ করে। ভগবানের নিত্যলীলায় যোগদানের রহস্য ইহা হইতে স্পষ্ট বুঝিতে পারা যাইবে।

স্বভাবের স্রোতে পতিত হইলে জাগতিক বন্ধনের এবং নিয়ন্ত্রণের গণ্ডী হইতে মুক্তি লাভ হয়। "নিস্ত্রৈগুণ্যে পথি বিচরতাং কো বিধিঃ কো নিষেধঃ।" ত্রিগুণাত্মিকা প্রভৃতির উর্দ্ধে অপ্রাকৃত ধামে অর্থাৎ ভাবরাজ্যে বিধি অথবা নিষেধের কোনই স্থান নাই। স্বভাবের খেলা অথবা লীলাতত্ত্ব সূক্ষ্মভাবে ধারণা করিতে হইলে প্রাসঙ্গিক ভাবে স্বভাব সম্বন্ধেও স্পষ্ট ধারণা থাকা আবশ্যক। এই সম্বন্ধে সংক্ষেপে ২।১টি কথা বলা যাইতেছে।

ভাব অভাব এবং স্বভাব ইহাদের মধ্যে পরস্পর সম্বন্ধ রহিয়াছে। খণ্ডভাবে দেখিতে গেলে কোন বস্তুর অনাদিকালের স্থিতিটিই ভাব। যখন ঐ স্থিতি ভঙ্গ হয় তখন অভাবের উদয় হয় ইহাই দুঃখ। ভাবটি কিন্তু দুঃখ নহে। দুঃখ নিবৃত্তিও নহে, আনন্দও নহে। ভাব অবস্থায় আত্মপরিচয় থাকে না। এই জন্যই ইহা অনাদি অবিদ্যার অবস্থা। এই অবস্থায় দুঃখ থাকে না—সুখও থাকে না। ইহাই কুণ্ডলিনীর সুপ্ততা অথবা অনাদি মায়া। জীব যতক্ষণ এই অনাদি নিদ্রায় নিদ্রিত থাকে ততক্ষণ স্বকীয় অস্তিত্বের বোধই তাহার থাকে না ; দুঃখ সুখের অনুভূতি তো দূরের কথা। কিন্তু যখন এই অবস্থা হইতে স্খলিত হইয়া জীব নিঃসৃত হয় তখন সে দুঃখই অনুভব করিয়া থাকে। কারণ ইহা ভাবচ্যুতি নিবন্ধন অভাবের অবস্থা। ইহারই নামান্তর সংসার। এই অভাবের অবস্থায় ভাবের পরিচয় লাভ হয়। ভাব স্বরূপতঃ নিজেকে নিজে চিনিতে পারে না। কিন্তু স্বরূপচ্যুতি অর্থাৎ সাময়িক আত্মবিস্মৃতি উদিত হইলে ঐ বিস্মৃতির অন্ধকারের মধ্যে অস্ফুট ক্ষীণ আলোকের ন্যায় নিজেকে নিজে স্মরণ করিতে থাকে। অভাবের

মধ্যে ভাব ক্রমশঃ স্মৃতিরূপে আত্মপ্রকাশ করে। ইহাই উপাসনার রহস্য। এই অবস্থার উদয় হইলেই জীবের লক্ষ্য স্থির হইয়া যায় এবং তাহার অন্তর্মুখ গতি আরব্ধ হয়। যেমন কোন সুন্দরী রমণী নিজের সৌন্দর্য্য সত্ত্বেও নিজে তাহা দেখিতে পায় না, অন্যের দৃষ্টি অনুসারে তাহা স্বীকার করিয়া লয় অথবা স্বচ্ছ দর্পণে প্রতিবিম্বরূপে নিজের মুখ নিজে দেখিয়া বিমোহিত হয়, ইহাও ঠিক সেই প্রকার। প্রতিবিম্বহীন বিম্বই ভাব। অভাবের মধ্যে স্মৃতিরূপে প্রতিভাসমান ভাবেই মূল ভাবের প্রতিবিম্ব। এই অবস্থায় অর্থাৎ অভাবের উদয় এবং প্রতিবিম্ব রূপে ভাব দর্শন সম্পন্ন হইলে ঐ প্রতিবিম্বকে বিম্বরূপে প্রাপ্ত হইবার জন্য ইচ্ছা জন্মে এবং তখন নিবৃত্তিমুখী গতির সূত্রপাত হয়। এই গতির পরিসমাপ্তির পূর্বেই অভাব নিবৃত্তি অনুভূত হয়। অথচ তখনও ভাবরাজ্যে পুনঃ প্রবেশ হয় নাই! এই যে অভাব নিবৃত্তি ইহাকেই আত্যন্তিক দুঃখাভাব অথবা মুক্তি বলিয়া বর্ণনা করা হয়। ইহা সংসারের অতীত অবস্থা। অন্তর্মুখ গতি আরও অগ্রসর হইলে ভাবরাজ্যে পুনঃ প্রবেশ হয়। তখন ভাব আর ভাব থাকে না, স্বভাবরূপে পরিণত হয়। ইহা মুক্তিরও পরাবস্থা। ইহাই পরমানন্দ, যাহার হিল্লোল নিত্যলীলারূপে ভক্তগণ কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। ভাব এবং স্বভাব একই বস্তু, কিন্তু ভাব জড়, স্বভাব চৈতন্য। এই জড় অথবা অচিৎ অবস্থাকে পূর্ণ চিন্ময় অবস্থাতে পরিণত করাই সৃষ্টিলীলার এবং আধ্যাত্মিক সাধনার একমাত্র উদ্দেশ্য। দুঃখের মধ্যে পতিত না হইলে আনন্দের আস্বাদন পাওয়া যায় না। দুঃখে পতিত হওয়ার পূর্বের অবস্থা এবং দুঃখভোগের পর প্রত্যাবর্ত্তনের উত্তরাবস্থা ঠিক একরূপ নহে। এক অখণ্ড আনন্দ ভিন্ন দ্বিতীয় কোন বস্তু নাই। উহাই অখণ্ড ভাব। উহা হইতে নির্গম না হইলে অভাব অথবা দুঃখের অনুভূতি লাভ হয় না। কিন্তু দুঃখ স্থায়ী বস্তু নহে। কারণ শক্তির যে প্রবাহ ভাব হইতে অভাবের সৃষ্টি করে সেই প্রবাহই ফিরিবার সময় অভাবকে স্বভাবে পরিণত করে। তখন ভাবকে চিনিতে পারা যায়— অভাব কিংবা দুঃখ বা সংসারের প্রকৃত সার্থকতা কি তাহা

তখনই বুঝিতে পারা যায়। এই যে স্বভাবের কথা বলা হইল ইহা যদিও ভাব ভিন্ন অপর কিছু নহে তথাপি, ইহা স্বীয় ভাবরূপে উপলব্ধিগোচর হইয়াছে বলিয়া ইহা হইতে জীবকে আর পুনরাবর্ত্তন করিতে হয় না। ইহারও অতীতাবস্থা আছে। তাহাই মহাচৈতন্য। ভাব হইতে অভাব—অভাব হইতে স্বভাব, তারপর মহাচৈতন্য। স্বভাবের খেলা আনন্দ অথবা রসের অনন্ত প্রস্রবণ। ইহার সম্যক্ আস্বাদন না পাইলে সংসার তাপে শুষ্ক ও শীর্ণ জীব পুষ্টিলাভ করিতে পারে না। এই আনন্দরূপী অমৃত পান করিয়া মুক্ত শিশু যখন ক্ষুধা তৃষ্ণা রহিত এবং চিন্তাশূন্য অবস্থা লাভ করিবে তখন আনন্দের অতীত পরম চৈতন্য কে আত্মমধ্যে ধারণা করিবার জন্য যোগ্যতা লাভ হইবে।

অতএব আনন্দময় ভাবরাজ্য প্রাপ্ত হইলে সংসারের সকল তাপ উপশান্ত হয় এবং স্নিগ্ধ অমৃতাভিষেকনিবন্ধন সে সুশীতল মাধুর্য্য রসের মধ্যে মগ্ন হইয়া পড়ে।

ভাব হইতে অভাবে নামিয়া আসা, ইহাই অবরোহণ এবং অভাব হইতে পুনর্বার স্বভাবে ফিরিয়া যাওয়া, ইহাই আরোহণ। এই ভাবে একটি আবর্ত্তন পূর্ণতা লাভ করে। ইহার উদ্দেশ্য জড় সত্তাকে ক্রমশঃ চৈতন্য সত্তাতে পরিণত করা। বস্তুতঃ উপলব্ধির প্রাক্কালীন আনন্দই জড় পদবাচ্য এবং উপলব্ধির পরবর্ত্তী কালে ঐ আনন্দই চৈতন্যরূপে বর্ণিত হইয়া থাকে। একই অখণ্ড বস্তু সদা এবং সর্বত্র বিদ্যমান রহিয়াছে। অধিকার এবং সামর্থ্যানুসারে তাহা নানারূপে প্রতিভাত হয়।

অভাবের রাজ্যে বিধিনিষেধের শাসন স্বাভাবিক! কিন্তু স্বভাবকে প্রাপ্ত হইলে বিধি নিষেধের কোনই সার্থকতা থাকে না। এইজন্য স্বভাবের খেলা বেদবিধির অগোচর। স্বভাবকে প্রাপ্ত হইলেই যে স্বভাব হইল তাহা নয়। তখন আনন্দের ধারা বহিতে লাগিল এবং সেই ধারায় জীব স্নাত হইয়া নিরন্তর আনন্দ পান করিতে লাগিল ইহা সত্য। কিন্তু ইহার একটি পরাবস্থা আছে। তাহা আনন্দেরও অতীত। উহার প্রকৃত জাগরণ অথবা মহাচৈতন্য।

ভাবরাজ্যের অনন্ত লীলা নিত্যানন্দময়! এই লীলার অবসানে মহাভাবের লীলা স্পষ্টতঃ ফুটিয়া উঠে। মহাভাবই ঘনীভূত আনন্দ সত্তা যাহার নামান্তর হ্লাদিনী শক্তি। ভাবের লীলার ফলে যেমন আনন্দ ঘনীভূত হইয়া মহাভাবরূপ পরমানন্দে পর্য্যবসিত হয়—ঠিক তেমনি মহাভাব লীলার অবসানে এই পরমানন্দ পরম চৈতন্যে স্থিতি লাভ করে। তখন ঐ চৈতন্য ক্ষণিকের জন্য তাহাকে জাগাইয়া দেয়। এই ক্ষণিক জাগরণকে কালবন্ধন দ্বারা নিত্য জাগরণরূপে পরিণত করিতে পারিলেই লীলাতীত এবং ভাবাতীত নিত্য-প্রবুদ্ধ স্বয়ংপ্রকাশ চৈতন্যের স্ফুরণ হইয়া থাকে।

ভাব হইতে অভাব এবং হইতে স্বভাব, ইহাই নির্দিষ্ট নিয়ম, একথা পূর্বেই বলা হইয়াছে। কিন্তু ইহার রহস্য এখনও সম্যক্‌প্রকারে ভেদ করা হয় নাই। ভাব হইতে যে অভাবের সংক্রমণের কথা বলা হইল ইহার অর্থ কি? বস্তুতঃ অবরোহ এবং আরোহ উভয় ক্রমেই বুঝিতে হইলে কলাজ্ঞান আবশ্যক। যাহাকে ভাবাবস্থা বলা হইয়াছে—তাহা সাম্যবস্থা, তাহাতে অনন্ত কলার সন্নিবেশ রহিযাছে, বুঝিতে পারা যায়। সুতরাং অনন্তের হ্রাস বৃদ্ধি নাই বলিয়া বাস্তবিক পক্ষে ভাব হইতে অভাবের উদয় যুক্তি দ্বারা বুঝান যায় না। কিন্তু তথাপি সৃষ্টি প্রক্রিয়া এবং সংহার প্রক্রিয়া বিশদভাবে বিচারের দ্বারা বোধগম্য করা আবশ্যক। যে অনন্ত কলার কথা বলা হইল তাহা অনন্ত হইলেও সমষ্টিরূপে দেখিলে একই—বিন্দু বা মণ্ডল। স্বাতন্ত্র্য শক্তি এই মণ্ডলের স্বরূপগত ধর্ম। ইহা মণ্ডলের সহিত অভিন্ন সত্তা লইয়া বিদ্যমান রহিয়াছে! স্বাতন্ত্র্য প্রভাবে যখন অনন্ত কলা হইতে একটি কলা তিরোহিত হয় তখনই মহা সাম্যের উপর বিরাট ক্ষোভের উদয় হয় এবং সাম্যাবস্থা বৈষম্যময়ী সৃষ্টির সূচনা করে। এই এক কলার তিরোধানই মূল্য অবিদ্যা—বস্তুতঃ ইহা এক নহে, অর্দ্ধ মাত্রা। যাহা হউক, সে রহস্যের উত্থাপন এখানে করার আবশ্যকতা নাই। অনন্ত কলা হইতে এক কলার তিরোভাব মূল অবিদ্যারূপে অথবা মহামায়ার স্বরূপ আবরণ শক্তি রূপে প্রসিদ্ধ। এই অবস্থাকেই পূর্বে আংশিক

সুষুপ্তি বলিয়া বর্ণনা করিয়াছি। এই যে সাম্যময়ী ভাব সত্তার কথা বলা হইল ইহা সুখ দুঃখের অতীত। ঐ অনন্ত কলা অনন্ত বটে, কিন্তু বিন্দুরূপে উহা এক। সুতরাং একই অনন্ত এবং অনন্তই এক। যখন মূল সাম্য ভঙ্গ হয় তখন ঐ বোধহীন জড়পদবাচ্য ভাবনামক মহাসত্তাতেই ক্ষোভ হয় বুঝিতে হইবে। এই ক্ষোভ হইতেই আনন্দের সৃষ্টি হয়। অর্থাৎ যাহা চৈতন্য ছিল তাহা আনন্দ দ্বারা সীমাবদ্ধ হয়। চৈতন্য আনন্দ যুক্ত হইয়া যুগলরূপে প্রকাশ পায়। এক এক কলার ক্রমিক তিরোভাব অনুসারে আনন্দ সত্তাও ক্রমশঃ সীমাবদ্ধ হইয়া স্ফুরিত হইতে থাকে। এক কলা কম অনন্ত কলার স্তর হইতে এক কলা পর্য্যন্ত ভাবরাজ্যের বিকাশ। এক কলা হইতে রেণু রেণু ক্রমে অমৃত রশ্মির বিকিরণের ফলে প্রাকৃতিক সত্তা সম্পন্ন মায়িক জগতে এককলা বিকীর্ণ হইয়া রহিয়াছে।

আরোহণের সময় এই ছড়ান অমৃত কিরণগুলি একত্র করিয়া এক কলা পূর্ণ করিতে পারিলে মায়িক জগৎকে অতিক্রম করিবার উপযোগী সাধনা সমাপ্ত হয়। এই এক কলা লইয়াই ভাবজগতে প্রবেশ হয়। ভাবের বিকাশের ফলে ক্রমশঃ পরপর কলারাজ্য অতিক্রান্ত হইতে থাকে। এক কলা কম অনন্ত কলা পর্য্যন্ত বিকাশ সিদ্ধ হইলেই রাধাকৃষ্ণের যুগল তত্ত্ব রাধার পূর্ণ আত্মসমর্পণের ফলে একল কৃষ্ণরূপে পরিণত হয়। ইহাই আনন্দের পরিসমাপ্তি। কিন্তু পূর্ণ জাগরণ ইহাও নহে। কারণ এককলা এখনও তিরোহিত অবস্থায় রহিয়াছে। এই এককলার পূর্ণ উন্মেষ না হওয়া পর্য্যন্ত আনন্দ চৈতন্যরূপে পরিণত হয় না।

আনন্দ যে চৈতন্য নহে অথবা চৈতন্য আনন্দ নহে এমন কথা বলা হইতেছে না। যাহাকে আনন্দ বলা হইতেছে তাহাও চৈতন্যই—কিন্তু এক কলা সুষুপ্তির আবেশ তাহাতে রহিয়াছে। সেই জন্যই এই আনন্দতত্ত্বের মধ্যেই শক্তি-শক্তিমানের যুগল ভাবের বিকাশ হয়। চৈতন্যও বাস্তবিক আনন্দতত্ত্বই—তবে এ আনন্দে সুষুপ্তি নাই যুগল নাই—এমন কি অন্তর্লীন ভাবেও শক্তি-শক্তিমানে ভেদ নাই।

উহা একই অনন্ত সত্তা। অনন্ত হইয়াও উহা এক। সুতরাং চৈতন্যস্বরূপ ভিন্ন প্রকৃত অদ্বৈত অবস্থার প্রতিষ্ঠা হওয়া সম্ভবপর নয়। ঐ অবস্থায় অনন্ত কলারই বিকাশ থাকে।

অনন্তকলা চৈতন্য। এরকম অনন্ত কলা হইতে আরম্ভ করিয়া এক কলার পূর্ব পর্যান্ত আনন্দ অথবা ভাবরাজ্যের কলা। এক কলা চিৎকলা বা ব্রহ্মজ্যোতিঃ। এক কলার কিরণরাশি অথবা অংশ প্রত্যংশ অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ড বিশিষ্ট সমগ্র মায়িক জগৎ।

এই বিবরণ হইতে বুঝিতে পারা যাইবে যে সমগ্র অভাবের জগৎ মহাচৈতন্যের এক কলার উপর প্রতিষ্ঠিত 'একাংশেন স্থিতো জগৎ।' পক্ষান্তরে সমগ্র চৈতন্য জগৎ বা ভাবজগৎ আনন্দ-সাম্রাজ্যের পর একটিমাত্র কলাকে আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে। কলার ক্রমিক ক্ষয় এবং ক্রমিক বিকাশ, ইহাই অবরোহ এবং আরোহ প্রণালীর মর্মকথা। যাহাকে ভাব বলিয়া পূর্বে উল্লেখ করা হইয়াছে তাহা বস্তুতঃ অনন্ত কলা সম্পন্ন অদ্বৈত ও অখণ্ড পরম তত্ত্ব। কিন্তু তাহা বোধহীন, সুতরাং আনন্দহীন এবং দুঃখহীন। যখন স্বাতন্ত্র্যবশে অথবা মহা করুণার উচ্ছ্বাসে এই ভাবসত্তা বিক্ষুব্ধ হয় এবং সত্তালীন জীব সকল ভাব হইতে বিকীর্ণ হইয়া বহির্মুখে অভাবের দিকে ধাবমান হয় তখন সর্বপ্রথম স্তরে স্তরে আনন্দের রাজ্য অর্থাৎ ভাবময় জগৎ উদ্ঘাটিত হইয়া চরমাবস্থায় দুঃখবহুল অভাবের জগৎ ফুটিয়া উঠে।

জীব অন্তরালবর্ত্তী আনন্দরাজ্য সকল ভেদ করিয়া মায়ার জগতে অবতীর্ণ হইবার সময় কোন স্তরেরই উপলব্ধি প্রাপ্ত হইতে পারে না। নিদ্রিতাবস্থায় যানে আরূঢ় হইয়া দীর্ঘপথ অতিক্রম করিলে যেমন পথের অন্তর্গত দৃশ্য সকল দেখিতে পাওয়া যায় না অথচ পথ কাটিয়া যায়, সৃষ্টির ধারায় এই প্রকারই হইয়া থাকে। জীব নামিয়া আসার সময় যে যে স্তর ভেদ করিয়া নামিয়া আসে তাহার কোন সন্ধান রাখিতে পারে না, সুপ্তবৎ চলিয়া আসে। কিন্তু ধরাতে আরূঢ় হইয়া অর্থাৎ স্থূল দেহে অভিনিবিষ্ট হইয়া চৈতন্য প্রাপ্ত হইলে দুঃখের অনুভবের সঙ্গে সঙ্গে অর্থাৎ অভাব উপলব্ধির প্রভাবে পূর্ব স্মৃতি অস্ফুট

ভাবে জাগিতে থাকে। তখন সদ্‌গুরুর কৃপায় বিক্ষিপ্ত পরমাণু সকল সংহত করিয়া চিৎকলার উন্মেষ করিতে পারিলে সিদ্ধাবস্থায় ভাবরাজ্যে প্রবেশ হয় এবং ভাবের বিকাশ চলিতে থাকে। ভাবের বিকাশই কলার বিকাশ তাহাতে সন্দেহ নাই। তখন জীব বুঝিতে পারে যে ভাবজগতে সে নবাগত নহে—ভাবরাজ্যের প্রতি স্তরেই তাহার পূর্ব স্মৃতি জাগিয়া উঠে, এবং সে অনুভব করিতে পারে যে উহা তাহার নিজেরই রাজ্য—এতদিনে সে উহা ভুলিয়া গিয়াছিল, এখন আবার ফিরিয়া পাইয়াছে। এই প্রকার পর পর প্রত্যেকটি স্তরেই হইয়া থাকে। তখন দেখা যায় যে জীব কোন স্তরেই অপরিচিত নহে। এই জন্য যদিও স্তর "সংখ্যা" অসংখ্য এবং যদিও এক স্তরের সহিত অন্য স্তরের ভাবগত পার্থক্য আছে তথাপি জীব ফিরিবার সময় প্রত্যেক স্তরকেই স্বকীয় রাজ্য বলিয়াই অনুভব করে। শুধু অনুভব করে না, তাহার পূর্ব স্মৃতিও জাগিয়া উঠে। স্বধামের অনুভূতি না হওয়া পর্য্যন্ত এবং স্বগণের দ্বারা নিজেকে পরিবেষ্টিত না পাওয়া পর্য্যন্ত জীব আনন্দের আস্বাদন প্রাপ্ত হইতে পারে না। সংসার কান্তার জীবের বিদেশ, ভাবরাজ্য তাহার স্বদেশ। এইভাবে ভাবরাজ্যের সমগ্র আনন্দ সম্পদ অধিকার করিয়া মহাচৈতন্যের অন্তিম কলার জন্য তাহাকে প্রতীক্ষা করিতে হয়। কারণ উহার বিকাশ না হওয়া পর্য্যন্ত আনন্দের অতীত শুদ্ধ চৈতন্য সত্তা স্বয়ংপ্রকাশ রূপে উপলব্ধি গোচর হয় না।

সাধারণতঃ জীব সকলের প্রকৃতিগত পার্থক্য লক্ষিত হয়। কারণ ভাবরাজ্যের যে স্তর হইতে অংশ নির্গত হইয়া যে জীবের কারণ সত্তা রচিত হয় সেই জীবের পক্ষে আপাততঃ ঐ স্তরই স্ব-ধাম। ঐ ভাবই তাহার স্ব-ভাব। এই প্রকারে দেখিতে গেলে প্রত্যেক জীবেরই একটা বৈশিষ্ট্য লক্ষিত হইবে। ইহা ভাবগত বৈশিষ্ট্য।

কিন্তু মনে রাখিতে হইবে যে সকল জীবই মূলে একই জীব, এবং ঐ একই জীব অবতরণ কালে পর পর সকল স্তর ভেদ করিয়া আসিয়াছে। এইজন্য ফিরিবার সময় পূর্ণ চৈতন্যের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া

ক্রমবিকাশের পর্ব ধরিতে হইলে তাহার পক্ষে সমগ্র ভাবরাজ্যই পর পর অতিক্রম করা আবশ্যক। এবং স্বভাবের নিয়মে তাহাই হইয়া থাকে। কোন নির্দিষ্ট ভাবকে সে স্বভাব বলিয়া ধরিয়া থাকিতে পারে না। কারণ তাহার পক্ষে ক্রম বিকাশের পথে কখনও না কখনও প্রত্যেকটি ভাবই স্বভাব রূপে উপলব্ধি গোচর হইয়া থাকে। শুধু প্রত্যেকটি ভাব নহে, মহাভাবও তাহাই। শুধু মহাভাব নহে, স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বা রসরাজও তাহাই। বস্তুতঃ মহাচৈতন্য প্রত্যেক জীবেরই আত্মস্বরূপ।

অতএব রাগানুগা ভক্তি সাধনা করিয়া নিত্য সখীর অনুগত হইয়া জীব যখন ভাবজগতের ব্যাপক লীলায় যোগদান করে তখন সে একটি নির্দিষ্ট কোটিকেই আশ্রয় করিয়া থাকে। তাহার স্থান বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন। অনন্ত জীবের মধ্যে সেই স্থান অন্য কোন জীব অধিকার করিতে পারে না। যতদিন সে নিজের রিক্ত স্থান গ্রহণ না করে তত-দিন ঐ স্থান বা আসন রিক্তই থাকে। এইভাবে প্রত্যেকটি জীবেরই একটি বিশেষ ভাবময়ী স্থিতি আছে জানিতে হইবে। নিত্য লীলা আস্বাদনের পক্ষে এই সত্য অকাট্য এবং অভ্রান্ত। পক্ষান্তরে প্রত্যেক জীবই যখন মূলে এক এবং সেই এক জীবই যখন বহির্মুখ হইয়া অনন্ত জীবরূপে পরিণত হইয়াছে তখন জীব আপন স্বরূপে ফিরিবার মুখে প্রত্যেকটি স্তর, শুধু প্রত্যেকটি স্তর নহে প্রত্যেকটি স্তরের অন্তর্গত প্রত্যেকটি জীবভাব আত্মস্বরূপে আস্বাদন করিতে করিতেই ক্রমশঃ মহাসত্তাতে পরিণত হয়। এই জন্য প্রতি জীবই অনন্ত জীবের প্রতিনিধি। সুতরাং যে কোন জীবের পক্ষে ভাবরাজ্যের অনন্ত প্রকার আস্বাদনই ভোগের সামগ্রী। কোনটিকেই বাদ দেওয়া চলে না। এই অনন্ত রূপে এবং অনন্তভাবে অভিব্যক্ত অনন্ত প্রকার রসের আস্বাদন করিবার যোগ্যতা প্রত্যেকটি জীবেরই রহিয়াছে। শুধু তাহাই নহে, মায়া জগতে যে অনন্ত দুঃখ, যাহা অনন্ত জীবে বিভক্ত রূপে অনুভূত হইতেছে তাহা ঐ ভাগ্যবান জীব একাকী অনুভব ও বহন করিয়া থাকেন। সমগ্র মায়িক জগতের অন্তর্গত বিভিন্ন জীবের

সমস্ত দুঃখভার যে স্বয়ং গ্রহণ করিতে প্রস্তুত নহে তাহার পক্ষে ভাব-রাজ্যের অনন্ত সম্পদ এক ভাব হইয়াও অনন্ত ভাবের প্রতিনিধি রূপে অনন্ত রসময় ব্যাপক আনন্দ সম্ভোগ সম্ভবপর নহে, এবং ঐ ব্যাপক আনন্দের অতীত মহাচৈতন্যে প্রবেশও সম্ভবপর নহে।

সুতরাং বুঝিতে হইবে তত্ত্বের দিক দিয়া সিদ্ধান্ত দুইটিই সত্য। প্রতি জীবই একক, তাহার মত দ্বিতীয় কেহ নাই। পক্ষান্তরে প্রতি জীবই অনন্ত। একাধারে অনন্ত জীবের অনন্ত ভাব অভিব্যক্ত হয়। নিত্য লীলা প্রতি জীবের পক্ষে নিত্য লীলা তাহাতে সন্দেহ নাই। পক্ষান্তরে নিত্য লীলা হইলেও যে কোন জীব উহাকে অতিক্রম করিয়া লীলাতীত মহাচৈতন্যে স্থিতিলাভ করিতে সমর্থ। এই যে মহাচৈতন্যের কথা বলা হইল ইহাই স্বভাবের পরিসমাপ্তি। যুগল লীলাই স্বভাব। ফিরিবার মুখে অভাবনিবৃত্তি এবং স্বভাব প্রাপ্তি এই উভয়ের মধ্যবর্ত্তী একটা অবস্থা আছে। ইহাকে মুক্তি বলে। ইহাই আত্যন্তিক দুঃখ নিরোধ। ইহা সংসারের অপগম অবস্থা, কিন্তু ভাবরাজ্যের অভিব্যক্তির পূর্ব্বাবস্থা। এই অবস্থায় দুঃখ তো থাকেই না, দুঃখের বীজও থাকে না। সুতরাং এই অবস্থা প্রাপ্ত হইলে জন্ম-মৃত্যুর চক্র চিরদিনের জন্য নিবৃত্ত হইয়া যায়। চিৎকলার অর্থাৎ নির্বিশেষ জ্ঞানের অভিব্যক্তি হইতেই এই অবস্থা প্রাপ্তি ঘটে। কিন্তু ইহাও পরমাবস্থা নহে। ইহার পরই প্রকৃত ভক্তি অর্থাৎ ভাবময়ী ভক্তির সূচনা হয়, যে ভক্তির আধার মুক্ত পুরুষ ভিন্ন কেহ হইতে পারে না। এই ভক্তির বিকাশের সঙ্গে সঙ্গেই সূর্য্যোদয়ে কমলের উন্মীলনের মত লীলাময় ভাবরাজ্যটি ফুটিয়া উঠে। ইহার পর পূর্ণ আনন্দে লীলা উপসংহৃত হইলে বিশুদ্ধ ভগবত্তত্ত্বে স্থিতি হয়, যাহাতে মহাভাব অথবা পরাভক্তিও স্বরূপ ধর্মরূপে নিহিত থাকে। ইহার পর মহাচৈতন্যের অবস্থা। মহাচৈতন্যের অবস্থা অখণ্ডমণ্ডলাকার মহাবিন্দুস্বরূপ। ঐ অবস্থায় অনন্ত কলা বিকাশপ্রাপ্ত, সুতরাং চৈতন্যই চৈতন্য, সুষুপ্তির লেশমাত্রও বিদ্যমান নাই। এই চৈতন্য প্রাপ্তির পর আর অবসাদ হয় না। যে ভাবসত্তা হইতে সৃষ্টির সূত্রপাত হয় এবং জীবরাশির নির্গম

হয় ইহাও তাহাই, অথচ ঠিক তাহা নহে। নিত্য দুঃখময় অভাবের রাজ্য এবং নিত্যানন্দময় স্বভাবের রাজ্য উভয়ের অতীত এই মহাচৈতন্য। আপাততঃ ইহাকেই পরমপদ বলিয়া ধরা যাইতে পারে।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে ভগবানের অন্তরঙ্গ বা স্বরূপশক্তি এবং বহিরঙ্গ বা মায়াশক্তির ন্যায় তটস্থ শক্তি অথবা জীব শক্তিও আছে। এই তটস্থ শক্তি হইতেই জীব আবির্ভূত হইয়া থাকে। জীব নিত্য ও অণুপরিমাণ, কিন্তু নিত্য হইলেও তাহার আবির্ভাব আছে। যে শক্তি হইতে এই অণুসকল অর্থাৎ চিদণুসকল নিরন্তর আবির্ভূত হইতেছে তাহাই তটস্থ শক্তি। স্বরূপ শক্তির অন্তর্গত হ্লাদিনী শক্তি অনন্ত বৃত্তি সম্পন্ন। হ্লাদিনীর মুখ্যবৃত্তি মহাভাব। ইহা আনন্দের সারভূত। ইহা এক হইলেও ইহার স্বরূপভূত অনন্ত অংশ আছে। এইগুলিকে ভাব বলে। স্বরূপশক্তির প্রতিবিম্ব তটস্থ শক্তি ধারণ করিয়া থাকে বলিয়া অনন্ত ভাবরাশি অনন্ত চিদণুতে অভিব্যক্ত অবস্থায় প্রতিফলিত হইয়া রহিয়াছে। মুখ্য ভাবে এক একটি ভাব এক একটি অণুতে প্রতিফলিত হয় এবং গৌণভাবে যাবতীয় ভাব প্রত্যেকটি অণুতে প্রতিফলিত হয়। যে মুখ্য ভাব যে অণুতে প্রতিফলিত হয় তাহাই ঐ অণুর স্বভাব। অভাবের রাজ্যে আসিয়া এই অন্তঃস্থিত স্ব স্ব ভাবকেই অর্থাৎ চিদানন্দের প্রতিবিম্ব স্বরূপ ভাব বিম্বস্বরূপ ভাবরূপ প্রিয়তম আদর্শকেই প্রতি জীব অন্বেষণ করিতে থাকে। ইহার কিঞ্চিৎ আভাস বহু পূর্ব্বে দেওয়া হইয়াছে।

আপাততঃ যে ভাব অভাব ও স্বভাবের পরস্পর সম্বন্ধ আলোচনা করা হইল তাহা হইতে ঐ তত্ত্বটি আরও পরিস্ফুট হইবে। ভাব সমুদ্রে অণুরূপী জীব অনাদিকাল হইতে নিদ্রিতাবস্থায় লীন হইয়া রহিয়াছে। ইহাই জীবগত তটস্থ শক্তির নিষ্ক্রিয় অবস্থা। তখন স্বাতন্ত্র্যবশে মহাসত্তায় ক্ষোভ উৎপন্ন হয় তখন ঐ ক্ষোভ একদিকে যেমন স্বরূপ শক্তিকে বিচলিত করে অপর দিকে তেমনি তটস্থ শক্তিকেও বিচলিত করে। বলা বাহুল্য, মায়া শক্তির চলনও ইহারই অনুরূপ। স্বরূপ

শক্তি ক্ষুব্ধ না হওয়া পর্য্যন্ত যেমন হ্লাদিনী বা মহাভাবকে প্রাপ্ত হওয়া যায় না ; তেমনি তটস্থ শক্তি ক্ষুব্ধ না হওয়া পর্যন্ত জীবাণুকেও পাওয়া যায় না ! সুতরাং অণুরূপী জীব অনাদি সুষুপ্তি হইতে উত্থিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই স্বহৃদয়ে প্রতিবিম্বিত রূপে স্বানুরূপ ভাবসত্তাকে উপলব্ধি করিয়া থাকে। ইহাই ভাবক্ষোভের অবস্থা। বলা বাহুল্য, ইহা অভাবেরই অন্তর্গত। ইহার পর অভাব নিবৃত্তি বা মুক্তাবস্থা। স্বভাবে প্রবেশ মুক্তির উত্তরকালে হইয়া থাকে। স্বভাবের পূর্ণ বিকাশে মহা-চৈতন্য বা অনন্ত জাগরণ অবশ্যম্ভাবী।

ভাবরাজ্যের মুখ্য সাধনা মধুর রসের অনুশীলন। কিন্তু অন্যান্য রসও যথাবস্থিত ভাবে আস্বাদিত হইয়া থাকে। একদৃষ্টিতে প্রত্যেক জীবেরই একটি আত্মভূতা প্রকৃতি আছে যাহাকে অনুসরণ করিতে পারিলে তাহার স্বেচ্ছাচার এবং স্বাধীনতা সিদ্ধ হয়। নিত্য লীলাতে যাবতীয় অবান্তর রস মুখ্য রসেরই সহায়ক রূপে এবং অঙ্গরূপে আস্বাদিত হইয়া থাকে। বস্তুতঃ কোন জীবকে উপেক্ষা করিবার উপায় নাই। তবে যোগ্যতা অভিব্যক্তির জন্য প্রতীক্ষা করিতে হয়। যখন সু-অবসর আগত হয় তখন জীব মহাভাবের ভিতর দিয়া পূর্ণ রস তত্ত্বকে আস্বাদন করিতে সমর্থ হয়। রাসলীলার রহস্য বুঝিতে পারিলে এই মহাতত্ত্বটি কিয়দংশে হৃদয়ঙ্গম হইতে পারে।

ভাবরাজ্যের মহালীলা কোন ভাবকে উপেক্ষা করিয়া সম্পন্ন হয় না, কারণ বিশ্ব জগতে একটি পরমাণুরও গৌরবময় স্থান আছে। এইখানে ক্ষুদ্র ও বৃহৎ উভয়েরই সমান মূল্য। যাহার স্বভাব আছে সেই নিত্য লীলায় যোগ দিতে এবং যোগদান করিয়া আনন্দ আস্বাদন করিতে সৌভাগ্য লাভ করে। স্বভাবের ভজন প্রণালী অর্থাৎ রাগমার্গের উপাসনা, ইহাই ভাবজগতের মহামূল্য সম্পৎ। এই সম্পৎ লাভ করিতে হইলে অভাবের রাজ্য হইতেই স্বভাবকে গঠন করিতে চেষ্টা করিতে হয়। এই গঠন প্রণালীর মূলমন্ত্র হৃদয় স্থিত ভাবের প্রতিবিম্ব। কারণ উহাকে আশ্রয় করিয়াই স্বভাব গঠিত হইবে। স্বভাব পূর্ণাঙ্গরূপে প্রস্ফুটিত না হইলে অখণ্ড আনন্দের আস্বাদন

সম্ভবপর হয় না। বিক্ষিপ্ত চিত্তে বিক্ষিপ্ত ইন্দ্রিয়ে, আনন্দের নিত্য নব নব লীলা ধারণা করিতে পারা যায় না। বস্তুতঃ ঐ লীলা তখন প্রতিভাসমানও হয় না। এইজন্যই প্রবর্তক অবস্থায় স্বভাবকে গঠন করিবার উপযোগী কর্ম অর্জন করিতে হয়। নতুবা স্বভাব গঠিত হয় না এবং ভাবেরও বিকাশ হয় না অর্থাৎ সিদ্ধিলাভ হয় না। ভাবের সাধনাই প্রকৃত সাধনা এখানে বক্রগতির আশঙ্কা নাই, স্খলনের সম্ভাবনা নাই, পূর্বস্মৃতির তাপ নাই, ভাবী আশার আকুলতা নাই, স্বার্থপরতা নাই, মোহ নাই, ফলাকাঙ্খা নাই, এবং নৈরাশ্যের আবিলতাও নাই। ইহা প্রকৃতির সাধনা, পুরুষের নহে। পুরুষকার অবলম্বন করিয়া প্রকৃতি প্রাপ্ত না হইলে ভাবরাজ্যে প্রবেশও হয় না, স্বভাবের সাধনাও চলে না।

পশুভাব হইতে যোগ্যতা লাভ করিয়া বীরভাবে উঠিলে প্রকৃতির সহিত খেলা করিবার অধিকার জন্মে। ব্রহ্মচারী অবস্থায় জ্ঞান ও বীর্য্য সম্পাদন করিয়া যেমন গৃহস্থাশ্রমে ভোগাস্বাদনে অধিকার জন্মে ঠিক সেই প্রকার প্রবর্তক অবস্থায় সিদ্ধিলাভ করিলে স্বভাবের সাধনায় অধিকার জন্মে, তৎপূর্বে নহে। ভাবের সাধনা অত্যন্ত কঠিন। অথচ মূলে অহংকার নাই বলিয়া এবং ইহা পুরুষকারের খেলা নহে বলিয়া অত্যন্ত সরল। কারণ যখন হয় তখন ইহা আপনিই হইয়া থাকে। স্বভাবের সাধনা কাহাকেও করিতে হয় না। ব্রজলীলা স্বভাবের সাধনারই নামান্তর। এই কথা ক্রমশঃ আরও পরিস্ফুট হইবে।

অভাবের জগৎ পার হইয়া ভাব জগতে প্রকাশ করিতে হয়। জাগতিক অভাব দূর না হইলে ভাবরাজ্যের আনন্দে যোগদান করিতে পারা যায় না। ইহা সবই সত্য। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে ভাব-রাজ্যেও এক হিসাবে অভাবেরই রাজ্য। কারণ যদি ভাবের সহিত অভাবের যোগ না থাকিত তাহা হইলে স্বভাব রূপে পরমানন্দ ধারা বহিত না। স্বভাবই যোগমায়া। লীলারসের বিকাশ ইহারই অধীন। স্বভাবের রাজ্যে জাগতিক অভাব নাই ইহা সত্য, কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে অভাব নাই ইহা সত্য নহে। কারণ প্রকৃত অভাব

যাহা তাহা ঐ সময়ই অনুভব করা যায়। জাগতিক অবস্থার মধ্যে খণ্ড ভাবের অনুভূতি হইত এবং খণ্ড ভাবের দ্বারাই তাহার তৃপ্তি হইত। কিন্তু জাগতিক সত্তার উর্দ্ধে স্বভাবের আত্মপ্রকাশের মধ্যে যে অভাবের রোল ধ্বনিত হইয়া উঠে তাহা অত্যন্ত করুণ।

মায়িক জগতের অভাব খণ্ড ভাবের দ্বারা তৃপ্ত হইতে পারে, কিন্তু মায়াতীত অগতের অভাব মহাভাব ভিন্ন তৃপ্ত হইতে পারে না। এই অভাব অনন্ত, কিন্তু অভাব থাকা সত্ত্বেও এ জগৎটি দুঃখের জগৎ নহে, আনন্দের জগৎ। ইহার কারণ এই জগতের অধিষ্ঠাত্রী শক্তি যোগমায়া—মায়ামাত্র নহে। এই জগতে অভাববোধের সঙ্গে সঙ্গে ভাব ফুটিয়া উঠে। তাই তৃপ্তি অথবা আনন্দ রূপে চৈতন্য স্ফুর্ত্তি লাভ করে। যদি অভাব এখানে না থাকিত তাহা হইলে স্বভাব আনন্দময় হইত না। সুতরাং বুঝিতে হইবে অভাববোধ হইতেই দুঃখ ও সুখ উভয়েরই আবির্ভাব হয়। তবে পার্থক্য এই যে মায়া-জগতে অভাব বোধ হইলেও ভাবের দ্বারা সঙ্গে সঙ্গে তাহার তৃপ্তি সাধন হয় না। যতক্ষণ তাহা না হয় ততক্ষণ দুঃখবোধ অনিবার্য্য। কিন্তু শুদ্ধ নিত্য জগতে অভাব বোধের সঙ্গে সঙ্গেই তদনুরূপ ভাব আত্মপ্রকাশ করিয়া থাকে। সুতরাং তখন ঐ অভাব বোধই আনন্দের হেতু হইয়া দাঁড়ায়। এইভাবে ভাব জগতে পর পর আনন্দের তরঙ্গ বহিতেই থাকে। ইচ্ছা ও প্রাপ্তির মধ্যে ব্যবধানের অন্তরাল থাকে না বলিয়া ইচ্ছা কিছুক্ষণ অপূর্ণ থাকিয়া দুঃখের সৃষ্টি করিতে পারে না।

এই ভাবরাজ্যে প্রবেশ করিবার মুখ্য উপায় মহা ইচ্ছার স্রোতে স্বীয় ইচ্ছাকে বিসর্জন দেওয়া। প্রতিদানে কিছুই পাইবার আশা না রাখিয়া নিজের ব্যক্তিগত ইচ্ছা ও শুভাশুভ বোধকে চিরদিনের জন্য অর্পণ করা। যে মহা ইচ্ছা ভাব জগতে অব্যাহত গতিতে ক্রীড়া করিয়া থাকে তাহাই মনুষ্য চিত্তে খণ্ড ইচ্ছা রূপে আবির্ভূত হয়। কিন্তু মনুষ্য কর্তৃত্বাভিমানবিশিষ্ট বলিয়া স্বীয় ইচ্ছাকে ও বিচার শক্তিকে বিসর্জ্জন দিতে চাহে না। গুরু-আজ্ঞা অথবা শাস্ত্রের

আদেশ মহা ইচ্ছারই প্রতিনিধি মাত্র। এই জন্য নির্বিচারে গুরু আজ্ঞা পালন করিতে না পারিলে নিত্যধামে স্বীয় ভাবানুরূপ স্থিতি লাভ করা যায় না। বস্তুতঃ বিনা বিচারে নিজের ইচ্ছা বিসর্জন দেওয়া, ফলাকাঙ্খা না রখিয়া অতীতের চিন্তা না করিয়া বর্তমানের দোষ গুণের দিকে লক্ষ্য না রাখিয়া গুরুর আজ্ঞা প্রতিপালন পূর্বক তাঁহার ইচ্ছার সঙ্গে নিজের ইচ্ছা যুক্ত করা, ইহাতে অতি সহজেই কর্মবন্ধন কাটিয়া যায় এবং ভাবরাজ্যে প্রবেশের দ্বার খুলিয়া যায়।

জীব স্বাধীন কি পরাধীন সে বিচার উত্থাপন করিবার আবশ্যকতা নাই। তবে ইহা সত্য যে সে একদিকে স্বাধীন এবং অপর দিকে সম্পূর্ণ অপরের অধীন। জাগতিক ঘটনা পরম্পরা কার্য্যকারণভাবে বিন্যস্ত শক্তিবর্গের পরস্পর সংঘর্ষের ফল। কারণা-স্বরূপ কার্য্যের উদ্ভব এই নিয়মেই হইয়া থাকে। ইহাই নিয়তি এবং কালশক্তি। সমগ্র জড় জগৎ এই নিয়তির অধীন। সাধক জীব গুরূপদিষ্ট সাধনার দ্বারা এই নিয়তি অথবা কালশক্তিকেই জয় করিয়া থাকে। তখন সে ভাবরাজ্যে প্রবেশ করিতে সমর্থ হয়। মনুষ্য চৈতন্য স্বরূপে স্বাধীন কিন্তু দেহ সম্বন্ধ বশতঃ দেহের দিক দিয়া পরাধীন। ভগবৎ শক্তির প্রতিনিধিরূপে গুরুর ইচ্ছা সাধক-জীবনে কার্য্য করিয়া থাকে। ইহাই আজ্ঞা রূপে অথবা বিধিনিষেধ রূপে প্রকাশিত হয়। জীব নিজের ইচ্ছাকে এই ব্যাপক ইচ্ছার সঙ্গে সজ্ঞানে যোগ করিতে পারিলে অশেষ ক্লেশ হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারে। জীব স্বাধীন বলিয়া তাহার ইচ্ছা অর্পণ সম্পূর্ণ ভাবে তাহারই অধীন। সে নির্বিচারে গুরুর আদেশ গ্রহণ করিতে পারে অথবা ইচ্ছা করিলে নাও করিতে পারে। এই ক্ষেত্রে তাহার সম্পূর্ণ স্বাধীনতা রহিয়াছে। এইস্থলে তাহার ফলাফল দেখিবার আবশ্যকতা নাই। তাহার স্ব ইচ্ছাকে নির্বিচারে গুরু আজ্ঞার সম্মুখে প্রসন্ন চিত্তে বলিদান করিতে পারিলে গুরুর অহেতুক কৃপা লাভ করিতে পারা যায়। অহেতুক কৃপা লাভ করিতে হইলে নিজের আত্মবিসর্জন ও অহেতুক হওয়া আবশ্যক। ইহাই মহাবিশ্বাস ও নির্ভরের

রহস্য। ইহার ফলে ক্ষণিকের জন্য সাধক ইচ্ছাহীন হইয়া তাহার পর ভাবরাজ্যে প্রবিষ্ট হয়। তখন ভগবদিচ্ছাই স্ব ইচ্ছারূপে কার্য্য করিয়া থাকে। এই ভাবের রাজ্যে একমাত্র ইচ্ছা সর্বত্র অনন্ত রূপে ক্রীড়া করিতেছে। এই ইচ্ছা বস্তুতঃ কাহারও ইচ্ছা নহে—ইহা অনিচ্ছার ইচ্ছা অথবা স্বভাবের খেলা। এই ইচ্ছাই মায়াতীত অভাব, যাহা হইতে অনন্ত লীলাবিলাস অনন্ত রূপে প্রকাশ পাইতেছে। যেদিন এই অনন্ত অভাবের উপশম হইবে সেই দিন জীব নিত্যলীলার মধ্যেও লীলাতীত ভাবে বিশ্রাম লাভ করিবে।

———

৬

ভাবরাজ্য ও লীলারহস্য (ক)

শ্রীকৃষ্ণ তত্ত্বটি কামতত্ত্ব। কামবীজ ও কামগায়ত্রী ইহার স্বরূপ। প্রসঙ্গতঃ একথা পূর্ব্বে কিছু বলা হইয়াছে। রাধাকৃষ্ণ একই তত্ত্বের দুইটি দিক। উভয়ে ভেদ নাই এবং আত্যন্তিক অভেদও বলা যায় না। এই জন্যই এইটিকে যুগল তত্ত্ব বলিয়া বর্ণনা করা হয়। এক ও বহু, ইহার মধ্যবর্ত্তী অবস্থাই দুই। দুইকে আশ্রয় না করিয়া এক বহুরূপে প্রকাশিত হইতে পারে না। বহু অবস্থায় ভেদ পরিস্ফুট থাকে। কিন্তু যখন এই পরিস্ফুট ভেদ অতিক্রান্ত হয় তখন অভেদের মধ্যেই যাবতীয় ভেদ উপসংহৃত হইয়া থাকে। এই অবস্থাটি যুগল অবস্থা। একই তত্ত্ব অর্দ্ধাঙ্গ পুরুষ ও অর্দ্ধাঙ্গ প্রকৃতি রূপে প্রকাশিত হইলে তাহাকে অবশ্য একই বলা হয়, তথাপি তাহা এক হইয়াও দুই। প্রকারান্তরে তাহা ঠিক দুইও নহে, তাহা দুই হইয়াও এক। যেখানে শুধু এক সত্তা, যেখানে দ্বিতীয়ের আভাস একের মধ্যে জাগরূক থাকে না, সেখানে এক নিজেকেও নিজে দেখিতে পায় না। ইহা বোধহীন জড়ত্বের অবস্থা। এই এক সত্তা প্রকাশাত্মক চিৎস্বরূপ হইলেও ইহাকে চেতন বলা যায় না। কারণ ইহা নিজের স্বরূপ নিজে উপলব্ধি করিতে পারে না। যেখানে উপলব্ধি নাই সেখানে আনন্দের আস্বাদন কোথায়? এই জন্যই মহাচৈতন্যে এক কলা সুপ্তির আবির্ভাব হইলে পরিচ্ছিন্নতাবশতঃ অবিভক্ত এক সত্তা দুই সত্তায় পরিণত হয়। অর্থাৎ এক সত্তার মধ্যেই দ্বিতীয় সত্তার স্ফুরণ হইয়া থাকে। এই অবস্থায়ই আনন্দের আস্বাদন সম্ভবপর।

উপনিষদে আছে—'স একাকী নারমত স আত্মানং দ্বিধা করোৎ অর্দ্ধেন পুরুষোঽভবৎ অর্দ্ধেন নারী'—ইত্যাদি। ইহা হইতে প্রতীত হয় যেটি একাকী অর্থাৎ সকল অবস্থা তাহাতে আনন্দের অনুভূতি প্রকট থাকে না। আনন্দের আস্বাদনের জন্য মূল এক সত্তা নিজেকে

ভাগ করিয়া দুই সত্তায় পরিণত হয়। এই দুইটি সত্তার একটি পুরুষ অর্থাৎ পরমপুরুষ এবং অপরটি প্রকৃতি অর্থাৎ পরমা প্রকৃতি। এই পুরুষও প্রকৃতির মধ্যে আত্যন্তিক বিচ্ছেদ নাই। বস্তুতঃ পুরুষ ও প্রকৃতি একই স্বরূপের দুইটি অঙ্গ মাত্র। কিন্তু এই দুইটি অঙ্গ পরস্পর বিরুদ্ধ। কিন্তু বিরুদ্ধ হইলেও একটি অপরটির জন্য প্রতীক্ষা করিয়া থাকে। নতুবা কোনটিই পূর্ণ হইতে পারে না। পুরুষ আত্মার পূর্ণতার জন্যই প্রকৃতিকে এবং প্রকৃতিও নিজের পূর্ণতার জন্য পুরুষকে প্রার্থনা করে। পুরুষ ভিন্ন প্রকৃতি অপূর্ণ এবং প্রকৃতি ভিন্ন পুরুষও অপূর্ণ। এইজন্য এই দুইটি বস্তুতঃ দুই নহে, দুইয়ে মিলিয়া এক! একটি অর্দ্ধাঙ্গ এবং অপরটি তাহার অবশিষ্ট অর্দ্ধাঙ্গ।

এই যে পুরুষের স্বীর তৃপ্তি বা পূর্ণতার জন্য প্রকৃতির দিকে ঈক্ষণ অথবা প্রকৃতির স্বকীয় তৃপ্তির জন্য পুরুষের দিকে ঈক্ষণ ইহাকেই কাম বলে। ইহাই সৃষ্টির মূল। এই কাম ত্রিগুণাতীত মায়াতীত অত্যন্ত শুদ্ধ দিব্য প্রেম স্বরূপ।

শাস্ত্রে আছে প্রাকৃত জগতে কামের শক্তি রতি। অপ্রাকৃত ভাব জগতেও বাস্তবিক পক্ষে তাহাই। কারণ এইখানেও কামের শক্তি রতি। ভেদ শুধু এই অংশে যে একটি প্রাকৃত এবং ত্রিগুণাত্মক, কিন্তু অপরটি অপ্রাকৃত ও ত্রিগুণাতীত এবং বিশুদ্ধ সত্বাত্মক, প্রাকৃতিক কাম ও অপ্রাকৃত কাম মূলতঃ এক হইলেও কার্য্যতঃ বিভিন্ন। প্রাকতিক কাম বর্জন করিতে না পারিলে অপ্রাকৃত কামের কোনই সন্ধান পাওয়া যায় না। অপ্রাকৃত কাম স্বচ্ছ হইলেও প্রাকৃত কামের ন্যায় যাবতীয় বৃত্তিই তাহাতে প্রকাশিত হয়। প্রাকৃত কামের বিরোধী জ্ঞান। সুতরাং জ্ঞানের উদয় হইলে অর্থাৎ জ্ঞানরূপে অগ্নি প্রদীপ্ত হইলে প্রকৃত কাম এবং উক্ত কামের কার্য্য কিছুই বর্ত্তমান থাকে না। এই জন্য শিবের তৃতীয় নেত্রজাত বহ্নি দ্বারা প্রাকৃত কাম দগ্ধ হইয়াছিল। কিন্তু অপ্রাকৃত কাম ও জ্ঞান এই উভয়ের মধ্যে ঐ প্রকার সম্বন্ধ লক্ষিত হয় না। কারণ জ্ঞানের সবিশেষ ঘনীভূত অবস্থাই আনন্দ যাহার নামান্তর অপ্রাকৃত কাম। জ্ঞান নির্বিশেষ।

কিন্তু অপ্রাকৃত কাম সবিশেষ। জ্ঞানের সামর্থ্য নাই যে অপ্রাকৃত কামকে দগ্ধ করে। পক্ষান্তরে অপ্রাকৃত কামের উদয় হইলে জ্ঞান নিষ্প্রভ হইয়া যায়। অপ্রাকৃত কামই ভাবরাজ্যের সারবস্তু। ইহাই ভগবানের আনন্দময়ী নিত্যলীলার মূল উপাদান। কাম ভস্ম হইয়া আনন্দ অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ইহা শুধু পৌরাণিক কথা নহে, অধ্যাত্ম জগতের একটি নিগূঢ় সত্য। ভগবতী ললিতার অপাঙ্গ দৃষ্টিতে মন্মথ উজ্জীবিত হইয়া পুনর্বার আকার ধারণ করে। এই আকার প্রাকৃতিক উপাদানে রচিত নহে বলিয়া ইহা আর জ্ঞানাগ্নির দাহ্য থাকে না। এই যে সাকার কাম ইহাই অপ্রাকৃত নবীন মদন যাহার কথা তত্ত্বজ্ঞ মর্মগ্রাহী ভক্তগণ কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। শ্রীকৃষ্ণ তত্ত্বের ইহাই স্বরূপ। সুতরাং এক হিসাবে ললিতার অপাঙ্গ দৃষ্টি হইতে অনঙ্গ অপ্রাকৃত অঙ্গ প্রাপ্ত হয় বলিয়া কার্য্য ও কারণের অভেদ বিবক্ষায় শ্রীকৃষ্ণকেও ললিতাতত্ত্বসহ অভিন্ন মনে করা হয়। 'কদাচিদ্ আদ্যা ললিতা পুংরূপা কৃষ্ণ বিগ্রহা' ইত্যাদি বাক্য হইতেও ললিত ও কৃষ্ণের অভেদ সিদ্ধ হইয়া থাকে। ললিতা কামেশ্বরী-তত্ত্ব। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণতত্ত্বের সহিত যে তাহার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে তাহা বলাই বাহুল্য। শ্রীকৃষ্ণ অপ্রাকৃত কাম এবং শ্রীরাধা অপ্রাকৃত রতি।

কামতত্ত্বের স্ফুরণের সঙ্গে সঙ্গেই এক অদ্বৈত বিন্দু দুই রূপে পরিণত হইল এবং এই একের সহিত দুইয়ের আবশ্য আকর্ষক সম্বন্ধ স্থাপিত হইল। একবার এক বিন্দু হইতে বিন্দুদ্বয়ের নির্গম হইতে লাগিল আবার বিন্দুদ্বয় সংকুচিত হইয়া একে লীন হইতে লাগিল। ইহাই বিন্দু বিসর্গের খেলা। বিন্দু জ্ঞান, বিসর্গ কর্ম। বিন্দু চিৎ, বিসর্গ আনন্দ। বিন্দু শিব বা প্রকাশ, বিসর্গ শক্তি বা বিমর্শ। বিন্দু বিসর্গের খেলাই কামকলা বিলাস। শাস্ত্রে আছে—

"অহং চ ললিতাদেবী রাধিকা যা চ গীয়তে।
অহং চ বাসুদেবাখ্যো নিত্যং কামকলাত্মকঃ॥
সত্য যোষিৎ স্বরূপাঽহং যোগিচ্ছাহং সনাতনী।

অহং চ ললিতাদেবী পুং রূপা কৃষ্ণ বিগ্রহা।"

ইহা হইতে জানা যায় কামকলার যাহা বিলাস তাহাই রাধা-কৃষ্ণের শৃঙ্গার-ক্রীড়া। এই ক্রীড়া হইতেই প্রতি নিয়ত বাষ্পোদ্‌গমের ন্যায় আনন্দ রস নির্গত হইতেছে। এবং উহা যোগ্য আধারকে প্লাবিত করিয়া সমগ্র বিশ্বে বিস্তার প্রাপ্ত হইতেছে। এই যে কামকলা ইহাতে তিনটি বিন্দু আছে। কারণ বিন্দু দুই, কার্য্য বিন্দু এক। বস্তুতঃ এই কার্য্য বিন্দুই কারণবিন্দুদ্বয়ের সংঘর্ষজনিত আনন্দের উদয় বা প্রাদুর্ভাব। বস্তুতঃ ইহাই নন্দের নন্দন।

কামকলার বিলাস বস্তুতঃ অগ্নি, সোম এবং রবি এই তিনটি বিন্দুর খেলা। অগ্নি ঊর্দ্ধ শক্তি কিন্তু সোম অধঃ শক্তি। অগ্নি শিখা উদগত হইয়া চন্দ্র বিন্দুকে আঘাত করিলে ঐ বিন্দু দ্রবীভূত হয়। চন্দ্রবিন্দু অত্যন্ত কঠিন। অগ্নির আঘাত ব্যতিরেকে উহাতে দ্রুতি আসে না। কিন্তু যখন উহা গলিয়া যায় তখন উহা হইতে অমৃত ক্ষরণ হয় বা ধরা নির্গত হয়। অগ্নি ও সোমের যেটি সাম্যাবস্থা তাহারই নাম কাম অথবা রবি। সুতরাং কামরূপী সবিতার এক পৃষ্ঠে অগ্নিরূপী তাপ এবং অপর পৃষ্ঠে চন্দ্ররূপী সুশীতলতা। চন্দ্র ষোড়শী কলার নামান্তর। ইহা নিষ্কলঙ্ক শুদ্ধ চন্দ্রবিন্দু বুঝিতে হইবে। পঞ্চদশ কলা প্রতিবিম্ব-রূপে অগ্নিমণ্ডল কালচক্রের আকারে আবর্তন করিতে থাকে। অগ্নিশিখা ষোড়শী কলা রূপ অমৃত বিন্দুকে আঘাত করিলে যে অমৃত ধারা নির্গত হয় তাহা সর্বপ্রথমে কামরূপী রবি ঊর্দ্ধ রশ্মি দ্বারা আহরণ করিয়া থাকে। পরে উহা নির্গত হইয়া অগ্নিমণ্ডলস্থ পঞ্চদশকলাত্মক চন্দ্রে সঞ্চারিত হয়। এই পঞ্চদশ কলা হইতে অনিত্য জগতের সৃষ্টি হইয়া থাকে। নিত্যধামের সৃষ্টি ষোড়শীরূপা অমৃত কলা হইতে হইয়া থাকে। অমৃত কলা ক্ষুব্ধ হইয়া আনন্দময় ভাবরাজ্য গঠন করে। ষোড়শীকলা কালচক্রের অধীন নহে বলিয়া স্বভাবতঃ অগ্নি বা কাল বা মৃত্যুর অধীন নহে; কিন্তু পঞ্চদশ কলা স্বরূপতঃ চন্দ্রকলা হইলেও কালরাজ্যের অন্তর্গত এবং অগ্নি বা মৃত্যুর অধীন। অতএব পঞ্চদশ কলা হইতে অনিত্য রাজ্যে যে সকল দেহ রচিত হয় মৃত্যুই তাহার

পর্য্যবসান। কারণ যদিও ঐ সকল দেহেরও উপাদান ষোলকলা তথাপি উহা সোমের অমৃতকলা নহে। এই জন্য মৃত্যুরূপ অগ্নিদ্বার উহার অবসান ঘটিয়া থাকে।

অগ্নি দুই প্রকার। এক কালাগ্নি, দ্বিতীয় জ্ঞানাগ্নি। প্রাকৃত দেহ উভয় প্রকার অগ্নি দ্বারাই দগ্ধ হইয়া যায়, তবে কালাগ্নির দ্বারা দগ্ধ হইলে উহার পুনরুত্থান হয়। এই জন্য সংসারের নিবৃত্তি হয় না। কারণ কাল বীজকে নাশ করিতে পারে না বলিয়া ঐ অবশিষ্ট বীজ হইতে অভিনব দেহের উৎপত্তি হইয়া থাকে। কিন্তু ঐ দেহ জ্ঞানাগ্নির দ্বারা দগ্ধ হইলে নির্বীজ হয়, কারণ জ্ঞানরূপী অগ্নি বীজকেও দগ্ধ করিয়া থাকে। এইজন্য জ্ঞানের ফলে বিদেহ অবস্থা লাভ করিলে পুনর্বার সংসারে আবর্ত্তন ঘটে না।

কিন্তু যে দেহ সোমের অমৃত কলা দ্বারা রচিত উহাকে কোন অগ্নি স্পর্শ করিতে পারে না—কালাগ্নিও নহে জ্ঞানাগ্নিও নহে। ঐ দেহ ভাগবতী তনু বলিয়া প্রসিদ্ধ। ভগবান, তাঁহার পার্ষদ ভক্তগণ, নিত্য মণ্ডল সকলেই ঐ প্রকার দেহে বিশিষ্ট। যাঁহারা ভক্তি সাধনার ফলে ভাবরাজ্যে প্রবেশ করেন তাঁহারাও ঐ প্রকার দেহ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। ঐ দেহে অগ্নি স্পর্শ হয় না বলিয়া উহা নিত্য নির্বিকার। উহা মৃত্যুর অতীত এবং জরা রহিত।

পূর্বে যে অগ্নি এবং সোমের মিলন জনিত অমৃতস্রাবের কথা বলা হইল তাহাই রাধা-কৃষ্ণের নিত্য মিলন জনিত রসপ্রবাহের নামান্তর। ভাবরাজ্যে প্রবিষ্ট ভক্তগণ এই রসময় দেহই প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, যাহা নিত্য অমৃতকলাময়। এই দেহের সোমকলা কখনই ক্ষয়প্রাপ্ত হয় না (কারণ ইহা কালরূপ অগ্নির অধিকারের বহির্ভূত)। যৌবনের পরবর্ত্তী কোন অবস্থা ইহাকে স্পর্শ করে না। অভিনয়ের প্রয়োজনানু-রোধে যে কোন প্রকার রূপের আবির্ভাব হইতে পারে, তথাপি এই সকল রূপ আবরণ মাত্র। মূলরূপটি জরা ও বিকার রহিত। ভাব-জগতে বিভিন্ন প্রকার ভাবের সন্নিবেশ রহিয়াছে, সুতরাং ভাবানুরূপ দেহও বিদ্যমান আছে। কিন্তু সর্বভাবের পরিসমাপ্তি মধুর ভাবে।

এই মধুই ভাবের লীলাই ব্রজলীলা। বস্তুতঃ মধুর ভাবটিকে কেন্দ্রে রাখিয়া অন্যান্য যাবতীয় ভাব তাহার চারিদিকে স্থিতি লাভ করে। যে কোন ভাবেই সাধক অবস্থান করুক না কেন তাহাকে চরম অবস্থায় মধুর ভাব আশ্রয় করিতেই হইবে। কারণ প্রকৃতি না হইয়া প্রকৃতির লীলা আস্বাদন করা যায় না, যদিও ভাব মাত্রই স্বভাব বলিয়া প্রকৃতিরই অন্তর্গত তথাপি মধুর ভিন্ন অন্যান্য ভাবে পুরুষকারের কিঞ্চিৎ আভাসের গন্ধ রহিয়াছে। এই জন্যই মধুর ভাবই বস্তুতঃ চরম ভাব। এই মধুর ভাব লাভ করিলে ভগবানের ন্যায় সিদ্ধ ভক্তেরও কৈশোর পর্য্যন্ত বয়স অভিব্যক্ত হয়। স্থুল দৃষ্টিতে বয়সের নিরূপণ কালের অধীন বলিয়া সর্বত্র প্রসিদ্ধ আছে। কিন্তু নিত্যধামে কালের ক্রিয়া নাই বলিয়া সেখানকার বয়স কালাধীন নহে। তাহা কালের বিকাশের অধীন। বাল্য পৌগণ্ড কৈশোর প্রভৃতি অবস্থা কলারই বিভিন্ন প্রকার বিকাশ অবস্থা। কলার পূর্ণ বিকাশ হইলে ষোড়শীর অভিব্যক্তি হয়। ইহাই ললিতা। ইহাই রাধা। বস্তুতঃ ইহাই কৃষ্ণ তত্ত্ব।

যুগল তত্ত্ব উপলক্ষ্য করিয়া কামকলার কিঞ্চিৎ বিশ্লেষণ এইখানে অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। এই বিশ্লেষণে অগ্নি সোম ও রবি এই তিনটি বিন্দুরই স্বরূপ ও ক্রিয়াগত মীমাংসা রহিয়াছে। তিনটি বিন্দুর মধ্যে একটি অগ্নিস্বরূপ, অপরটি সোমস্বরূপ এবং তৃতীয় বিন্দুটি রবি-স্বরূপ—ইহার নাম কাম বা সংযুক্ত বিন্দু। ইহার দুইটি অংশ অগ্নিরূপে এবং সোমরূপে প্রকাশিত থাকে। কেহ কেহ ঐ দুইটি বিন্দুকে চন্দ্র ও সূর্য্যরূপেও গ্রহণ করিয়া থাকেন। এই দুইটি শুক্র ও রক্ত বিন্দু নামে প্রসিদ্ধ। এই দৃষ্টি অনুসারে তৃতীয় বিন্দুটি অগ্নি স্থানীয়। এই প্রকার বিভিন্ন ধারায় তত্ত্ব বিন্যাস হইতে পারে। তবে ইহা মনে রাখিতে হইবে চন্দ্রের ষোল কলা—এই কলাগুলি কার্য্য-রূপে পরিণত হয়। আমরা এই স্থলে প্রথম দৃষ্টিকোণ অবলম্বন করিয়া মহাবিন্দুটিকে উভয়বিন্দুর সামরস্যরূপে গ্রহণ করিতে চেষ্টা করিতেছি। এই সামরস্যবিন্দুটিই কাম। ক্ষোভ অবস্থার পর ইহাতে

যে দুইটি ভেদ লক্ষিত হয় তাহার একটিকে অগ্নি এবং অপরটিকে চন্দ্র বলিয়া গ্রহণ করা আবশ্যক। সৃষ্টিমুখে বিক্ষোভের পর যখন অগ্নি ও চন্দ্র পরস্পর পৃথক্ হইয়া যায় তখন চন্দ্রের মধ্যে অগ্নির এবং অগ্নির মধ্যে চন্দ্রের অনুপ্রবেশ সম্পন্ন হয়। এই জন্যে অগ্নির মধ্যেও চন্দ্রকে পাওয়া যায়। ইহাই পঞ্চদশ কলারূপী চন্দ্র। এই চন্দ্র অগ্নিদ্বারা অনুবিদ্ধ বলিয়া কখনও না কখনও অগি ইহাকে শোষণ করিবেই। অতএব পঞ্চদশ কলাত্মক চন্দ্রের যাবতীয় বিকার কখনও না কখনও মৃত্যুর দ্বারা অভিভূত হইতে বাধ্য। কিন্তু যেটি ষোড়শী কলা নামে প্রসিদ্ধ তাহা অমৃত কলা। পঞ্চদশ কলা পর্য্যন্ত অগ্নি অথবা কামের অধিকার। এই জন্য যে রূপ ষোড়শী কলা হইতে উদ্ভূত তাহা নিত্য নির্ম্মল এবং অগ্নি সংস্পর্শ বিহীন। ষোড়শী কলা অগ্নি দ্বারা আক্রান্ত হয় না বলিয়া যে দেহ ষোড়শী কলার জন্য অমৃত হইতে উদ্ভূত তাহাতেও কালের ধর্ম বিকার উৎপন্ন হয় না। এই জন্য এই দেহ শুধু যে মৃত্যু অতিক্রান্ত হইয়া যায় তাহা নহে, ইহা বস্তুতঃ মৃত্যুকে জয় করিয়া মৃত্যুঞ্জয় নাম ধারণ করিয়া থাকে। পঞ্চদশ কলা ষোড়শীর মধ্যে লীন হইয়া ষোড়শীরূপে বিদ্যমান থাকে। এইজন্য ষোড়শী কলা হইতে জাত দিব্যজগতের প্রতি দেহই অমৃতময়। উহা সবই ষোড়শী কলাত্মক বলিয়া অভিন্ন। কিন্তু এই অভেদ সত্ত্বেও পঞ্চদশ কলার প্রতি কলার বৈশিষ্ট্য ষোড়শীমধ্যেও বিদ্যমান থাকে। অর্থাৎ যেটি পঞ্চমী তাহা পঞ্চমী হইয়াও ষোড়শী এবং ষোড়শী হইয়াও পঞ্চমী, যেটি দশমী তাহা দশমী হইয়াও ষোড়শী এবং ষোড়শী হইয়াও দশমী। এই ভেদ বা পঞ্চদশ কলার অনন্ত বৈচিত্র ষোড়শীর অদ্বৈত সত্তার মধ্যে বিদ্যমান থাকে।

দেহ মাত্রই চন্দ্রকলা হইতে উদ্ভূত। এই চন্দ্রকলা পঞ্চদশ কলা রূপই হউক অথবা ষোড়শীকলারূপই হউক তাহাতে কিছু আসিয়া যায় না। পঞ্চদশ কলা হইতে যে স্বরূপ প্রকটিত হয় তাহার নিত্যতা আপেক্ষিক। কারণ ঐ দেহ মৃত্যুকে জয় করিতে পারে না। চরমা-বস্থায় মৃত্যুরূপী অগ্নি যখন সমগ্র রসটুকুকে শোষণ করিয়া লয় তখন

দেহপাত হইয়া থাকে। তৈলের অভাবে প্রদীপ যেমন নিভিয়া যায় ঠিক সেইরূপ সোম-কলার অভাবে দেহস্থিতি খণ্ডিত হইয়া যায়। ইহাই মৃত্যুর জয়। এই অবস্থার পূর্ণ পরিণতি মহামৃত্যু অথবা বিদেহ কৈবল্য।

কিন্তু মনে রাখিতে হইবে এই দেহ প্রাকৃত দেহ। ইহা যতই শুদ্ধ হউক ইহার প্রাকৃতত্ব মুক্ত হয় না। এই জন্য মহামৃত্যুতে ইহার পর্য্যবসান। কিন্তু যে দেহ ষোড়শী কলা হইতে উদ্ভূত হয় তাহা বৈন্দব দেহ। ঐ দেহ স্বভাব অনুসারে যত কলারই প্রতীত হউক না কেন বস্তুতঃ উহা ষোড়শী। অগ্নি ঐ দেহকে জয় করিতে পারে না। অর্থাৎ উহাকে শোষণ করিয়া রসহীন করিতে পারে না। এই প্রসঙ্গে ইহা মনে রাখিতে হইবে, প্রথম আবির্ভাবের পর এই বিশুদ্ধ দেহও অগ্নির দ্বারা আক্রান্ত হইয়া থাকে। পুনঃ পুনঃ অগ্নি কর্ত্তৃক আক্রমণের ফলে একদিকে যেমন পরিমিত শোষণ-কারিণী অগ্নি শক্তি ক্ষীণ হইয়া যায় অপরদিকে তেমনি রসময় দেহের ক্রমবিকাশ সিদ্ধ হইতে থাকে। এই ক্রমবিকাশের ফলে কালাগ্নি ক্ষীণ হইয়া যাওয়ার পরে অমৃত কলাই শুদ্ধ বিদ্যমান থাকে। ইহাই সাকার সিদ্ধি অথবা ভাগবতী তনুর পূর্ণতালাভ। এই অবস্থার পরে আর ক্রমবিকাশ নাই, কারণ ইহা ষোড়শী কলারই আত্মস্ফুরণ, যদিও এই স্ফুরণ কোথাও এক কলা রূপে, কোথাও পাঁচ কলা রূপে, কোথাও দশ কলা রূপে, কোথাও বা বার কলা রূপে আত্মপ্রকাশ করিয়া থাকে। প্রকৃত দেহে সোমাংশের ক্ষয় হইলেই অগ্নির পূর্ণ ক্রিয়া উপলব্ধ হয় এবং তাহার ফলে দেহ ও দেহবীজ বিনষ্ট হইয়া নিরাকার স্থিতির উদয় হয়। পক্ষান্তরে অপ্রাকৃত দেহে অগ্নি অংশের ক্ষয় হইয়া গেলে অনন্ত অমিশ্র সোমকলাই বিদ্যমান থাকে। এই অবস্থায় নিত্য সিদ্ধ সাকার ভাবের স্ফুরণ হইয়া থাকে।

বলা বাহুল্য, সমগ্র ভাবরাজ্যে এই প্রকার অনন্ত নিত্য সাকারের দ্বারা গঠিত। এই সোমকলা পূর্ণ সাকার পিণ্ড সকল অগ্নিজয়ী বলিয়া মহাপ্রলয়েও ইহারা বিনষ্ট হয় না।

কামকলাতত্ত্ব প্রসঙ্গে অগ্নি, সোম এবং রবি এই তিনটি বিন্দু এবং চিৎকলা বা হার্দ্ধ কলা বিশেষরূপে আলোচ্য।

রবি অথবা উর্দ্ধ বিন্দু অধঃস্থিত চন্দ্র ও অগ্নিরূপ অর্থাৎ শুক্ল ও রক্তরূপ বিন্দুদ্বয়ের নিত্যযুক্ত অবস্থা। কামিনী-তত্ত্বে উর্দ্ধ বিন্দু মুখ রূপে এবং অধঃ বিন্দুদ্বয় স্তন যুগল রূপে কল্পিত হইয়া থাকে। বলা বাহুল্য, উর্দ্ধ বিন্দু হইতেই সমগ্র মস্তকের রচনা হয়। তদ্রূপ অধঃ বিন্দু দ্বয় হইতে কণ্ঠ হইতে নাভি পর্য্যন্ত দেহ-অংশ নির্মিত হয়। যাহাকে হার্দ কলা বা চিৎকলা বলিয়া উল্লেখ করা হইল তাহা ত্রিকোণাত্মক যোনির প্রতি রূপক। উহা হইতে নাভির নিম্নাংশ রচিত হইয়া থাকে। এই ভাবে কামিনী তত্ত্ব অথবা কুণ্ডলিনী শক্তি সাকার ভাবে যোগীর ধ্যান গোচর হইয়া থাকে। এই কামিনী তত্ত্বের অভিনিবেশ বশতঃ সাধক প্রকৃতি ভাবাপন্ন হইয়া কামতত্ত্ব আয়ত্ত করিতে সমর্থ হয়।

অ এবং হ এই উভয়ের সমাহারে বিন্দু সহযোগে অহংভাবের স্ফুরণ হইয়া থাকে। এই অহং ভাবই মূলীভূত কামতত্ত্ব। ইহাই অপ্রাকৃত নবীন মদন। অ বর্ণমালার আদি ও হ বর্ণমালায় অন্ত, উভয়ের সমাহারে সমগ্র বর্ণমালাই দ্যোতিত হইতেছে। অ প্রকাশাত্মক পরম শিব এবং হ বিমর্শরূপা পরাশক্তি, উভয়ের ভাব অথবা নিত্যযুক্ত ভাব সিদ্ধ হইতেছে। ইহাকেই যুগল মিলন বলে। সুতরাং যাহাকে অহংভাব বলা হয় তাহাই নিত্যসিদ্ধ রাধাকৃষ্ণের যুগল স্বরূপ। মনে রাখিতে হইবে 'অ' যেমন শুদ্ধ চিৎ স্বরূপ, 'হ' তেমনি শুদ্ধ চিৎকলা বা হার্দ কলা। হ আধা এবং এই আধাই রাধা, যিনি অ কে আশ্রয় করিয়া বিন্দু সহকারে অভিন্ন ভাবে বা মিলিত ভাবে প্রকাশ পাইতেছেন।

সুতারাং অ ও হ অর্থাৎ বিন্দু ও বিসর্গ, ইহাই সৃষ্টির আদিম রস-লীলার অন্তরঙ্গ স্বরূপ। অব্যক্তাবস্থা হইতে যখন অচিন্ত্য ভাবে কলার উন্মেষ হয় তখন সর্বপ্রথম চিৎভাবের স্ফুরণ হইয়া থাকে। অন্যান্য ভাব তাহার পরবর্ত্তী। এই চিৎ ভাবের দ্যোতক অনুত্তর বা

অ। ইহার পর ক্রমশঃ অর্থাৎ উত্তরোত্তর কলা সকলের স্ফূর্ত্তি হইতে হইতে পরে অন্তর্মুখ প্রবাহ উপস্থিত হয়। ইহার ফলে যাবতীয় মাতৃকা বর্গের অভিব্যক্তির পর সম্প্রসারণের অবসানে সংকোচভাব নিষ্পন্ন হইয়া বিন্দুতে স্থিতিলাভ হয়। বিন্দু হইতে বিসর্গ এবং বিসর্গ হইতে পুনরায় বিন্দু। ইহারই নাম অহং। ইহাই কাম তত্ত্ব। যাহার নাম কাম তাহাকেই প্রেম বা আনন্দ বলা হইয়া থাকে। ইহার রহস্য ক্রমশঃ বুঝিতে পারা যাইবে।

পশুভাব বীর ভাব ও দিব্যভাব আধ্যাত্মিক ক্রমবিকাশে এই ভাবের পরিচয় আগম শাস্ত্রে প্রাপ্ত হওয়া যায়। পশুভাব অতিক্রান্ত না হইলে বীরভাবের উদয় হয় না। বীরভাব ভেদ না না হওয়া পর্য্যন্ত দিব্যভাব আবির্ভূত হইতে পারে না। পশু কৃত্রিম নিয়মের অধীন, কিন্তু যাহার পশুত্ব ঘুচিয়া গিয়াছে তাহার জন্য কোন নিয়মের বন্ধন আবশ্যক হয় না। সে স্বভাবের প্রবাহে আত্ম সমর্পণ করিয়া থাকে। অভিমান মূলক কোন কর্মই তাহার দ্বারা অনুষ্ঠিত হয় না। পশু অবস্থায় শক্তির বিকাশ থাকে না, অর্থাৎ শক্তি নিদ্রিত থাকে। বস্তুতঃ কুণ্ডলিনী শক্তির নিদ্রিতাবস্থাই পশুত্ব। কুণ্ডলিনী শক্তির পূর্ণ জাগরণ দিব্য ভাব ও ভাবাতীত। ইহারই নামান্তর মহা-চৈতন্য বা শিবত্ব। পশুকে শিব হইতে হইতে বীর বা মনুষ্য ভাব গ্রহণ করিতেই হইবে। এই জন্য যতক্ষণ পর্য্যন্ত বীরভাবের খেলা না সাঙ্গ হয় ততক্ষণ পর্য্যন্ত শিবত্বের অভিব্যক্তি সুদূরপরাহত। শক্তির বিকাশ সিদ্ধ হইলে পশু আর পশু থাকিতে পারে না, তাহাকে রূপান্তর গ্রহণ করিতে হয়। শক্তির জাগরণ নিবন্ধন এই যে রূপান্তর ইহাই মনুষ্যভাব বা বীরভাব। পশুভাবে শক্তির বিকাশ সম্পন্ন হয় না বলিয়া উহা জড়ত্বেরই নামান্তর। দিব্য বা শিবভাবে শক্তির বিকার পূর্ণতয়া সিদ্ধ হয় বলিয়া ঐ অবস্থাটি বিশুদ্ধ রূপে বর্ণিত হয়। ইহার মধ্যবর্ত্তী যে অবস্থা তাহা সুপ্তি ও জাগরণের অন্তরাল দশা। পশু অবস্থায় চৈতন্য শক্তির বিকাশ থাকে না বলিয়া কর্মে অধিকার থাকে। যথাবিধি কর্ম করিতে করিতে পশুত্ব কাটিয়া যায়।

ইহা বস্তুতঃ শক্তির উন্মেষের ফল স্বরূপ। বীরভাবে জাগ্রৎ শক্তির সহিত অন্তরঙ্গ ভাবে সংঘর্ষ চলিতে থাকে। এবং সংঘর্ষের ফলে ক্রমশঃ বীরভাব দিব্য ভাবে পরিণত হয়। জাগ্রৎ চৈতন্য শক্তির সঙ্গে সঙ্গে চৈতন্যের সহিত অবিনাভূত আনন্দশক্তিও জাগিয়া উঠে ও খেলা করিতে থাকে। এই খেলা মনুষ্যের সহিত তাহার ভাবের খেলা—ইহাই ভাবজগতের বৈশিষ্ট্য। এই স্বভাবের খেলাই বীরভাবের উপাসনা। এই উপাসনায় অগ্রসর হইলে আভাসময় দ্বৈতভাব ও যুগল ভাবও পরম অদ্বৈত ভাবে পর্য্যবসিত হয়।

বিন্দুর উর্দ্ধ গতি সিদ্ধ না হওয়া পর্য্যন্ত পশুভাব সম্পূর্ণ প্রকারে অস্তমিত হয় না। সুতরাং বুঝিতে হইবে একমাত্র উর্দ্ধ-রেতাই প্রকৃত বীর। বীরভাবে জাগ্রৎ শক্তির সঙ্গলাভ হইয়া থাকে। অন্তিম অবস্থায় ইহাই যুগললীলায় পর্য্যবসিত হয়। কিন্তু ভাব-রাজ্যের সংঘর্ষণ যতই অধিক ঘটিতে থাকে ততই সাধকের অন্তঃসত্ত্ব অভিব্যক্ত হইয়া কোন না কোন ভাবের রঙ্গে রঞ্জিত হইয়া থাকে। বীরভাবের ক্রমবিকাশ হইতে হইতে যুগল ভাব কাটিয়া গেলে এক অদ্বৈত সত্তাই থাকিয়া যায়। যতক্ষণ এই অদ্বৈত সত্তা পূর্ণ পুরুষের রূপে পরিণত না হয় ততক্ষণ ইহা অসম্পূর্ণ, এবং অপূর্ণ বলিয়াই ইহা নিয়তির অধীন থাকে। এই অবস্থা অদ্বৈত হইলেও ইহাতে স্বাতন্ত্র্যের বিকাশ থাকে না। কিন্তু স্বাতন্ত্র্যের বিকাশ না হওয়া পর্য্যন্ত পূর্ণত্ব এবং মহাচৈতন্য বলা চলে না। প্রথম অবস্থাটি দিব্যভাব, দ্বিতীয়টি ভাবাতীত।

সুতরাং ভাবরাজ্যের এবং মহাভাবের লীলা যে মায়িক জগতের পাশবিক লীলা নহে ইহা বলাই বাহুল্য। কারণ পশুত্ব নিবৃত্ত না হওয়া পর্য্যন্ত অর্থাৎ চিৎশক্তির বিকাশ না হওয়া পর্য্যন্ত স্বভাবের রাজ্যে প্রবেশলাভ ঘটে না। ভাবরাজ্যের লীলা জাগ্রৎ চিৎশক্তির অবস্থায় হয়, চিৎশক্তির অনুন্মেষ অবস্থায় নহে এবং লীলাতীত পূর্ণ চৈতন্য অবস্থায়ও নহে। বিসর্গ শক্তি বিভিন্ন বলিয়া এই লীলাতে চৈতন্য নিহিত থাকে। কিন্তু বিসর্গ শক্তির যতই ভেদ থাকুক তাহা

চরম অবস্থায় বিন্দুতে গুটাইয়া যায়। তখন লীলার উপসংহার হয়। এই লীলার উপসংহারের সঙ্গে সঙ্গেই লীলাতীত আত্মচৈতন্য নিজেকে প্রকাশ করিয়া থাকে। এই চৈতন্য প্রকাশের দ্বারই অহম্।

লীলার চরম উৎকর্ষ শৃঙ্গার লীলাতে, তাহার পূর্ণ বিকাশ রাস-লীলাতে হইয়া থাকে। রাসলীলায় একটি বহিরঙ্গ ও একটি অন্তরঙ্গ ভাগ আছে। যেটি রাসলীলার বহিরঙ্গ তাহাতে প্রত্যেকটি প্রকৃতির সহিত ঐ প্রকৃতির ভোক্তা ও অধিষ্ঠাতা রূপী পুরুষের যুগল মিলন হইয়া থাকে। কিন্তু রাসলীলার যেটি আভ্যন্তরীণ ভাগ তাহাতে অনন্ত প্রকৃতির প্রত্যেকটি এক পরমা প্রকৃতিরূপে ফুটিয়া উঠে এবং প্রকৃতির জাগরণের সঙ্গে সঙ্গেই পরম পুরুষ ও তদনুরূপ-ভাবে তাহার সহিত মিলিত হয়। জীবের অনাদিকালের অনন্ত তৃষ্ণা এই এক মহামিলনে পরম তৃপ্তিলাভ করিয়া থাকে। যুগ যুগান্তরে এবং অনন্ত রূপের মধ্য দিয়া যে মিলনাকাঙ্খী জীবের-জ্ঞানাকাঙ্খী জীবের জ্ঞাতসারে এবং অজ্ঞাতসারে হৃদয়ে সঞ্চিত হইতেছিল রাস মিলনে তাহার পূর্ণ নিবৃত্তি সিদ্ধ হইয়া থাকে। এই মহামিলনের মধ্য দিয়াই অদ্বৈত ব্রহ্মে প্রবেশ হয়।

প্রাকৃত জীব পশুত্ব পরিহার পূর্বক ভাবরাজ্যে প্রবিষ্ট হইয়া এবং ভাবের বিকাশ সাধন করিতে করিতে প্রেম এবং প্রেমের বিভিন্ন বিলাসময়ী অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া সিদ্ধির পূর্বক্ষণে ভগবানের সহিত মিলনে আহুত হইয়া থাকে। বলা বাহুল্য, মাধুর্য্যে প্রবেশ না হওয়া পর্য্যন্ত উহা সম্ভবপর হয় না। এই বহিরঙ্গ লীলা তখনই অন্তরঙ্গ নিকুঞ্জ লীলার আকার ধারণ করে যখন খণ্ড খণ্ড প্রকৃতি মহাপ্রকৃতিরূপিণী হইয়া পরম পুরুষের সহিত মিলিত হইতে উদ্যত হয়।

এই মহামিলনের অনেক রহস্য আছে। কারণ একদিকে যেমন প্রকৃতি আত্মসমর্পণ করিতে করিতে ক্রমশঃ ক্ষীণ হইতে থাকে এবং পুরুষকে পুষ্ট করে, অপর দিকে তেমনি পুরুষ ঠিক ঐ প্রকার

আত্মসমর্পণের ফলে ক্রমশঃ অব্যক্ত হইয়া প্রকৃতিকে পুষ্ট করিয়া থাকে।

এক অবস্থায় প্রকৃতি ক্রমশঃ পুরুষরূপে পরিণত হয় এবং অন্তে একমাত্র পুরুষই বর্ত্তমান থাকে। ইহা পুরুষরূপে সাকার অদ্বৈত স্থিতি। পক্ষান্তরে পুরুষ ক্রমশঃ প্রকৃতিরূপে পরিণত হইয়া চরমে একমাত্র প্রকৃতিকে স্থাপনা করে। তখন প্রকৃতি ভিন্ন আর কিছু থাকে না। ইহা প্রকৃতিরূপে সাকার অদ্বৈত স্থিতি। এইপ্রকার অদ্বৈতভাব যুগপৎ অথবা পরপর সম্পন্ন হইতে পারে। ইহা সিদ্ধ হইয়া গেলে পুরুষ ও প্রকৃতির মহা সামরস্য সংঘটিত হয়। তাহাই যথার্থ অদ্বৈতাবস্থা। যুগল অবস্থা হইতে অদ্বৈত আত্মস্বরূপে স্থিতি পর্য্যন্ত আত্মরমণের বিভিন্ন প্রকার অবস্থা রহিয়াছে। এইগুলি সবই নিকুঞ্জ লীলার অন্তর্গত। ইহার মধ্যেও সমরত বিষমরত প্রভৃতি বিভিন্ন প্রকার অবস্থা আছে, এবং তদনুসারে রসাভিবক্তির সূক্ষ্ম ক্রম ভেদও রহিয়াছে। এখানে তাহা আলোচ্য নহে।

প্রকৃত কাম বিগলিত না হওয়া পর্যান্ত রাসলীলায় যোগদান করা যায় না। রাসলীলা তো দূরের কথা, ভাব জগতের কোন লীলাতেই প্রবেশ করা যায় না, এমন কি বাস্তবিক পক্ষে ভাব জগতেও প্রবেশ করা চলে না। কারণ প্রাকৃত কাম পাশবিক অবস্থা এবং স্বভাবের খেলা পশুত্বের অতীত। শক্তি অর্থাৎ চিৎশক্তি উন্মেষ প্রাপ্ত না হওয়া পর্য্যন্ত কামের প্রভাব বিদ্যমান থাকে। ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্গত কোন স্থানে চিৎশক্তির উন্মেষ নাই—যাহা আছে তাহা মহাশক্তির বিকাশ। মায়াশক্তির রাজ্যে কামকে একেবারে পরিহার করা যায় না। এইজন্য উর্দ্ধতম লোক এবং সম্প্রজ্ঞাত সমাধির উর্দ্ধতম অবস্থাতে বীজরূপে কামসত্তা বিদ্যমান থাকে। কিন্তু অপ্রাকৃত জগতের বিকাশ, ভাবময়। অপ্রাকৃত জগতে কাম কর্ম ও অবিদ্যা এবং অহংকার সবই বিলুপ্ত। সেখানে একমাত্র স্বভাবই খেলা করিয়া থাকে। যদি রাধাকে চিৎশক্তির প্রতীক বলিয়া ধরা হয় তাহা হইলে রাধার সঙ্গ নিবন্ধন যে শ্রীকৃষ্ণের প্রাকৃত কাম আসিতে পারে না তাহা স্পষ্টই

বুঝিতে পারা যায়। এইজন্য রাধাযুক্ত কৃষ্ণই মদনমোহন বলিয়া কীর্ত্তিত হন। রাধা বর্জিত কৃষ্ণ বিশ্ববিমোহন হইয়াও প্রাকৃত কামের অধীন। ইহা হইতে বুঝা যাইবে রাধা বর্জিত কৃষ্ণ ভাব-রাজ্যের বস্তু নহে। উহা প্রাকৃতিক দেব বিশেষ। রাধা বা মহাভাব ক্রমশঃ কৃষ্ণ স্বরূপে আত্মবিসর্জন করিলে অন্তে যে একল কৃষ্ণ ভাব অবশিষ্ট থাকে তাহা রাধা বর্জিত অবস্থা নহে। কারণ রাধা তখন শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপেরই অন্তর্গত। বস্তুতঃ এই কৃষ্ণই অপ্রাকৃত কাম-স্বরূপ। ইহার বীজই কামবীজ।

———

ভাবরাজ্য ও লীলারহস্য (খ)

নিত্যলীলায় দেশকাল এবং কার্য্য কারণ ভাব লোকোত্তর ভাবে গৃহীত হইয়া থাকে। বস্তুতঃ ঐ দেশ আমাদের পরিচিত দেশ হইতে বিলক্ষণ। এই অবস্থায় কালও স্তম্ভিত হইয়া থাকে। তখন যে কাল অনুভূত হয় তাহা ভগবানের নিত্যক্রীড়া সহচর, প্রাকৃতিক জগতের পরিণাম সম্পাদক কাল নহে। কার্য্যকারণ ভাব সম্বন্ধেও ঐ একই কথা।

দর্পণে কোন জিনিষ প্রতিবিম্বিত হইলে যেমন ঠিক সেই জিনিষের প্রতিরূপকটি দেখিতে পাওয়া যায় অথচ দর্পণ ঐ সকল বস্তুর দ্বারা বিন্দুমাত্রও বিচলিত হয় না ঠিক সেই প্রকার শুদ্ধ চৈতন্য নির্লিপ্ত বলিয়া তাহাতে জাগতিক সত্তার ঠিক ঠিক প্রতিবিম্ব পতিত হয়। কিন্তু এই সকল প্রতিবিম্বের দ্বারা চৈতন্যের শুদ্ধতা বিন্দু মাত্রও ন্যূন হয় না। আকাশ যেমন অচল হইয়াও সকল বস্তুতে অনুপ্রবিষ্ট—শুধু তাহাই নহে, প্রতি বস্তুর সহিত তাদাত্ম্যসম্পন্ন—শুদ্ধচৈতন্যও ঠিক তাহাই। শুদ্ধ চৈতন্য এক হইলেও তাহাতে অনন্তভাবের স্বরূপ যোগ্যতা রহিয়াছে। বস্তুতঃ ক্রিয়াশক্তির উন্মেষ কালে দেখিতে পাওয়া যায়—এক অখণ্ড শুদ্ধ চৈতন্যই বিভিন্ন আকারে ও বিভিন্ন বর্ণে অনুরঞ্জিত হইয়া শোভা পাইতেছে। তাদাত্ম্য সম্বন্ধবশতঃ যখন ও যেখানে যে কোন রূপের আবির্ভাব হউক না কেন উহা বস্তুতঃ শুদ্ধচৈতন্য সত্তায় নিত্যোদিত ভাবে রহিয়াছে। যে পূর্বস্মৃতি হইতে বঞ্চিত হইয়া ইতস্ততঃ সঞ্চরণ করিতেছে তাহার পক্ষে শুদ্ধচৈতন্যের মহিমার আখ্যান বিসদৃশ প্রতীত হয়। কিন্তু চিদ্ দৃষ্টি অবলম্বনে বুঝিতে পারা যায় যে এক অখণ্ড শুদ্ধ চৈতন্যই অনন্ত আকারে স্ফুরিত হইতেছে। এই সকল আকার যাহা জীবমাত্রকে নিত্য লীলার রাজ্যে যাইয়া বাসন্তিক বেশভূষার ন্যায় গ্রহণ করিতে হয়—রসের

উদ্বোধবিষয়ে সাহায্য দান করে। রসের অভিব্যক্তির জন্যই অভিনয়ের প্রয়োজন। কিন্তু অভিনয় করিতে হইলে অভিনেতাকে ভূমিকা গ্রহণ করিতে হয়। এই ভূমিকাগুলি অনাদিকাল হইতেই নিত্যসিদ্ধরূপে বর্ত্তমান রহিয়াছে। সুতরাং ভূমিকা বর্জন করিয়া রসোদ্বোধ হইতে পারে না।

কার্য-কারণ, ভাব কল্পিত হইলেও তাহার মধ্যে একটি সত্য আছে যাহা অকল্পিত মহাসত্যেরই অন্তর্গত। নিত্যলীলা নিকেতনটি চন্দ্র ও সূর্য্যের আলোকে আলোকিত হয় না। উহাতে দিনরাত্রির কোনো ভেদ নাই। উহা স্বয়ংপ্রকাশ চৈতন্যস্বরূপ জ্যোতির্ময় রাজ্য।

নিত্যলীলার অন্তর্গত বৈচিত্র্য মায়িক ভেদ নহে। মায়া অথবা জড়শক্তির প্রভাবে যে ভেদ ও ভেদজ্ঞান উৎপন্ন হয় তাহা সত্যই ভেদ, কিন্তু মায়াতীত স্বরূপ চৈতন্যে ভেদও থাকে না এবং ভেদ জ্ঞানও থাকে না। ইহা অদ্বৈতাবস্থা। কিন্তু যখন এই শুদ্ধ চৈতন্যে চিৎ শক্তির প্রভাব বশতঃ রসাস্বাদনের অনুরূপ অনন্ত লীলাময় বৈচিত্র্য আবির্ভূত হয় তখন ঐ সকল বৈচিত্র্য বর্ণনার মুখে ভেদরূপে প্রতি-পাদিত হইলেও পারমার্থিক দৃষ্টিতে ভেদের মধ্যে গণনীয় নহে। কারণ মায়াতীত অবস্থায় জড়ত্ব থাকে না বলিয়া বাস্তবিক পক্ষে ভেদও থাকে না। কিন্তু প্রশ্ন হইতে পারে যেখানে ভেদ নাই সেখানে বৈচিত্র্য কি প্রকারে সিদ্ধ হইতে পারে? বৈচিত্র্য ভেদের ন্যায় প্রতীয়মান হইলেও ভেদাত্মক নহে। ভগবৎ স্বরূপে যে অচিন্ত্যশক্তি নিত্য সিদ্ধ রূপে স্বীকৃত হয় এবং যাহা তাঁহার স্বরূপ হইতে অভিন্ন—তাহারই প্রভাবে বৈচিত্র্যের উদয় হইয়া থাকে। এই অচিন্ত্যশক্তিকে কেহ কেহ 'বিশেষ' নামে বর্ণনা করিয়া থাকেন। এই শক্তির এমনি মাহাত্ম্য যে বস্তু আপন স্বরূপে অক্ষুণ্ণ থাকিয়াও ইহার প্রভাবে ক্ষুণ্ণবৎ প্রতীত হয়, এবং এক থাকিয়াও অনেকবৎ প্রতীতি গোচর হয়। স্বরূপ গত একত্ব আবৃত না হইলে যে বৈচিত্র্যের উদ্ভব হয় তাহাকে ভেদ বলা চলে না। ঐ বৈচিত্র্য নির্দ্দেশ করিবার জন্য বৈষ্ণবাচার্য্যগণ 'বিশেষ' নামে একটি পরিভাষা সৃষ্টি করিয়াছেন।

"ভেদাভাবেঽপি ভেদকার্য্য নির্ব্বাহকো বিশেষঃ।"

বস্তুতঃ ইহা ভগবানের অচিন্ত্য শক্তিরই নামান্তর। ভগবান শঙ্করাচার্য্য তাঁহার একটি স্তোত্রে লিখিয়াছেন—"সত্যপি ভেদাপগমে নাথ তবৈবাহং ন মামকীনস্ত্বম্। ইহার তাৎপর্য্য এই—জীবাত্মা ও পরমাত্মার পরস্পর ভেদ দূর হইয়া গেলেও উভয়ের মধ্যে বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান থাকে যাহার প্রভাবে পরমাত্মাকে লক্ষ্য করিয়া আত্মা 'আমি তোমার' এই কথা বলিতে পারে, কিন্তু 'তুমি আমার' এই কথা বলিতে পারে না। ভেদাপগমের পরেও এই বিলক্ষণতা বস্তুতঃ মায়া অথবা অবিদ্যা নিবন্ধন নহে, কিন্তু অন্য কোনও অচিন্ত্য কারণ বশতঃ। ইহা হইতে বুঝা যায়—ভেদাতীত অবস্থাতেও বৈচিত্র্য থাকিতে পারে। বস্তুতঃ এক অখণ্ড অদ্বৈত সত্তার মধ্যে বৈচিত্র্য রহিয়াছে। ইহা সর্ব্ববাদি সিদ্ধ। এই বৈচিত্র্য সজাতীয় বিজাতীয় অথবা স্বগত ভেদের অন্তর্গত নহে—ইহা বলাই বাহুল্য।

অনুত্তর প্রকাশময় পরমেশ্বরের স্বরূপভূতা একটি পরমাশক্তি আছে, ইহার নাম স্বাতন্ত্র্য। ইহা স্বরূপ হইতে অভিন্ন অথচ ক্রিয়া নির্ব্বাহক বলিয়া শক্তিপদ বাচ্য। ইহা ঠিক ইচ্ছা নহে। অথচ লৌকিক ভাষায় বুঝাইতে গেলে ইহাকে ইচ্ছা ভিন্ন অন্য কোন নামে নির্দ্দেশ করা যায় না। এই অনুত্তর প্রকাশের নাম বিন্দু এবং এই স্বাতন্ত্র্যরূপা ইচ্ছা অব্যক্তাবস্থায় বিষয়হীন এবং আশ্রয়-ভূত স্বরূপের সহিত অভিন্ন হইলেও অভিব্যক্তাবস্থায় ইহা সবিষয়ক বলিয়া প্রতীত হয়। এই ইচ্ছার যাহা বিষয় তাহাই বিসর্গ। এই ইচ্ছার দুইটি অবস্থা আছে—একটি বিসর্গহীন শুদ্ধ বিন্দু অবস্থা ইহাই ইচ্ছার অব্যক্তাবস্থা। অপরটি বিসর্গোন্মুখ অথবা বিসর্গাত্মক অবস্থা।

বিসর্গহীন ইচ্ছা—প্রসুপ্ত ভুজগাকার শক্তি কুণ্ডলিনীরূপে বর্ণিত হইয়া থাকে। ঐ ইচ্ছাই পরাশক্তি। কোন কোন স্থানে উহাকেই সপ্তদশী কলা বলিয়াও নির্দ্দেশ করা হয়। এই সপ্তদশী কলা নিত্যোদিত ও স্বয়ং প্রকাশ। ষোড়শকলা নিরন্তর ইহা দ্বারাই আপ্যায়িত হইতেছে, কারণ সূর্য্যরশ্মি দ্বারা নিরন্তর পঞ্চদশ কলা

শোষণ হওয়ার দরুণ ক্ষয়প্রাপ্ত হয় বলিয়া ষোড়শীকলা নিরন্তর অমৃত-বর্ষণের দ্বারা ঐ ক্ষয়কে আপূরণ করিয়া থাকে। সপ্তদশী অনন্তের ভাণ্ডার হইতে সর্ব্বদাই ষোড়শীকে পূর্ণ করিয়া রাখে। এই জন্য এক হিসাবে ষোড়শী ও সপ্তদশী উভয়ের অমা কলা তাহাতে সন্দেহ নাই। ইচ্ছা শক্তি অব্যক্তাবস্থা হইতে ব্যক্ত অবস্থায় অবতীর্ণ হইলেই বিসর্গ পদাবাচ্য হইয়া থাকে। অর্থাৎ ইচ্ছার ক্ষুব্ধ অবস্থাই বিসর্গ। পক্ষান্তরে বিসর্গের ক্ষোভ ত্যাগ হইলে তাহারই নাম বিন্দু। পর ও অপর ভেদে বিসর্গ দুই প্রকার। পর বিসর্গ আনন্দাত্মক এবং অপর বিসর্গ ক্রিয়াত্মক। প্রথমটি অনুত্তরের পরাবস্থা অর্থাৎ 'আ'কার এবং দ্বিতীয়টি স্থূলতার পরাকাষ্ঠা অর্থাৎ 'হ'কার। যাহাকে বিসর্জ্জনীয় বলিয়া আচার্য্যগণ নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন তাহার স্বরূপ এই জন্যই দুইটি বিন্দু দ্বারা গঠিত হয়। এই দুইটি বিন্দু পরবিসর্গ অপরবিসর্গ এই দুইটির দ্যোতক। মহা-বিন্দুর স্বরূপভূতা স্বাতন্ত্র্যশক্তি বহিরুন্মুখ অবস্থায় এই দুইটি বিন্দু প্রকাশিত করিয়া প্রসৃত হইয়া থাকে। এই ক্রমে বিভিন্ন প্রকার রূপ অবভাসিত হয়। বস্তুতঃ এই সকল বিচিত্র রূপ আভাসময় এবং ঐ সকল আভাস বিসর্গের কার্য্য নহে, কিন্তু বিসর্গেরই আত্মপ্রকাশ। অর্থাৎ নিত্যলীলা মণ্ডলটি বিসর্গ মণ্ডলেরই নামান্তর। ইহাতে যাহা কিছু আবির্ভূত ও তিরোহিত হইয়া থাকে তাহা সবই সাক্ষাদ্‌ভাবে বিসর্গেরই স্বরূপ—বিসর্গের কার্য্য নহে। কারণ যেখানে ভেদ নাই সেখানে কার্য্য-কারণ ভাব থাকিতে পারে না। মায়াতীত বিসর্গমণ্ডলে বৈচিত্র্য থাকিলেও বাস্তব ভেদ নাই বলিয়া কার্য্য কারণ ভাবের অস্তিত্বই নাই। অর্থাৎ এক অখণ্ড অদ্বৈত সত্তার মধ্যেই অনন্ত বৈচিত্র্যের উল্লাস—ইহাই বিসর্গের খেলা। ইহাই শ্রীভগবানের হ্লাদিনী শক্তির লীলাতরঙ্গ। ইহাই মহাভাবের ক্রীড়া বা নিকুঞ্জলীলা এবং মহাভাব হইতে নিঃসৃত লীলাময় ভাবরাজ্যের আত্মপ্রকাশ।

স্বাতন্ত্র্যশক্তির প্রভাবে একই সত্তা প্রমাতা এবং প্রমেয় এবং উভয়ের অন্তরাল স্থিত প্রমাণ—এই তিন ভাগে বিভক্ত হয়।

ইহাদেরই নামান্তর চন্দ্র সূর্য্য এবং অগ্নি। প্রমাতা বেদক এবং প্রমেয় বেদ্য, উভয়ের মধ্যে যে সম্বন্ধ তাহা বেদ্য বেদক সম্বন্ধ। প্রমাতা মূলতঃ এক হইলেও বেদ্যাংশের অবস্থাগত তারতম্যবশতঃ পৃথক্ পৃথক্ কল্পিত হইয়া থাকে। যখন বেদ্য ক্ষুব্ধ হয় তখনকার অবস্থা হইতে—যখন বেদ্য ক্ষুব্ধ হয় না তখনকার অবস্থাকে পৃথক্ বলিতেই হইবে। বেদ্য ক্ষুব্ধ হইলে প্রমাণ ব্যাপারে প্রমাতার স্বাত্মবিশ্রান্তি কম হয়। তাহার তুলনাতে বেদ্য বিশ্রান্তি অধিক হয়। পক্ষান্তরে বেদ্য অক্ষুব্ধ থাকিলে প্রমাতার স্বাত্মবিশ্রান্তি অধিক হয় এবং বেদ্য বিশ্রান্তি কম হয়। যে অবস্থায় স্বাত্মবিশ্রান্তি হয় তাহাকে যোগীগণ রাত্রি বলেন ও যে অবস্থায় বেদ্যবিশ্রান্তি হয় তাহাকে তাঁহারা দিন বলেন। দিনের নামান্তর জাগ্রৎ এবং রাত্রির নামান্তর সুষুপ্তি। এই উভয় অবস্থার মধ্যবর্ত্তী একটি অবস্থা আছে, তাহার নাম স্বপ্ন। এই অবস্থায় প্রমাতার বিমর্শ প্রধান দশা অভিব্যক্ত থাকে ইহা আনন্দাস্বাদনের অবস্থা। যেটিকে জাগ্রৎ অবস্থা বলা হইয়াছে তাহা চৈতন্যাবস্থা এবং সুষুপ্তি অবস্থা শুদ্ধ স্বরূপ নিষ্ঠার নামান্তর। ইহা সত্তায় স্থিতির অবস্থা। ইহা হইতে প্রতীত হইবে যে সত্তা চৈতন্য ও আনন্দ অর্থাৎ সচ্চিদানন্দ। ইহাই অহোরাত্র নিরন্তর শক্তিরূপে আবর্ত্তিত হইতেছে। দিন ও রাত্রিকে ক্ষয় করিতে পারিলে তুরীয়াবস্থার সন্ধান পাওয়া যাইতে পারে। কারণ তুরীয়াবস্থাতে দিন ও রাত্রির ভেদ বর্ত্তমান থাকে না। অহোরাত্র যে নিত্যলীলা চলিতেছে তাহা অনন্ত প্রকার বৈশিষ্ট্যযুক্ত হইলেও এক হিসাবে জাগ্রত স্বপ্ন ও সুষুপ্তির অন্তর্গত। বৈষ্ণবগণের অষ্টকালীন লীলা এই অহোরাত্র বিজ্ঞানেরই অন্তর্গত। এই লীলা কালকে আশ্রয় করিয়া হইয়া থাকে। ইহাই ভাবরাজ্যের লীলা। কিন্তু যেটি তুরীয় লীলা তাহা কালের অন্তর্গত নহে। সুতরাং তাহা অষ্টকালীন লীলা নহে। তাহা ক্ষণের লীলা—মহাভাবের লীলা।

এই লীলার মধ্যে কখনও দিন দীর্ঘ হয় রাত্রি হ্রস্ব হয়, কখনও রাত্রি দীর্ঘ হয় দিন হ্রস্ব হয় এবং কখনও দিন ও রাত্রি উভয়ই সমান

থাকে। বিসর্গের প্রসারের মুখে যখন বাহ্যভাব প্রবল তখন দিন দীর্ঘ, তাহাই গ্রীষ্মকাল। যখন আভ্যন্তর ভাব প্রবল তখন রাত্রি দীর্ঘ, তাহাই শীতকাল। দিন ও রাত্রি সমান হইলে বিষুবৎ ভাবের উদয় হয়। এই অবস্থাই তুরীয়াবস্থায় যাইবার সাহায্যকারী।

নিত্য নব নব উন্মেষ না হইলে লীলা সিদ্ধ হয় না। এই যে প্রতিক্ষণে নব উন্মেষ ইহা শক্তির জাগ্রতাবস্থা ভিন্ন সম্ভবপর হয় না। যেমন জীব শক্তি ও শিব—এই তিনটি মূলতত্ত্ব আছে, তেমনি ব্যক্ত ব্যক্তাব্যক্ত এবং অব্যক্ত তিনটি লিঙ্গ রহিয়াছে। অব্যক্ত লিঙ্গের পর আনন্দময় লিঙ্গ—সেখান হইতে নিত্য নব নব উন্মেষ উত্থিত হইয়া থাকে, যাহা নিত্য লীলার প্রাণ। ব্যক্ত লিঙ্গে জীব অথবা নরভাব প্রধান। এই অবস্থায় দৃশ্যরূপে বিশ্বের দর্শন হইয়া থাকে। এই দৃশ্যরূপী বিশ্বকে অপলাপ করিতে পারিলে ব্যক্ত লিঙ্গের মধ্যেই অব্যক্ত লিঙ্গের আভাস ফুটিয়া উঠে। ঐ অবস্থা ব্যক্তাব্যক্ত লিঙ্গ নামে পরিচিত। উহা বিশুদ্ধ শক্তির স্ফুরণাত্মক অবস্থা। ব্যক্তাব্যক্ত লিঙ্গ এইজন্য শক্তিভাব প্রধান। এই লিঙ্গ হইতে যখন শক্তির অপলাপ হয় তখন ব্যক্তভাব আর থাকে না। শুধু অব্যক্ত লিঙ্গই বর্তমান থাকে। অব্যক্ত লিঙ্গ শিবভাবময়। কিন্তু এখান হইতেও নিত্য-লীলার স্ফুরণ হয় না। যখন অব্যক্ত লিঙ্গ হইতে শিবভাবেরও অপলাপ হইয়া যায় তখন অব্যক্ত লিঙ্গও থাকে না। এই অবস্থায় ব্যক্ত ব্যক্তাব্যক্ত এবং অব্যক্ত কোন লিঙ্গই থাকে না। এই অবস্থায় নরভাব; শক্তিভাব এবং শিবভাব সবই অস্তমিত হইয়া যায়। কিন্তু লিঙ্গত্রয়ের তিরোধান হইলেও অব্যক্ত লিঙ্গের উত্তরকালীন অবস্থাটি অলিঙ্গ অবস্থা নহে। উহা আনন্দময় লিঙ্গের অবস্থা। এই আনন্দময় লিঙ্গ হইতেই অনন্তপ্রকার নব নব উন্মেষময় নিত্যলীলার আবির্ভাব হইয়া থাকে। এই অবস্থাটি স্পন্দের অবস্থা। ইহাই অপ্রাকৃত কামতত্ত্বের খেলা।

বস্তুতঃ বিসর্গ যখন প্রসৃত হয় তখন দুইটি প্রান্তভূমিকে স্পর্শ করিয়া আন্দোলিত হইতে থাকে। ঘড়ির পেণ্ডুলম যেমন আন্দোলিত

হওয়ার সময় এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত নিরন্তর চলিতে থাকে, বিসর্গেরও সেইরূপ অবস্থাই হইয়া থাকে। যে দুইটি প্রান্তকে আশ্রয় করিয়া এই আন্দোলন ব্যাপার নিষ্পন্ন হয় তাহার একটি পরা বা শক্তি কুণ্ডলিনী এবং অপরটি প্রাণকুণ্ডলিনী। এই দুইটি প্রান্ত-বিন্দুর মধ্যক্ষেত্রে আন্দোলন চলিতে থাকে। পরাকুণ্ডলিনী অথবা শক্তিকুণ্ডলিনী বস্তুতঃ চৈতন্যেরই নামান্তর। ইহাকে চিৎশক্তি বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। প্রাণকুণ্ডলিনী শুদ্ধ সংবিৎতত্ত্বের প্রথম পরিণামের পরাকাষ্ঠা। বিসর্গ প্রাণকুণ্ডলিনীকে ভেদ করিতে পারে না।

অভাবের জগৎ বা মায়িক জগৎ, ভাবের জগৎ এবং সর্ব্বোপরি স্বরূপের জগৎ এই তিনটি পর পর সুশৃঙ্খলভাবে বিন্যস্ত রহিয়াছে। দ্রষ্টা আত্মা অনাদি অবিবেক বশতঃ চিত্তের সহিত অভিন্ন রূপে অতীত হইতেছেন। এইরূপ তাদাত্ম্য সম্পন্ন আত্মা চিত্তের সহিত অভিন্ন রূপে জ্ঞাতা সাজিয়া জ্ঞেয় রূপ জগৎকে অন্বেষণ করিতেছেন। যতক্ষণ দ্রষ্টা আত্মা চিত্ত দ্বারা আবিষ্ট ততক্ষণ এই মায়িক জগৎ বাহ্যরূপে প্রতীয়মান হইতে বাধ্য। কিন্তু যখন আত্মা দ্রষ্টারূপে চিত্ত হইতে বিবিক্ত হইয়া সাক্ষাৎকারলাভ করিয়া থাকেন তখন বাহ্য জগৎ বা বহিরঙ্গ শক্তিস্বরূপ মায়াজগৎ লীন হইয়া যায়, একমাত্র ভাবজগৎই প্রকাশ পাইতে থকে। এই ভাব অপ্রাকৃত সত্ত্বের তরঙ্গ ভিন্ন অপর কিছু নহে। একই জলরাশি যেমন ঈষৎ পবন—হিল্লোল বিভিন্ন প্রকার তরঙ্গাদি পরিণাম রূপে আত্মপ্রকাশ করে এবং ঐ অবস্থায় ঐ সকল বিভিন্ন পরিণামের মূলতত্ত্ব জল রূপে প্রতীত হইতে থাকে, ঠিক সেই প্রকার একই অপ্রাকৃত সত্ত্বরূপী ভাব সম্পৎ বিক্ষুব্ধ হইয়া অনন্ত ভাবরূপে পরিণত হয়। ইহাই ভাবরাজ্যের বিকাশ প্রণালী। ইহার পর দ্রষ্টা পুরুষ যখন মহাচৈতন্যের নিকট নিজের স্বরূপ বিসর্জ্জন করে অর্থাৎ দ্রষ্টা আর দ্রষ্টা রূপে স্থিতি গ্রহণ করে না তখন ভাবরাজ্য বা মহাভাব রাজ্য তিরোহিত হইয়া যায়। ইহাই শূন্যাবস্থা। প্রথমে জ্ঞানের বিষয় জ্ঞেয় জগতের সত্তা স্থূল দৃষ্টিতে প্রতীত হয়, তাহার পর

জ্ঞান নির্বিষয়ক ও সাকার হইলে জ্ঞেয় সত্তা উহাতে অস্তমিত হইয়া যায়। ইহাই বিজ্ঞানাত্মক জগতের অবস্থা শুদ্ধ বিকল্পের অবস্থা। এই অবস্থায় বাহ্যজগৎ বলিয়া কোন বস্তুর সত্তা থাকে না। এই অনন্ত জগৎ নিজের চিত্তেরই বিলাসরূপ বলিয়া তখন প্রত্যক্ষ হয়। এই অবস্থায় দ্রষ্টা দ্রষ্টারূপে স্বীয় সত্তাকেই দর্শন করিয়া থাকেন, অবশ্য অনন্ত আকারে। এই দর্শনে বাহ্য পদার্থের অনুভূতি থাকে না। সমস্ত জগৎটি নিজেরই মধ্যে রহিয়াছে বুঝিতে পারা যায়। তখন বিশ্ব ভগবান শঙ্করাচার্য্যের ভাষায় দর্পণ দৃশ্যমান নগরী সদৃশ নিজ স্বরূপে বা আপন আত্মাতে প্রতীত হয়। এমন কি অতীত অনাগত ও বর্তমান এই ত্রিবিধ কালও নিজের মধ্যেই প্রকাশ পাইয়া থাকে। নিজের বাহিরে দ্বিতীয় কোন বস্তুর অবসর থাকে না। ইহার পর দ্রষ্টা আর মনোময় দৃশ্যের দ্রষ্টা না থাকিয়া পরমপদে আত্মসমর্পণ করিয়া থাকে। সঙ্গে সঙ্গে বিজ্ঞানময় জগৎ অন্তর্হিত হইয়া যায়। একমাত্র শূন্যই তাহার স্থান অধিকার করে। তখন দ্রষ্টা থাকে না বলিয়া দৃশ্যও থাকে না। ইহাই মহাচৈত্যন্তের অবস্থা।

সুতরাং বাহ্য সত্তা হইতে মহাচৈতন্যে উঠিবার ক্রম এই—(ক) বাহ্য জগতের অনুভব। এই সময় বাহ্য জগৎ সত্য বলিয়াই প্রতীত হয়। এই অনুভবে ভেদ ভাবের প্রাধান্য থাকে। ইহাই সংসার অবস্থা। সাধারণ জীব মাত্রই এই অবস্থায় বর্ত্তমান আছে। (খ) এই অবস্থায় বাহ্য জগতের অনুভব থাকে না। দৃশ্যমান সমগ্র জগৎই অনুভূত হয় বটে, কিন্তু তাহা যে আমার বাহিরে—এরূপ প্রতীতি হয় না। তাহা চিত্তের বিজৃম্ভন—চিত্ত হইতে অতিরিক্ত কোন পদার্থ নহে। সুতরাং সমস্ত জগৎটিই এই অবস্থায় নিজের মধ্যেই একদেশে অনুভূত হয়। যিনি এই অবস্থা লাভ করেন তিনি মহাপুরুষ পদবাচ্য। যাঁহার দেহের একদেশে সমগ্র বিশ্বরূপ ভাসিয়া উঠে, এই বিশ্ব তাঁহার নিকট ভৌতিক নহে। ইহা বিজ্ঞানাত্মক বা শুদ্ধ বিকল্পময়। (গ) ইহার পর চিত্তের উপশম হয়। তখন আর জগতের ভান হয় না। জ্ঞেয়রূপ জগৎ পূর্ব্বেই নিবৃত্ত হইয়াছিল—জ্ঞানরূপ জগৎ এখন নিবৃত্ত হইল। এই

চিত্তনিবৃত্তির সঙ্গে সঙ্গে দ্রষ্টা আর দ্রষ্টা থাকে না। কারণ দৃশ্যের অভাবে দ্রষ্টৃত্ব সম্ভবপর হয় না। এই অবস্থায় বিশুদ্ধ বিকল্পও থাকে না। ইহাই নির্ব্বিকল্প অবস্থা—যাহাকে পূর্বে মহাচৈতন্য বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। এইটি শূন্যাবস্থা। এই অবস্থায় প্রপঞ্চের পূর্ণ উপশম হইয়া থাকে।

পূর্ব্বোক্ত বিশ্লেষণ হইতে বুঝিতে পারা যাইবে মহাভাবের এবং ভাবরাজ্যের লীলা দ্বিতীয় অবস্থার অনুরূপ অবস্থাবিশেষ। উহা সংসার অবস্থার অতীত অথচ যথার্থ নির্ব্বিকল্প অবস্থার পূর্ব্ববর্ত্তী। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে নির্ব্বিকল্পক অবস্থায় যাইবার জন্য শুদ্ধ বিকল্প রাজ্য ভেদ করা আবশ্যক হয়। নিত্যলীলা স্বভাবের লীলা তাহাতে সন্দেহ নাই, ইহা ভাবের খেলা, আনন্দের অভিনয়, কিন্তু বস্তুতঃ প্রকৃত অভাবের বিরাট ক্রন্দন। যতক্ষণ জীব সংসারাবস্থায় বদ্ধ থাকিয়া ত্রিতাপের জ্বালায় জ্বলিতে থাকে ততক্ষণ এই মহান অভাব অনুভব করিতে পারে না। সংসার অতিক্রম করিয়া মুক্ত না হওয়া পর্য্যন্ত এই অভাব বা বিরহ ধারণাতেই আসে না। সুতরাং যেটা আনন্দের লীলা সেইটিই প্রকারান্তরে দেখিতে গেলে মহাবিরহের অনুভূতি মাত্র। এই বিরহের অবসান অস্থায়ীরূপে পুনঃ পুনঃ হইলেও স্থায়িরূপে তখনই হইতে পারে যখন চৈতন্য কলার বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে এই বিরহটি ক্রমশঃ মহামিলনের অদ্বৈত সত্তার দিকে অগ্রসর হইতে থাকে। অতএব এই নিত্যলীলা হইলেও যথার্থ নিত্যলীলা পদবাচ্য নহে। কারণ এই অবস্থা অপূর্ণ। ইহার পর মহাচৈতন্যে প্রবিষ্ট হইলে ভাব এবং মহাভাব সমস্ত অতিক্রান্ত হইয়া যায় এবং মিলন ও বিরহ কিছুরই সার্থকতা থাকে না। আত্মার তৃপ্তি সাধনের জন্যই ইহার ব্যবস্থা।

কিন্তু ইহা প্রকৃত নিত্যলীলা না হইলেও তাহার আভাস বলিয়া অবশ্যই বর্ণিত হইবার যোগ্য। যথার্থ লীলা পূর্ণাবস্থায়ই সম্ভবপর। সেখানে ক্রমবিকাশের আবশ্যকতা থাকে না এবং প্রকৃত অতৃপ্ত ও

অভাব প্রভৃতি কিছুরই সত্তা থাকে না। ইহার বিশেষ বিবরণ পরে করা যাইবে।

যে আনন্দময় লিঙ্গের কথা উল্লেখ করা হইয়াছে তাহাকে প্রাপ্ত হইলেই নিত্যলীলার সূত্রপাত হইয়া থাকে একথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। এই আনন্দময় লিঙ্গ বীজ ও যোনি এই উভয়ের মিলনাত্মক। বীজ ও যোনির মিলনই বস্তুতঃ যুগলমিলন। একই শুদ্ধ চৈতন্য—বীজ ও যোনি আকারে প্রকাশমান হইয়া উভয়ের তাদাত্ম্য অবস্থায় নিত্যলীলায় অঙ্কুর রূপে পরিণত হয়। যখন মূল চৈতন্য স্বাতন্ত্র প্রভাবে দুই ভাগে বিভক্ত হয় তখন পরস্পর পৃথককৃত হইয়া এই দুইটি ভাগ পরস্পর মিলিত হইয়া নব নব লীলা স্ফূর্তির কারণ হইয়া থাকে। একই চৈতন্য একাংশে ক্ষুব্ধ করে এবং অপরাংশে স্বয়ংই ক্ষুব্ধ হয়। নিমিত্ত ও উপাদানের অভিন্নতা এই ভাবেই সিদ্ধ হইয়া থাকে। নিমিত্ত ও উপাদনের পার্থক্যের সঙ্গে সঙ্গে মায়িক স্তর আবির্ভূত হয় এবং পদার্থ সকলের মধ্যে পরস্পর ভেদ জ্ঞান প্রকটিত হয়।

চৈতন্যের মধ্যে একদিকে ক্ষুব্ধ হইবার স্বাভাবিক প্রবণতা জাগিয়া উঠে। বাহ্য ক্ষোভক না থাকিলেও চৈতন্যের স্বরূপ হইতে আপনি ক্ষোভের আবির্ভাব হয়। ইহা ক্ষণিক ব্যাপার।

রাধাতন্ত্রে আছে ষোড়শ গোপী পারমার্থিক দৃষ্টিতে ষোড়শটি স্বরের মূর্ত্তি। সুতরাং নিত্যলীলার মূলীভূত ষোড়শ শক্তিই বস্তুতঃ স্বরতত্ত্ব ভিন্ন অপর কিছু নহে। এই স্বরতত্ত্ব কি প্রকারে আবির্ভূত হয় এবং আবির্ভূত হইয়া কি প্রকারে এক স্বর অন্য স্বরে পরিণত হয় ইহার বিশেষ জ্ঞানের সহিত ক্ষোভের রহস্য উদঘাটনের প্রণালী জড়িত রহিয়াছে। এই জন্য লীলার মর্ম্ম গ্রহণের উদ্দেশ্যে ক্ষোভের স্বরূপ, সার্থকতা, প্রকার ভেদ ও ফলগত বৈশিষ্ট্য আলোচনা করা আবশ্যক। পূর্ব্বে যে ত্রিবিধ লিঙ্গের কথা বলা হইয়াছে তাহার মধ্যে অব্যক্ত লিঙ্গে অহংভাবের প্রাধান্য এবং ব্যক্ত লিঙ্গে ইদংভাবের প্রাধান্য বর্ত্তমান থাকে। উভয় লিঙ্গের মধ্যবর্ত্তী ব্যক্তাব্যক্ত লিঙ্গে অহংভাব

এবং ইদংভাব এই উভয়েরই সাম্যভাব লক্ষিত হয়। চৈতন্যের যে অংশে অহংভাবের স্ফুরণ হয় তাহা জীব ভাব। উভয়ের মধ্যবর্তী ভাবটি শক্তিভাব। এই শক্তিভাবেরও দুইটি অবস্থা আছে—যখন আরোহক্রমে চৈতন্য জীবভাবকে শিবভাবের দিকে অগ্রসর করিয়া নেয় এবং যখন অবরোহক্রমে চৈতন্য শিবভাবকে ক্রমশঃ জীবভাবের দিকে পরিবর্ত্তন সম্পন্ন করে। এই দুইটি অবস্থা ঠিক এক নহে। প্রথম অবস্থায় অহংভাবের দ্বারা আচ্ছন্ন হইয়া জীবভাব বিদ্যমান থাকে। দ্বিতীয় অবস্থায় ইদংভাবের দ্বারা আবৃত হইয়া অহংভাব বিদ্যমান থাকে। যেটি অব্যক্ত লিঙ্গ তাহা হইতেই ইদংভাবের স্ফুরণের সঙ্গে সঙ্গে বাহ্যলীলার সূত্রপাত হয়। কিন্তু অব্যক্ত লিঙ্গের পর অনুত্তর ধামরূপ যে মহালিঙ্গ স্বয়ংপ্রকাশরূপে উদিত হয় সেই আনন্দময় লিঙ্গ হইতেই অহংবোধময় অব্যক্ত লিঙ্গের আবির্ভাব সূত্র পতিত হয়। এই জন্য আনন্দময় লিঙ্গ হইতে অব্যক্ত লিঙ্গের আবির্ভাব পর্য্যন্ত লিঙ্গের আবির্ভাব পর্য্যন্ত যে চৈতন্য শক্তির খেলা তাহাই রহস্য লীলা বলিয়া বর্ণিত হইবার যোগ্য। আমরা পূর্বে যে ভাব ও মহাভাবের কিঞ্চিৎ পার্থক্য উল্লেখ করিয়াছি এইস্থলে উহারই অনুরূপ পার্থক্যের মূল লক্ষিত হয়।

ক্ষোভ কাহাকে বলে ? ক্ষোভের রহস্য কি ? লীলাতত্ত্বের সহিত ইহার সম্বন্ধ কি ? এই সকল প্রশ্নের মীমাংসার জন্য আপাততঃ কয়েকটি কথা দিগদর্শন রূপে উল্লেখ করা যাইতেছে। যে মহাচৈতন্য পর প্রমাতা বা মহাসাক্ষিরূপে স্বয়ংপ্রতিষ্ঠভাবে বিদ্যমান রহিয়াছে তাহাতে অনন্ত জ্ঞেয়রাশি অর্থাৎ বাহ্য ও আভ্যন্তর যাবতীয় ভাবসত্তা অভিন্ন-রূপে বিদ্যমান থাকে। এই মূল চৈতন্য সীমাহীন উপাধিরহিত এবং অনবচ্ছিন্ন। ইহা নির্বিশেষ রূপেই বর্ণিত হইবার যোগ্য। কিন্তু ইহাতে একটি ইচ্ছা নামে স্বাতন্ত্র্যশক্তি রহিয়াছে। ইহা চৈতন্যের স্বরূপ হইতে অভিন্ন। যখন ইহার প্রভাবে ঐ অন্যান্য ভাবরাজি চৈতন্যের সহিত অভিন্ন থাকিয়াও ভিন্নবৎ প্রতিভাসমান হয় তখনই বলা হয় যে চৈতন্যের ক্ষোভ উৎপন্ন হইয়াছে। এই ক্ষোভ উৎপন্ন হওয়া

ও বিসর্গের উদ্ভব হওয়া একই কথা। চৈতন্য নিজে ক্ষুব্ধ হইয়া নিজেকেই ক্ষুব্ধ করিয়া থাকে। যখন চৈতন্য নিজে ক্ষুব্ধ হয় তখন উহা স্বরূপনিষ্ঠ স্বাতন্ত্রশক্তিরই খেলা বুঝিতে হইবে। উপাদানকে ক্ষুব্ধ করিতে হইলে নিমিত্তকেও ক্ষুব্ধ হইতে হয়। নিমিত্তের ক্ষুব্ধ ভাব গ্রহণ স্বাতন্ত্রবশতঃ হইয়া থাকে, কিন্তু উপাদানের ক্ষুব্ধতা নিমিত্তের প্রভাববশতঃ ঘটিয়া থাকে। ক্ষোভ হইলেই ক্ষোভের একটি আধার আবশ্যক হয়। কারণ নিরাধার ক্ষোভ হইতে পারে না। এই যে আধারটির কথা বলা হইল ইহারই নামান্তর যোনি। ক্ষোভ বিসর্গেরই অবস্থা বিশেষ। বিসর্গের মূলে বীজ সত্তা আবশ্যক, কারণ বীজেরও বিসর্গ হয়। এই বীজ চৈতন্য ভিন্ন অপর কিছু নহে। চৈতন্য স্বরূপে অনন্ত জ্ঞেয়ভাবরাশি অব্যক্ত রূপে মগ্ন থাকে। এই সকল ভাব আপন আপন বিশেষ রূপ লইয়া তাহাতে প্রকাশমান থাকে না। এই নির্ব্বিশেষ শুদ্ধ চৈতন্যই বীজরূপে অর্থাৎ বিশ্বের বীজ রূপে পরিচিত।

চৈতন্য নিষ্ঠ অনন্ত ভাবরাশি সমমষ্টিরূপে বিশ্ব নামে অভিহিত হয়। বিশ্বের বীজ চৈতন্যই কারণ চৈতন্য হইতে অতিরিক্ত বিশ্ব নামে দ্বিতীয় কোন পদার্থ নাই। কিন্তু না থাকিলেও অতিরিক্তবৎ বিশ্বের আবির্ভাব চৈতন্য হইয়া থাকে।

ইহা কি প্রকারে হয়। চৈতন্যে যে সাতন্ত্রশক্তি রহিয়াছে, যাহাকে মূল ইচ্ছা বলিয়া অথবা মহা ইচ্ছা বলিয়া বর্ণনা করা হয়, তাহারই প্রভাবে বিসর্গের উদয় হয়। অর্থাৎ অভিন্নসত্তা ভিন্নবৎ প্রতীয়মান হয়। ইহারই নাম—বীজ ও যোনির পরস্পর সংঘটন। যোনির সহিত ইচ্ছার সামরস্য হইলে ভূপুরূপে সৃষ্টির পূর্ণ বিকাশ ঘটিয়া থাকে।

ক্ষোভ কার্যতঃ দুইপ্রকার, নিজে ক্ষুব্ধ হওয়া এবং অপরকে ক্ষুব্ধ করা। পুরুষ ক্ষুব্ধ হইয়া প্রকৃতিকে ক্ষুব্ধ করে। কারণ প্রকৃতি ক্ষুব্ধ না হইলে পুরুষের ইচ্ছানুরূপ তাহার গর্ভ হইতে অনন্তভাবরাশি বহিরন্মুখ হইয়া প্রকটিত হইতে পারে না। [illegible] মনে রাখিতে হইবে

পুরুষ ও প্রকৃতি এক অখণ্ড চৈতন্যরেই দুইটি দিক। চৈতন্যের মধ্যে এই দুইটি দিকের পরস্পর সংঘর্ষকে নিকুঞ্জলীলা বলে। যে ক্ষোভাধারের কথা পূর্ব্ব বলা হইয়াছে তাহা বাহ্যসৃষ্টির পক্ষে অপরিহার্য অবলম্বন, কারণ ঐ আধারকে উপেক্ষা করিয়া অন্তঃস্থিত ভাব বাহ্যরূপে প্রকাশিত হইতে পারে না এবং সৃষ্টির ইচ্ছাও পূর্ণ হইতে পারে না। এই যে ইচ্ছার পূর্ণতার কথা বলা হইল ইহার সম্যক্ সিদ্ধি তৃপ্তির নামান্তর। তৃপ্তির আবির্ভাব অর্থাৎ বাহ্য সৃষ্টির উন্মীলনে কিংবা ভাবরাজ্যের প্রাকট্য বিষয়ে চিৎশক্তি হইতে ক্রিয়াশক্তি পর্যন্ত পঞ্চবিধ শক্তির ক্রমিক স্ফুরণ আবশ্যক হয়। চিৎশক্তি আনন্দশক্তি ইচ্ছাশক্তি জ্ঞানশক্তি ও ক্রিয়াশক্তি এই পঞ্চবিধ শক্তির অবির্ভাবই বিন্দু হইতে বিসর্গের আবির্ভাব। চিৎশক্তি অনুত্তর, ইহাই, 'অ' কার আনন্দশক্তি 'অ' কার, উভয়ই স্বরূপতঃ অভিন্ন। ইহার পর ইচ্ছাশক্তি 'ই'কার (ঈ অথবা ঈশ্বরত্ব ইচ্ছারই মাত্রাগত বৃদ্ধির নামান্তর) উন্মেষ শক্তি 'উ'কার—অর্থাৎ জ্ঞানশক্তি (ঊনতা বা জ্ঞেয়ভাব উন্মেষেরই মাত্রা-বৃদ্ধির ফলমাত্র)। ক্রিয়াশক্তির অস্ফুট স্ফুট স্ফুটতর এবং স্ফুটতম—চারিটি ভেদ এ ও ঐ ঔ রূপে প্রসিদ্ধ। ঋ ৠ ঌ ঃ ইহারা পূর্ব্বোক্ত পঞ্চ শক্তির অন্তর্গত নহে। ইহারা অমৃত কলারূপে এবং নপুংসক। বিন্দু ও বিসর্গ সহকারে এই পরামর্শগুলি রশ্মিগুলি স্বরবর্ণরূপে পরিচিত। নপুংসক বর্ণ চতুষ্টয় বাদ দিলে ইহারা সকলেই এক হিসাবে বীজরূপী। যখন অনুত্তর চৈতন্য অথবা আনন্দের সহিত ইচ্ছাশক্তির মিলন হয় তখন 'এ' কাররূপী যোনি আবির্ভূত হয় যাহাকে অস্ফট ক্রিয়াশক্তি বলিয়া পূর্ব্বে বর্ণনা করা হইয়াছে। ইহা ত্রিকোণাত্মক। ইহারা তিনটি কোণের নাম—ইচ্ছা, জ্ঞান ও ক্রিয়া। বলা বাহুল্য, অনুত্তর ও আনন্দ মধ্যবিন্দুরূপে রহিয়াছে। কিন্তু সূক্ষ্মভাবে দেখিতে গেলে ইহা একটি ত্রিকোণ নহে—ইহার মধ্যে দুইটি ত্রিকোণ রহিয়াছে। কারণ যাহাকে অনুত্তর পরামর্শ বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে তাহা অথবা আনন্দ শক্তি স্বরূপতঃ ত্রিকোণাত্মক। কারণ অনুত্তরকে বিশ্লেষণ করিলে তাহার মধ্যে বামা জ্যেষ্ঠা ও রৌদ্রী এই

তিনটি শক্তিকে প্রাপ্ত হওয়া যায়—আনন্দ সম্বন্ধেও ঐ একই কথা। অতএব একটি অধোমুখ ত্রিকোণ, এবং অপরটি উৰ্দ্ধমুখ ত্রিকোণ, এই দুইটি ত্রিকোণ মিলিত হইয়া যে ষট কোণ উৎপন্ন হয় তাহাই অত্যন্ত গুহ্য এবং রহস্যময় পীঠরূপে ঐ-কারের রূপ ধারণ করিয়া আত্মপ্রকাশ করে। পুরুষ ও প্রকৃতির যুগল ভাব অথবা মিথুনী ভাবই ঐ কারের রহস্য। শ্রীকৃষ্ণের বীজ যন্ত্র ও পীঠ বুঝিতে হইলে ষট কোণ রহস্য ভেদ করা একান্তই আবশ্যক।

ব্রহ্মসংহিতাতে যে গোকুল যন্ত্রের সংক্ষিপ্ত বিবরণ আছে—যাহার সঙ্গে গোলোক বা শ্বেতদ্বীপ এবং মহাবৃন্দাবনের সম্বন্ধ জড়িত রহিয়াছে —তাহাতেও মূলে এই ষট্ কোণকে আশ্রয় না করিয়া যুগলতত্ত্ব রাধা-কৃষ্ণের আবির্ভূত হইবার উপযোগী দ্বিতীয় কোন যন্ত্র বা পীঠ বর্ত্তমান নাই। ক্ষণভেদে অর্থাৎ বিভিন্ন ক্ষণ অনুসারে বিভিন্ন প্রকার আনন্দ ফুটাইয়া তুলিবার জন্য ষট্কোণের অথবা ষড়র মুদ্রার আবশ্যকতা বৌদ্ধগণও স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। অনুত্তর অথবা আনন্দের সহিত জ্ঞানের সহযোগ প্রাপ্ত হইলে ওঁকারের উদ্ভব হয়। পূর্বোক্ত অনুত্তর আনন্দের সহিত এই 'ও'কারের পুনর্বার যোগ হইলে স্থূল বীজরূপী 'ঔ' কারের আবির্ভাব হয়। বস্তুতঃ এই স্থূলের উপরই যন্ত্রটি নিবদ্ধ। চিৎশক্তি হইতে ক্রমশঃ আনন্দাদি ক্রমে ইচ্ছা জ্ঞান ও ক্রিয়াশক্তি আবির্ভাব হইয়া এবং ক্রিয়াশক্তি ক্রমশঃ স্থূলতম অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া পরিশেষে প্রত্যাহার অবলম্বন পূর্ব্বক বিন্দুতে প্রত্যাগমন করে। এই প্রক্রিয়াটি স্বভাবের মধ্যে নিম্নস্তরে আবর্ত্তিত হইতেছে। ইহাকেই অহংভাবের বিকাশ বা চৈতন্য শক্তির উদ্দীপন বলে। অন্যান্য বর্ণরাশি এই মূল শক্তি সকলের স্ফুরণের মুখেই যথাক্রমে প্রকাশিত হয়। আদিবর্ণ 'অ'—ইনি প্রকাশ স্বরূপ পরমশিব। অন্ত্যবর্ণ—'হ'কারের অর্দ্ধভাগ, ইনি বিমর্শরূপা পরাশক্তি। উভয়ে মিলিত হইয়া অ-হ রূপে প্রত্যাহার ন্যায়ে যাবতীয় বর্ণকে অর্থাৎ পঞ্চাশৎ মাতৃকাকে গর্ভে ধারণ করিয়া রহিয়াছে। বিন্দুরূপে অখণ্ডমণ্ডলের মধ্যে অদ্বৈত সত্তা লইয়া এহ শিবশক্তি-যুগলমূর্ত্তি বিরাজমান রহিয়াছেন। ইহারই

নাম অহং বা আত্মা। ইনিই ত্রিপুরসুন্দরী। ইহাই রাধা-কৃষ্ণের যুগল তত্ত্বের রহস্য।

ত্রিপুরসুন্দরীর রহস্যে পূর্ণ অভিজ্ঞান লাভ করিতে না পারিলে —রাধাকৃষ্ণতত্ত্বে প্রবেশ করিবার দ্বিতীয় কোন পথ নাই। এই সম্বন্ধ বিশেষ আলোচনা পরে করা যাইবে।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে ভাবরাজ্যের ক্রমবিকাশের পথে প্রথমতঃ পশুভাব কাটিয়া যায়। অর্থাৎ সকল দৃশ্য পদার্থ মাত্রেই যে ইদংরূপে ভান ছিল তাহা অপগত হয়। অর্থাৎ চারিদিক্কার পদার্থকে তখন 'ইহা' বলিয়া প্রতীতি জন্মে না। উহাতে আমি' রূপে প্রতীতি ক্রমশঃ উৎপন্ন হইয়া আমি' ভাবের অতীত অনুত্তর সত্তাতে স্থিতিলাভ হয়। মধ্যাবস্থাতে 'আমি' ভাব থাকে না বটে, কিন্তু তাহার আভাসটী থাকে। তখন সকল পদার্থের জ্ঞান ইদংরূপে উদিত হয় এবং পূর্বস্তরের অহংভাবের অভাসটি ঐ বিশুদ্ধ জ্ঞানটিকে ঢাকিয়া রাখে। এই অবস্থায় শক্তি ভাবের উন্মেষ বিদ্যমান থাকে। অর্থাৎ সকল বস্তুই শক্তিরূপে অর্থাৎ আত্মার ধর্মরূপে প্রতীতিগোচর হয়। এই অবস্থাটি অতিক্রান্ত হইলে বিশুদ্ধ অহংভাবের সূত্রপাত হইয়া তাহার পূর্ণতা ক্রমশঃ সিদ্ধ হয়। ইহা অব্যক্ত লিঙ্গ অবস্থায় সিদ্ধ হয়। সর্বাত্মভাব বলিতে বৈষ্ণবচার্য্যগণ এই অবস্থাকেই লক্ষ্য করিয়াছেন। এই অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছেন তিনি সর্ব্বত্র নিজেরই স্ফুর্ত্তি উপলব্ধি করিয়া থাকেন। কিন্তু এই আত্মস্ফুর্ত্তি যথার্থ আত্মস্বরূপ নহে—ইহা মনে রাখিতে হইবে। ইহার পর আনন্দ লিঙ্গময় অনুত্তর-ধামে প্রবিষ্ট হইলে সর্বাত্মভাবের অতীত আত্মার পরম স্বরূপে স্থিতি-লাভ হয়। সর্ব্বত্র আমি আমি ভাবের প্রকাশই সর্ব্বাত্মভাব। এই অবস্থায় ভক্তের দৃষ্টিতে সর্ব্বত্রই আত্মভাবের অনুভূতি হইয়া থাকে। অর্থাৎ নিজেকেই অনন্ত আমি রূপে উপলব্ধি করা যায়। বাহ্য উপলব্ধির ইহাই চরম সীমা। এই অবস্থার অবসানে বহু আমি এক আমিতে পরিণত হয়। তাহার পর ঐ আমি আমিত্বহীন হইয়া বিচিত্র অনন্ত ভাবে আত্মপ্রকাশ করে। এই আত্মপ্রসারণের মধ্যে

প্রথম পুরুষ মধ্যম পুরুষ ও উত্তম পুরুষ এই তিন রূপেই চৈতন্য নিজেকে প্রকাশ করিয়া থাকে। এই অচিন্ত্য মাধুর্য্যময় অবস্থায়, 'আমি তুমি' ভাব চিরদিনের জন্য স্বাভাবিক নিয়মে অস্তমিত হয়। তাহার পর শুধু রসাস্বাদনের জন্য কৃত্রিম অভিনয়ের ন্যায় অনন্ত লীলা বৈচিত্র্য ফুটিয়া উঠে। জীবের উর্দ্ধারোহণ ক্রমে যে নিত্যলীলা ভাবরাজ্যে অনুষ্ঠিত হয় তাহা এই অনাদি অনন্ত লীলার প্রতিবিম্ব মাত্র।

এই যে সর্বাত্মভাবের কথা বলা হইল ইহা আবির্ভূত হইলে সর্ব্বত্রই পুরুষোত্তম স্বরূপ দর্শন হয় বলিয়া পুরুষোত্তম রূপে পরিদৃষ্ট সর্ব্ব বস্তুতেই একটি অপূর্ব্ব স্নেহের বিকাশ লক্ষিত হয়। ইহার পরই ভিতরে এবং বাহিরে সমরূপে অখণ্ডভাবে পুরুষোত্তমভাব প্রকট হইয়া থাকে। যাহার ফল অলৌকিক সামর্থ্য অথবা নিত্য লীলায় প্রবেশ।

সুতরাং বুঝিতে হইবে নিত্যলীলায় প্রবিষ্ট হইবার পূর্ব্বে সর্ব্বত্র আত্মভাবের স্ফুর্ত্তি হওয়া আবশ্যক। কারণ তাহা না হইলে স্নেহের উদয় হইতে পারে না। এখন প্রশ্ন এই সর্ব্বাত্মভাবের অভিব্যক্তির মূল কারণ কি? এই সম্বন্ধে কোন কোন বিশেষজ্ঞ আচার্য্য বলিয়া থাকেন যে প্রেমভক্তির পরাকাষ্ঠা হইতেই সর্ব্বাত্মাভাবের উদয় হইয়া থাকে। প্রেমভক্তির পাক অনুসারে তিনটি অবস্থা প্রকাশিত হয়। তন্মধ্যে প্রথমটির নাম প্রেম—দ্বিতীয়টির নাম আসক্তি এবং তৃতীয়টির নাম ব্যসন। ইহার পরই সাধনার সমাপ্তি হইয়া সর্ব্বত্মভাবরূপে ফলের উদয় হয়। প্রেম রুচি হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে। যখন কোন বিশিষ্ট মনুষ্যে ভগবানের প্রতি স্বাভাবিক রুচি উৎপন্ন হয় তখন উহাকে শ্রবণাদি সাধন ভক্তি দ্বারা পরিশীলন করিলে উহা চরম অবস্থায় প্রেমরূপে পরিণতি লাভ করে। কিন্তু যাহার চিত্তে রুচি উৎপন্ন হয় নাই তাহার পক্ষে শ্রবণাদি দ্বারা প্রেমভক্তির বিকাশ সম্ভবপর নহে। এইভাবে বুঝিতে পারা যায় যে জীব মাত্রই আপাততঃ প্রেমভক্তির যোগ্য বলিয়া গ্রহণ করা চলে না। কোন

কোন বিশিষ্ট জীবে ভগবদিচ্ছায় ভাবের বীজ নিহিত থাকে। বলা বাহুল্য, এই সকল জীব আসুরিক জীব হইতে বিলক্ষণ দৈব জীবের অন্তর্গত। সৎসঙ্গ প্রভৃতি বিভিন্ন কারণের প্রভাবে এই সূক্ষ্ম বীজ শক্তি রুচি রূপে ফুটিয়া উঠে। ইহার পর সাধনভক্তি দ্বারা প্রেমের আবির্ভাব হয়। প্রেম পরিস্ফুত হইয়া প্রথমে আসক্তি এবং তাহার পর ব্যসনরূপে অভিব্যক্ত হয়। ইহার পর সর্বত্র আত্মভাবের স্ফুর্ত্তি হইয়া থাকে। তখন সর্ব্বত্র সমরূপে ভগবৎ স্ফুর্ত্তি হওয়ার দরুণ নিত্যলীলায় প্রবেশ হইয়া থাকে।

নিত্যলীলায় যে সকল জীবের প্রবেশাধিকার জন্মে তাহারা সকলেই যে একই প্রকার অবস্থা লাভ করে এমন নহে। কারণ ভাবরাজ্যের অনন্ত বৈচিত্র্যের মধ্যে যাহার যেটি আপন প্রকৃতি সে তাহাই প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

জীব সকলের মধ্যে যেমন একটি মৌলিক সাম্য আছে তেমনি প্রত্যেক জীবের একটি বৈশিষ্ট্যও আছে। এই বৈশিষ্ট্যটি সাংসারিক অবস্থায় ফোটে না। ইহা জীবের স্বভাবসিদ্ধ বলিয়া সংসারের কৃত্রিম আবরণ কাটিয়া গেলে ইহা আপনি জাগিয়া উঠে। এই হিসাবে প্রত্যেকটি জীবেরই ব্যক্তিগত বিলক্ষণতা রহিয়াছে। এই জন্যই দার্শনিকগণ মুক্ত আত্মাতেও 'বিশেষ' স্বীকার করিয়াছেন। এই বিশেষ স্বরূপগত আকৃতিগত, গুণগত, ধর্মগত ক্রিয়াগত এবং সম্বন্ধগত। সুতরাং একটি জীবের সহিত অন্য একটি জীবের কোন অংশেই সমানতা পরিদৃষ্ট হয় না (যদিও সকল জীবই মূলতঃ এক ও অভিন্ন)।

এই জীবগত বিশেষের সার্থকতা ভাবরাজ্যে উপলব্ধি গোচর হয়। কারণ ভাবরাজ্যে বিধি নিষেধের প্রেরণা থাকে না বলিয়া অন্তর্নিহিত ভাব অথবা স্বভাবই লীলাগত বৈশিষ্ট্যের এবং রসাস্বাদনের নিয়ামক হইয়া থাকে। ভাবের আস্বাদনে যেমন 'বিশেষ' অনুভূত হয় তেমনি অভাবের অনুভূতিতেও বিশেষের পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়।

এই স্থলে প্রসঙ্গতঃ নিত্যলীলা সম্বন্ধে একটি মহাসত্যের ইঙ্গিত

দেওয়া আবশ্যক মনে করিতেছি, যদিও ইহার আভাস পূর্ব্বে বহু স্থানে কিছু কিছু দেওয়া হইয়াছে। নিত্যলীলার দুইটি দিক আছে। এক দিক হইতে দেখিতে গেলে নিত্যলীলা প্রকৃত প্রস্তাবে উর্দ্ধগামী জীবের পক্ষে নিত্যলীলা নহে, উহা একটি বিশ্রামশালা মাত্র। যখন কোন জীব ভাবরাজ্যে প্রবিষ্ট হইয়া ক্রমশঃ নিত্যলীলায় যোগদান করে তখন সে ক্রমশঃ ঐ লীলারসের আস্বাদনে অধিকতর পুষ্টিলাভ করিতে করিতে কলার বিকাশ সম্পাদন করিয়া যথাসময়ে লীলাচক্র ভেদ করিয়া চলিয়া যায়। এইস্থলে নিত্যলীলা নিত্যসিদ্ধ এবং অবিনাশী হইলেও উক্ত জীবের পক্ষে তাহা চিরস্থায়ী হয় না। কারণ মুক্ত হইলেও উক্ত জীবটি অপূর্ণ বলিয়া ভাবরাজ্যের ভিতর দিয়াই তাহাকে পূর্ণতা লাভ করিতে হইবে বলিয়া এক সময়ে তাহাকে লীলাচক্র অতিক্রম করিতেই হইবে। কিন্তু তাহার পক্ষে লীলাচক্রে স্থায়িত্ব না থাকিলেও লীলাকে অনিত্য বলা চলে না। অনাদি কাল হইতে অনন্ত কাল পর্য্যন্ত লীলাচক্রের অভিনয় এই ভাবেই হইয়া আসিয়াছে এবং এই রূপেই হইবে। কিন্তু নিত্যলীলার আর একটি দিক আছে, ঐ দিক হইতে বিচার করিলে বুঝিতে পারা যাইবে যে পূর্ব্বোক্ত লীলামণ্ডল প্রকৃত লীলামণ্ডল নহে। লীলার প্রকৃত স্থান বিশ্রামের পরাবস্থায় অবস্থিত অর্থাৎ ক্রমবিকাশের সমাপ্তির পর। কাজ করা, বিশ্রাম করা এবং খেলা করা এই তিনটি মূল ব্যাপার। তন্মধ্যে সমগ্র মায়িক জগৎটি কার্য্যক্ষেত্র বলিয়া কর্ম অর্জন ও উহার ফল ভোগ এইখানে হইয়া থাকে। এই জন্য ইহা কাজ করার স্থান। ইহার পর একটি বিশ্রামাগার আছে। সেখানে বিশ্রাম করিয়া বিশ্রাম সুখের আস্বাদন লাভ করা যায়। ইহার পর খেলা করার একটি দিক রহিয়াছে। এই খেলাটি কাজ করার অন্তর্গত নহে এবং ইহা বিশ্রামেরও পরাবস্থা। ইহাই খেলা করার দিক। কাজ করার যেমন শেষ নাই, ঠিক সেই প্রকার খেলা করারও শেষ নাই। এই মহাখেলার পীঠ বিশ্রামের পরে কোন ভাগ্যবান প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। এই খেলা বা লীলার উপযোগী ধাম এবং পরিবার এবং পরিবারবর্গ সবই

সাকার। সুতরাং এই সকলগুলি চরম বিশ্রামের অবস্থায় অভিব্যক্ত রচনাশক্তি দ্বারা প্রকটিত হইয়া থাকে। অর্থাৎ শুদ্ধ চৈতন্য অবস্থায় প্রতিষ্ঠিত হইয়া পূর্ণ অহংভাবে স্থিতি লাভ করিলে নিত্যলীলায় প্রবেশের প্রাথমিক স্তর সমাপ্ত হয়। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে পূর্ণ বস্তু কিছুই সৃষ্টি করিতে পারেন না। সৃষ্টিকর্ত্তা হইতে হইলে তাঁহাকে ইচ্ছা পূর্ব্বক অভাব সৃষ্টি করিয়া অভিনয়ের দ্বারা রসাস্বাদনের ব্যবস্থা করিতে হইবে। এই জন্যই পরিপূর্ণ আত্মস্বরূপে অর্থাৎ পূর্ণাহন্তাতে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর স্বীয় স্বাতন্ত্র্য বশে নিজের চারিদিকে মহাশূন্য সৃষ্টি করিয়া ঐ মহাশূন্যের মধ্যে ইচ্ছানুরূপ লীলামণ্ডল রচনা করিতে হয়।

শ্রীবৃন্দাবন প্রভৃতি ভগবানের নিত্য বিহারভূমি সকল এই নীতি অবলম্বন করিয়াছে। পূর্ণ স্বরূপের মধ্যে অচিন্ত্যশক্তি দ্বারা রচনা করিয়া রাখা হইয়াছে এবং এখনও হইতেছে। শুধু তাহাই নহে, যোগীর বিশিষ্ট প্রকৃতি অনুসারে রচনাতেও বৈশিষ্ট্য প্রকাশিত হইয়াছে। এই জন্য এক শ্রীবৃন্দাবনেরই রচনা প্রণালী শিল্পীর শিল্প কৌশলের প্রভাবে নানাপ্রকার পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। অন্যান্য লীলা-ধাম সম্বন্ধেও ঐ একই কথা জানিতে হইবে।

পূর্ণ আত্মস্বরূপে অভিনয়ের জন্য অপূর্ণতা উৎপাদন করিয়া পুনর্বার তৃপ্তি সাধনের জন্য রসাভিব্যক্তির প্রণালী অনুসারে বিভিন্ন প্রকার রচনা আবশ্যক হইয়া থাকে। অতএব লীলাধাম সকল নিত্য হইলেও রচিত, এবং মহাশূন্যের মধ্যে গুপ্তভাবে অবস্থিত। জগন্মাতার বিশেষ অনুগ্রহ ব্যতীত এই সকল গুপ্ত স্থান দেখিতে পাওয়া যায় না।

এই সকল লীলার সঙ্গে অতি গুপ্ত ভাবে কর্ম্ম জগতের সম্বন্ধ রহিয়াছে। লীলাজগতের দিক হইতে যাহা লীলা মাত্র কর্মজগতের দিক হইতে তাহা লীলা হইলেও কর্মশক্তির প্রেরণাদায়িনী—শুধু লীলা নহে। কিন্তু খেলা ও কাজের মধ্যে এইরূপ পরস্পর সম্বন্ধ প্রয়োজন অনুসারে এরূপ সুকৌশলে স্থাপিত হইয়াছে যে উহা দ্বারা

লীলার লীলাত্ব ক্ষুণ্ণ হয় না। অথচ উহার প্রভাবে কর্ম্মের যথাযথ ব্যবস্থা সম্পন্ন হইয়া থাকে। তবে লীলার এমন দিকও আছে, যাহা শুধুই লীলা মাত্র। তাহার সহিত কর্মের ব্যবহিত সম্বন্ধও দেখিতে পাওয়া যায় না।

কর্ম্ম লীলা ও বিশ্রাম এই যে তিনটি অবস্থার কথা বলা হইয়াছে পূর্ণত্বের পথে ইহার প্রত্যেকটিরই অনুভব হইয়া থাকে। তবে আপন আপন বিশিষ্ট প্রকৃতির প্রেরণা অনুসারে কেহ কর্ম হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া বিশ্রাম লাভ করিবার পর নিত্যলীলায় প্রবেশ করেন। তাহার পর লীলাতীত অবস্থায় চিরবিশ্রাম প্রাপ্ত হন। আবার এমনও কেহ কেহ আছেন যাঁহারা বিশ্রাম ও লীলা উভয়ের আস্বাদন গ্রহণ করিয়া পুনর্বার নূতনভাবে কর্মরাজ্যে প্রবেশ করেন। তিনটি অবস্থাই নিত্য। কিন্তু স্ব স্ব প্রকৃতি অনুসারে যিনি যেটিতে প্রধানতঃ স্থিতি লাভ করিতে ইচ্ছা করেন তাঁহাকে তদ্ ভিন্ন অপর দুইটি অনুভব করিয়া লইয়া নিজের অভীপ্সিত অবস্থাতে প্রবেশ করিতে হয়। কিন্তু যাহার যে প্রকার প্রকৃতিই হউক না কেন পূর্ণত্ব লাভ করিতে হইলে তিনটি অবস্থার সহিতই পরিচিত হওয়া আবশ্যক। স্থূল দৃষ্টিতে মনে হইতে পারে এই তিনটি অবস্থা কর্ম, ভক্তি ও জ্ঞান এই তিনটি মহাপথের পূর্ণতায় পরিসমাপ্তির নামান্তর। অদ্বৈতাবস্থায় গিয়া কর্ম নিত্যকর্ম রূপে পরিণত হয়—তদ্রূপ ভক্তি নিত্যলীলাতে পর্য্যবসিত হয় এবং জ্ঞানের চরম ফল নিত্যবিশ্রাম অথবা চিরশান্তি। অদ্বৈতাবস্থাই পূর্ণত্ব। সুতরাং পূর্ণত্বে প্রতিষ্ঠিত হইলে নিত্যকর্ম, নিত্যলীলা ও নিত্যবিশ্রাম এই তিনটি বাস্তবিক পক্ষে অবিভক্ত রূপেই প্রকাশিত হয়। কিন্তু তথাপি ব্যক্তিগত প্রকৃতির বৈশিষ্ট্যানুসারে কেহ অপর দুইটিকে অঙ্গ রূপে অনুভব করিয়া অঙ্গিরূপে আপন ইষ্ট অবস্থায় অবস্থিত হন।

ইহা পূর্ণত্ব হইলেও পরিপূর্ণাবস্থা রূপে পরিগণিত হইবার যোগ্য নহে। কারণ অঙ্গাঙ্গি ভাব থাকা পর্য্যন্ত একটা অলৌকিক বৈষম্য স্বীকার করিতেই হয়। যথার্থ সামরস্য অবস্থায় গুণপ্রধানভাব থাকে

না। এই জন্য পূর্ণাবস্থায় যাইয়াও পরিপূর্ণত্ব লাভ করার প্রয়োজন আছে। পরিপূর্ণাবস্থাই যথার্থ যোগাবস্থা। এই অবস্থায় সর্ববিরোধের সমন্বয় হইয়া থাকে। সুতরাং বিশ্রামের সহিত খেলার, খেলার সহিত কাজের এবং কাজের সহিত বিশ্রামের কোন প্রকার বিরোধ থাকে না। এই জন্যই যোগী পরিপূর্ণ অবস্থার অধিকারী হইলে কিছুই পরিহার করেন না। অথচ বাহ্য দৃষ্টিতে পরিহার সিদ্ধ হইয়া যায়। কর্ম্ম যখন পূর্ণ হইয়া যায় তখন খণ্ড দৃষ্টিতে দেখিতে গেলে কর্ম অতিক্রান্ত হইয়া বিশ্রামের রাজ্যে প্রবেশ লাভ হয় কিন্তু এই বিশ্রান্তি কর্মরহিত জড়ত্ব নহে। ইহাতে অনন্ত কর্ম বিদ্যমান থাকে। সীমাবদ্ধ কর্ম্ম থাকে না বলিয়া কর্ম্মগত চাঞ্চল্য থাকে না। কারণ অনন্ত কর্মের সহিত বিশ্রান্তির কোনই বিরোধ নাই। এই জন্যই যোগী একস্থানে চিরদিনের জন্য স্থিতিলাভ করিয়া অচল অবস্থা প্রাপ্ত হইলেই পক্ষান্তরে অনন্তরূপে অনন্ত দেশে অনন্ত প্রকারের কর্ম নিয়ত সম্পাদন করিয়া থাকেন। যিনি নিষ্ক্রিয়, কুটস্থ, অবিচল দ্রষ্টারূপে অথবা পরমতত্ত্বের উপাসকরূপে নিত্য একাসনে সমাসীন তিনিই ঐ একই সময়ে বিভিন্নরূপে বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন কার্য্য সম্পাদন করিয়া জগচ্চক্র চালনা করিয়া থাকেন। তিনি নিষ্ক্রিয় হইয়াছেন ইহাও যেমন সত্য তেমনি তিনিই কর্ম করিতেছেন ইহাও সম্পূর্ণ সত্য। এইস্থলে নিষ্ক্রিয়ভাব এবং সক্রিয়ভাব পরস্পর বিরুদ্ধ নহে। ইহার একমাত্র কারণ এই ক্রিয়াকে ত্যাগ করিয়া তিনি নিষ্ক্রিয় হন নাই। ক্রিয়ার পূর্ণতার ফলে তিনি ঐ অবস্থা লাভ করিয়াছেন ঠিক সেই প্রকার বিশ্রামেরও একটা পূর্ণতা আছে। যখন বিশ্রাম পূর্ণত্ব লাভ করে তখন বিশ্রাম অতিক্রান্ত হইয়া লীলারাজ্যে প্রবেশ হয়। এই যে লীলা ইহা বিশ্রামের বিরোধী নহে। বিশ্রাম পরিহার করিয়া লীলাতে প্রবেশ হয় নাই। বিশ্রামের পূর্ণতার ফলেই ঐরূপ প্রবেশ হইয়াছে। সুতরাং কর্ম, বিশ্রাম এবং লীলা ইহাই যেখানে ক্রম সেখানে নিত্যলীলায় অধিকার লাভ করিলে কর্ম এবং বিশ্রাম কোনটারই পরিহার হয় না। বিশ্রামের এক প্রান্তে কর্ম এবং অপর

প্রান্তে লীলা। যেমন শ্রীকৃষ্ণের একদিকে সঙ্কর্ষণ এবং অপরদিকে রাধা, ইহাও তদ্রূপ। সুতরাং কেহ এই ক্রমানুসারে নিত্যলীলায় প্রবিষ্ট হইলে বুঝিতে হইবে, সে একদিকে সংসারে প্রতিনিয়ত কর্মে নিরত রহিয়াছে ইহা যেমন সত্য, তেমনি সে সংসারের অতীত শান্তিধামে অবিচলিত ভাবে বিশ্রাম লাভ করিতেছে ইহাও তেমনি সত্য। উপরন্তু ইহাও স্বীকার করিতে হইবে যে সে কর্মও করিতেছে এবং বিশ্রামও করিতেছে, ইহারই সঙ্গে সে নিত্য লীলায়ও আপন ভাবানুসারে যোগ দিয়াছে। প্রত্যেক ব্যাপারের জন্যই তাহার পৃথক স্বরূপের আবশ্যকতা আছে। যে এক স্বরূপে সর্বদা আপন আসনে অচল ভাবে বসিয়া রহিয়াছে সেই অপর স্বরূপে অনন্ত জগতে আপন যোগ্যতানুসারে পরিভ্রমণ করিতেছে।

কিন্তু এই দুইটি স্থিতিই চরম স্থিতি নহে। ইহার উপরে একটি নিত্যলীলারূপ লোকত্তর দশা বিরাজমান রহিয়াছে। কাজ করা শান্তি-লাভ করা এবং খেলা করা—সবই অনন্তভাবে হইয়া থাকে। অথচ এই অনন্তত্ত প্রকৃত অনন্ত নহে। কারণ একই অখণ্ড সত্তা স্বাতন্ত্র্য শক্তি প্রভাবে অনন্তরূপে প্রকাশময় হয়।

পরিপূর্ণ অবস্থা অনুভব করা অত্যন্ত কঠিন। ইহা ভাবমুখে বা অভাবমুখে অনুভব করিতে হয় না। ইহা যুগপৎ উভয় প্রকারেই অনুভূত হয়। অথচ ইহাতে ভাব ও অভাব কোন প্রকারেরই ছায়া স্পর্শ হয় না।

শ্রীভগবান জীবের কল্যাণের জন্য বিভিন্ন স্তরে বিদ্যমান থাকেন। কিন্তু ভাবের আলোক প্রকাশিত হইলে ঐ সকল বহিরঙ্গ ধারা অন্তরঙ্গ ধারা রূপে প্রকাশিত হইয়া ধরাতলে পরিপূর্ণ মহাসত্যের অবতরণের আভাস দিয়া থাকে। যোগী কায়ব্যূহ করিয়া আকাশ মণ্ডলের বিভিন্ন সীমার মধ্যে বিভিন্ন রূপ ধারণ করিয়া আত্মপ্রকাশ করিয়া থাকেন। এই কায়ব্যূহের বহুত্ব তাঁহার মূল অদ্বৈত সত্তাকে ক্ষুন্ন করিতে পারে না।

সূক্ষ্ম সত্তায় অভিমান প্রবিষ্ট হইলে ঐখান হইতে কারণ সত্তায় অনুসন্ধান করিয়া তাহাতে স্থূল আবর্জ্জনারাশি সমস্তই আহুতিরূপে

অর্পণ করিতে হয়। তখন স্বাভাবিক নিয়মে কারণসত্তাতেই অভিমানের উদয় হয়। কারণ হইতে মহাকারণের প্রবেশও এই প্রকারেই হইয়া থাকে।

* * *

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে প্রত্যেকটি ধামেরই এক একটি নির্ম্মাণগত বৈচিত্র্য রহিয়াছে। যে যোগী পূর্ণ চৈতন্যে অধিষ্ঠিত হইয়া কোন নির্দ্দিষ্ট ধামের রচনা করেন তাহার পক্ষে ঐ নির্দ্দিষ্ট ধাম স্ব-ধামেরই অন্তর্গত। শ্রীবৃন্দাবন অথবা গোলক এই কারণেই নানাপ্রকারে কল্পিত হইয়াছে। অন্যান্য ধাম সম্বন্ধেও সেই একই কথা।

ধামতত্ব অত্যন্ত গম্ভীর। ইহার সম্বন্ধে স্থূলভাবের জ্ঞাতব্য সকল বিষয় প্রসঙ্গতঃ কিছু কিছু পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। কিন্তু ধামের যাহা পরম রহস্য তাহা এখনও আলোচিত হয় নাই।

ধাম একটি যন্ত্র বিশেষ। গীতাতে ভগবান পরম ধাম সম্বন্ধে বলিয়াছেন যে উহা অগ্নি সোম এবং সূর্য্য এই ত্রিবিধ জ্যোতির অতীত স্বয়ং জ্যোতিঃস্বরূপ এবং পুনরাবৃত্তি রহিত। কিন্তু শুধু এই বর্ণনা হইতে পরম ধামের স্বরূপ হৃদয়ঙ্গম হয় না।

যাঁহারা তান্ত্রিক যন্ত্র বিজ্ঞানের সহিত পরিচিত আছেন তাঁহারা জানেন যে প্রত্যেকটি যন্ত্রই মূলে একটি বিন্দু হইতে উদ্ভূত হয়। একই মহাবিন্দু হইতে ক্রমশঃ ত্রিকোণ প্রভৃতি চক্রের আবির্ভাব হইয়া নানাপ্রকার যন্ত্র রচিত হইয়া থাকে। এক একটি যন্ত্র বিন্দুতে অধিষ্ঠিত ভগবানের এক একটি রূপের আত্মপ্রসারণ মাত্র। বিন্দু সমগ্র যন্ত্রের মধ্যস্থ। মাকড়সা যেমন নিজের কেন্দ্রে থাকিয়া চতুর্দ্দিকে জাল রচনা করিয়া থাকে। চৈতন্যও তেমনি নিজে মধ্যস্থ থাকিয়া চতুর্দ্দিকে ভাবানুসারে চক্র বিস্তার করিয়া থাকে। যতক্ষণ পর্য্যন্ত শক্তির এই আত্মপ্রসারণ ক্রিয়া নিবৃত্ত না হয় ততক্ষণ পর্য্যন্ত রচনা প্রণালী চলিতেই থাকে। যন্ত্র মাত্রই তত্তৎ নাম ও রূপ বিশিষ্ট ভগবানেরই ধাম স্বরূপ। বিন্দু হইতে ত্রিকোণ অথবা চতুষ্কোণ আবির্ভূত হইয়া উত্তরোত্তর বিভিন্ন চক্রের স্ফুরণ হইয়া থাকে। সর্ব্বমূলে যে রাজ্যটি

সৃষ্টির প্রথম স্পন্দনের সহিত ফুটিয়া উঠে তাহাই মহাত্রিকোণ। এই ত্রিকোণ হইতে সমগ্র বিশ্বের উদ্ভব হইয়া থাকে এবং সমগ্র বিশ্বের উপসংহারও এই ত্রিকোণেই সম্পন্ন হয়। ত্রিকোণটি শক্তি যন্ত্র। ত্রিকেণের মধ্যস্থিত বিন্দু ক্ষুব্ধ হইয়া ত্রিকোণ এবং ক্রমশঃ অন্যান্য চক্র নির্মাণ করিয়া থাকে। নগরে প্রবিষ্ট হইয়া পর পর বিভিন্ন স্তর ভেদ করিতে করিতে ত্রিকোণ সমীপে আসিয়া উপস্থিত হইতে হয়। কারণ এই ত্রিকোণটি মাতৃরাজ্য। সৃষ্টির মূল অন্বেষণ করিতে হইলে সাধক মাত্রেকেই ইহার নিকট আসিতেই হইবে। সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে বিচার করিলে ত্রিকোণের উৎপত্তিরও একটি প্রণালী লক্ষিত হইবে। কারণ বিন্দুর স্পন্দন না হইলে ত্রিকোণের আবির্ভাব হইতেই পারে না। যে বিন্দুর স্পন্দন হইতে এই ত্রিকোণ রাজ্যটি আবির্ভূত হয়—তাহাই মহাবিন্দু। এই মহাবিন্দু কামতত্ত্ব অথবা মহাসবিতা নামে প্রসিদ্ধ। ইহা ক্ষুব্ধ হইলে শ্বেত ও রক্ত যে দুইটি বিন্দু আবির্ভূত হয় তাহাদের প্রথমটি চন্দ্রস্বরূপ এবং দ্বিতীয়টি অগ্নি স্বরূপ। যখন অগ্নির শিখা ঊর্দ্ধগতি প্রাপ্ত হইয়া সোম বিন্দুকে স্পর্শ করে তখন ঐ বিন্দু দ্রুত হয় এবং তাহা হইতে অমৃতস্রাব হইতে থাকে। এই অমৃত নিরন্তর ক্ষরণ হইতে হইতে অমৃতরাজ্য অথবা সোপকরণ নিত্যধাম রচিত হইয়া থাকে। এই অমৃতকলার মূলীভূত ত্রিকোণটি কামকলা নামে প্রসিদ্ধ। ইহা হইতে সৃষ্টির উপকরণ স্বরূপ তত্ত্বসমূহ আবির্ভূত হইয়া থাকে। ঐ সকল তত্ত্ব পরস্পর সংযোগে বিশ্ব রচনা করিয়া থাকে। শ্রীবৃন্দাবনধাম অথবা গোলোক ধাম বা শ্বেতদ্বীপ ঐ একই অবস্থায় আবির্ভূত বিভিন্ন দৃশ্যের নামান্তর।

কুণ্ডলী যন্ত্রই মুখ্য যন্ত্র। এই যন্ত্রের নির্মাণ অত্যন্ত রহস্যময়। আদি নাদ হইতে মহানাদ ভেদ করিয়া যে নাদ ধারা বীজের কার্য্যভূত খণ্ড নাদ পর্য্যন্ত অবতীর্ণ হয় তাহারই পরিণাম কুণ্ডলিনীরূপে রচিত হইয়া থাকে। মূল ধামে অনন্ত শক্তি প্রস্ফুট ভাবে বিরাজ করিয়া থাকে। ঐ সকল শক্তি হইতে বিশ্বের উপাদানস্বরূপ তত্ত্বরাশি প্রকটিত হয়।

রসরাজ পরমপুরুষ শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব ও বিলাসের যন্ত্রটি শ্রীকৃষ্ণের স্বকীয় ধাম। এই ধামের রচনাপ্রণালী অন্যান্য ধামের ন্যায় বাসনা ভেদে বিভিন্ন প্রকার। শ্রীকৃষ্ণ তত্ত্বের আলোচনার মধ্যে তাঁহার ধামের স্বরূপ বিবরণ আবশ্যক। এই জন্য দৃষ্টান্তস্বরূপ বিভিন্ন দৃষ্টিকেন্দ্র হইতে তাঁহার ধামের বিশ্লেষণ করিতে চেষ্টা করা যাইতেছে। লঘু ব্রহ্ম সংহিতাতে শ্রীকৃষ্ণের ধাম সম্বন্ধে যে বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায় তাহা হইতে জানিতে পারা যায় যে সহস্রদল কমল গোকুল নামে প্রসিদ্ধ। ইহা অতি বিশাল রাজ্য। এই কমলের যেটি মধ্যবিন্দু বা কর্ণিকা তাহাই স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণের স্ব-ধাম। এই বিন্দুটি অনন্তের অংশ সম্ভূত বলিয়া বর্ণিত হইয়া থাকে। অথবা অনন্ত যাঁহার অংশ সেই বলদেব ইহাতে অবস্থান করিয়া থাকেন।

> সহস্রপত্রং কমলং গোকুলাখ্যং মহৎ পদম্।
> তৎ কর্ণিকারং তদ্ধাম তদনন্তাংশসম্ভবম্॥

এই যে মধ্যবিন্দুরূপী কর্ণিকার কথা বলা হইল ইহা একটি বিশিষ্ট যন্ত্র, ইহাতে ষট্‌কোণ বিরাজ করিতেছে। কিন্তু ষট্‌ কোণটি দুইটি ত্রিকোণের সমন্বয়ে উৎপন্ন হইয়াছে। তন্মধ্যে একটি উর্দ্ধমুখ ত্রিকোণ যাহা তন্ত্রশাস্ত্রে শিব-ত্রিকোণ নামে প্রসিদ্ধ এবং শক্তি ত্রিকোণ নামে আর একটি ত্রিকোণ যাহা অধোমুখে অবস্থিত—এই দুইটি ত্রিকোণের পরস্পর সংঘটন হইতে ষট্‌কোণ নামক যন্ত্রটি আবিষ্কৃত হইয়াছে। পরমপুরুষ ও পরমা প্রকৃতির পরস্পর মিলিত ভাবের প্রতীক এই ষট্‌কোণ। তান্ত্রিকগণ, এবং বৌদ্ধাচার্য্যগণ 'এবং' কার রূপ এই ষট্‌কোণেরই যথোচিত সমাদর করিয়া গিয়াছেন। এই ষট্‌কোণের মধ্যেই ক্ষণভেদে ভিন্নরূপে ভিন্ন ভিন্ন আনন্দের নব নব উন্মেষ জাগিয়া উঠে। সমগ্র চক্রটি যখন গুটাইয়া আসে তখন এই ষট্‌কোণের মধ্যেই তাহার উপসংহার হইয়া থাকে। ষট্‌কোণ হইতে মধ্যবিন্দুতে স্থিতিলাভ করা পরম সৌভাগ্যের কথা। এই ষট্‌কোণই যুগল মিলনের ক্ষেত্র। সেজন্য ইহাকে উপেক্ষা করা চলে না। এই মহাপদ্মের কর্ণিকারে বীজরূপ বজ্র অথবা হীরকের কীল রহিয়াছে।

চতুরক্ষরী মন্ত্রটি কীলক মন্ত্র। এইস্থানে ষট্‌পদী অষ্টাদশাক্ষরী মন্ত্র অবস্থিত। তাহা ছাড়া প্রকৃতি এবং পুরুষ উভয়ের দ্বারাই এই স্থানটি সংরক্ষিত। মন্ত্রের প্রকৃতি কৃষ্ণ এবং পুরুষও কৃষ্ণই। মন্ত্র সকলের কারণরূপে সমষ্টিরূপে অধিষ্ঠাত্রী দেবতা রূপে এবং ইষ্ট রূপে পুরুষ প্রতীতিগোচর হইয়া থাকেন। এই কর্ণিকাতে প্রেমানন্দ ও মহানন্দ-স্বরূপ অমৃত রস বিদ্যমান থাকে এবং উহাতে জ্যোতিঃস্বরূপ মন্ত্রটি অর্থাৎ কামবীজটি অব্যক্তরূপে সংযুক্ত রহিয়াছে। ইহার চারিদিকে শ্বেতদ্বীপ চতুরস্র আকারে বিদ্যমান রহিয়াছে। এই চতুরস্রের চারিদিকে বাসুদেব সংকর্ষণ প্রদ্যুম্ন এবং অনিরুদ্ধ এই চারিটি ব্যূহের ধাম রহিয়াছে। দশটি শূলের দ্বারা যন্ত্রটি দশদিকে আবদ্ধ। অষ্ট নিধি এবং অষ্ট সিদ্ধি মন্ত্রাত্মক দশটি দিক্‌পাল, শ্যাম, গৌর, রক্ত ও শুক্ল বর্ণ বিশিষ্ট পার্ষদবর্গ বিমলাদি ষোলটি উদ্ভূত শক্তি—ইহাদের দ্বারা চারিদিক আবৃত।

* * *

পদ্মপুরাণের উত্তর খণ্ডে বৈকুণ্ঠ নামক পরম ধামের বিস্তৃত বর্ণনা দেখিতে পাওয়া যায়। এই রাজ্যে বহুসংখ্যক জনপদ আছে। রত্নময় প্রাকার বিমান ও সৌধদ্বারা অলঙ্কৃত। ইহার প্রধান নগরী অযোধ্যা নামে প্রসিদ্ধ। এই নগরের চারিটি দ্বার রত্নময় গোপুর ও মণিকাঞ্চনাদি ঘটিত চিত্রে রঞ্জিত। প্রাকার ও তোরণ সকলের দ্বারা ইহা বেষ্টিত। বিভিন্ন দ্বারে বিভিন্ন রক্ষক, দ্বার সংখ্যা চারিটি। পূর্ব্বদ্বারে —চণ্ড এবং প্রচণ্ড, দক্ষিণদ্বারে—ভদ্র ও সুভদ্র, পশ্চিমদ্বারে—জয় ও বিজয় এবং উত্তরদ্বারে—ধাতা ও বিধাতা বিরাজমান রহিয়াছেন। এই বিশাল পুরীর মধ্যভাগে অন্তঃপুর আছে। ইহা মণিময় প্রাকার ও রত্নময় তোরণ দ্বারা ভূষিত। ইহার মধ্যে দিব্যমণ্ডল যাহা সহস্র সংখ্যক মাণিক্য স্তম্ভের দ্বারা বিধৃত।

পদ্মপুরাণে পাতালখণ্ডে নিত্য বৃন্দাবনের বিবরণ দেখিতে পাওয়া যায়। ব্রহ্মসংহিতার ন্যায় এই স্থানেও সহস্রদল কমলের ন্যায় গোকুলের স্বরূপ বর্ণিত হইয়াছে। এই কমলের কর্ণিকাই শ্রীগোবিন্দের স্থান।

মাথুরমণ্ডল ও সহস্রদলের মতন। ইহা বিষ্ণুর সুদর্শন চক্রের পরিমাণ বিশিষ্ট। এই মণ্ডলে বারটি বন প্রধান, তন্মধ্যে সাতটি যমুনার পশ্চিমে এবং পাঁচটি উহার পূর্ব্বে অবস্থিত। এই বারটি বনের নাম, এই প্রকার—ভদ্র, শ্রী, লৌহ, ভাণ্ডারী, মহা, তাল, খাদিরক, বকুল, কুমুদ, কাম্য, মধু, ও বৃন্দাবন। গোকুলটি মহারণ্য। মধুবন ও বৃন্দাবনের প্রাধান্য অঙ্গীকৃত হইয়াছে। এই সকল ব্যতীত আরও বহু উপবন আছে। সেগুলি শ্রীকৃষ্ণের বিভিন্ন প্রকার লীলার সহিত সংশ্লিষ্ট। এই সকল লীলাভূমির মধ্যে কদম্ববন, খণ্ডিকবন, অশোকবন, কেতকবন, অমৃতবন, প্রভৃতি প্রসিদ্ধ। উপবনের সংখ্যা ত্রিশটি। প্রধান বন পূর্ব্বোক্ত দ্বাদশটি। সহস্রদল কমলের কর্ণিকার উপরে স্বুবর্ণ পীঠ ও মণিমণ্ডপ অবস্থিত। ইহার আট দিকেই আটটি দল বিদ্যমান। তন্মধ্যে দক্ষিণ দলে মহাপীঠ বিরাজ করিতেছে। অগ্নিকোণের দলে দুইটি ভাগ—একটিতে নিকুঞ্জ কুটির ও অপরটিতে বীর কুটির অবস্থিত। পূর্বদিককার দল পবিত্রতা সম্পাদক বলিয়া প্রসিদ্ধ। ঈশান দিকের দলটি সিদ্ধপীঠ যেখানে গোপীগণ কাত্যায়নী পূজা করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে প্রাপ্ত হইয়াছিল। বস্ত্রহরণ ও অলঙ্কার হরণ এই স্থলেই হইয়াছিল। উত্তর দিককার দলে দ্বাদশ আদিত্য অবস্থিত। বায়ু কোণের দলে কালিয়হ্রদ প্রতিষ্ঠিত। পশ্চিম দিক্‌কার দল যজ্ঞ পত্নীগণের অত্যন্ত প্রিয় ছিল। অঘাসুরের মোক্ষলাভ এবং ব্রহ্মমোহন এই দলেই হইয়াছিল। নৈর্ঋৎ কোণের দল ব্যোমঘাতন বলিয়া প্রসিদ্ধ। শঙ্খচূড় বধ এই দলের প্রধান লীলা। এই অষ্টদলের কমল লইয়া বৃন্দাবনের প্রধান খেলা। গোপীশ্বর শিবলিঙ্গ অষ্টদল কমলের অধিষ্ঠাতা। অষ্টদলকে বেষ্টিত করিয়া ষোড়শদল রহিয়াছে। ষোড়শদলের প্রত্যেকটি দলেই কোন না কোন লীলাস্থল অবস্থিত। দক্ষিণদিক্‌কার প্রথম দলে মধুবনের স্থিতি। সেখানে চতুর্ভুজ মহাবিষ্ণু প্রকট হইয়াছিলেন। দ্বিতীয় দল খদিরবন। এইখানে গোবর্দ্ধন পর্বতে মহালীলা হইয়াছিল। প্রসিদ্ধি আছে এইখানেই শ্রীকৃষ্ণ নিত্যবৃন্দাবনের পতি

হন ও গোবিন্দত্ব লাভ করেন। তৃতীয় দল অতি উৎকৃষ্ট স্থান—চতুর্থ দল অদ্ভুত রসের লীলাভূমি। এইখানে নন্দীশ্বর বন ও নন্দালয় অবস্থিত। পঞ্চমদলের অধিষ্ঠাতা গোপাল অথবা ধেনুপাল। ষষ্ঠ ও সপ্তম দলে ক্রমশঃ নন্দবন ও বকুলবন বিরাজিত। ধেনুকাসুরের বধস্থলী তালবন অষ্টম দলে অবস্থিত। নবম দলে কুমুদবন এবং দশম দলে কাম্যবন স্থিত। কাম্যবনে দেবগণ ব্রহ্মার অনুগ্রহ প্রাপ্ত হন এবং আরও কতকগুলি লীলা প্রদর্শিত হয়। একাদশ দলে বহু বন আছে। ইহা ভক্তগণের বিশেষ অনুগ্রহ সাধক। সেতুবন্ধের নির্মাণ এই দলেই হইয়াছিল। দ্বাদশদলে ভাণ্ডীরবন যেখানে শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীদাম প্রভৃতির সঙ্গে খেলা করিতেন। ভদ্রবন, শ্রীবন ও লৌহবন ক্রমশঃ ত্রয়োদশ চতুর্দশ ও পঞ্চদশ দলে স্থিত আছে। ষোড়শ দলে মহাবন। শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলা, পুতনাবধ, যমলার্জ্জুন-ভঞ্জন প্রভৃতি এইখানেই হইয়াছিল। পঞ্চমবর্ষীয় দামোদর নামক বালগোপাল এই স্থানের অধিষ্ঠাতা।

পুরাণে আছে যে, বৃন্দাবনের অদ্ভুত রহস্য ত্রৈলোক্য মধ্যে কেহই পরিজ্ঞাত নহে। পদ্মপুরাণে শ্রীবৃন্দাবনের যেরূপ বর্ণনা আছে তাহা প্রায় ব্রহ্মসংহিতারই অনুরূপ। উহাতে স্পষ্টই লিখিত আছে যে ঐ স্থল পূর্ণানন্দ রসের আশ্রয়। ওখানকার ভূমি চিন্তামণি স্বরূপ, জল অমৃত রসপূর্ণ, কৈশোর একমাত্র বয়স, পুরুষ মাত্রই বিষ্ণু এবং স্ত্রী মাত্রই লক্ষ্মী। ওখানে সকলের বিগ্রহ নিত্য ও আনন্দময় এবং সকলেই হাস্যমুখ। দুঃখ, জরা, মৃত্যু, ক্রোধ, মাৎসর্য্য, ভেদজ্ঞান, অহংকার ঐস্থান হইতে চির নির্ব্বাসিত। ঐস্থানে কোকিল ও ভ্রমর-গণের নিনাদ, শুকের গান, ময়ূরের নৃত্য, নানাপ্রকার পুষ্প সৌরভ, মধুর সমীরণ পুষ্পবেণুর বিকিরণ, সর্বদা পূর্ণচন্দ্রের উদয় বিশিষ্টরূপে লীলাভূমির সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্য প্রকাশ করিয়া থাকে। ঐস্থানে বৃক্ষাদির অঙ্গেও পুলক সঞ্চার হয় এবং প্রেম ও আনন্দের অশ্রুবর্ষণ দৃষ্ট হয়। ইহা অতি গুপ্তস্থান। অষ্টকোণাত্মক যোগপীঠ মাণিক্য

রত্নময় সিংহাসন, তন্মধ্যে অষ্টদল কমল এবং কমলের কর্ণিকাতে পরম স্থান। ইহা গুণাতীত মহাধাম।

যে সিংহাসনে রাধাগোবিন্দ উপবিষ্ট তাহার বাহ্যপ্রদেশে যোগপীঠ ও ললিতাদি সখীর অবস্থান। পশ্চিমে ললিতা, বায়ুকোণে শ্যামলা, উত্তরে ধন্যা, ঈশানকোণে হরিপ্রিয়া, পূর্বে বিশাখা, অগ্নিকোণে শৈব্যা, দক্ষিণে পদ্মা এবং নৈঋতে ভদ্রা প্রতিষ্ঠিত। রাধিকা মূলা প্রকৃতি, ললিতাদি তাহার অংশ স্বরূপ।

যোগপীঠের কেশরাগ্রে চন্দ্রাবলীর স্থান। চন্দ্রাবতী, চন্দ্রাবলী, চিত্ররেখা, চন্দ্রা, মদনসুন্দরী, কৃষ্ণপ্রিয়া, মধুমতী, ও চন্দ্ররেখা এই আটটি প্রকৃতি এবং পূর্ব বর্ণিত অষ্টসখী পরস্পর মিলিত হইয়া ষোড়শ প্রকৃতির বিকাশ। এই সকল প্রকৃতির অগ্রভাগে সহস্র সহস্র কিশোরী গোপকন্যা বিরাজ করিতেছেন। যাহাদের দক্ষিণাংশে শ্রুতিকন্যাগণ ও বামাংশে দেবকন্যাগণ দিব্যালঙ্কারে বিভূষিত হইয়া সঙ্গীত আদি দ্বারা লীলারসের পুষ্টিসাধন করিতেছেন।

এই পর্যন্ত শ্রীকৃষ্ণের মন্দিরের অন্তরঙ্গ ভাগ বুঝিতে হইবে। মন্দিরের বাহ্য প্রদেশে প্রিয় সখাগণ অবস্থান করেন। ইহাদের সকলেরই বয়স, বেশ, বল, পৌরুষ, গুণ, কর্ম, ভূষণ ও বেণুবাদন শ্রীকৃষ্ণেরই অনুরূপ। মন্দিরের বাহিরে পশ্চিম দ্বারে শ্রীদাম, উত্তর দ্বারে বসুদাম, পূর্ব দ্বারে সুদাম এবং দক্ষিণ দ্বারে কিঙ্কিনী অবস্থিত। ইহার বাহিরে সুবর্ণময় মন্দির—প্রতি মন্দিরে স্বর্ণবেদী এবং তাহার উপরে সুবর্ণময় পীঠ। এই পীঠে স্বর্ণালংকার ভূষিত গোপাল মূর্তি বিরাজিত। চারিদিকে এই প্রকার অসংখ্য গোপাল মূর্তি বিরাজ করিতেছেন। কাহারও নাম স্তোককৃষ্ণ, কাহারও নাম অংশুভদ্র ইত্যাদি। সকলেরই হস্তে শৃঙ্গ, বীণা ও বেত্র। বয়স, বেশ, আকার ও স্বর সকলেরই একই প্রকার। এই সকল গোপালের চতুর্দিকে ক্ষীরস্রাবী ধেনু সকল বিরাজ করিতেছেন। গোপালমণ্ডলের বাহিরে কোটি সূর্য্যের ন্যায় উজ্জ্বল সুবর্ণ প্রাচীর। এই প্রাচীরের চারিদিকে চারিটি মহাবন। পশ্চিম দিকের বন মহোত্তান নামে প্রসিদ্ধ। ইহা

পারিজাত বৃক্ষের বন। পারিজাত বৃক্ষের নীচে স্বর্ণমন্দির তাহাতে সুবর্ণময় পীঠ। ঐ পীঠের উপর দিব্য সিংহাসনে চতুর্ভুজ বাসুদেব মূর্তি বিরাজ করিতেছেন। তাঁহার অষ্ট মহিষী অর্থাৎ রুক্মিণী, সত্যভামা সুলক্ষণা নাগ্নজিতী, মিত্রবৃন্দা, অনুবৃন্দা, সুনন্দা ও জাম্ববতী ও উদ্ধবাদি ভক্ত পারিষদগণ তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া আছেন। উত্তর দিকের মহাবন হরিচন্দন বৃক্ষের। ইহার মধ্যে পূর্ববৎ মন্দির ও সিংহাসনে সঙ্কর্ষণ বা বলরাম রেবতীসহ বিরাজমান। ইনি নীলাম্বর-ধারী ও মধুপানে মত্ত। দক্ষিণদিকে নিকুঞ্জবনে সন্তানক বৃক্ষের নীচে প্রদ্যুম্ন (কামদেব ও রতি) বিরাজমান। পূর্বদিকে সুরতরুমূলে অনিরুদ্ধ ও উষা পূর্ববৎ মন্দিরে ও সিংহাসনে বিরাজমান। এই চারটি চতুর্ব্যূহ নামে প্রসিদ্ধ। উর্দ্ধদিকে আকাশমণ্ডলে কিরীট ও কুণ্ডলধারী চিন্ময় বিষ্ণু বিগ্রহ পরিদৃষ্ট হয়। ইহা নিষ্কাম ভক্তের স্থান। ভগবানের বামদেশে যক্ষ গন্ধর্ব সিদ্ধ কিন্নর সকল স্ব স্ব স্থানে অবস্থান করিতেছেন এবং অপ্সরাগণ নৃত্য করিতেছেন। অগ্রভাগে প্রহ্লাদ নারদ, শুকদেব, সনৎকুমার প্রভৃতি ভক্তগণ অবস্থিত রহিয়াছেন। ইহার বহির্দেশে উচ্চ স্ফটিকময় প্রাচীর। ইহা নানা বর্ণে উজ্জ্বল। ইহার চারি দ্বারে চারি জন বিষ্ণু দ্বারপালরূপে বিরাজিত আছেন। ইঁহাদের সকলেরই বর্ণ পৃথক পৃথক। যিনি পশ্চিম দ্বারে আছেন তাহার বর্ণ শুক্ল। উত্তরেরটি রক্ত পূর্বেরটি গৌর এবং দক্ষিণেরটি কৃষ্ণবর্ণ।

ইতিপূর্বে যন্ত্রাত্মক ভগদ্ধামের কিঞ্চিদ্ আভাস সংক্ষিপ্ত রূপে দেওয়া হইয়াছে। গোলোক, বৈকুণ্ঠ, বৃন্দাবন, গোকুল প্রভৃতি সবই যন্ত্ররূপী। ইহার কিঞ্চিৎ বিবরণ দেওয়া হইলেও সম্যক্ পরিচয় দেওয়া হয় নাই। কারণ এই ধাম গঠন ভেদে ভিন্ন ভিন্ন প্রকার হইয়া থাকে। পদ্মপুরাণে বৈকুণ্ঠধামের বর্ণনা আছে। ভক্তপ্রবর রামানুজ আচার্য্য ও তাঁহার গদ্যত্রয় গ্রন্থে বৈকুণ্ঠধামের বর্ণনা করিয়াছেন। পৌরাণিক সাহিত্যে বহুস্থানে প্রসঙ্গতঃ বৈকুণ্ঠধামের বর্ণনা পাওয়া যায়। কিন্তু এই সকল সর্বাংশে একপ্রকার নহে। ঠিক তদ্রূপ গোলোকধামের বর্ণনাও বহু-

স্থানে পাওয়া যায়। শ্বেতদ্বীপ গোলোকধামেরই নামান্তর। ইহার অন্তর্গত সহস্র পত্রাত্মক গোকুল পদ্ম ভক্তসমাজে প্রসিদ্ধ। মাথুরমণ্ডল এই ধামেরই নামান্তর। ব্রজভূমির সন্নিবেশ এক এক স্থলে এক এক প্রকার পাওয়া যায়, অবশ্য মূল রহস্যটি সর্বত্রই মূলতঃ একই। গোকুল ও শ্রীবৃন্দাবনের বর্ণনা পদ্মপুরাণে এবং অন্যান্য পুরাণেও আংশিকভাবে উপলব্ধ হয়। গোপাল চম্পূতে এই বিবরণের অনুরূপ বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে। লঘু ব্রহ্মসংহিতা এবং জীব গোস্বামিকৃত উহার টীকাতেও এ সম্বন্ধে কিছু কিছু বর্ণনা দেখিতে পাওয়া যায়।

ইহা হইতে বুঝিতে পারা যাইবে সাধকের বাসনা ভেদই ধামগত বৈচিত্র্যানুভূতির কারণ। কিন্তু এই সকল বৈচিত্র্য তাত্ত্বিক নহে, প্রাসঙ্গিক মাত্র। আসল কথা এই, ধামের মূল তত্ত্বটি যন্ত্র, এবং যন্ত্রের মূল তত্ত্বটি মন্ত্র। সুতরাং মন্ত্রের মূল তত্ত্ব আশ্রয় করিয়া যন্ত্রকে প্রস্ফুটিত করিতে পারিলে যন্ত্রের বিকাশ স্বভাবতঃই সিদ্ধ হয়। যন্ত্র ভিন্ন মহাচৈতন্যকে আয়ত্ত করিয়া কার্য্যে পরিণত করা যায় না। মহাচৈতন্যে সবই আছে অথচ কিছুই নাই। যিনি যাহা প্রাপ্ত হইতে ইচ্ছা করেন তিনি উহা হইতে সুকৌশলে তাহা প্রাপ্ত হইতে পারেন। যন্ত্র মুক্ত শক্তিকে নিয়ন্ত্রিত করিবার কৌশল মাত্র। শক্তিকে যন্ত্রে বদ্ধ করিতে না পারিলে উহা দ্বারা স্বানুরূপ কার্য্য সাধনও অসম্ভব। কারণ মুক্ত শক্তি বদ্ধতা স্বীকার করে না। তাহা দ্বারা কোন কার্য্যই সিদ্ধ হয় না। যন্ত্র,—মন্ত্র ও বীজকে উপজীব্য রূপে আশ্রয় করিয়া আত্মপ্রকাশ করিয়া থাকে। এই জন্যই যন্ত্রের এত মহিমা। যন্ত্ররহস্য পরিজ্ঞাত থাকিলে মহাচৈতন্য হইতে যিনি যাহা ইচ্ছা করেন তাহাই দোহন করিয়া বাহির করিতে পারেন। যিনি যন্ত্রবিজ্ঞানে অভিজ্ঞ তিনি যন্ত্র সাহায্যে ইচ্ছানুরূপ স্ফুরণ করিতে পারেন। যন্ত্র মধ্যে বর্ণ এবং বর্ণসমষ্টিজাত বীজ তত্তৎস্থানে আধান করিতে পারিলে যন্ত্রের বৈশিষ্ট্য নিষ্পন্ন হয়। আধান সম্বন্ধে বৈশিষ্ট্য থাকিলে উহার ফলে যন্ত্র মধ্যেও বৈশিষ্ট্য লক্ষিত হয়। মহানারায়ণ উপনিষদে বৈকুণ্ঠ যন্ত্রের নির্দ্দেশ রহিয়াছে। ইহাও এই প্রসঙ্গে আলোচ্য।

যন্ত্র ইষ্টদেবতার গৃহস্বরূপ, সুতরাং যন্ত্রবিজ্ঞান আয়ত্ত করিয়া তাহাতে মূল মন্ত্রের এবং বীজের আলোক প্রক্ষেপ করিতে পারিলে যন্ত্রানুরূপ ভগবদ্ধাম প্রস্ফুটিত হইয়া উঠে। এই প্রসঙ্গে অধিক আলোচনা অনাবশ্যক বোধে পরিত্যক্ত হইল।

পূর্বে শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব এবং রাধাতত্ত্ব সম্বন্ধে বলা হইয়াছে—যে এই উভয় তত্ত্বই ত্রিপুরসুন্দরীর সহিত বিশেষরূপে সম্বন্ধ বিশিষ্ট। ত্রিপুর-সুন্দরী ললিতা নামে কুঞ্জাধিষ্ঠাত্রী মুখ্য সখীরূপে বৃন্দাবন লীলায় স্থান পাইয়াছে ইহা সত্য। কিন্তু উহাই শেষ কথা নহে। বাসুদেব ত্রিপুরসুন্দরীর রূপান্তর এবং কামকলার প্রতীকস্বরূপ। রাধাও তাহাই। ইঁহাদের মধ্যে যে অতি সূক্ষ্ম পার্থক্য রহিয়াছে তাহা এখানে উপেক্ষিত হইল। প্রসিদ্ধি আছে হরিনাম রূপ মহামন্ত্রের ঋষি বাসুদেব, ছন্দ গায়ত্রী এবং দেবতা স্বয়ং ত্রিপুরা। বাসুদেব-সহস্রনামক গ্রন্থে ইহা উল্লিখিত হইয়াছে। যথা—'হরিনাম্নোহি মন্ত্রস্য বাসুদেব ঋষিঃ স্মৃতঃ। গায়ত্রী ছন্দ ইত্যুক্তং ত্রিপুরা দেবতা মতা।' এই গ্রন্থ হইতে জানা যায় যে মহাদেবের আদেশে বাসুদেব ত্রিপুরসুন্দরীর ভজন করেন। এই সুন্দরী দশ মহাবিদ্যার মধ্যে শ্রেষ্ঠ। ইনি শিবের হৃদয়স্থিত। বাগ্‌ভবকূট (যাহার নামান্তর ত্রৈলোকমোহন)। কামরাজকূট ও শক্তিকূট সম্মিলিত ভাবে মহাবিদ্যার মন্ত্র। ত্রিপুরা বাসুদেবের তপস্যায় প্রসন্ন হইয়া তাঁহার নিকট আবির্ভূতা হন ও তাঁহাকে শক্তিযুক্ত হইয়া কুলাচার অবলম্বনে সাধন করিতে আদেশ করেন। লক্ষ্মী ত্রিপুরার অংশরূপা। তাঁহাকে সঙ্গী করিয়া তাঁহার সহকারিতায় যুক্তভাবে সাধনার উপদেশ দেওয়া হয়। হরিনাম দ্বারা দশ হইতে দ্বাদশ বর্ষ মধ্যে কর্ণশুদ্ধি আবশ্যক, ইহাও দেবীর বচন হইতে বুঝিতে পারা যায়। হরিনামের রহস্য নাম সাধন প্রসঙ্গে বলা হইবে। আপাততঃ ইহাই জানিয়া রাখা আবশ্যক। রহস্য ত্যাগ করিয়া শুধু মন্ত্র জপ করিলে কোন ফল লাভ হয় না।

পূর্বে যে কামকলাতত্ত্বের কথা বলা হইয়াছে এ রহস্য

আলোচনাতেও প্রকারান্তরে তাহারই আভাস প্রাপ্ত হওয়া যায়। কারণ কৃষ্ণনামের রহস্য বর্ণনা প্রসঙ্গে জানিতে পারা যায় যে এই নামের অবয়ব ভূত 'ক' কামের বাচক 'ঋ' শ্রেষ্ঠ শক্তি, উভয়ের সংযোগে 'কৃ' কামিনী অথবা কামকলা তত্ত্বের বাচক। 'ষ' পূর্ণ প্রেমাবস্থাতে বিদ্যমান অমৃত নাম্নী ষোড়শী কলা। 'ণ' নির্বাণ স্বরূপ। উভয়ের সমন্বয়ে সাক্ষাৎ ত্রিপুরাই অভিহিত হইয়া থাকেন। পক্ষান্তরে হরিনামের রহস্যেও এই মহাতত্ত্বের ইঙ্গিত জানিতে পারা যায়। 'হ' = শিব, র = দশমূর্ত্তিময়ী ত্রিপুরা, এ = ভগ অথবা যোনি। সুতরাং হরে শব্দ অথবা হরি শব্দ সাক্ষাৎ ত্রিপুরারই বাচক, 'হরিস্তু ত্রিপুরা সাক্ষাৎ মম মূর্ত্তি র্ন সংশয়ঃ।'

শ্রীকৃষ্ণের সহিত এই যে ত্রিপুরার সম্বন্ধ প্রদর্শিত হইল, ইহা আরও স্পষ্ট ভাবে কোন কোন গ্রন্থে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে শ্রী কৃষ্ণযামল মহাতন্ত্রে উল্লিখিত হইয়াছে যে ঊর্দ্ধলোকের অন্তর্গত স্বর্গ মহর্লোক জনলোক তপোলোক ও সত্যলোক সর্বত্র প্রসিদ্ধ। ব্রহ্মলোকের উপর চতুর্ব্যূহের স্থান। বৈকুণ্ঠের দক্ষিণে সঙ্কর্ষণ। বৈকুণ্ঠের নীচে ও পশ্চিমে প্রদ্যুম্ন বা কামদেব। কামের ঊর্দ্ধে ও উত্তরে অনিরুদ্ধ এবং পূর্বে বাসুদেব। এই সকল স্থানই—সত্যলোকের ঊর্দ্ধে এবং বৈকুণ্ঠের নিম্নে অবস্থিত। চতুর্ব্যূহের ঊর্দ্ধে জ্যোতির্ম্ময় বৈকুণ্ঠধাম বা পরব্যোম। ইহা চতুর্ব্যূহ উপলক্ষিত চতুরস্রের মধ্যস্থানে অবস্থিত। ইহার উপরে কৌমার লোক, যেখানে ব্রহ্মাণ্ড রক্ষক কার্ত্তিকেয় অবস্থান করেন। ইহার উপর মহাবিষ্ণুর স্থান। ইনিই সহস্রশীর্ষা পুরুষ এবং শ্রীকৃষ্ণের অংশের অংশ হইতে উদ্ভূত। যে কারণসলিলের কথা পূর্বে বলা হইয়াছে তাহা এই মহাবিষ্ণুর মুখ হইতে উদ্ভূত। সেই সলিলে মহাসঙ্কর্ষণ অবস্থিতি করেন, যাঁহাকে শয্যা করিয়া শেষ শায়ী ভগবান জাগ্রত স্বরূপ হইয়াও সুপ্তবৎ বিদ্যমান থাকেন। জগতের সৃষ্টি এবং প্রলয় ইহাঁরই নিশ্বাস এবং প্রশ্বাসের স্বরূপ। এই মহাযোগী কারণ সমুদ্রে অর্দ্ধ উন্মীলিত নেত্রে গোবিন্দের চরণ ধ্যানে মগ্ন থাকেন। তাঁহার বাম পার্শ্বে মহালক্ষ্মী (যিনি রাধার অঙ্গ হইতে উদ্ভূত) অর্দ্ধ

নিমীলিত নেত্রে তাঁহাকে ব্যজন করেন। পরম পুরুষ গোবিন্দের ধ্যান বশতঃ মহাবিষ্ণুর অঙ্গে পুলক উৎপন্ন হয়! প্রতি রোমে ব্রহ্মাণ্ডের আবির্ভাব হয়। অন্তরালে রাধার চিন্তাবশতঃ নেত্রান্তে অশ্রুধারা নির্গত হয়। বামচক্ষু হইতে যমুনা, দক্ষিণ হইতে গঙ্গা এবং মধ্যম হইতে গোমতী উদ্ভূত হন। এই তিনটি ধারা পুনর্বার কারণ সমুদ্রে প্রবিষ্ট হয়। ইহাঁরাই জগতে তমঃ (কালা) সত্ত্ব (সাদা) ও রজঃ (লাল) নামে প্রসিদ্ধ।

ইহার উপর ত্রিপুরসুন্দরীর লোক। ইহাঁর পূর্ণযন্ত্র, যাহা শ্রীযন্ত্র নামে প্রসিদ্ধ, এই স্থানে বিরাজমান। ইনি কৃষ্ণ হইতে উৎপন্ন এবং স্বয়ং কৃষ্ণরূপা, চতুর্ভুজ এবং রক্তবর্ণ! ইনি শুক্ল বর্ণ বাণী পীতবর্ণা ভুবনেশ্বরী, রক্তবর্ণা ত্রিপুরাসুন্দরী, শ্যামবর্ণ, কালিকা এবং কৃষ্ণবর্ণা নীলসরস্বতী। পরাশক্তি দুর্গা সাক্ষাৎ কৃষ্ণস্বরূপা—'দুর্গাখ্যা যা পরাশক্তিঃ সাক্ষাৎ কৃষ্ণস্বরূপিণী।'

রাধা ও কৃষ্ণের বিপরীত রতি হইতে দুর্গা ও রাম উৎপন্ন হন। দুর্গাই গোবিন্দ এবং রাম অথবা সঙ্কর্ষণই রাধা। সঙ্কর্ষণকে নিত্য-সৃষ্টির জন্য মহাবিষ্ণুর উদরে প্রবেশ করান হয়। মহাবিষ্ণুর নাড়ীতে যাইয়া সঙ্কর্ষণ কুণ্ডলী আকার প্রাপ্ত হন এবং সহস্রমুখ হইয়া মুখরন্ধ্র হইতে বহির্গত হন। মহাবিষ্ণু অখিল ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি ধারণ ও সংহার করেন। তাঁহার উর্দ্ধস্থ মধ্য ফণাচক্রে গৌরীপুর নামক চক্র আছে! সেখানে দুর্গা ভুবনেশ্বরী রূপে বিরাজমান রহিয়াছেন। গৌরীলোকের পূর্বে যে দেবী আছেন তিনি কখনও শ্যামা কখনও কনকপ্রভা চতুর্ভুজা শঙ্খ, চক্র, শূল ও মুদগর-ধারিণী। তাঁহার নিকটেই কালরূপা কালিকা অবস্থিত। চক্রের দক্ষিণে নীলসরস্বতী বা উগ্রতারা বা একজটার স্থান। চক্রের পশ্চিমে শুক্লবর্ণা শুভ্র সত্ত্বময়ী ব্রহ্ম বাগ্‌বাদিনী নিত্যা অবস্থিত। পীতবর্ণা ভুবনেশ্বরী ছিন্নমস্তা রূপে পরিণত হন।

এই চক্ররাজের উত্তরে যোগিনীগণ এবং ডাকিনী এবং লাকিনী বেষ্টিত সিদ্ধ যোগিনীগণ অবস্থিতি করেন। ভুবনেশ্বরী চক্ররাজের

উত্তরে, ছিন্নমস্তা পশ্চিমে, বাণীর দক্ষিণে নীলসরস্বতী এবং পূর্বে শ্যামা, দুর্গা ও কালিকা।

এই প্রকার পর পর লোক সংস্থানের এবং সঙ্গে সঙ্গে দিব্য মণ্ডলের অবস্থানের সবিশেষ বর্ণনা কৃষ্ণযামল মহাতন্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায়। শ্রীকৃষ্ণতত্ত্বের রহস্য প্রতিপাদনের জন্যই এই গ্রন্থখানার আবির্ভাব। এইস্থলে অধিক বিশ্লেষণ অনাবশ্যক বলিয়া পরিত্যক্ত হইল।

শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব ও শ্রীরামতত্ত্ব সম্বন্ধে যোগিগণ কিছু কিছু রহস্য প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। অবশ্য শ্রীরামচন্দ্র মর্য্যাদাপুরুষোত্তম, এবং শ্রীকৃষ্ণ লীলাপুরুষোত্তম, ইহা প্রসিদ্ধই আছে। একই পুরুষোত্তমতত্ত্ব ভাব ভেদে শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাম রূপে দুই ভাবে প্রকাশমান।

শুকসংহিতা হইতে অবগত হওয়া যায় যে এই তত্ত্ব অত্যন্ত গুহ্য। এমন কি জ্ঞানিগণও ইহা ধারণা করিতে পারেন না। এই গ্রন্থে পঞ্চদশ ধারণায় উল্লেখ আছে। এই পঞ্চদশ ধারণার মধ্যে প্রথম পাঁচটি ধারণা পঞ্চভূতকে আশ্রয় করিয়া হইয়া থাকে। ইহার পর ষষ্ঠ ধারণা মনোময়ী এবং সপ্তম ধারণা উন্মনী। ইহার বিষয় ব্যক্ত অথবা অভিব্যক্ত মায়িক প্রকৃতি। ইহার পর পরম শূন্যকে আশ্রয় করিয়া পরশূন্যময়ী অষ্টম ধারণার উদয় হয়। এই পরশূন্যের পরই ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার হইয়া থাকে। কিন্তু ইহা সগুণ ব্রহ্ম এই জন্য নবম ধারণা ব্রহ্ম বিষয়। দশম ধারণা নির্গুণ ব্রহ্ম বিষয়ক। এইখানেই নির্ব্বিশেষ ধারণা পরিসমাপ্ত। একাদশ ধারণাতে রামতত্ত্বের স্ফুরণ হয়। কিন্তু রাম একাকী; তাঁহার স্বরূপ শক্তির বিকাশ নাই। দ্বাদশ ধারণায় স্বরূপ শক্তির উন্মেষ হইয়া থাকে। এই জন্য সীতা-রামের যুগলরূপ ইহার বিষয়। ইহা পূর্ণ সচ্চিদানন্দময়ী অবস্থা। যদিও স্বরূপশক্তির বিকাশ হইয়াছে, তথাপি এখনও লীলার আবির্ভাব হয় নাই। কিন্তু ত্রয়োদশী ধারণা নিত্য লীলারসের আনন্দকে আশ্রয় করিয়া উদ্ভূত হয়। চতুর্দ্দশী ধারণা গোপলীলারসরূপী আনন্দকে আশ্রয় করিয়া উদ্ভূত হয়। ইহা পরিপূর্ণ ব্রহ্মরসানন্দময়। পঞ্চদশী

ধারণা বল্লভাশ্রয়। তখন যোগী স্বয়ং কান্তরূপী ভগবানকে প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। ইহাই পূর্ণ ও সহজ অবস্থা। ইহা পূর্ণ প্রেম-রসানন্দময়।

এইভাবে পঞ্চদশ ধারণার জ্ঞান হইতে পূর্ণ কলার বিকাশ হয়। ইহারই নামান্তর মুক্তিলাভ।

প্রসিদ্ধি আছে একবার শুকদেব গোলোকধাম দর্শন করিতে গিয়াছিলেন। সেখানে যাইয়া পরমানন্দময় বৃন্দাবন এবং অন্যান্য ভগবানের লীলাস্থল দর্শন করেন। তিনি দেখিতে পান দিব্য শ্রী যমুনার তীরে বংশীবট তরুর মূলদেশে গোপীগণের সহিত শ্যাম-সুন্দর নৃত্য করিতেছেন—'যত্র ব্রহ্মাদয়ো দেবাঃ কোটিজন্মার্জ্জিতৈঃ শুভৈঃ। গোপিকাভাবমাসাদ্য রময়ন্তি পুনঃ পুনঃ। ঋষয়ঃ শ্রুত-য়শ্চৈব গোপিকাভাবভাবিতাঃ। ক্রীড়ন্তি প্রভুনা সাকং মহাসৌভাগ্য-মণ্ডিতাঃ।' ঐ স্থানে শুকদেব পরীক্ষিতের দর্শন পান। পরীক্ষিৎ তাঁহাকে বলিলেন যে তাঁহারই কৃপায় ভাগবত শ্রবণ করিয়া তিনি নিত্য লীলাময় গোলোকধামে রাম তত্ত্বের আস্বাদন লাভ করিয়াছেন। আরও বলিলেন, একদিন বৃন্দাবন তটে শ্রীকৃষ্ণের লীলা বিহার কালে শ্রীকৃষ্ণেরই অনুরূপ সৌন্দর্য্য মাধুর্য্য বার্দ্ধা বয়স ও গুণসম্পন্ন একজন স্নিগ্ধ শ্যামল দেহ পুরুষ আসেন। ইনিই শ্রীরামচন্দ্র। তখন শ্রীকৃষ্ণ সেই দেহে প্রবিষ্ট হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ঐ আগন্তুক পুরুষ বনমালা ও মুরলী ধারণ করিয়া রাসমণ্ডলে গোপীমণ্ডল মধ্যস্থ হইয়া পূর্বের ন্যায় নৃত্য করিতে লাগিলেন।

উৎকলীয় বৈষ্ণবগণ, বিশেষতঃ যাঁহারা চৈতন্যমহাপ্রভুর দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া ভাবরাজ্যে প্রবেশ করিয়াছিলেন, শ্রীকৃষ্ণ এবং নিত্যলীলাতত্ত্ব নানাপ্রকারে বিশ্লেষণ করিয়া গিয়াছেন। ইহাঁদের সিদ্ধান্ত এবং বঙ্গীয় বৈষ্ণবগণের সিদ্ধান্ত সর্বাংশে অভিন্ন নহে। বিশেষ আলোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায়, তান্ত্রিক সাধনার অনেক গুহ্য রহস্য উৎকলীয় বৈষ্ণবগণের সিদ্ধান্ত মধ্যে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে।

মহাপুরুষ যশোবন্ত দাস প্রেমভক্তির আলোচনা প্রসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ তত্ত্ব, রাধাতত্ত্ব, যুগল রহস্য, যোগমায়াতত্ত্ব এবং নিত্যলীলার বৈশিষ্ট্য সুচারুভাবে বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। তিনি বলেন—সৃষ্টির আদিতে একমাত্র ভগবানই ছিলেন—তখন চারিদিক শূন্যময় ছিল। বস্তুতঃ শূন্যের আবির্ভাব মহাশূন্যরূপ ভগবদ্‌জ্যোতিঃ হইতেই হইয়া থাকে। এইভাবে ভগবৎসত্তা চিন্মণ্ডল মধ্যে বিরাজমান থাকে। ভগবৎ স্বরূপ অক্ষরের অতীত বলিয়া নিরাকার চিন্ময়। 'আমি' ভাবটি শূন্য মধ্যে বুদ্‌বুদের মত উত্থিত হয়। সৃষ্টির ইচ্ছা উদিত হইবার পূর্বে আত্মা যোগ-যুক্তাবস্থায় আত্মারাম স্বরূপে অবস্থিত থাকেন।' কিন্তু যে ক্ষণে সৃষ্টির বাসনা ফুটিয়া উঠে তখনই নির্গুণ ভগবৎসত্তার মধ্যে প্রকৃতির আবির্ভাব হয়। এই প্রকৃতি পঞ্চকলা বিশিষ্ট। তাঁহার পাঁচটি কলার নাম—উর্ম্মি, ধূর্ম্মী জ্যোতি, জ্বালা ও বিন্দু। প্রকৃতি চিৎ ও অচিতের মিশ্রণ। কলা পাঁচটির বর্ণ পৃথক্ পৃথক্ এবং বেদও পৃথক্ পৃথক্। অর্থাৎ উর্মি কলার বর্ণ শ্বেত বেদ ঋক্। ধূর্ম্মী কলার বর্ণ পীত বেদ যজু। জ্যোতি কলার বর্ণ লোহিত বেদ সাম। জ্বালা কলার বর্ণ কুঙ্কুমবৎ, বেদ অথর্ব। বিন্দু কলার বর্ণ শ্যাম ও বেদ শিশু। ইহারা পঞ্চমবেদের মূল স্বরূপ। এই পাঁচ কলা কারণ সলিলে পতিত হইলে যোগমায়ার আবির্ভাব হয়। যোগমায়া বিশ্বমধ্যে ভগবানের লীলা যোজনা করিয়া থাকেন। ইনি সৃষ্টির মূল। এই জন্য ভক্তসম্প্রদায়ে ইহাকে আদিশক্তি অর্দ্ধমাত্রা বলিয়া বর্ণনা করিয়া থাকে।

যোগমায়ার আবির্ভাবের পর কমলরূপী কালপুরুষের উৎপত্তি হয়। এই কালরূপী কমলটি কারণ সমুদ্রে স্থির হইয়া না থাকিতে পারায় যোগমায়া অথবা অর্দ্ধমাত্রা স্বীয় অঙ্গ হইতে ওঁকার উৎপাদন করেন। ওঁএর উপরিভাগ অর্থাৎ নাদ ও বিন্দু অর্দ্ধমাত্রার সহিত সংসৃষ্ট, এবং উহাই ব্রজলীলা নামে অভিহিত। এই ব্রজলীলা জ্যোতির্লিঙ্গ। এই জ্যোতির্লিঙ্গ এবং অর্দ্ধমাত্রা যুক্ত হইয়া সৃষ্টির বিকাশ করিয়া থাকে। এই জ্যোতির্লিঙ্গকেই কেহ কেহ বিরাট

বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। সময় ও স্থল বিশেষে এই অনন্ত বা শেষ বলভদ্র নামে অভিহিত হন। যোগমায়া শক্তিরূপে মধ্যস্থান অধিকার করেন। যোগমায়া ও জ্যোতির্লিঙ্গ আদি প্রকৃতি ও আদি-পুরুষ রূপে পরিণাম প্রাপ্ত হন। যোগমায়া বা অর্দ্ধমাত্রার সহিত বিন্দুর যোগই প্রণব অথবা ওঁকার। পূর্বোক্ত বিন্দু ব্রহ্মস্বরূপে অনাকারের অবস্থিতি বলিয়া বুঝিতে হইবে। ভগবান প্রকৃতিতে স্বয়ং প্রবেশ করিয়া ক্রম ভেদ অনুসারে বিভিন্ন নাম ধারণ করিয়া থাকেন। একমাত্র নিজের প্রকৃতিই প্রকৃতি পদবাচ্য। যোগমায়া ইহারই শক্তি। যে জ্যোতির্লিঙ্গ যোগমায়াতে রত আছে তাহাও তাই। বিন্দুমধ্যে অনক্ষর ব্রহ্ম অনাকাররূপে অবস্থিত রহিয়াছেন। স্বর্ণাকৃতি বিশিষ্ট অনন্ত বিন্দু হইতে আবির্ভূত হয়। অনন্তকেই সুষুম্না নাড়ী বলিয়া বর্ণনা করা হয়। এই নাড়ীর ধ্যান হইতে শিশু বেদের উপলব্ধি হয় অর্থাৎ নিস্ত্রৈগুণ্যালোকে স্থিতিলাভ হয়।

উৎকলীয় বৈষ্ণবগণ বলেন মহামায়া নিজের আবির্ভাব সংক্রান্ত রহস্য জানিতে ইচ্ছা করিয়া শূন্যে দৃষ্টিপাত করিতেই দেখিতে পাইলেন জ্যোতিঃ অগ্নি হিম ও বিন্দু পর পর অবস্থিত। ঐস্থানে শূন্যব্রহ্ম আপন মহিমাতে বিরাজমান শূন্য হইতে উর্মি ধুর্মী জ্যোতি ও জালার সহিত মহারস নিরন্তর ঝরিতে লাগিল। ঐ রস পান করিয়া মহামায়া গর্ভবতী হন। দুই হাতে দুই অঞ্জলি পান করার ফলে বাম ভাগে স্ত্রী ও দক্ষিণ ভাগে পুরুষের আবির্ভাব হয়। ভগবান স্ব প্রকৃতির শক্তিরূপিণী যোগমায়াতে নিজ কলার সহিত প্রবেশ করিয়া জীব ও পরম নামক দুইটি মূর্ত্তি ধারণ করেন। এই দুইটি মূর্ত্তির নাম রাধা ও কৃষ্ণ। এই যুগলাঙ্গ শিশু মূর্ত্তি ভূমিতে পতিত হইয়া প্রাণশূন্য হয়। যোগযুক্ত অবস্থায় অবস্থানই এই রূপকের তাৎপর্য্য বলিয়া মনে হয়। এই স্থলে বিদ্যা ও অবিদ্যা শক্তিময়ী এবং চিৎ ও অচিৎ উপাদানময়ী রূপে পরিকল্পনা হইয়াছে। অচিৎ ভাবের প্রবলতার সময় যোগমায়া অবিদ্যাময়ী। তখন তিনি গর্ভে চাপ দিতেই গর্ভ অকালে ভূপতিত হয় ও শিশু হইতে প্রাণ বহির্গত হয়। ইহাই যোগযুক্ত অবস্থার

সূচনা। ইহার পর যোগমায়া ভগবানের নিকট যুক্ত স্বরূপে লীলার অভিলাষ প্রকাশ করেন। তখন লীলার উপযোগী শক্তি পিণ্ডে খেলিতে লাগিল। তখন হইতে তিনি লীলাময়ী হইলেন। জীব ও পরমের মধ্যে সর্বদা চিৎ লইয়া খেলা চলিতেছে। এই দুই মূর্ত্তি রাধা কৃষ্ণ রামনাম ধারণ করেন। নিকটেই ১৬টি শক্তির প্রকাশ হয়। সেই সকল শক্তির নাম—শ্রী, ভূ, কীর্ত্তি, ইলা, লীলা, কান্তি, বিদ্যা, বিমলা উৎকর্ষিণী, জ্ঞানা, ক্রিয়া, যোগা, প্রভা, মত্তা ঈশানা ও অনুগ্রহা। হংস ও পরমহংসরূপী জীব ও পরম সেখানে বিরাজমান থাকেন। যোগমায়া আশ্রিত হইয়া জীব ও পরমের অর্থাৎ রাধা ও কৃষ্ণের নিত্য লীলা চলিতেছে। বিন্দু হইতে উৎপন্ন পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণই 'ম' কার, ইহার শ্যামবর্ণ। 'রা' হইল রাধা অর্থাৎ জীব। ইহা চারিকলা হইতে উৎপন্ন এবং ইহার বর্ণ শ্বেত। উর্মি প্রভৃতি চারি কলা হইতে জীবরূপী রাধা উৎপন্ন হয়। এবং বিন্দু হইতে পরব্রহ্মরূপী শ্রীকৃষ্ণ আবির্ভূত হন। জীব যে সময় পরমের সহিত সমাধিতে মগ্ন থাকে তখন তাহা মরা অর্থাৎ লীলা শূন্য অবস্থায় বিদ্যমান থাকে। পক্ষান্তরে যখন উভয়ের মধ্যে লীলার বাসনা জাগিয়া উঠে তখন তাহা রাম নামে আত্মপ্রকাশ করে। লীলাময় অবস্থার মহত্ত্ব উপলব্ধি করার পক্ষে যাহারা সুখ দেখিয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করে তাহারা মুক্তির অধিকারী। তাহাদিগকে কখনই পাপ স্পর্শ করে না। ইহাদেব মধ্যে ভুঃ ও অগস্ত্য প্রভৃতি ঋষির নাম উল্লেখযোগ্য। রাধা শ্রীকৃষ্ণের মুখ হইতে জীব ও পরম তত্ত্বের রহস্য শ্রবণ করিয়া কয়েকটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন তন্মধ্যে প্রধান প্রশ্ন এই ছিল যে প্রপঞ্চ লীলাতে রাধাকে অন্যের স্ত্রীরূপে প্রকাশ ও শ্রীকৃষ্ণ নিজে বীর পুরুষরূপে জগতের অপলাপ ভাজন হওয়ার কারণ কি? ইহার উত্তরে শ্রীকৃষ্ণ বলেন যে একদা নিত্য মণ্ডলে রাধার অঙ্গ হইতে ক্লান্তি নিবন্ধন স্বেদবিন্দু ক্ষরিত হইয়া ক্ষীর সাগরে পতিত হয়। উহা হইতে একটি নীলবর্ণ কন্যা আবির্ভূত হন, যাঁহাকে বরুণ বিষ্ণুমহিষী মহালক্ষ্মী বলিয়া চিনিয়াছিলেন। ঐ কন্যা প্রত্যহ ব্রহ্মার গৃহে বিষ্ণুকে পতিরূপে কামনা করিতেন ও গঙ্গাতটে

বালুকাদ্বারা পূজা করিতেন। কোন সময়ে একজন যতি ঐ কন্যার রূপে আকৃষ্ট হইয়া তাহাকে বিবাহ করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন। তখন কন্যাটি ক্রোধবশতঃ তাহাকে নপুংসক হইতে অভিশাপ প্রদান করেন। ঐ যতি তারপর তপস্যা করিয়া ভগবানকে প্রসন্ন করেন, ও সেই কন্যা-টিকে প্রাপ্ত হইবার জন্য বর প্রার্থনা করেন। ভগবান তাঁহার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করেন। এই কন্যাটি দ্বাপরে চন্দ্রসেনা নামে গোপকুলে জন্মগ্রহণ করে। বলা বাহুল্য, রাধা স্বয়ংই ঐ কন্যা। যে যতিটি শাপ বশতঃ নপুংসক হইয়াছিল সে দ্বাপরযুগে রাধার পতিরূপে জন্মগ্রহণ করে। কথিত আছে সেই কন্যাটিকে অজ্ঞান কুণ্ডে ডুবাইয়া শিশুরূপে প্রকাশ করেন, এবং কালিন্দী তটবর্ত্তী পদ্মবনে রক্ষা করেন। বৃষভানু নামক গোপ ঐ কন্যাটিকে নিজ কন্যারূপে লালন পালন করিয়া রাধিকা নামে পরিচয় দেন।

অন্যত্র অপ্রসিদ্ধ বলিয়া এই নাতিদীর্ঘ বিবরণ এখানে প্রকাশিত করিলাম। ইহা হইতে উৎকলীয় বৈষ্ণবগণের রাধাকৃষ্ণ তত্ত্ববিষয়ক সিদ্ধান্তের কিঞ্চিৎ পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যাইবে।

আমরা পূর্বে ত্রিপুরার সহিত রাধাকৃষ্ণ তত্ত্বের সম্বন্ধের বিষয়ে কয়েকটি কথা বলিয়াছি। উৎকলীয় বৈষ্ণবগণের মধ্যে কেহ স্পষ্ট ভাবেই এই সম্বন্ধের সত্তা নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন রাধাকৃষ্ণের প্রেমরস উচ্ছ্বসিত হইয়া সাকার রূপে প্রকাশ পায়। এই আকার প্রেমেরই আকার। যাহাকে আমরা যমুনা অথবা কালিন্দী বলিয়া গ্রহণ করিয়া থাকি তাহা ভগবানের কল্পনা হইতে সঞ্জাত। জীব ও পরম বা রাধা ও কৃষ্ণের প্রেমরসে ঐ প্রেমরূপা গর্ভবতী হইয়া যথাকালে যাহাকে প্রসব করেন তাঁহার নাম ত্রিপুরা। ত্রিপুরাই ত্রিগুণের মূলভূতা অর্থাৎ সত্ত্ব রজঃ তমঃ এই তিন গুণের অধিষ্ঠাত্রী। তিনপুরে রূপের সাম্য ভঙ্গ না হওয়ার দরুণ ত্রিপুরা নামের সার্থকতা বুঝিতে হইবে। ভগবানের প্রেমলীলা জগতে প্রচারিত হওয়ার ইহাই প্রথম ক্রম।

ত্রিগুণে প্রেমের বিলাসের জন্য সর্বদা সর্বত্র লীলা প্রকটিত হইবার প্রথম সূত্রপাত এইবার সিদ্ধ হইল।

ত্রিপুরা ত্রিগুণময়ী, তাঁহার প্রভাবে শুধু যে স্বর্গ প্রভৃতি তিনটি লোক প্রভাবিক হয় তাহা নহে—দশদিক সমভাবেই প্রভাবিত হইয়া থাকে। যোগমায়ার আদেশে ত্রিপুরা জীব ও পরমের অর্থাৎ যুগলরূপের সেবায় নিজেকে নিযুক্ত করিল। চিৎ ও অচিৎ ভাবরূপী জীব ও পরমের লীলা বিহারে ত্রিগুণাত্মিকা ত্রিপুরার অভিনয় সর্ব প্রধান। ত্রিপুরা দ্বারা বিশ্ব সংসারের হিত সাধন হয় বলিয়া ত্রিপুরা বিশ্ববাসীর আরাধ্য। রাসমণ্ডলের নৃত্যস্থলে ত্রিপুরা দ্বার রক্ষার কার্য্যে নিযুক্ত, কারণ তিনিই ত্রিগুণের অধিষ্ঠাত্রী। সত্ত্ব প্রভৃতি গুণত্রয় হইতে অ উ ম রূপে ওঁকার জন্মে এবং তাহা হইতে বিষ্ণু ব্রহ্মা ও রুদ্র রূপে বিশ্বভুবনের সৃষ্টি হয়।

উৎকলীয় বৈষ্ণবগণের লীলাধামের বিবরণ পুরুষোত্তম তাপনীর বর্ণনা অনুরূপ। দিবাকর বলরাম প্রভৃতি আপন আপন ভাব কেন্দ্র হইতে ঐ মূল বর্ণনার প্রতিধ্বনি করিয়াছেন। তাপনী শ্রুতিতে আছে যে শূন্য মণ্ডলে নিরালম্ব ভাবে বৈকুণ্ঠ অবস্থিত। সেখানে সাযুজ্য অবস্থায় পদ্মাসনে ভগবদ্ধ্যান নিরত শেষ দেব রহিয়াছেন, যাঁহার মস্তকে সহস্র ফণা বিরাজ করিতেছে। এই ফণার উপরে বিষ্ণুলোক অথবা বৈকুণ্ঠ স্থাপিত। তাহার উপর সুদর্শন চক্র অতি উজ্জ্বল তেজ এবং তীব্র বেগ সহকারে নিরন্তর ঘূর্ণিত হইতেছে। সুদর্শনের উপরে শ্রীকৃষ্ণের মুখ্যস্থান গোকুল শোভা পাইতেছে। ইহারই নামান্তর মাথুর মণ্ডল। ইহা অতি বিশাল স্থান। ইহা চারিদিকে সুধাসমুদ্রের দ্বারা বেষ্টিত। ঐ স্থানে অষ্টদল কমলে মধ্যে মণি পীঠে পর পর ৭টি আবরণ বর্ত্তমান আছে ইত্যাদি।

এই যে নিত্যধামে জীব ও পরমের লীলা বিহার ইহাকেই রাস নাম বলে। পূর্ব্ববর্ণিত জীব ও পরম মানব দেহকে আশ্রয় করিয়া অবস্থিত আছেন। ইহার একটি পরাবস্থা আছে—তাহার নাম অনক্ষর। বলা বাহুল্য, ইহা অক্ষরের অতীত হইলেও সম্পূর্ণরূপে

নিরাকার নহে। সকলের শেষে নিরাকার বা মহাশূন্য। ঐ স্থান হইতে সুধা বর্ষণের ন্যায় নিরন্তর নামামৃত ক্ষরিত হইতেছে। উহাই চিরকালের মূল স্থান।

প্রথমে ভগবানের হুংকার হইতে ওঁকারের উৎপত্তি হয় অর্থাৎ নিঃশব্দ হইতে শব্দের আবির্ভাব হয়। এই একাক্ষর ওঁকার শিশু বেদ নামে প্রসিদ্ধ। ইহা ত্রিবেদের মূলভূত ও অনাদি অক্ষর স্বরূপ। এই স্থান হইতে রা ম এই দুইটি অক্ষরের উৎপত্তি হয়। ইহার পরবর্ত্তী অবস্থায় ত্রিকোণ প্রকটিত হয়। ত্রিকোণ ত্রিতত্ত্বের বা তত্ত্বত্রয়ের নামান্তর। রাম শব্দে রাধা ও কৃষ্ণ এবং ত্রিতত্ত্ব শব্দে জীব পরম ব্রহ্ম, হরে রাম কৃষ্ণ, পরা রমা কামবীজ ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর, গুরু শিষ্য ভগবান, কৃষ্ণ রাধা চন্দ্রাবলী এবং জগন্নাথ বলরাম সুভদ্রা জানিতে হইবে। এই হরে রাম কৃষ্ণ ছয় অক্ষর হইতে অষ্টকোন বা অষ্ট অক্ষর উদ্ভূত হয়। এই অষ্ট অক্ষর চারিটি তত্ত্ব বীজ বা নামকে বুঝায়। ইহা হইতে হরে রাম কৃষ্ণ হরে এই অবস্থার উদয় হয়। ইহা হইতে 'হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে' এই ষোল অক্ষর জাত হয়। সর্বশেষে এই ষোল অক্ষর হইতে 'হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে' এবং 'হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে' এই ষোল নাম ৩২ অক্ষর উৎপন্ন হয়।

যশোবন্ত বলিয়াছেন যে প্রেমভক্তি ভিন্ন ভগবৎ প্রাপ্তি অসম্ভব। তাঁহার মতে চারি প্রকার ভক্তির মধ্যে প্রেমভক্তিই শ্রেষ্ঠ নবধাভক্তির মধ্যেও প্রেমভক্তির স্থান সর্বোচ্চ। প্রেম ষোড়শীর মন্ত্র প্রেম ভক্তি সাধনার দ্বার স্বরূপ। এই প্রেম ষোড়শীর কথা যশোবন্তও বলিয়াছেন এবং দিবাকর দাস ও বিশেষ রূপে বর্ণনা করিয়াছেন। প্রেমভক্তির অধিকার লাভ করিতে হইলে রাধা ভাবে ভজন একান্ত আবশ্যক।

প্রেমভক্তি ব্রহ্মগীতার চতুর্থ অধ্যায়ে আছে যে নিরাকার শূন্যরূপী ভগবান হইতে গগনের প্রকাশ হয়। গগন হইতে জল অথবা কারণ বারি আবির্ভূত হয়। ইহা হইতে ভগবান নিজেই সৃষ্ট হইয়া আদিমূল নামে প্রকটিত হন। গোলোকে কামবীজ অঙ্গে ধারণ করিয়া একার্ণব জলে অবস্থান করেন। ঐ ভূমির চারিপার্শ্বে চারি বেদ ও মধ্যে

কালিন্দী হ্রদ ছিল। গোলকবাসী আদিপুরুষ ভগবানের অঙ্গ হইতে প্রকৃতির উদ্ভব হয়। তখন ঐ দুইটি অর্থাৎ আদিপুরুষ ভগবান এবং তৎপ্রসূত প্রকৃতি দুই অক্ষরের বীজ রূপে পরিণত হন। এবং কৃষ্ণ ও রাধা নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। রাম নামের অর্থ রাধা কৃষ্ণ। কামবীজ ও রজঃ এই দুইটি মূল। ইহারাই সংসারের পিতা মাতা। এই দুইয়ের সম্মিলন হইতে বিরাটের আবির্ভাব হয়—তাহাই লজ্জা বীজ। বিরাটের মস্তকে রাধাকৃষ্ণ বিরাজ করেন। বিরাট হইতে জীব উৎপন্ন হয়, যাহার নাম চন্দ্রাবলী এবং যাহা কৃষ্ণ সঙ্গে অবস্থান করে। তখন কৃষ্ণ রাধা ও চন্দ্রাবলী তিন রূপে নৃত্য চলিতে থাকে। এইখানে চন্দ্রাবলী একটি বিশিষ্ট বীজের নাম। চন্দ্রাবলী প্রেমারূপা হইয়া প্রেমকালিন্দী নামে পরিচিত হয় ও তাহার জল ষট্‌শক্তি রূপে পর পর ছয়টি একাক্ষরী বীজ রূপে প্রকাশিত হয়।

রাধাকৃষ্ণ ও চন্দ্রাবলী যে রূপ ত্রিকোণে অবস্থিত সেই রূপ ষট্‌কোণে বৃন্দাবতী রঙ্গদেবী রত্নরেখা লীলাবতী সুভদ্রা ও প্রিয়াবতী নামক ছয়টি সখীর অবস্থান জানিতে হইবে। এই ছয়টি সখী 'হরে রাম কৃষ্ণ' এই তিন নাম ছয় অক্ষরের রূপান্তর মাত্র। ইঁহারা কৃষ্ণচন্দ্রের শরীর স্বরূপ। 'হরে রাম কৃষ্ণ এই তিন নাম ছয় অক্ষরের প্রতি অক্ষরে কৃষ্ণের অঙ্গ স্বরূপ রূপ নির্দিষ্ট আছে। হ=রূপ, রে=অধর, রা=ভুজ, ম=বাহুরেখা, কৃ=মূর্দ্ধা, ষ্ণ=মূর্ত্তি। এই ষট্‌কোণের নাম প্রেমশয্যা। সেখানে বৃন্দাবতীর অবস্থিতি। প্রকারান্তরে ঐ ছয়টি অবয়বকে নেত্রদ্বয় কর্ণদ্বয় এবং নাসাদ্বয় রূপে গ্রহণ করা যাইতে পারে। এই প্রেমশয্যাতে রাধাকৃষ্ণ জড়ভাবে অবস্থান করেন। বৃন্দাবতী পুনর্ব্বার অষ্ট সখীর সঙ্গে নিত্য সেবা করিতেছেন। 'হরে কৃষ্ণ হরে রাম' এই চারি নাম ৮ অক্ষরকে অষ্টসখী বলে। তাহাদিগকে অষ্ট পট্টমহিষীও বলা যায়। ইহাদের নাম ললিতা, বিমলা, শ্রীরাধা, শ্রীমতী, হরিপ্রিয়া, সুকেশী, সচলা. ও পদ্মা। ইহারা অষ্টকোণ যন্ত্রের প্রত্যেক কোণে এবং রাধাকৃষ্ণ মধ্যস্থলে বিরাজমান আছেন।

১৬ নাম, ৩২ অক্ষরের বিচারও কতকটা এই প্রকার। হরে=৮,

রাম = ৪, কৃষ্ণ = ৪ এরূপে ১৬ নাম ৩২ অক্ষর। চারিটি কৃষ্ণকে এক দেহরূপে গ্রহণ করিতে হইবে, তারপর তাহাকে চারিটি পৃথক রূপে দেখিতে হইবে, যথা—লীলাঙ্গ কৃষ্ণ, স্তোক কৃষ্ণ, শ্রীকৃষ্ণ ও বালকৃষ্ণ। ইহা পুরুষাঙ্গের বিচার। পুরুষদের সহিত চারিটি প্রকৃতি জড়িত, যথা—রাধা, চন্দ্রাবলী, দূতী ও ত্রিপুরা। রামাদি নামের বিচারে চারিটি রাম বিরাট, শেষদেব, অনন্ত ও বলভদ্র রূপে গ্রহণীয়! তাঁদের চারিটি শক্তি ক্রমশঃ রামা, রামাবলী, রেবতী ও যোগমায়া। ১৬টি গোষ্ঠীর নাম এই প্রকার—বিমলা, সরঘা, কুন্তলা বৃন্দাবতী, হংসচার, সুমিধা, সুকেশী চিত্ররেখা, রম্ভা, পদ্মিনী, গোমতী, বৈনেত্রী, রঙ্গিনী, সুরেখা ইত্যাদি। পূর্বের ১৬ ও ১৬ উভয়ে মিলিয়া ৩২টি। এই ৩২টি পুনর্বার ৬৪টি রূপে পরিণত হয়। তাহার বিবরণ এখানে দেওয়া অনাবশ্যক।

প্রণব ব্রহ্ম নিরাকাররূপী, তাহা অর্দ্ধমাত্রার শিরোদেশে অবস্থিত। উভয়ই ওঁকারের ব্রহ্মরূপ—ইহাই শূন্যপুরে বিন্দু রূপে প্রকাশ।

পূর্বোক্ত সংক্ষিপ্ত বর্ণনা হইতে উৎকলীয় বৈষ্ণবগণের রাধাকৃষ্ণতত্ত্বের রহস্য সম্বন্ধে একটি অস্পষ্ট ধারণা চিত্তক্ষেত্রে উদ্ভূত হয়। ইহার পরিস্ফুট বিশ্লেষণ বর্ত্তমান আলোচনার বিষয়ীভূত নহে। কিন্তু বিশ্লেষণ না করিলেও একটু প্রণিধান হইতেই বুঝিতে পারা যাইবে যে রাধাকৃষ্ণতত্ত্ব ত্রিপুরাতত্ত্বের সহিত জড়িত এবং ইহার উপাসনা ও লীলা বিলাস প্রভৃতির সিদ্ধান্ত আগম উপদিষ্ট যন্ত্র মন্ত্র ও মাতৃকাতত্ত্বের গুহ্য রহস্যের সহিত বিজড়িত। উৎকলীয় বৈষ্ণবগণের পরিভাষার মধ্যে কোন কোন স্থলে নাথ যোগীদের, কোন কোন স্থলে বজ্র ও কাল-চক্রযানী বৌদ্ধের এবং কোন কোন স্থলে বৌদ্ধ ও বৈষ্ণব সহজ মার্গের সিদ্ধান্তের সঙ্গে কিছু কিছু সম্বন্ধ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা হইতে বুঝা যায় মধ্যযুগে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের উপাসক ও যোগিগণ কৃষ্ণতত্ত্বের ও নিত্যলীলার রহস্য উদ্‌ঘাটনের জন্য আপন আপন সাধনা শক্তি ও প্রতিভা দ্বারা যথাশক্তি চেষ্টা করিয়াছেন।

শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব সম্বন্ধে অথবা শুধু শ্রীকৃষ্ণ কেন যে কোন দিক দিয়া যে

কোন পরম তত্ত্ব সম্বন্ধে আলোচনা করিতে গেলে আমাদিগের পক্ষে একটি বিষয়ে বিশেষ লক্ষ্য রাখা রাবশ্যক। শ্রীকৃষ্ণ ভগবান হউন বা না হউন, অবতার হউন বা না হউন, যে তত্ত্বটিকে শ্রীকৃষ্ণ-তত্ত্ব বলিয়া বর্ণনা করা হইতেছে তাহা একটি নিত্যসিদ্ধ অবস্থা। যিনি আরোহ ক্রমেই হউক অথবা অবরোহ ক্রমেই হউক ঐ তত্ত্বটিকে আশ্রয় করিয়া আত্মপ্রকাশ করিবেন তাঁহাকেই আমরা শ্রীকৃষ্ণ বলিতে বাধ্য। যিনি বাসুদেব ও দেবকীর পুত্র ছিলেন তিনি ঐ তত্ত্বটি লাভ করিতে পাইয়াছিলেন বলিয়াই কৃষ্ণ নামে পরিচিত হইয়াছিলেন। কৃষ্ণতত্ত্বের আলোচনায় পূর্ব্বোক্ত বাসুদেব সত্য সত্যই কৃষ্ণতত্ত্ব লাভ করিয়া-ছিলেন কিনা তাহা প্রধান আলোচ্য বিষয় নহে। কিন্তু ঐ নিত্য ও স্বভাবসিদ্ধ তত্ত্বটির বিশ্লেষণ একান্তই আবশ্যক। দেবকীনন্দন কৃষ্ণ ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে সত্য বলিয়া প্রতিপন্ন না হইলেও কৃষ্ণতত্ত্বের আলোচনার ক্ষতি বৃদ্ধি হয় না। যে পরম চৈতন্যের কথা পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি তাহা আপনাকে ঈষৎ সঙ্কুচিতবৎ করিয়া শক্তিযুক্ত কৃষ্ণ স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়। জীব কৃষ্ণস্বরূপে স্থিতিকালে স্বয়ং কৃষ্ণরূপেই অবস্থান করে এবং তাহার পর শনৈঃ শনৈঃ মহাচৈতন্যে প্রবেশ করে।

শ্রীকৃষ্ণতত্ত্বটি যুগনদ্ধ অবস্থার দ্যোতক। ইহাকে সাধারণতঃ যুগলভাব বলা হয়। অর্থাৎ কৃষ্ণ ও রাধা এই উভয় অংশ সম্মিলিত ভাবে একটি পরমতত্ত্ব রূপে প্রকাশিত হয়। কৃষ্ণ রাধা বিরহিত ভাবে এবং রাধা ও কৃষ্ণ বিরহিত ভাবে আপেক্ষিক স্বতন্ত্রতা লইয়া প্রকাশিত হইতে পারে বটে, কিন্তু তাহা যুগলতত্ত্ব নহে। যুগলতত্ত্ব অবিনাভাব সম্বন্ধ ব্যতিরেকে সিদ্ধ হয় না। যদিও মহাচৈতন্য হইতে যুগল-তত্ত্বটিকে কিঞ্চিৎ নিম্নকোটির বলিয়া ধরিয়া লওয়া হইয়াছে তথাপি ইহা সত্য যে উভয়ের মধ্যে বাস্তবিক পক্ষে উচ্চনীচ ভাব নাই। শুধু তত্ত্ব বিশ্লেষণ ও পরিস্ফুটতার জন্য একটি কল্পিত ভেদ স্বীকার করিয়া লইয়া মহাচৈতন্য হইতে পৃথক্ ভাবে যুগলতত্ত্বের ব্যাখ্যা করা হইয়া থাকে। বস্তুতঃ এক ও দুই পৃথক্ নহে, তিন হইতেই পার্থক্য বা

বহুত্বের সৃষ্টি। এক পিঠে যাহা এক, অপর পিঠে তাহাই দুই। বস্তুতঃ দুইটি পিঠ মূলতঃ একই বস্তু। এই জন্যই দার্শনিক পরিভাষাতে এককে বুঝাইবার জন্য দুইটি পৃথক্ শব্দ নাই। একমাত্র দ্বয় বা দ্বৈত শব্দ হইতেই অদ্বৈত বা অদ্বয়রূপে একত্বের কল্পনা করা হয়। বস্তুতঃ সাম্যই একত্ব, বৈষম্যই দ্বৈত। রাধাকৃষ্ণের যেটি অদ্বৈত অবস্থা, যে অবস্থায় রাধাকৃষ্ণের পরস্পর পার্থক্যেরপ্রতীতি হয় না, তাহাই অদ্বয় ব্রহ্ম। আর যে অবস্থায় অদ্বয়ব্রহ্মে ক্ষোভ না থাকিলেও ক্ষোভের বিকাশ হয় তাহাই রাধাকৃষ্ণ যুগলতত্ত্ব। পারমার্থিক দৃষ্টিতে উভয়ে কোন ভেদ নাই।

পূর্ণানন্দ তাঁহার শ্রীতত্ত্ব চিন্তামণিতে পরব্রহ্মের যে স্বরূপ নিরূপণ করিয়াছেন তাহাতেও এই দ্বৈত ও অদ্বৈত বিষয়ক অচিন্ত্য বৈশিষ্ট্য প্রকাশিত হইয়াছে। সহস্রদল কমলের কর্ণিকাতে বিরাজমান চন্দ্রমণ্ডলের মধ্যবর্ত্তী হংসপীঠ বা অন্তরাত্মার উর্দ্ধদেশে পরব্রহ্ম বা পরমশিবের অভিব্যক্তি হয়। এই বস্তুটি সকলের আত্মস্বরূপ। ইহার বর্ণনা প্রসঙ্গে তিনি ইহাকে রস বিরসমিত বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। রস বলিতে পরমানন্দ রস বুঝিতে হইবে এবং বিরস বলিতে শিব শিবশক্তির সামরস্য আনন্দরস বুঝিতে হইবে। ইহার তাৎপর্য্য এই —আত্মা একদিকে নিত্যস্বরূপ অবস্থিত হইয়াও অপর দিকে নিরন্তর শক্তি সমাগম রস অনুভব করিয়া থাকেন। এই আত্মাস্বরূপকেই তিনি শ্রীগুরু রূপে বর্ণনা করিয়াছেন। এই ক্ষেত্রে রস শব্দটি একল ব্রহ্মাবস্থার বাচক এবং বিরস শব্দটি রাধাকৃষ্ণ অথবা শিবশক্তি রূপ যুগল অবস্থার বাচক।

সুতরাং বুঝিতে হইবে যিনি মহাচৈতন্য রূপে পরমাদ্বৈত স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত তিনি রাধাকৃষ্ণ বা শিবশক্তি যুগল রূপেও সঙ্গে সঙ্গে অবস্থান করিতেছেন। তবে যে মহাচৈতন্যের সংকোচের কথা বলা হয় তাহা সৃষ্টির ধারাটি স্পষ্ট রূপে বুঝিবার জন্য।

মহাচৈতন্যেই অনুত্তর চিৎস্বরূপ এবং যুগলতত্ত্বটি আনন্দস্বরূপ।

বস্তুতঃ একই ব্রহ্মবস্তু যুগপৎ চিদ্‌রূপে ও আনন্দরূপে প্রকাশমান। চিৎপ্রকাশে দুইয়ের কোন স্ফুরণ থাকে না, কিন্তু আনন্দ দুই ভাব না হইলে হইতেই পারে না। দুই বলিতে এখানে ভেদজ্ঞানজনিত দ্বৈত নহে। ইহা অভেদ অবস্থারই একটি দিক—যখন দুইটি জিনিষের একটি ছাড়িয়া আর একটি প্রকাশিত হইতে পারে না। ইহাই যুগলতত্ত্ব।

অষ্টদল কমলের কথা পূর্ব্বে উল্লেখ করা হইয়াছে। এই কমলের কর্ণিকাতে শ্রীরাধার স্থিতি স্বীকার করিতে হইবে। এই অষ্টদলে আটটি সখী বিরাজ করেন। বস্তুতঃ আটটি নহে, সমগ্র কমলটিকে আশ্রয় করিয়া ষোড়শ সখী বিরাজ করিতেছেন। ইহার মধ্যে পূর্ব দিকে বিশাখার স্থান, বর্ণ পীত। পশ্চিম দিকের দলে ললিতা বিরাজ করেন। ইহাঁরও বর্ণ পীত। দক্ষিণ দিকের দলে পদ্মা এবং উত্তর দিকের দলে শ্রীমতী প্রতিষ্ঠিত আছেন। উভয়েরই বর্ণ লাল। পূর্ব দক্ষিণ দিকের দলে (অগ্নিকোণে) শৈব্যা—বর্ণ শ্যাম। ঈশান কোণের দলে হরিপ্রিয়া—বর্ণ লাল। বায়ুকোণের দলে অন্তসিদ্ধা —বর্ণ কৃষ্ণ এবং নৈঋতকোণের দলে ভদ্রা—বর্ণ লাল। এই অষ্টসখী ব্যতিরিক্ত আরও অষ্টসখী আছেন, যাঁহাদিগকে লইয়া মোট সংখ্যা ষোড়শ নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। এই অতিরিক্ত অষ্টসখীর নাম মনসুন্দরী—বর্ণ শ্বেত, বিশাখা ও হরিপ্রিয়ার মধ্যে; চন্দ্রা—বর্ণ নীল, হরিপ্রিয়া ও শ্রীমতীর মধ্যে; চিত্ররেখা—বর্ণ শুক্ল শ্রীমতী ও অন্তসিদ্ধার মধ্যে; চন্দ্রাবলী—বর্ণ শুক্ল অন্তসিদ্ধা ও ললিতার মধ্যে; রসপ্রিয়া - বর্ণ শুক্ল, ললিতা ও ভদ্রার মধ্যে; শশিরেখা—বর্ণ নীল, ভদ্রা ও পদ্মার মধ্যে; মধুমতী - বর্ণ শুক্ল, পদ্মা ও শৈব্যার মধ্যে; প্রিয়া—বর্ণ শুক্ল, শৈব্যা ও বিশাখার মধ্যে।

রহস্তপুরাণ নামক গ্রন্থে ৯৩ কোটি কুঞ্জের কথা উল্লিখিত হইয়াছে। ধাম কিন্তু মাত্র দুইটি একটি ভূমণ্ডলে, নাম শ্রীবৃন্দাবন এবং অপরটি গোলোকে নাম নিত্যবৃন্দাবন। এই ৯৩ কোটি কুঞ্জের মধ্যে ৮৪টি কুঞ্জ মুখ্য। প্রসিদ্ধি আছে যে মহাপ্রভু বল্লভ এইজন্ত ৮৪

জন সেবক নিযুক্ত করিয়াছিলেন। প্রতি কুঞ্জের সেবাভার এক একজন সেবকের উপর অর্পিত থাকে। প্রেমের মুখ্য সংখ্যা ৮৪ প্রকার হয় বলিয়া ৮৪টি কুঞ্জের কথা প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। এই ৮৪ প্রকার প্রেমভক্তির শ্রেণীবিভাগের মূল ভিত্তি এই প্রকার। কথিত আছে, শ্রীভগবানের গুণময় স্বরূপ নয়টি। প্রতি স্বরূপের সহিত খেলিবার জন্য তদনুরূপ একটি করিয়া শক্তি যুক্ত আছে। ইহাদের নাম অজা, অরূপা, নির্গুণা, নিরাকারা, সনাতনী, নিরীহা, পরমব্রহ্মভূতা, অবিনাশিনী ও নিরঞ্জনা,। এই নয়টি হইতে পৃথক্ পৃথক্ ভাবে শ্রবণাদি নববিধ ভক্তির উদয় হয়। নির্গুণ স্বরূপ ভগবানের সচ্চিদানন্দঘন প্রকৃতি হইতে প্রেম লক্ষণ ভক্তির উদয় হয়। শ্রবণাদি ভক্তির প্রত্যেকের নববিধ কার্য্য। এই সকল কার্য্যকে ভক্তির সন্তান বলিয়া গণ্য করা হয়। প্রেম-লক্ষণ ভক্তির তিনটি প্রকার ভেদ সহজ, সুহিত ও সুস্থিত বলিয়া প্রসিদ্ধ। অতএব সর্বসাকল্যে ভক্তি সংখ্যা—৯ × ৯ + ৩ = ৮৪ প্রকার।

যাঁহারা অপ্রাকৃত অনুভব শক্তি দ্বারা এই সকল তত্ত্ব দর্শন করিয়া ভক্তির সূক্ষ্ম ভেদ সকল আয়ত্ত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন তাঁহারা এই সকল বিবরণ বিস্তারিত ভাবেই লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন।

নববিধা ভক্তির নয়টি কুঞ্জের নাম এই প্রকার ঃ—শ্রবণ—সূক্ষ্মকুঞ্জ, কীর্ত্তন—দেহকুঞ্জ, অর্চ্চন—বিহারকুঞ্জ, পাদসেবন—শৃঙ্গারকুঞ্জ, স্মরণ—মহাকেলিকুঞ্জ, বন্দন—একান্তকুঞ্জ, দাস্য—গোপ্যকুঞ্জ, সখ্য—ভাবকুঞ্জ, নিবেদন—পরমরসকুঞ্জ। ইহার প্রত্যেকটির নয়টি অবান্তর ভেদ আছে। শ্রবণের সহিত শ্রুতির যোগে যে নয়টি কার্য্যের উদ্ভব হয় তদনুসারে সূক্ষ্মকুঞ্জের নয়টি অবান্তর ভেদ এই—প্রীতি, প্রেম, কন্দর্প, লীলা, মজ্জন, বিহার, উৎকণ্ঠা, মোহন ও যুগল। এই প্রকার কীর্ত্তন ও নর্ত্তনের সহযোগে সঞ্জাত দেহ—কুঞ্জের নয়টি ভেদ—হাব, ভাব, কটাক্ষ, অলখ, মুক্তা, ভ্রূ, বেণী, রোম ও নীবী। অর্চ্চন ও পূজার পরস্পর সম্বন্ধ হইতে উদ্ভূত বিহারকুঞ্জের নয়টি অবান্তর ভেদ—

কটাক্ষপাত, মান ভ্রমণ, তিষ্ঠন, সঙ্গীত, আলস্য, কলকুজিত, বিবিধাকার দুকুল ও কুচ। পাদসেবন ও পাদোদকার সংসর্গ হইতে উৎপন্ন শৃঙ্গার-কুঞ্জের নয়টি ভেদ—নেত্র, কুণ্ডল, হাব, তাম্বুল, আড় লাবণ্য, হাস্য, উৎসাহ ও উগ্রতা।

স্মরণ ও স্মৃতির যোগসম্ভূত মহকেলিকুঞ্জের নয়টি ভেদ—কোকিলালাপ, গ্রীবা, আলিঙ্গন, চুম্বন, অধরপান, দর্শন, দর্পণ, প্রলাপ ও উন্মাদ।

বন্দন ও নতির সম্বন্ধজাত একান্তকুঞ্জের নয়টি ভেদ—দর্প, উৎসাদন, উৎকর্ষ, দীন, অধীন, সুরত, আকর্ষণ, উচাটন ও মূর্চ্ছা। দাস্য ও বিনয়ের সম্বন্ধ জন্য গোপ্যকুঞ্জের নয়টি ভেদ বশীকরণ, স্তম্ভন, প্রিয়াস্কন্ধারোহণ, আবেশে বার্ত্তালাপ, পর্য্যঙ্কশয়ন, প্রিয়া-চরণতাড়ন মুখক্ষত ও দন্তক্ষত।

সখ্য ও মৈত্রের যোগজাত ভাবকুঞ্জের নয়টি ভেদ—ক্ষোপিত-রঙ্গ বিগতাভারণ, ভূষণ, কম্প, রতিপ্রলাপ, তণ্ডুলগীর, প্রিয়াবাসভবন, মদন গুহ্য ও আসক্তকুঞ্জ।

নিবেদন ও আত্মসমর্পণের সম্বন্ধজাত পরমরসকুঞ্জের নয়টি ভেদ—পীড়ারঙ্গ, সুরতশ্রমনিষেধ, ঠুমক, বাগ্‌বিভ্রম, ব্যস্তভাব, কামটঙ্ক, কিঙ্কিনীরব, বীরবিপরীত ও সুরতত্রাত।

প্রেমভক্তির অন্তর্গত সুহৃৎ ও সুহৃদাসঙ্গ জন্য—কলিকা কৌতুক, সুহিত ও হিতকারিণীর সঙ্গজন্য সুরতকুঞ্জ এবং সহজ ও সহজার সংসর্গ উদ্ভূত সহজ প্রেমকুঞ্জ প্রসিদ্ধ।

পূর্বোক্ত ৮৪ কুঞ্জের মধ্যে অন্তিমকুঞ্জই সর্বশ্রেষ্ঠ। অর্থাৎ সহজ-প্রেম প্রেমভক্তির পরমসার। কুঞ্জলীলার চরম আস্বাদন এই সহজ প্রেমেরই হইয়া থাকে। ইহাই প্রেমের পরাকাষ্ঠা। গৌড়ীয় সম্প্রদায়ের ভক্তগণের ন্যায় বল্লভ সম্প্রদায়ের ভক্তমণ্ডলীও লীলা সম্বন্ধে স্ব স্ব অনুভবের বিশ্লেষণ করিয়া ব্যাপক সাহিত্য রচনা করিয়া গিয়াছেন। অষ্টসখীর নামকরণ নানাস্থানে নানা প্রকার উপলব্ধ হইলেও মূলসিদ্ধান্ত সম্বন্ধে কোন প্রকার ভেদ লক্ষিত হয় না।

গৌড়ীয় সম্প্রদায়েও বিভিন্ন গ্রন্থে বিভিন্ন প্রকার বর্ণনা দেখিতে পাওয়া যায়। পুরাণাদিতেও সেইরূপ। সুতরাং বল্লভীয় ভক্তগণের সিদ্ধান্ত কোন কোন অংশে বহিরঙ্গ দৃষ্টিতে পৃথক্ প্রতীত হইলেও তুলনার জন্য আলোচনার যোগ্য। তাঁহারা বলেন ললিতাদি অষ্টসখী প্রকট লীলাতে ভনু নামান্ত আট জন গোপের কন্যারূপে আবির্ভূতা হইয়াছিলেন। ইঁহাদের সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই প্রকার :—

এই বিবরণটি একটি প্রাচীন বল্লভ সম্প্রদায়ীয় হস্ত লিখিত পুস্তক হইতে উদ্ধৃত হইল। ইহাতে কোন কোন স্থানে ত্রুটি লক্ষিত হইলেও ইহার প্রামাণিকতা সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই। লেখকের প্রমাদ বশতঃ ত্রুটি ঘটিয়া থাকিবে।

শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব এবং শ্রীকৃষ্ণরূপ ঠিক এক বস্তু নহে। তত্ত্বটি নিত্য, রূপটি অনাদি কাল হইতেই স্ব স্বরূপে একক রূপেই হউক অথবা যুগল রূপেই হউক বিরাজ করিতেছে। রূপটি তত্ত্বেরই বাহ্য প্রকাশ মাত্র। তত্ত্বাতীত যেমন তত্ত্বরূপে প্রকট হইতে পারেন তেমনি তত্ত্বও স্বস্বরূপ হইতে অবতীর্ণ হইতে পারেন। যিনি কৃষ্ণতত্ত্বে কৃষ্ণরূপে নিত্য প্রতিষ্ঠিত তিনি প্রত্যাগমনের সময় হইলে তত্ত্বরূপে স্থিত হইয়া নিজের পরিচয় প্রদান করিতে পারেন। সুতরাং কৃষ্ণ অবতার কিংবা অবতারী এই অবান্তর প্রশ্নের সমাধান করিতে চেষ্টা না করিয়া মূল রহস্যটি আয়ত্ত করিতে শিক্ষা করা উচিত। প্রপঞ্চলীলাতে যে কৃষ্ণরূপের স্ফুরণ হয় তাহা নিরন্তর প্রপঞ্চ মধ্যে থাকিয়াও প্রপঞ্চাতীত স্বরূপে অবস্থান করিয়া থাকে। যে মূল স্থান হইতে সৃষ্টির উৎস উন্মুক্ত হয় সেই পর্য্যন্ত অনুধাবন করিতে না পারিলে সৃষ্টি তত্ত্বের ব্যাখ্যা পরিপূর্ণ হইবার আশা নাই। সৃষ্টি বিকাশের ক্রমমধ্যে স্বরূপগত ভাবে শ্রীকৃষ্ণ ও তাঁহার গণ সকলের স্থান নাই। আমরা যাঁহাকে মর জগতের বসুদেব ও দেবকীর নন্দন বলিয়া পরিচয় দেই তিনি জীব ছিলেন অথবা নারায়ণের অংশরূপী ভগবানের বিভূতি ছিলেন তাহার মীমাংসা করা অতি কঠিন। তবে ইহা সত্য যে অংশাবতার হইলেও লোক-শিক্ষার জন্যই হউক অথবা অন্য কারণেই হউক ভগবানকেও গুরু গ্রহণ করিতে হয়। পক্ষান্তরে আরোহক্রমে জীবরূপী আত্মা দীক্ষাপ্রাপ্ত হইয়া যথোচিত সাধনপথে চলিতে চলিতে এক সময় দেহসংস্কার হইতে মুক্তিলাভ করে। এই অবস্থায় যে কোন প্রকার দেহের আশ্রয়ে যথাবিধি উপায় অবলম্বন করিয়া ব্যবধান কাটাইতে পারিলে প্রতি আত্মাই পূর্ণত্ব লাভ করিতে পারে। যেটি নিত্যসিদ্ধ কৃষ্ণতত্ত্ব তাহা এইভাবে বিভিন্ন পথ আশ্রয় পূর্ব্বক বিভিন্ন সাধক প্রাপ্ত হইতে সমর্থ হয়। এইভাবে প্রাকৃত মনুষ্যও অপ্রাকৃত পুরুষোত্তম রূপে পরিণত হইয়া যায়।

প্রসিদ্ধি আছে শ্রীকৃষ্ণ উপমন্যুর নিকট যথাবিধি দীক্ষাগ্রহণ করিয়া পাশুপত যোগ শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন। ইহাও প্রসিদ্ধ আছে যে,

শ্রীকৃষ্ণ অর্থাৎ বাসুদেব দীর্ঘকাল ত্রিপুরসুন্দরীর আরাধনা করিয়া তাঁহাকে প্রসন্ন করিয়াছিলেন। ভগবতী প্রসন্ন চিত্তে তাঁহাকে সুদীর্ঘ তপস্যার পারিশ্রমিক স্বরূপ বরদান করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন। পূর্ণত্ব লাভের জন্য তিনি শ্রীকৃষ্ণকে তাঁহার স্বরূপ উপলব্ধির অর্থাৎ ব্রহ্ম-উপলব্ধির মার্গ প্রদর্শন করেন। তিনি স্পষ্টই বলিয়াছিলেন যে, শক্তি সংযোগে অর্থাৎ শক্তির সহিত একযোগে কুলাচার সাধন না করিলে ব্রহ্মজ্ঞানে প্রতিষ্ঠা লাভ করা যায় না। এই জন্য তাঁহারই আদেশে তাঁহার অংশভূতা মহালক্ষ্মীর স্বরূপ শ্রীরাধাকে কুল সাধনের নিত্য সঙ্গীরূপে বরণ করিয়া লইতে আদেশ করেন। ত্রিপুরার মতানুসারে হরিনামের দ্বারা কর্ণশুদ্ধি করিয়া নবযৌবনের উন্মেষের সঙ্গে সঙ্গেই কুলকার্য্যে ব্রতী হইতে হয়। হরিনাম কাহাকে বলে এবং ইহার অর্থ কি? তাহার কিছু পরিচয় পূর্বে দেওয়া হইয়াছে। কর্ণশুদ্ধি হরেকৃষ্ণ ইত্যাদি ষোলনাম বত্রিশ অক্ষর দ্বারা দশ হইতে দ্বাদশ বৎসর বয়সের মধ্যে অবশ্যই সম্পন্ন করিতে হয়। ইহা ব্যতীত মহাবিদ্যা সিদ্ধ হয় না। বলা বাহুল্য, এই হরিনামের ঋষি বাসুদেব এবং দেবতা ত্রিপুরা। দ্বিজমুখ হইতে দক্ষিণ কর্ণে নামগ্রহণ করিতে হয়। প্রথমে ছন্দ অর্থাৎ গায়ত্রী ছন্দ গ্রহণ করিয়া পরে নামগ্রহণ করা বিধি। কর্ণ অশুদ্ধ রাখিয়া সেই অশুদ্ধ কর্ণে মহাবিদ্যার শ্রবণ বা গ্রহণ করিলে প্রত্যবায় হয়। ষোড়শ বৎসর বয়সে মহাবিদ্যা গ্রহণ করা আবশ্যক। ইহার পরেই কুলরহস্য পরিজ্ঞাত হইতে হয়। কারণ রহস্যহীন হইয়া মন্ত্রজপ করিলে তাহাতে কোন ফল লাভ হয় না। হরিনামের রহস্য এই—'হ' = শিব, 'র' = শক্তি—ত্রিপুরা—(দশমহাবিদ্যাময়ী), "এ" = যোনি। ক—কাম, ঋ = পরমা শক্তি উভয়ে মিলিয়া কৃ—কামকলা, ষ—ষোড়শ কলাত্মক চন্দ্র, ণ—নিবৃত্তি বা আনন্দ। সর্ব্বসাকল্যে = ত্রিপুর-সুন্দরী।

ষোল বৎসর বয়সে যে দীক্ষালাভ হয় তাহার নাম জ্যেষ্ঠা দীক্ষা। দীক্ষা গ্রহণ না করিয়া নাম জপ করিলে তাহা পশুর কর্ম বলিয়া পরিগণিত হয়। ইহার পর—ভগবতী ত্রিপুরা তাঁহার কণ্ঠস্থিত মালা

তাঁহাকে অর্পণ করেন। এই মালাগুলি সাক্ষাদ্ আম্নায় স্বরূপা। এইগুলি মণিমালা রূপেই বিখ্যাত। চারিটি মালার নাম—হস্তিনী, চিত্রিনী, গন্ধিনী ও পদ্মিনী। এই মালা কয়েকটি পঞ্চাশৎ মাতৃকারূপা অক্ষমালা নামে পরিচিত। তাত্ত্বিক দৃষ্টিতে ঐ মালার মধ্যেই বিশ্বজগতের যাবতীয় জ্ঞান নিহিত রহিয়াছে। এইজন্য এই মালাকে আত্মার মালা বলিয়া কেহ কেহ বর্ণনা করেন। ৫১ মহাপীঠ ইহাদেরই নামান্তর। এই মালা অপূর্ব্বভাবে গ্রথিত। কামতত্ত্ব ভিন্ন অন্য কোন সূত্র দ্বারা ইহা গাঁথিতে পারা যায় না। জগতের সৃষ্টি ও সংহারের মূলে এই পঞ্চাশটি পীঠ স্বরূপ রহিয়াছে। ভগবতী ত্রিপুরা ঐ অপূর্ব্ব মালা বাসুদেবকে অর্পণ করেন যাঁহার প্রভাবে বাসুদেব পূর্ণত্ব লাভে সমর্থ হন। মালা চারিটির স্বরূপ ও বর্ণ এই প্রকার—হস্তিনী—ইহা শুক্ল-বর্ণ ভগবানের দূতী স্বরূপা। চিত্রিণী—ইহা পীতবর্ণ। ইহার বিচিত্র রূপ সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডে ব্যাপ্ত রহিয়াছে। সন্ধিনী—ইহার বর্ণ কৃষ্ণ। ইহাও ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপক। পদ্মিনী বা রঙ্গিনী রক্তবর্ণা, ইহা সর্ব্বদাই কাম কলার সহিত যুক্ত থাকে।

এই কুলাচার সাধন করিয়া এবং তৎফল প্রাপ্ত হইয়া বাসুদেব পূর্ণত্ব লাভ করেন। বাসুদেব পাশুপত সাধনা করিয়াছিলেন অথবা কুল সাধনা করিয়া সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন—তাহার মীমাংসা করিবার এখন কোন উপায় নাই। ঊর্দ্ধাম্নায় তন্ত্রে আছে যে রাধাই মহাবিদ্যা। তাঁহার মন্ত্র ষোড়শ অক্ষর বিশিষ্ট। এই জন্যই রাধা স্বয়ং ষোড়শী বিদ্যারূপে পরিচিত। এই বিদ্যার পরম্পরা মধ্যে সর্ব্বপ্রথম ব্রহ্মার স্থান, কারণ তিনিই প্রথম ইহা প্রাপ্ত হন। পরে রাবণ, শিব, ব্যাস, গৌতম প্রভৃতি ইহার প্রচার করেন।

ঊর্দ্ধাম্নায় তন্ত্রে ষোড়শী রাধারই নামান্তর (শক্তি সঙ্গম তন্ত্র দ্রষ্টব্য)। ষোড়শী যে ললিতা তাহা সর্বত্র প্রসিদ্ধ। কৃষ্ণলীলার ললিতা কুঞ্জ-অধিষ্ঠাত্রীরূপে রাসলীলায় দ্বাররক্ষয়িত্রীরূপে রাধার অষ্ট সখীর মধ্যে সর্ব্বপ্রধান সখীরূপে স্থান প্রাপ্ত হইয়াছেন। বস্তুতঃ ললিতা অথবা

ত্রিপুরার প্রসন্নতা ভিন্ন এই গুহ্য লীলাতে কাহারও প্রবেশ হয় না, ইহা পদ্মপুরাণ পাতালখণ্ডে বর্ণিত হইয়াছে।

পূর্ণত্বের সাধনা অত্যন্ত কঠিন। বাসুদেব নরদেহ গ্রহণ করিয়া শিবানুগ্রহেই হউক অথবা ভগবতী ত্রিপুরার অনুগ্রহেই হউক পূর্ণত্ব লাভের কৌশল আয়ত্ত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তাই তিনি উত্তম পুরুষ রূপে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করিতে সফলতা লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার পুরুষোত্তম ভাব প্রাপ্তির ইহাই রহস্য। ঐ যে ত্রিপুরাতত্ত্ব মালার কথা বলা হইয়াছে উহার নাম কলাবতী মালা। উহা নিজের আয়ত্ত এবং নিজ স্বরূপে প্রকাশিত না হওয়া পর্য্যন্ত পুরুষ পুরুষই থাকে, কখনই পুরুষোত্তম হয় না।

যাঁহারা বাসুদেবের এই সাধন ব্যাপার শ্রদ্ধার সহিত গ্রহণ করেন না তাঁহাদিগের পক্ষে শ্রীকৃষ্ণ তত্ত্বে অধিষ্ঠিত নিত্যরূপই বাসুদেব আকারে ধরাতে প্রকট হইয়াছিলেন ইহাই বলিতে হইবে। যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণকে পরব্রহ্ম বলিয়া গ্রহণ করেন এবং ধরাতলে তাঁহার আবির্ভাবকে পরব্রহ্মের প্রাকট্য বলিয়া প্রচার করেন তাঁহাদের মতে বাসুদেবের তপস্যা বাহ্য দৃষ্টিতে লোক সংগ্রহের প্রকার ভেদ মাত্র। যাঁহারা তাঁহাকে স্বয়ং ভগবান না বলিয়া অংশ বা কলা—অবতার রূপে গ্রহণ করিয়া থাকেন তাঁহাদের পক্ষেও ঐ একই কথা। কিন্তু আমার মনে হয় পূর্ব বর্ণিত কোন মতই অসত্য নহে। কিঞ্চিৎ সত্য সকল মতেই বিদ্যমান রহিয়াছে। সুতরাং সকল মতের সমন্বয় করিয়াই সাধারণ লোকের পক্ষে প্রকৃত সত্যের নির্ণয় করিতে হইবে। তবে তত্ত্বের সহিত পুরুষের পার্থক্যটি বজায় রাখিয়া সমন্বয়ের পথে অগ্রসর হওয়া উচিত, ইহাই আমার বিশ্বাস। কারণ পুরুষ কালের অধীন, কিন্তু তত্ত্ব কালের অতীত।

স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ দীর্ঘকাল পরে এক একবার ধরাতলে আবির্ভূত হইয়া থাকেন। তাঁহার নিত্যলীলা কালের অতীত এবং মায়ারও অতীত তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু তাঁহার প্রকট লীলা ভৌমবৃন্দাবনে মাঝে মাঝে হইয়া থাকে। বহু ঋষি ও মুনি সেই সময়

শ্রীকৃষ্ণের পরিকর রূপে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকেন। ভগবান যখন আসেন তখন তাঁহার পারিষদবর্গও তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে আসেন। নিত্য ভক্তগণ তো আসেনই, তা ছাড়া যাঁহারা দীর্ঘকাল রাগভক্তির অনুশীলন করিয়াছেন তাঁহারাও সিদ্ধির সময় আসন্ন জানিয়া ভূলোকে জন্মগ্রহণ করেন। এই সকল ভক্তগণের মধ্যে নানা জীব রহিয়াছে। যাঁহারা সুদীর্ঘকাল শ্রীকৃষ্ণ প্রাপ্তির জন্য উৎকট তপস্যা করিয়াছেন তাঁহারাও আবির্ভূত হন। প্রসিদ্ধি আছে মানসসরোবর নিবাসী ৭১ হাজার মুনিগণ এইরূপ তপস্যার ফলেই শ্রীকৃষ্ণকে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। কেহ এক কল্প, কেহ দুই কল্প, এমনি কি কেহ কেহ শতকল্প পর্যন্ত আরাধনা করিয়া তাঁহাকে প্রাপ্ত হইয়াছেন। পূর্ব্ব ইতিহাস অন্বেষণ করিলে দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, বিভিন্ন মুনি শ্রীকৃষ্ণলীলাতে যুক্ত হইবার জন্য বিভিন্ন জপ করিয়াছেন এবং তাঁহাদের ধ্যান প্রণালীও পরস্পর বিভিন্ন।

প্রসিদ্ধি আছে উগ্রতপা নামক মুনি পঞ্চদশ অক্ষর মন্ত্র কামবীজে পুটিত করিয়া দীর্ঘকাল কঠোর তপস্যা সাধন পূর্ব্বক জপ করিয়াছিলেন এবং পীতবাস শ্যামবর্ণ নবযৌবন সম্পন্ন বংশীধারী রসোন্মত্ত নিজকর দ্বারা প্রিয়ার আকর্ষণকারী শ্রীকৃষ্ণমূর্ত্তি ধ্যান করিয়াছিলেন। এই ভাবে একশত কল্প সাধনার পর তিনি গোকুলে সুনন্দ নামক গোপের সুনন্দা নাম্নী কন্যা হইয়া জন্মগ্রহণ করেন। সত্যতপা নামক মুনি শুষ্ক পত্র ভোজন করিয়া দশকল্প পর্যন্ত জলমধ্যে অবস্থান পূর্বক কামবীজ পুটিত দশাক্ষর মন্ত্র জপ করেন এবং ভগবতী লক্ষ্মীর কঙ্কণোজ্জ্বল হস্তদ্বয় ধারণ করিয়া নৃত্যশীল বনমালা শোভিত পুনঃ পুনঃ প্রিয়ার সহিত আলিঙ্গন নিরত শ্রীকৃষ্ণ মূর্ত্তির ধ্যান করেন। ইহার ফলে তিনি গোকুলের সুভদ্র গোপের কন্যা ভদ্রা রূপে জন্মগ্রহণ করেন। এই প্রকার হরিধামা, জাবালি, ব্রহ্মর্ষি কুশধ্বজের শুচিশ্রবা ও সুবর্ণ নামক বেদজ্ঞ পুত্রদ্বয়, জটিল প্রভৃতি মুনি চতুষ্টয়, দীর্ঘতপা মুনির পুত্র শুক (এই দীর্ঘতপা পূর্ব্ব কল্পে ব্যাস নামে বিখ্যাত ছিলেন), শ্বেতকেতুর পুত্র, রাজপুত্র চিত্রবীজ প্রভৃতি ব্রহ্মর্ষি দেবর্ষি রাজর্ষি এবং অন্যান্য মুনিগণ এক কল্প দুই কল্প এমন কি শত কল্প পর্যন্ত তপস্যা, জপ ও ধ্যান

করিয়া অভিনব কল্পে নরলোকে ভগবানের আবির্ভাবের সময় গোকুলে স্বেচ্ছানুরূপ গোপীদেহ গ্রহণ করেন। সকলে যে একই মন্ত্র জপ করিতেন এমন নহে—কেহ দশাক্ষর, কেহ পঞ্চদশাক্ষর, কেহ বিংশাক্ষর, কেহ অষ্টাদশ অক্ষর, কেহ একাদশাক্ষর, কেহ পঞ্চবিংশাক্ষর ইত্যাদি বিভিন্ন মন্ত্র জপ করিয়া সিদ্ধিলাভ করেন। ইহার মধ্যে অধিকাংশ মন্ত্রই কামবীজ পুটিত। ধ্যান ও যে সকলে একই প্রকার মূর্ত্তির করিতেন তাহা নহে। তবে দ্বিভুজ মুরলীধারী গোপবেশ শ্রীকৃষ্ণ মূর্ত্তি ভিন্ন চতুর্ভুজ নারায়ণ মূর্ত্তির ধ্যান তাঁহারা করিতেন না। স্ব স্ব রুচির অনুরূপ বাল্য, পৌগণ্ড, কৈশোর অথবা নবযৌবন কোন একটা বয়সকে তাঁহারা ধ্যেয়রূপে অবলম্বন করিতেন।

দণ্ডকারণ্যবাসী গোপাল উপাসক ইষ্টসিদ্ধিসম্পন্ন মুনিগণ শ্রীরামচন্দ্রের রূপ ও লাবণ্য দর্শন করিয়া ভাবোন্মেষ বশতঃ স্বয়ং কান্তা ভাবাপন্ন হইয়া তাঁহাকে পতিরূপে প্রাপ্ত হইতে ইচ্ছা করেন। তখন তাঁহাদের সেই বাসনা পূর্ণ হইবার উপায় ছিল না। ভগবান শ্রীরামচন্দ্র তাঁহাদিগকে আশ্বাস দিয়াছিলেন যে ভবিষ্যতে কৃষ্ণাবতার কালে তাঁহাদিগকে গ্রহণ করিবেন। এবং তাঁহাদের ইচ্ছা পূর্ণ করিবেন। এই সকল মুনি গোকুলে গোপী রূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। এই বিবরণ পদ্মপুরাণের উত্তরখণ্ডে আছে।

বৃহদ্ বামনপুরাণেও এই প্রকার কথা আছে। এই সকল গোপী-গণের মধ্যে কেহ কেহ রাসারম্ভে সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। সিদ্ধি বলিতে এখানে ভগবৎ সম্ভোগ যোগ্য চিন্ময় দেহ বুঝিতে হইবে।

মুনিদের ন্যায় উপনিষদ অথবা শ্রুতিগণও গোপীগণের অতুলনীয় সৌভাগ্য দর্শনে বিস্মিত হইয়া শ্রদ্ধাপূর্বক তপঃ সাধন করিয়াছিলেন এবং পরিশেষে ব্রজধামে গোপীরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। এই বিবরণ বৃহদ্ বামন পুরাণে আছে। এই ক্ষেত্রেও তাঁহারা কোটি কন্দর্পের লাবণ্য সম্পন্ন শ্রীকৃষ্ণের রূপ দর্শন করিয়া কামিনী ভাব প্রাপ্ত হইয়া তাঁহার দিকে অনুরক্ত হইয়াছিলেন। গায়ত্রী স্বয়ং গোপীভাব প্রাপ্ত হইয়া শ্রীকৃষ্ণকে ভজনা করিয়াছিলেন। ইহা পদ্মপুরাণ সৃষ্টিখণ্ডে

আছে। এই সকল মুনি এবং শ্রুতিবর্গ গোপীভাব অবলম্বন পূর্ব্বক দলে দলে অর্থাৎ সমষ্টিভাবে শ্রীকৃষ্ণের ভজনা করিতেন। ইঁহারা সকলেই সাধন পরায়ণ ছিলেন, সিদ্ধ ছিলেন না। কেহ কেহ রাসের প্রাক্কালে সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন।

সাধক গোপীদের মধ্যে শুধু ইঁহারাই সমষ্টিভাবে সাধন করিতেন, অন্যান্য সকলে পৃথক্ পৃথক্ করিতেন। কোন কোন ব্যক্তি ভগবৎ স্বরূপে রাগ প্রাপ্ত হইয়া সাধন কার্য্যে নিরত হন এবং পরে তৎযোগ্য অনুরাগ উৎকণ্ঠা অনুসারে লাভ করিয়া সময় সময় এক একটি করিয়া পৃথক ভাবে অথবা দুই একটি করিয়া সঙ্ঘবদ্ধ ভাবে ব্রজধামে জন্মগ্রহণ করেন। এইস্থলে 'অনুরাগ' শব্দে রাগানুগা ভজনের উৎকণ্ঠা বুঝিতে হইবে, স্থায়ী ভাবরূপ অনুরাগ নহে। কারণ উহা সাধক দেহে উৎপন্ন হইতে পারে না, সিদ্ধদেহেই উৎপন্ন হইতে পারে। ইঁহাদের মধ্যে প্রাচীন এবং নবীন দুই শ্রেণীর লোকই ছিলেন। যাঁহারা প্রাচীন তাঁহারা দীর্ঘকাল হইতে ভগবানের নিত্যসিদ্ধ ভক্তগণের সালোক্য প্রাপ্ত ছিলেন। প্রাচীনগণ পূর্ব্ব পূর্ব্ব কল্পের কৃষ্ণাবতার কালে সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। ইঁহারা বর্ত্তমান কল্পেও আবির্ভূত হন এবং ভবিষ্যৎ কল্পেও আবির্ভূত হইবেন।

যাঁহারা বর্ত্তমান কল্পে সিদ্ধিলাভ করেন তাঁহারাও কৃষ্ণাবতার কালে আবির্ভূত হন। 'নবীন' শব্দে তাঁহাদিগক লক্ষ্য করা হয়। এই সকল গোপী মানব যোনি এবং দেবতা গন্ধর্ব্ব প্রভৃতি অমর্ত্ত্য যোনি উভয় স্থল হইতেই আসিয়া জন্ম গ্রহণ করেন।

মুনিগণের মধ্যে যাঁহারা গোপীভাব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ রাসারম্ভের প্রাক্কালে পতি প্রভৃতি গুরুজনের অনিচ্ছা-বশতঃ রাসলীলায় যোগ দিতে না পারিয়া গৃহে অবরুদ্ধ ভাবেই দেহত্যাগ করেন। এইভাবে তাহারা অপ্রাকৃত দেহে মহারাসে যোগদান করিতে সমর্থ হন।

প্রশ্ন হইতে পারে,যে সকল ভক্ত সাধক দেহে অবস্থান কালে নিষ্ঠা রুচি আসক্তি প্রভৃতি রাগানুগা ভক্ত্যঙ্গের অনুশীলনের উৎকর্ষবশতঃ

কোন না কোন জন্মে প্রেম ভক্তি লাভে সমর্থ হন তাঁহারা প্রপঞ্চাতীত নিত্য বৃন্দাবনস্থ ভগবল্লীলায় গোপীদেহ প্রাপ্ত হন অথবা প্রপঞ্চগোচর বর্ত্তমান কালীন কৃষ্ণাবতার প্রসঙ্গে ভূলোকে অর্থাৎ ভৌম বৃন্দাবনে গোপীরূপে জন্মগ্রহণ করেন। এই প্রশ্নের সমাধান কল্পে কেহ কেহ মনে করেন প্রেমভক্তির উদয় এবং উহার বিলাস সিদ্ধ দেহ ভিন্ন হইতে পারে না। এইজন্য স্নেহ মান প্রণয় প্রভৃতি স্থায়ীভাবগুলি একমাত্র সিদ্ধদেহেই আবির্ভূত হইতে পারে। তাই পৃথিবীতে কৃষ্ণবতার কালে ঐ সকল ভক্ত গোপীরূপে জন্মগ্রহণ করিয়া সিদ্ধ গোপীগণের সঙ্গ প্রভাবে দর্শন শ্রবণ স্মরণ গুণ-কীর্ত্তন দ্বারা ঐ সকল স্থায়ীভাব প্রাপ্ত হন। সিদ্ধ গোপীর স্বরূপ লক্ষণই এই যে তাঁহার কৃষ্ণবিরহে একটি ক্ষণকেও শতযুগ বলিয়া মনে হইয়া থাকে। বস্তুতঃ মহাভাবের ইহাই লক্ষণ।

এই প্রসঙ্গে কাহারও কাহারও ধারণা হইতে পারে যে একবার কৃষ্ণাবতার হইয়া গেলে সুদীর্ঘকাল অতীত না হইলে পুনর্ব্বার কৃষ্ণাবতারের অভ্যুদয় হয় না। অতএব ঐ সকল ভক্তকে এই দীর্ঘ-কাল পর্য্যন্ত অপূর্ণ অবস্থায়ই থাকিতে হয়। কারণ কৃষ্ণাবতারের সময় ভিন্ন অন্য সময়ে গোপীদেহে জন্ম সম্ভবপর নহে এবং গোপীজন্ম না হইলে স্নেহ প্রণয় প্রভৃতি প্রেমবিলাস স্থায়ী ভাব রূপে অধিগত হইতে পারে না। ইহার উত্তর এই যে কাহারও দীর্ঘকাল প্রতীক্ষা করিবার প্রয়োজন হয় না। কারণ প্রবাহরূপে কৃষ্ণাবতার ব্রহ্মাণ্ড মধ্যে কোথাও না কোথাও লাগিয়াই রহিয়াছে। অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে যে বিশিষ্ট ব্রহ্মাণ্ডে এই সময় শ্রীকৃষ্ণলীলা প্রকট হইয়াছে উপযুক্ত ভক্ত সেই ব্রহ্মাণ্ডেই গোপকন্যারূপে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকেন। ইহা যোগ-মায়ার প্রভাবে সম্পাদিত হয়। সূর্য্য যেমন পৃথিবীর কোন অংশে উদিত হইয়া অপরাংশে অস্তগমন করেন ঠিক সেই প্রকার শ্রীকৃষ্ণ লীলাও এক ব্রহ্মাণ্ডে প্রকট হয় ও অপর ব্রহ্মাণ্ডে তিরোহিত হয়। এইরূপ প্রত্যেক ব্রহ্মাণ্ডেই ভগবল্লীলার প্রাকট্য কোন না কোন ক্ষণে হইতেছে। ব্রহ্মাণ্ড সকল আবর্ত্তনশীল, তাই প্রতি লীলাই

আবর্ত্তনশীল বলিয়া প্রতীত হয়। এইজন্য যে কোন লীলা যে কোন সময় কোন না কোন ব্রহ্মাণ্ডে প্রকটরূপে সাক্ষাৎ হইতে পারে। তবে কোন্ ব্রহ্মাণ্ডে উহা এখন প্রকট তাহা জানা আবশ্যক। দিনের যে কোন সময় যেমন সূর্য্যোদয় লক্ষিত হইতে পারে, তবে সব স্থান হইতে নহে, কিন্তু স্থান বিশেষ হইতে। সেই রূপ যে কোন সময় কৃষ্ণলীলার আবির্ভাব প্রত্যক্ষ হইতে পারে, তবে ঐ নির্দ্দিষ্ট সময়ে কোন্ বিশিষ্ট ব্রহ্মাণ্ডে উহা প্রকট ইহা জানা আবশ্যক। ইহা হইতে বুঝা যাইবে যে যোগ্যতা পূর্ণ হইলে কালের প্রতীক্ষা আবশ্যক হয় না।

পূর্বোক্ত বিবরণ হইতে বুঝিতে পারা যায় যে সাধন পরায়ণ গোপীগণ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত—কেহ কেহ যৌথিকী অর্থাৎ যূথবদ্ধ, কেহ কেহ অযৌথিকী। যৌথিকীগণ মুনি এবং উপনিষদ ভেদে দুই প্রকার। অযৌথিকীগণ প্রাচীন এবং নবীন ভেদে দুইপ্রকার। ইহাঁরা সকলেই সাধিকা, সিদ্ধস্বরূপা নহেন। এতদ্ব্যতীত দেবীগণও সাধিকা-দের মতন বৃন্দাবনলীলাতে স্থান লাভ করেন। যখন শ্রীকৃষ্ণ দেবগণের মধ্যে মণ্বন্তর অবতার রূপে স্বর্গলোকে অংশতঃ দেহধারণ করেন তখন তাঁহার সন্তোষ বিধানের জন্য হ্লাদিনী শক্তিরূপা নিত্য প্রিয়াগণের অংশ দেবলোকে আবির্ভূত হয়। তারপর স্বয়ং ভগবান রূপে যখন তিনি ভুলোকে আবির্ভূত হন তখন ঐ সকল দেবীগণ অংশরূপে এবং নিত্যপ্রিয়াগণ অংশিনীরূপে, ব্রজমণ্ডলে জন্মগ্রহণ করেন। অর্থাৎ অংশিনী রূপা নিত্য প্রিয়াগণের প্রাণ সখী রূপে ঐ সকল অংশরূপা দেবীগণ গোপগৃহে জন্মগ্রহণ করেন। এতদ্ব্যতীত রাধা চন্দ্রাবলী প্রভৃতি ভগবানের নিত্য প্রিয়াগণ ব্রজভূমিতে ভগবদ্ আবির্ভাবের সময়ে সকলে আবির্ভূত হন। ইহারা সকলেই নিত্যপ্রিয়া। নিত্য সৌন্দর্য্য বৈদগ্ধ্য প্রভৃতি গুণ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় তাঁহার নিত্য ভক্তগণের মধ্যেও বিরাজ করে। নিত্য প্রিয়াগণের মধ্যে রাধা ও চন্দ্রাবলীর পর বিশাখা, ললিতা, শ্যামা, পদ্মা, শৈব্যা, ভদ্রা, পরা, বিচিত্রা, গোপালী, ধনিষ্ঠা, পালিকা প্রভৃতি প্রসিদ্ধ। চন্দ্রাবলীর আর এক নাম সোমাভা, রাধিকার নামান্তর গান্ধর্ব্বা।

অনুরাধা ললিতার নামান্তর। এতদ্ব্যতীত খঞ্জনাক্ষী মনোরমা মঙ্গলা বিমলা প্রভৃতি ব্রজগোপীগণের নাম শুনিতে পাওয়া যায়। ইঁহাদের শত সহস্র যূথ রহিয়াছে। প্রতি যূথে লক্ষ লক্ষ গোপীর সমাবেশ। রাধা ইহাতে কুঙ্কুমা পর্য্যন্ত সকলেই যূথেশ্বরী। ললিতা, বিশাখা, পদ্মা ও শৈব্যা এই চারিজন যূথেশ্বরী নহেন। ইঁহারা নিজের নিজের ইষ্ট রাধা প্রভৃতির ভাব সংরক্ষণ করিবার জন্য সখ্য প্রীতিতে নিবদ্ধ।

নিত্য প্রিয়াগণ দেবীগণ এবং যৌথিক এবং অযৌথিক সাধিকা-গণ—ইঁহাদের কথা সংক্ষেপে বলা হইল। ভগবদ্ভক্তির আশ্রয়ভূতা নায়িকাগণ স্বকীয়া ও পরকীয়া, ভেদে দুই প্রকার। যাঁহাদিগকে অগ্নি সাক্ষী করিয়া শাস্ত্রোক্ত বিধান অনুসারে বিবাহ করা হইয়াছে তাঁহারা স্বকীয়া। প্রসিদ্ধি আছে দ্বারকাতে শ্রীকৃষ্ণের ষোড়শ সহস্র মহিষী ছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে ১০৮ জন শ্রেষ্ঠ। প্রত্যেকটি মহিষীর সহস্র সহস্র সখী এবং দাসী ছিলেন। ইহাঁদের প্রত্যেকেই রূপে ও গুণে মূল মহিষীর অনুরূপ। তন্মধ্যে যাঁহাদের রূপ গুণ শক্তি প্রভৃতি সর্বাংশে মহিষী বর্গের সমান তাঁহারা সখী পদবাচ্য। কিন্তু কিঞ্চিদ্ অপকর্ষ থাকিলে তাঁহারা দাসী পদবাচ্য। এই সকল মহিষীবর্গের মধ্যে সত্যভামা জাম্ববতী অর্কনন্দিনী শৈব্যা রুক্মিণী ভদ্রা কৌশল্যা মাদ্রী, এই ৮টি প্রধান—ইহাঁদের মধ্যেও রুক্মিণী ও সত্যভামা প্রধান। তন্মধ্যে ঐশ্বর্য্যাংশে রুক্মিণী এবং সৌভাগ্যাংশে সত্যভামা উৎকৃষ্ট। গোকুল কন্যাগণের মধ্যে যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণকে পতিভাবে উপসনা করিতেন তাঁহারা এক হিসাবে স্বকীয়া কোটির বলা যাইতে পারে। কারণ গান্ধর্ব্ব রীতিতে শ্রীকৃষ্ণের সহিত তাঁহাদের বিবাহ হইয়াছিল, মুক্তভাবে বিবাহ হয় নাই। যাঁহারা পরকীয়া তাঁহারা স্ব স্ব হৃদয়ে তীব্র রাগ বশতঃ শ্রীকৃষ্ণ চরণে আত্মসমর্পণ করিয়া ছিলেন। ধর্ম্মতঃ তাঁহারা স্বীকৃত হন নাই, কিন্তু প্রীতির উৎকর্ষ বশতঃ ভগবানের প্রকৃষ্ট প্রেম ভাজন রূপে গৃহীত হইয়াছিলেন। পরকীয়া ভক্তগণের রাগ এত প্রবল যে উহা ইহলোক এবং পরলোক কাহারও অপেক্ষা রাখে না। অর্থাৎ সামাজিক লজ্জা লাঞ্ছনা প্রভৃতি এবং পারলৌকিক

অধর্মের ভয় তাঁহাদিগকে নিজ নিজ রাগবিষয় হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিতে পারে না। পরকীয়া বলিতে সকলেই যে অন্যের বিবাহিতা স্ত্রী হইবে এমন কোন কথা নাই কারণ অবিবাহিতা কন্যাও পরকীয়া হইতে পারে। যাহাকে ধর্ম সঙ্গত বিবাহবিধি অনুসারে গ্রহণ করা হয় নাই অর্থাৎ যে স্বকীয়া নহে সেই পরকীয়া। কুমারী-গণের মধ্যে যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণকে মনে মনে পতি রূপে বরণ করিয়াছেন এবং নিজের ইষ্টসিদ্ধির জন্য কাত্যায়নী ব্রত করিয়াছেন তাঁহারা পরকীয়া পদবাচ্যা নহেন। তদ্‌ভিন্ন অন্যান্য কুমারী পরকীয়ারূপে পরিগণিত হন। অবশ্য তীব্র রাগবশতঃ শ্রীকৃষ্ণ চরণে আত্ম সমর্পণ করা আবশ্যক। যাঁহারা যথাবিধি গোপগণের সহিত বিবাহ বন্ধনে বদ্ধ হইয়া মনে মনে নিরন্তর শ্রীকৃষ্ণ সঙ্গ কামনা করেন— তাঁহারা পরোঢ়া সংজ্ঞক পরকীয়া। এই সকল গোকুলবাসিনী বিবাহিতা স্ত্রীগণ কখনও স্ব স্ব পতির সঙ্গ লাভ করেন নাই এবং তাঁহাদের পতিগণও সে জন্য কোন প্রকার অভাব অনুভব করেন নাই। কোন কোন আচার্য্য মনে করেন গোপীগণের পতিগণ পুরুষদেহ সম্পন্ন হইলেও তাঁহাদের কাহারও মধ্যে কখনই কামবিকার উদ্ভূত হইত না। ইহা যোগমায়ার প্রভাব বুঝিতে হইবে। এতদ্ব্যতীত এই সকল গোপীগণের মাধ্য কাহারও কখনও সন্তান উৎপন্ন হয় নাই। শুধু তাহাই নহে, পুষ্পোদ্‌গম পর্য্যন্তও কাহারও হয় নাই। ইহাও যোগমায়ার প্রভাব বুঝিতে হইবে।

সখী ভিন্ন লীলার বিস্তর বা পুষ্টি সিদ্ধ হয় না। এই জন্যই বৈষ্ণবাচার্য্যগণ লীলার বর্ণনা প্রসঙ্গে সখীর সূক্ষ্ম আলোচনা করিয়া গিয়াছেন। বৃন্দাবনেশ্বরী শ্রীরাধার পাঁচ প্রকার সখীর কথা প্রসঙ্গতঃ পূর্ব্বে উল্লেখ করা হইয়াছে। ইহাঁদের নাম সখী নিত্যসখী প্রাণসখী প্রিয়সখী ও পরমপ্রেষ্ঠ সখী পরমপ্রেষ্ঠ সখী সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়তম। ইহাঁরাই শ্রীরাধার অন্তরঙ্গ অষ্টসখী। ইহাঁদের নাম—ললিতা, বিশাখা, চিত্রা, চম্পকলতা, তুঙ্গবিদ্যা, ইন্দুলেখা, রঙ্গদেবী ও সুদেবী! প্রিয়সখী—যেমন কুরঙ্গাক্ষী, সুমধ্য, মদনালসা, কমলা, মাধুরী,

মঞ্জুকেশী, কন্দর্পসুন্দরী, মাধবী, মালতী, কামলতা, শশিকলা প্রভৃতি। প্রাণসখীগণের মধ্যে শশিমুখী বাসন্তী লসিকা প্রভৃতির নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। নিত্যসখী—যথা কস্তুরী মণিমঞ্জরী প্রভৃতি। সখীর শ্রেণীতে কুসুমিকা, বিন্ধ্যা, ধনিষ্ঠা, প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। বস্তুতঃ শ্রীরাধার অথবা চন্দ্রাবলীর সখীগণের অন্ত নাই। এই সকল সখীর মধ্যে কেহ কেহ যূথেশ্বরী এবং অধিকাংশ কোন না কোন যূথের অনুগত। আকৃতি স্বরূপ স্বভাব ও কার্য্য নিবন্ধন সখীগণের মধ্যে অনন্ত প্রকার বৈচিত্র্য রহিয়াছে। সখীগণের সকলেরই প্রেম রাধা এবং কৃষ্ণ উভয়ের উপর সমরূপে বিন্যস্ত। বস্তুতঃ সখীগণের প্রেম যুগল প্রেমের পরাকাষ্ঠা বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তথাপি ইহা সত্য যে লীলা ভেদে কখনও ঐ প্রেম রাধার প্রতি কখনও বা কৃষ্ণের প্রতি কিঞ্চিদ্ আধিক্য প্রাপ্ত হয়। যেমন রাধার খণ্ডিতা অবস্থায় সখীগণের প্রেম কৃষ্ণ অপেক্ষা রাধার দিকে অধিক মাত্রায় প্রকাশিত হয়। কারণ খণ্ডিতা রাধার দুঃখ একমাত্র শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃকই প্রদত্ত। সখীগণ মনে মনে এই প্রকার অনুসন্ধান করেন বলিয়াই তাঁহাদের হৃদয় ঐ দুঃখ অসহ্য বলিয়া প্রতীত হয়। পক্ষান্তরে যখন শ্রীরাধার কঠোর অর্থাৎ দুর্জ্জয় মান আবির্ভূত হয় তখন শ্রীকৃষ্ণ বিরহ বশতঃ অত্যন্ত বিপদ্‌গ্রস্ত হইয়া পড়েন। এই জন্য সখীগণের প্রেম তখন রাধা হইতে শ্রীকৃষ্ণের প্রতিই কিঞ্চিদ্ অধিক মাত্রায় প্রকাশিত হয়। শ্রীকৃষ্ণের দুঃখ রাধা প্রদত্ত বলিয়াই সখীগণ ধারণা করেন। এইজন্য এই দুঃখ তাঁহাদের অসহ্য বলিয়া প্রতীত হয়।

সখীগণের যূথের কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। প্রতিযূথে অবান্তর গণ বর্ত্তমান আছে। এইজন্য সখীগণের যূথবিভাগের ন্যায় একটি গণ বিভাগও রহিয়াছে, যেমন সখীগণ, প্রাণ সখীগণ ইত্যাদি। অথবা যেমন রাধার যূথে ললিতার গণ বিশাখার গণ ইত্যাদি। এক একটি গণে কতজন সখীর সন্নিবেশ সম্ভবপর তাহার কোন নিয়ম নাই। ৫।৬টি হইতে আরম্ভ করিয়া সহস্র সহস্র পর্য্যন্ত সখীর দ্বারা এক একটি সখীর গণ রচিত হইতে পারে।

সখীগণের একটি বৈশিষ্ট্য এই যে তাঁহারা কখনই স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গ সঙ্গ জন্য সুখের প্রত্যাশা করেন না। তাঁহাদের একমাত্র লক্ষ্য আপন আপন যূথেশ্বরীগণ যাহাতে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গলাভে সুখী হইতে পারে। তাঁহাদের সুখই সখীগণের তৃপ্তির একমাত্র হেতু। এই দৃষ্টি অনুসারে সাধারণতঃ সখীগণ দুই প্রকার—প্রেম সৌন্দর্য্য বৈদগ্ধ্য প্রভৃতি গুণের আধিক্য বশতঃ শ্রীকৃষ্ণের অত্যন্ত লোভনীয় গাত্র ও তাহাদের অর্থাৎ ঐ সকল গুণের ন্যূনতা বশতঃ তাঁহার অতি লোভনীয় গাত্রী। তন্মধ্যে শ্রীকৃষ্ণ সুখের অনুরোধে তাহা হইতে আপন যূথেশ্বরীগণের অধিক আগ্রহ নিবন্ধন প্রথমোক্ত সখীগণের চিত্তে কখনও কখনও শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গ সঙ্গের স্পৃহা উদিত হয়। যেমন ললিতা প্রভৃতি পরম প্রেষ্ঠ সখীর।

দ্বিতীয় শ্রেণীর সখীগণ উভয়ের অভাব বশতঃ কখনও কখনও কৃষ্ণাঙ্গ সঙ্গ স্পৃহা বিশিষ্ট হন না। কস্তুরী প্রভৃতি নিত্য সখীগণ এই শ্রেণীর।

সখী প্রসঙ্গে আনুসঙ্গিক ভাবে দূতী সম্বন্ধেও দুই একটি কথা বলা যাইতেছে। স্বয়ং দূতী, বংশীদূতী, আপ্তদূতী ইত্যাদী দূতীগত ভেদ বিচারণীয়। স্বয়ং দূতী স্বয়ং রাধাই। বংশীদূতী শ্রীকৃষ্ণের বেণুধ্বনি, যাহা রাধাকে লোকলজ্জা লাঞ্ছনা গুরুগঞ্জনা প্রভৃতি উপেক্ষা করাইয়া গৃহ হইতে বনের দিকে আকর্ষণ করিয়া লইয়া আইসে। আপ্তদূতী কৃষ্ণের, যেমন বীরা অথবা বৃন্দা। বীরার বাক্য প্রগলভ হইয়া থাকে। বৃন্দা স্তোকবাক্য প্রয়োগে অতি নিপুণ। অসাধারণ দূতী তাহাদিগের নাম যাহারা শুধু কৃষ্ণের অথবা শুধু রাধার দূতীকার্য্য করিয়া থাকে। যেমন বীরা বৃন্দা, মেলা মুরলী ইত্যাদি। যাহারা রাধা এবং কৃষ্ণ উভয়ের পক্ষে সমরূপে দূতীকার্য্য করে তাহারা সাধারণ। ইহাদের মধ্যে তিনটি শ্রেণী আছে—কেহ শিল্পকারিণী, কেহ দৈবজ্ঞা এবং কেহ লিঙ্গিনী অর্থাৎ গৈরিকবসনা সংন্যাসিনী।

দূতী এবং সখী সম্বন্ধে আরও বহু কথা বলিবার আছে। এতদ্ব্যতীত প্রকট লীলায় সখা, পিতামাতা, পরিজন, পরিবার প্রভৃতি

সম্বন্ধেও অনেক কিছু বলিতে হইবে। রূপ গোস্বামী এবং অন্যান্য গোস্বামিপাদগণ এই সম্বন্ধে বলিয়াছেন অনেক কিছু। এখন মার্গতত্ত্ব সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলা যাইতেছে।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের পরমধাম গোলোক এবং তাঁহার বৈভব গোকুল অথবা দিব্য বৃন্দাবন কি উপায়ে প্রাপ্ত হওয়া যায়, এইখানে তাহাই আলোচনার বিষয়। প্রসঙ্গতঃ তাঁহার অন্যান্য ধাম প্রাপ্তি সম্বন্ধেও সংক্ষেপে কিছু আলোক প্রক্ষেপ করিতে চেষ্টা করা যাইবে।

নিরাকার নির্ব্বিশেষ নির্গুণ ব্রহ্মপদ প্রাপ্তির উপায় জ্ঞানযোগ, একথা বহু স্থলে বলা হইয়াছে। ঠিক সেই প্রকার অন্তর্য্যামী অর্থাৎ ব্যষ্টি, সমষ্টি ও মহাসমষ্টি বিগ্রহের অন্তরাত্মরূপী পরমাত্মা বা পরম-পুরুষকে প্রাপ্ত হইবার উপায় ধ্যানযোগ। ইহাও প্রসঙ্গতঃ একাধিক স্থলে আলোচিত হইয়াছে। ঠিক সেই প্রকার সাকার সচ্চিদানন্দময় বিগ্রহ সম্পন্ন রসস্বরূপ শ্রীভগবান্‌কে প্রাপ্ত হইবার একমাত্র উপায় ভক্তিযোগ, ইহাও বলা হইয়াছে।

কিন্তু প্রশ্ন এই, স্বরূপ কি? ভক্তি কত প্রকার? ভক্তির প্রতি-বন্ধক কি এবং পরা ভক্তির মুখ্য লক্ষ্য কি? এই সকল এবং এই জাতীয় অন্যান্য প্রশ্নের সমাধান না হইলে ভক্তিতত্ত্ব সম্বন্ধে সম্যক্ জ্ঞান লাভ হইতে পারে না। জ্ঞান ইচ্ছা প্রভৃতির ন্যায় ভক্তি মানবীয় অন্তঃকরণের বৃত্তি বিশেষ। ইহাই অনেকের ধারণা। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে ইহা সত্য ধারণা নহে। চিত্তের বৃত্তিরূপে ভক্তি আত্মপ্রকাশ করিয়া থাকে ইহা সত্য। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে স্বরূপতঃ ভক্তি চিত্তের বৃত্তি নহে। ইহা চিত্তের বৃত্তিরূপ হওয়া দূরে থাকুক, মায়া অথবা মহামায়ার বৃত্তিরূপও নহে। ইহা সাক্ষাৎ চিৎশক্তির বিলাস এবং অন্তঃকরণকে আশ্রয় করিয়া অন্তঃকরণের বৃত্তিরূপে মানব হৃদয়ে কার্য্য করিয়া থাকে। ইহার বিশেষ বিবরণ ক্রমশঃ বুঝিতে পারা যাইবে। ভক্তিকে অনুরাগ রূপেই গ্রহণ করা যাউক অথবা সেবা কিংবা জ্ঞান বিশেষ রূপেই মনে করা যাউক মূলে ভক্তির স্বরূপ এ সকলের অতীত। ভগবৎ স্বরূপ সচ্চিদানন্দময়। যে শক্তি দ্বারা ভগবৎ স্বরূপের উপলব্ধি

হয় তাহাও সচ্চিদানন্দময়ী, ইহা বলাই বাহুল্য। সচ্চিদানন্দময়ের স্বরূপভূতা এই সচ্চিদানন্দময়ী শক্তিই স্বরূপশক্তি বা চিৎশক্তি। সন্ধিনী সংবিদ্ ও হ্লাদিনী ইহারই তিনটি বৃত্তির নাম। ভগবৎ স্বরূপের আনন্দাংশের সহিত হ্লাদিনী শক্তির সম্বন্ধ বুঝিতে হইবে। হ্লাদিনী-রূপা স্বরূপশক্তি ব্যতিরেকে পরমানন্দময় ভগবৎ স্বরূপের আস্বাদনের দ্বিতীয় কোন উপায় নাই। অর্থাৎ ভগবদ্ বস্তু স্ব-সংবেদ্য। তিনি নিজেই আস্বাদনের বিষয়, নিজেই আস্বাদন করেন এবং নিজের আস্বাদনময়ী স্বরূপশক্তি এই আস্বাদনের সাধন।

ভগবৎ স্বরূপ বহির্ভূত কোন শক্তির দ্বারা ভগবৎ স্বরূপকে উপলব্ধি করা সম্ভবপর নহে। হ্লাদিনী শক্তির অনন্ত প্রকার খেলা আনন্দ রাজ্যে নিত্যলীলারূপে নিরন্তর সংঘটিত হইতেছে। কিন্তু ঐ খেলায় যোগদান করা অথবা উহার রস আস্বাদন করা মায়াচ্ছন্ন জীবের পক্ষে এমন কি কেবলী পুরুষের পক্ষেও, অসম্ভব। কারণ যতক্ষণ জীব হৃদয়ে পূর্বলিখিত স্বরূপ শক্তির বৃত্তি বিশেষ কোন শক্তির প্রাদুর্ভাব এবং বিকাশ সম্পন্ন না হয় ততক্ষণ ঐ জীবের পক্ষে তাহার প্রাকৃত শক্তি দ্বারা অপ্রাকৃত ভগবদ্ ধামের অভাবনীয় অচিন্ত্য অননুভূতপূর্ব রস বিলাসের ধারণা করা সম্ভবপর নহে।

এই যে হ্লাদিনী শক্তির বৃত্তিরূপ শক্তি বিশেষের কথা বলা হইল ইহাই ভক্তি। ইহা প্রাকৃতিক জগতের বস্তু নহে। বহু ভাগ্য ক্রমে জীব ইহা প্রাপ্ত হইলে ইহারই আকর্ষণে সে চিদানন্দময় দেহ লাভ করিয়া অপ্রাকৃত রাজ্যে প্রবেশ করিতে সমর্থ হয়। ইহা ভগবৎ প্রসাদরূপে আপনা আপনিই অহেতুক ভাবে জীব হৃদয়ে আবির্ভূত হয় অথবা জীবের সাধন বলে তাহার হৃদয়ে প্রকটিত হয় সে সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা এখনে করিবার প্রয়োজন নাই। তবে ইহা বলা যাইতে পারে যে অধিকার ভেদে উভয়ই দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। অর্থাৎ কোন কোন স্থলে জীবের দীর্ঘকালীন সাধনার ফলে সে এই ভক্তি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। আবার ইহাও দেখা যায় যে অন্যান্য স্থলে বিশেষ সাধনা ব্যতীরেকেও স্বয়ং ভগবানের অথবা ভক্ত বিশেষের কৃপা

প্রভাবে ইহা জীব হৃদয়ে সমুদিত হয়। ইহার নাম ভাবভক্তি। ইহা একদিকে যেমন সাধন ভক্তি হইতে পৃথক্ অপর দিকে তেমনি প্রেম-ভক্তি হইতেও পৃথক্। বস্তুতঃ এই প্রেম ভাবেরই পরিপক্ক পরিণাম বিশেষ। ভাব বীজ স্বরূপ, প্রেম ভাব বৃক্ষের সুগন্ধ ফল। ভাব না থাকিলে প্রেমের উদয় হইতে পারে না। যাহাকে সাধনভক্তি বলা হইল তাহা ভাবের কারণ স্বরূপ। সাধনা যথাবিধি এবং আন্তরিক ভাবে অনুষ্ঠিত হইলে উহা ভাব উৎপাদন করিয়া স্বয়ং ভক্তি-রূপে পরিণত হয়। অর্থাৎ যোগশাস্ত্রে যেমন যোগাঙ্গ সকলকেও যোগের হেতু বলিয়া যোগরূপে গণ্য করা হয় তদ্রূপ ভক্তি শাস্ত্রে নববিধ সাধনাকেও ভাব ভক্তির জনক বলিয়া ভক্তিরূপে গ্রহণ করা হইয়া থাকে। বস্তুতঃ সাধনা ক্রিয়া বা কর্ম্ম, তাহা স্বরূপতঃ ভক্তি নহে, কিন্তু ভক্তির অঙ্গ বলিয়া ভক্তিরূপে গৃহীত হইয়া থাকে।

ভাবরাজ্যের কথা পূর্বে বহু বিস্তারে বলা হইয়াছে। এই ভাব-রাজ্যে প্রবেশের সূত্রই ভাবভক্তি। যতক্ষণ জীব হৃদয়ে ভাবের উদয় না হয় ততক্ষণ তাহার পক্ষে ভাবরাজ্যরূপ নিত্যধামে প্রবেশ সুদূর পরাহত, কারণ ভাবরাজ্যে স্বভাবের রাজ্য। যতক্ষণ জীব কৃত্রিমতা পরিহার করিয়া স্বভাবের হস্তে আত্মসমর্পণ করিতে না পারিবে অর্থাৎ যতক্ষণ জীব অহন্তা ও মমতা রূপে স্বত্ব ও স্বামিত্ব বোধ, অর্থাৎ শাখাপল্লবযুক্ত অভিমান, পরিত্যাগ করিতে না পারিবে ততক্ষণ তাহার পক্ষে ভাবরাজ্যে প্রবেশ করা হইতে পারে না। জীব অহংকার বিমূঢ়াত্মা হইয়া নিজেকে কর্ত্তা বলিয়া মনে করে। এই কর্ত্তৃত্বাভিমান অপগত না হওয়া পর্য্যন্ত সে কর্মেরই অধিকারী—কর্মাতীত ভাবের নহে। যতক্ষণ কর্ম থাকে ততক্ষণ সাধনা। পরে কর্ম অতীত হইলে ঐ সাধনাই ভাব ভক্তি রূপে পরিণত হয়। যে সাধনারূপী কর্মের দ্বারা এইভাবে ভাবভক্তির উদয় হয় তাহা বাস্তবিক পক্ষে কর্ম হইলেও ভক্তগণের পরিভাষায় ভক্তিরূপে পরিগণিত হইয়া থাকে। ইহাই সাধনভক্তি।

মনুষ্যের চিত্তে দুইটি দিক আছে। তন্মধ্যে একটির স্বরূপ কর্ত্তব্য

পালন অথবা আজ্ঞা পালন এবং অপরটির স্বরূপ রুচির উদয়ে স্বতঃসিদ্ধ প্রেরণার প্রভাবে কর্ম্মের অনুষ্ঠান। অর্থাৎ কেহ কর্ত্তব্য মনে করিয়া কোন বিশেষ কার্য করিতে প্রবৃত্ত হয়। আবার এমন লোকও আছে যে ভাল লাগে বলিয়াই ঐ বিশেষ কার্য করিতে উদ্যত হয়, কর্ত্তব্য মনে করিয়া নহে। যে কর্ত্তব্যবোধে কর্ম্ম করে তাহার প্রেরণার মূলে থাকে শাস্ত্র অথবা গুরুজনের আদেশরূপী বাক্য যাহাকে স্থূল ভাষায় বিধিবাক্য বলা যাইতে পারে। কোন বিশেষ কার্যো তাহার আন্তরিক রুচি না থাকিলেও কেবল মাত্র গুরুজনের বা মহাজনগণের অথবা শাস্ত্রকারগণের আদেশের মর্য্যাদা রক্ষার জন্য সে ঐ কর্ম্ম করিতে প্রবৃত্ত হয়। কিন্তু কাহারও কাহারও প্রকৃতি এমনই ভাবে গঠিত যে তাহার পক্ষে ঐ কর্ম করিবার জন্য পূর্বোক্ত আদেশ বাক্যের প্রয়োজন হয় না। ঐরূপ কর্ম তাহার প্রকৃতির অনুকূল বলিয়া সে নিজের রুচি অনুসারে স্বতঃ প্রেরিত হইয়া উহা করিয়া থাকে। উহার জন্য গুরুবাক্যের বা শাস্ত্রীয় বিধিবাক্যের আবশ্যকতা হয় না। শাস্ত্রমতে ভক্তিপথে এই উভয়বিধ কর্মই সাধনভক্তির অন্তর্গত। তন্মধ্যে প্রথমটি বিধিমূলক বলিয়া বৈধীভক্তি ও দ্বিতীয়টি রাগমূলক বলিয়া রাগভক্তি নামে পরিচিত। বস্তুতঃ উভয়েই কর্ম, প্রকৃত ভক্তি নহে।

এই যে রাগ ভক্তির কথা বলা হইল ইহা প্রকৃত রাগভক্তি নহে —রাগভক্তির ছায়ামাত্র, কারণ প্রকৃত রাগভক্তি মায়াজগতে মায়াধীন জীবের হৃদয়ে আবির্ভূত হইতেই পারে না। প্রকৃত রাগভক্তি-স্বরূপশক্তির বিলাস, মায়ার বা অন্তঃকরণের পরিণাম নহে। প্রকৃত রাগভক্তির নাম রাগাত্মিকা ভক্তি—এই ছায়া রাগভক্তির নাম রাগানুগা ভক্তি।

প্রশ্ন হইতে পারে, কোন কোন জীবের হৃদয়ে এই জাতীয় ভক্তির উদয় হয় কেন? ইহার উত্তর দেওয়ার পূর্বে জীবের চিত্তটি বিশ্লেষণ করিয়া দেখা উচিত। জীব মাত্রেরই কর্মপ্রবৃত্তির মূলে কর্ত্তব্যতা বোধ অথবা ইষ্ট সাধনতা জ্ঞান রহিয়াছে। অর্থাৎ কর্ত্তব্য

মনে করিয়া কর্মে প্রবৃত্তি এবং ইষ্টপ্রাপ্তির সহায়ক মনে করিয়া কর্মে প্রবৃত্তি—উভয়ই জীবের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়। তবে কাহারও মধ্যে একটির প্রাধান্য এবং অপরটির গৌণতা এবং অন্য কাহারও মতে দ্বিতীয়টির প্রাধান্য ও প্রথমটির গৌণতা, এইরূপ লক্ষিত হয়। ইহার কারণ প্রকৃতিগত বৈচিত্র্য। বলা বাহুল্য, একই জীবের কালভেদে এবং অবস্থা ভেদে উভয় প্রকার ভাব লক্ষিত হইতে পারে।

ভগবদ্‌ভক্তি শাস্ত্রীয় বিধানের দ্বারা শাসিত হইলে তাহা বৈধী ভক্তি নামে পরিচিত হয়। বল্লভ সম্প্রদায়ে ইহারই নামান্তর মর্য্যাদা ভক্তি। তদ্রূপ ভগবদ্‌ভক্তি বিধিমূলক না হইয়া চিত্তের স্বারসিক রাগমূলক হইলে উহা রাগানুগা ভক্তিরূপে পরিগণিত হয়। বল্লভ সম্প্রদায়ে এই ভক্তির নাম পুষ্টি ভক্তি।

রাগানুগা ভক্তি এবং বৈধী ভক্তি উভয়ই কর্ম বা সাধনরূপ। রাগানুগা ভক্তি রাগাত্মিকা ভক্তির অনুকরণরূপে অনুষ্ঠিত হইলে সরল ও সহজ উপায়ে ভাব জগতে স্বরূপস্থিতির পথ খুলিয়া যায়। এইজন্য আচার্যগণ কি প্রকারে রাগানুগা ভক্তির অনুষ্ঠান করিতে হইবে তাহা রাগাত্মিকা ভক্তির আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন।

রাগাত্মিকা ভক্তি কামরূপা ও সম্বন্ধরূপা ভেদে দুই প্রকার বলিয়া রাগানুগা ভক্তিও দুই প্রকার—কামানুগা এবং অপরটি সম্বন্ধানুগা। কামশব্দে এখানে সম্ভোগেচ্ছা বুঝিতে হইবে। ব্রজবাসী গোপীগণ যে শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলিত হইতে ইচ্ছা করিতেন তাহার একমাত্র উদ্দেশ্য নিজ নিজ সঙ্গ দান করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে সুখী করা। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ সঙ্গ লাভ করিয়া নিজে সুখী হওয়া নহে। কারণ সমর্থা রতির তাৎপর্য্য স্বার্থে নহে, শুধু পরার্থে। কুব্জার কাম প্রকৃত কামপদবাচ্য নহে। এইজন্য কুব্জার ভক্তিকে গোপীগণের রাগাত্মিকা ভক্তির কোটিতে নিবেশ করা চলে না। শ্রীকৃষ্ণের প্রতি গোপীগণের এই কামরূপা ভক্তির প্রতিবিম্বরূপে কামানুগা ভক্তির উদয় হইয়া থাকে। নিত্য-লীলার পরিকর ব্রজবাসী ভক্তগণের ভক্তি সৌভাগ্যের কথা শ্রবণ করিয়া যাঁহার হৃদয়ে ঐ প্রকার ভক্ত হইবার জন্য বাসনা জন্মে তাঁহার

পক্ষে ঐ সকল ভক্তের ভাব, বেশ, প্রকৃতি, আচরণ গ্রহণ পূর্ব্বক মনে মনে উহাদের অনুকরণ করা আবশ্যক। ক্রিয়া ও ভাব এই দুইটি অনুকরণীয়। অনুকরণের উপায় উক্ত লীলা পরিকর ভক্তের ভাবাদির নিরন্তর স্মরণ। এই প্রকার অনুকরণীয় ভক্তকে এবং তাহার আচরণ স্বভাব প্রভৃতি নিরন্তর স্মরণ করিতে করিতে দেহান্তে দিব্য দেহ অর্থাৎ সিদ্ধদেহ বা ভাবদেহ লাভ করিয়া ঐ ভক্তের অনুগত ভাবে ব্রজধামে স্থিতি প্রাপ্তি হয়। মথুরা বৃন্দাবন প্রভৃতি লীলাধামে সকলে নিজের অবস্থিতি স্থূলদেহেই হউক অথবা মনোময় দেহে কল্পনার দ্বারাই হউক প্রতিষ্ঠিত হইলে আর কোন চিন্তার কারণ থাকে না। কামরূপা ভক্তির অনুকরণে জীবসকল কামানুগা ভক্তির অনুষ্ঠান করিয়া থাকে। প্রকৃতি ভিন্ন অন্যের পক্ষে এই ভক্তির অনুশীলন সুসাধ্য নহে। কিন্তু কখনও কখনও প্রকৃতি ভাবের অনুকরণ করিয়া পুরুষগণও এই ভক্তির অনুশীলন করিয়া থাকেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ দণ্ডকারণ্যবাসী মুনিগণের কথা বলা যাইতে পারে। ঐ সকল মুনি যে ভক্তির প্রভাবে জন্মান্তরে গোপী দেহ লাভ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ সঙ্গ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন তাহা কামানুগা ভক্তি। রাগাত্মিকা ভক্তির আর একটি ভেদ আছে, তাহার নাম সম্বন্ধরূপা ভক্তি। ব্রজধামে যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের সহিত কোন না কোন প্রকার সম্বন্ধের অভিমান করিতেন তাঁহারাই এই ভক্তির আশ্রয়। নন্দ শ্রীকৃষ্ণের পিতারূপে নিজেকে অভিমান করিতেন যশোদা করিতেন মাতৃরূপে। গোপগণের মধ্যে কেহ কেহ দাসরূপে, কেহ কেহ সখারূপে অভিমান করিতেন। আবার কাহারও কাহারও অভিমানে মিত্র ভাবও ছিল। কেহ কেহ একসঙ্গেই শ্রীকৃষ্ণের সহিত বিভিন্ন প্রকার সম্পর্কে সম্পর্কিত থাকার অভিমান করিতেন। এই সম্বন্ধরূপা ভক্তির অনুকরণে ভক্তগণ কেহ নিজেকে পিতারূপে কেহ মাতারূপে এবং অন্য কেহ সখা দাস বা অন্য পরিজন রূপে অভিমান করিতেন।

সাধনভক্তির যে দুইটি শ্রেণীর কথা বলা হইয়াছে তন্মধ্যে রাগানুগা ভক্তির কথা বলা হইল। বৈধীভক্তি চৌষট্টি অঙ্গের সহিত অনুষ্ঠিত

হওয়ার ব্যবস্থা আছে, কিন্তু কার্য্যতঃ এতগুলি অঙ্গের অনুষ্ঠান আবশ্যক হয় না। তন্মধ্যে গুরুপাদাশ্রয়, তাহার নিকট হইতে শিক্ষা ও দীক্ষা গ্রহণ প্রভৃতি সর্বাপেক্ষা অধিক উপযোগী। চরিতামৃতকার বৈধীভক্তির পাঁচটি অঙ্গের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। যথা—সাধুসঙ্গ, নামকীর্ত্তন, ভাগবত শ্রবণ, মাথুরমণ্ডলে বাস এবং শ্রদ্ধার সহিত শ্রীমূর্ত্তির সেবা। জীব গোস্বামী বৈধীভক্তির এগারোটি অঙ্গের কথা বলিয়াছেন— শ্রবণাদি নয়টি সাধনভক্তি ইহাদেরই অন্তর্গত। যথা— শরণাগতি, গুরুসেবা, শ্রবণ কীর্ত্তন, স্মরণ, পাদসেবা, অর্চ্চনা, বন্দনা, দাস্য, সখ্য ও আত্মনিবেদন। বৈধীভক্তি বিশ্লেষণ করিলে বুঝিতে পারা যাইবে যে ইহা কায় ইন্দ্রিয় ও অন্তঃকরণ দ্বারা ভগবানের উপাসনা। এই উপাসনা অপরাধবর্জিত হইয়া করিতে হয়, নতুবা উপাসনার সম্যক ফললাভ হয় না। অপরাধ দুইপ্রকার—সেবাপরাধ ও নামাপরাধ। সেবা অপরাধ বহুপ্রকারের হইতে পারে; আচার্যগণ পঁয়ষট্টি (৬৫) প্রকার অপরাধের উল্লেখ করিয়াছেন। নামাপরাধ দশটি প্রধান। বৈধীভক্তির বিভিন্ন অঙ্গ দর্শনে মনে হয় ইহা অনেকাঙ্গ, কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। বৈধীভক্তি একাঙ্গও হইতে পারে, অনেকাঙ্গও, হইতে পারে। অর্থাৎ অধিকার বিশেষে একটি মাত্র অঙ্গের অনুষ্ঠান করিয়াও বৈধীভক্তি সাধনার পূর্ণতা লাভ করা যায়। বহু অঙ্গের সমবেত সাধনে যে পূর্ণ ফল লাভ হইবে তাহাতে আর সন্দেহ কি? একমাত্র শ্রবণ দ্বারা পরীক্ষিৎ সিদ্ধকাম হইয়াছিলেন। তদ্রূপ শুকদেব একমাত্র কীর্ত্তন করিয়াই সিদ্ধি লাভ করেন। একমাত্র সখ্য দ্বারা অর্জ্জুন, সেবা দ্বারা হনুমান, স্মরণের দ্বারা প্রহ্লাদ এবং আত্মনিবেদনের দ্বারা বলি সিদ্ধিলাভ করেন। অম্বরীশের ভক্তি অনেকাঙ্গ ছিল। ইহাও শাস্ত্রে উল্লিখিত হইয়াছে।

———

৮

ভাবরাজ্য ও লীলা রহস্য (গ)

আমরা পূর্ব্বেই সামান্যভাবে তিনপ্রকার ভক্তির কথা উল্লেখ করিয়াছি। তন্মধ্যে সাধনভক্তির অনুষ্ঠান করিতে করিতে ঐ ভক্তির প্রভাবে কাহারও কাহারও চিত্তে ভাবভক্তির উদয় হয়। কিন্তু যাঁহারা অধিকতর ভাগ্যবান্ তাঁহারা সাধনভক্তির অনুষ্ঠান না করিয়াও ভগবৎ কৃপাতে ভাবভক্তি প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। এই ভাবে যাঁহারা ভাবের উপলব্ধি করেন এবং যাঁহারা সাধন ভক্তির অনুষ্ঠানের ফলস্বরূপ ভাব লাভ করিয়া থাকেন এই উভয় প্রকার ভক্তের মধ্যে কোনই পার্থক্য নাই। ভাব প্রাপ্ত হইলেই ভক্তি সাধনার প্রাকৃত স্তর অতীত হইয়া যায়। কারণ ভাব অপ্রাকৃত নিত্য সিদ্ধ বস্তু। উহা স্বরূপশক্তির বা হ্লাদিনীশক্তির বৃত্তিস্বরূপ। যে ভক্তহৃদয়ে ভাবের উন্মেষ হয় তাহার দেহ, ইন্দ্রিয় ও অন্তঃকরণ ক্রমশঃ অপ্রাকৃত আকার ধারণ করে। তখন তাহার দেহ সিদ্ধদেহ নামে পরিচিত হয়। এই দেহে ইন্দ্রিয় ও অন্তঃকরণের বৃত্তি যথাযৎ থাকিয়াও না থাকার মতন হয়। এই ভাবদেহ ভাবজগতের অধিবাসী—ইহা বলাই বাহুল্য।

ভাবভক্তি পরিপক্বতা লাভ করিলে প্রেমভক্তির উদয় হয়। প্রেম সূর্য্য স্বরূপ, ভাব তাহারই একটি কিরণ—কণা। কিন্তু ভাবের এমনি মহিমা যে ঠিকভাবে বিকাশপ্রাপ্ত হইলে স্বাভাবিক নিয়মে ইহা কখনও কখনও প্রেমরূপে পরিণত হইতেই হইবে। প্রেমরূপে পরিণত হইলে ভগবদ্ দর্শন সুলভ হয়। তখন ক্রমশঃ এই প্রেম নিত্য সিদ্ধ রস স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়। ভাবরাজ্যের যত আড়ম্বর তখন সকলই শান্ত হইয়া যায়। প্রেম, প্রেমের আশ্রয় ভক্ত ও প্রেমের বিষয় ভগবান এই তিনটি মিলিত হইয়া একটি অচিন্ত্য রসস্বরূপে আত্মপ্রকাশ করে। এই রসই মহারস।

এই যে ভাবের কথা বলা হইল ইহা রস সাধনায় বীজস্বরূপ। আমরা ব্রজবাসিগণের রাগভক্তি প্রসঙ্গে বলিয়াছি যে ইহা একদিকে কামরূপা এবং অপরদিকে সম্বন্ধরূপাও হইয়া থাকে। আচার্যগণ শুদ্ধা ভগবদ্‌ভক্তিকে রস সাধনার দিক হইতে এই জন্য শান্ত দাস্য সখ্য, বাৎসল্য ও মাধুর্য্য এই কয়টি শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়া থাকেন। তন্মধ্যে পূর্ব বর্ণিত কামরূপা ভক্তি মাধুর্য্যের অন্তর্গত এবং সম্বন্ধরূপা ভক্তি শান্ত, দাস্য প্রভৃতি বিভাগের অন্তর্গত জানিতে হইবে। এই সবগুলিই ভক্তিরসের বিভিন্ন আস্বাদন। কিন্তু অলঙ্কার শাস্ত্রে যে সকল রসের উল্লেখ ও সাধন প্রক্রিয়া দেখিতে পাওয়া যায় ভগবদ্‌ভক্তি অবস্থা বিশেষে উহার প্রত্যেকটির সঙ্গে জড়িত হইয়া গৌণ ভক্তিরস রূপে পরিগণিত হইতে পারে। ভাবরাজে প্রধান অপ্রধান গু উভয় প্রকার ভক্তি রসেরই সুব্যবস্থা রহিয়াছে। এই সকলগুলি প্রেমভক্তিরই প্রকার ভেদ।

অতএব প্রেম এক হইয়াও যেমন ভিন্ন ভিন্ন রূপে আস্বাদিত হইতে পারে, কারণ প্রেমের আশ্রয়ভূত ভক্তে প্রকৃতিগত বৈচিত্র্য রহিয়াছে। ঠিক সেই প্রকার ভগবৎ স্বরূপও মূলতঃ এক হইয়াও বিভিন্নরূপে আস্বাদ্যমান হয়। কারণ ভক্তের প্রকৃতিতে যেমন বৈচিত্র্য লক্ষিত হয় ঠিক সেই প্রকার ভগবৎ স্বরূপে ও প্রকৃতিগত বিচিত্রতা লক্ষিত হয়।

আমরা প্রেমের যে শ্রেণী বিভাগ করিলাম তাহা স্থূল দৃষ্টি অনুসারে বুঝিতে হইবে; সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে প্রেমের অনন্ত প্রকার। প্রেম ভক্তি রসের প্রত্যেকটির স্বরূপে অসংখ্য প্রকার বৈশিষ্ট্য রহিয়াছে। যাহার ফলে একটি ভক্তিরস অন্য একটি ভক্তিরসের সহিত আস্বাদন-গত সমতা লাভ করিতে পারে না। সজাতীয় রসে এই প্রকার পার্থক্য আছে। বিজাতীয় রসেও ঠিক ঐ প্রকারই আছে। অর্থাৎ শান্তভক্তি ও দাস্যভক্তির মধ্যে যেমন আস্বাদনগত বৈলক্ষণ্য অনন্ত প্রকারে আছে তদ্রূপ শুধু শান্ত ভক্তিরই অবান্তর ভেদের মধ্যে অনন্ত-প্রকার বৈলক্ষণ্য আছে। শুধু তাহাই নহে কোন একটি অবান্তর

রসাস্বাদনও দুইটি ক্ষণে ঠিক একপ্রকার নহে, এবং হইতেও পারে না। প্রতিক্ষণেই অভিনব আস্বাদন ফুটিয়া উঠিতেছে। অনন্ত-রসের অপার সমুদ্র—তাহাতে প্রতিক্ষণে নব নব ভাব মারুত হিল্লোলে অভিনব আস্বাদন উন্মেষিত হইতেছে। ইহাই লীলা বিলাসের অচিন্ত্য মাধুরী।

এই রস সমুদ্রের তরঙ্গ প্রেমভক্তির ভিত্তিতে স্বভাবের প্রভাবে অনন্তরূপে ক্রীড়াশীল হয়। প্রেমভক্তির পরে আর কোন অভিনব জাতীয় ভক্তির নির্দ্দেশ পাওয়া যায় না। কিন্তু প্রেমভক্তিরই উত্তরোত্তর বিলাস মহাভাব পর্য্যন্ত লক্ষিত হইয়া থাকে। এই সকল বিলাস সংখ্যাতে অগণিত এবং প্রকারও তাহাই। যাঁহার বিশ্লেষণ শক্তি যত তীক্ষ্ণ তিনি তত সূক্ষ্ম বিলাস লক্ষ্য করিতে পারেন। অস্তগমনোন্মুখ সূর্য্যের রক্তরাগে রঞ্জিত মেঘমালার মধ্যে যেমন পর পর অসংখ্য বর্ণ সন্নিবেশ দেখিতে পাওয়া যায়—একটি বর্ণ কোথায় সমাপ্ত হয় এবং অপরটির কোথায় আরম্ভ হয় তাহার নির্দ্দেশ যেরূপ করিতে পারা যায় না—প্রেমভক্তির বিলাসও ঠিক সেইরূপ। তথাপি আচার্য্যগণ মন্দমতি জিজ্ঞাসুগণের প্রাথমিক বোধের সৌকার্যের জন্য একটি স্থূল শ্রেণী বিভাগ করিয়াছেন এবং প্রত্যেকটি শ্রেণীর লক্ষণ নির্ব্বাচন করিয়াছেন। রসিক এবং ভক্তি জিজ্ঞাসু ঐ বিশ্লেষণ প্রণালী অনুসরণ করিয়া একপক্ষে যেমন ঐ সকল বিলাসকে আয়ত্ত করিতে পারেন তেমনি অপর পক্ষে অভিনব ভিন্ন ভিন্ন বিলাসের উদ্ভাবন ও পরিচয় গ্রহণও করিতে পারেন। ইঁহারা সকলেই স্বরূপ-শক্তির বৃত্তিরূপ নিত্যসিদ্ধ ভগবদ্ ভক্ত।

যাহাকে আমরা বৃত্তি বলিয়া মনে করি ভাব জগতে তাহার অপ্রাকৃত আকার এবং প্রকৃতি লক্ষিত হয়। বৃত্তির যেমন সংখ্যা নাই এ সকল আকৃতি ও প্রকৃতিরও তেমনি সংখ্যা নাই। ইহারা সকলেই চিৎকলা। অথবা চিদানান্দময়ী কলা। ব্রহ্মসংহিতার ভাষায় ইহারাই আনন্দ চিন্ময় রস প্রতিভাবিত কলা। সাধারণ ভাষাতে ইহাদিগকেই গোপ ও গোপিকা বলা হইয়া থাকে।

এই যে ভাবের কথা বলা হইল ইহা রস সাধনায় বীজস্বরূপ। আমরা ব্রজবাসিগণের রাগভক্তি প্রসঙ্গে বলিয়াছি যে ইহা একদিকে কামরূপা এবং অপরদিকে সম্বন্ধরূপাও হইয়া থাকে। আচার্যগণ শুদ্ধা ভগবদ্‌ভক্তিকে রস সাধনার দিক হইতে এই জন্য শান্ত দাস্য সখ্য, বাৎসল্য ও মাধুর্য্য এই কয়টি শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়া থাকেন। তন্মধ্যে পূর্ব বর্ণিত কামরূপা ভক্তি মাধুর্য্যের অন্তর্গত এবং সম্বন্ধরূপা ভক্তি শান্ত, দাস্য প্রভৃতি বিভাগের অন্তর্গত জানিতে হইবে। এই সবগুলিই ভক্তিরসের বিভিন্ন আস্বাদন। কিন্তু অলঙ্কার শাস্ত্রে যে সকল রসের উল্লেখ ও সাধন প্রক্রিয়া দেখিতে পাওয়া যায় ভগবদ্‌ভক্তি অবস্থা বিশেষে উহার প্রত্যেকটির সঙ্গে জড়িত হইয়া গৌণ ভক্তিরস রূপে পরিগণিত হইতে পারে। ভাবরাজে প্রধান অপ্রধান ও উভয় প্রকার ভক্তি রসেরই সুব্যবস্থা রহিয়াছে। এই সকলগুলি প্রেমভক্তিরই প্রকার ভেদ।

অতএব প্রেম এক হইয়াও যেমন ভিন্ন ভিন্ন রূপে আস্বাদিত হইতে পারে, কারণ প্রেমের আশ্রয়ভূত ভক্তে প্রকৃতিগত বৈচিত্র্য রহিয়াছে। ঠিক সেই প্রকার ভগবৎ স্বরূপও মূলতঃ এক হইয়াও বিভিন্নরূপে আস্বাদ্যমান হয়। কারণ ভক্তের প্রকৃতিতে যেমন বৈচিত্র্য লক্ষিত হয় ঠিক সেই প্রকার ভগবৎ স্বরূপে ও প্রকৃতিগত বিচিত্রতা লক্ষিত হয়

আমরা প্রেমের যে শ্রেণী বিভাগ করিলাম তাহা স্থূল দৃষ্টি অনুসারে বুঝিতে হইবে; সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে প্রেমের অনন্ত প্রকার। প্রেম ভক্তি রসের প্রত্যেকটির স্বরূপে অসংখ্য প্রকার বৈশিষ্ট্য রহিয়াছে। যাহার ফলে একটি ভক্তিরস অন্য একটি ভক্তিরসের সহিত আস্বাদন-গত সমতা লাভ করিতে পারে না। সজাতীয় রসে এই প্রকার পার্থক্য আছে। বিজাতীয় রসেও ঠিক ঐ প্রকারই আছে। অর্থাৎ শান্তভক্তি ও দাস্যভক্তির মধ্যে যেমন আস্বাদনগত বৈলক্ষণ্য অনন্ত প্রকারে আছে তদ্রূপ শুধু শান্ত ভক্তিরই অবান্তর ভেদের মধ্যে অনন্ত-প্রকার বৈলক্ষণ্য আছে। শুধু তাহাই নহে কোন একটি অবান্তর

রসাস্বাদনও দুইটি ক্ষণে ঠিক একপ্রকার নহে, এবং হইতেও পারে না। প্রতিক্ষণেই অভিনব আস্বাদন ফুটিয়া উঠিতেছে। অনন্ত-রসের অপার সমুদ্র—তাহাতে প্রতিক্ষণে নব নব ভাব মারুত হিল্লোলে অভিনব আস্বাদন উন্মেষিত হইতেছে। ইহাই লীলা বিলাসের অচিন্ত্য মাধুরী।

এই রস সমুদ্রের তরঙ্গ প্রেমভক্তির ভিত্তিতে স্বভাবের প্রভাবে অনন্তরূপে ক্রীড়াশীল হয়। প্রেমভক্তির পরে আর কোন অভিনব জাতীয় ভক্তির নির্দ্দেশ পাওয়া যায় না। কিন্তু প্রেমভক্তিরই উত্তরোত্তর বিলাস মহাভাব পর্য্যন্ত লক্ষিত হইয়া থাকে। এই সকল বিলাস সংখ্যাতে অগণিত এবং প্রকারও তাহাই। যাঁহার বিশ্লেষণ শক্তি যত তীক্ষ্ণ তিনি তত সূক্ষ্ম বিলাস লক্ষ্য করিতে পারেন। অস্তগমনোন্মুখ সূর্য্যের রক্তরাগে রঞ্জিত মেঘমালার মধ্যে যেমন পর পর অসংখ্য বর্ণ সন্নিবেশ দেখিতে পাওয়া যায়—একটি বর্ণ কোথায় সমাপ্ত হয় এবং অপরটির কোথায় আরম্ভ হয় তাহার নির্দ্দেশ যেরূপ করিতে পারা যায় না—প্রেমভক্তির বিলাসও ঠিক সেইরূপ। তথাপি আচার্য্যগণ মন্দমতি জিজ্ঞাসুগণের প্রাথমিক বোধের সৌকার্য্যের জন্য একটি স্থূল শ্রেণী বিভাগ করিয়াছেন এবং প্রত্যেকটি শ্রেণীর লক্ষণ নির্ব্বাচন করিয়াছেন। রসিক এবং ভক্তি জিজ্ঞাসু ঐ বিশ্লেষণ প্রণালী অনুসরণ করিয়া একপক্ষে যেমন ঐ সকল বিলাসকে আয়ত্ত করিতে পারেন তেমনি অপর পক্ষে অভিনব ভিন্ন ভিন্ন বিলাসের উদ্ভাবন ও পরিচয় গ্রহণও করিতে পারেন। ইঁহারা সকলেই স্বরূপ-শক্তির বৃত্তিরূপ নিত্যসিদ্ধ ভগবদ্ ভক্ত।

যাহাকে আমরা বৃত্তি বলিয়া মনে করি ভাব জগতে তাহার অপ্রাকৃত আকার এবং প্রকৃতি লক্ষিত হয়। বৃত্তির যেমন সংখ্যা নাই এ সকল আকৃতি ও প্রকৃতিরও তেমনি সংখ্যা নাই। ইহারা সকলেই চিৎকলা। অথবা চিদানান্দময়ী কলা। ব্রহ্মসংহিতার ভাষায় ইহারাই আনন্দ চিন্ময় রস প্রতিভাবিত কলা। সাধারণ ভাষাতে ইহাদিগকেই গোপ ও গোপিকা বলা হইয়া থাকে।

ভক্তিশাস্ত্রের পরিভাষা আলোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে চেষ্টা এবং ভাব এই উভয়ার্থেই ভক্তি শব্দের প্রয়োগ হইয়া থাকে। পূর্বে যে সাধন ভক্তির কথা বলা হইয়াছে যাহার নিরন্তর অনুশীলন হইতে ভাবের উদয় হয় তাহা চেষ্টারূপা ভক্তি। ইহা ভাবের কারণ স্বরূপ। কিন্তু ভাবের কার্যাস্বরূপের চেষ্টাও ভক্তিতে আছে। উহা রসাবস্থায় অনুভাবরূপে বর্ণিত হইয়া থাকে। অর্থাৎ চেষ্টা হইতে ভাব উৎপন্ন হয় এবং ভাব হইতে চেষ্টা উৎপন্ন হয়। দুইটিই চেষ্টারূপা ভক্তি তাহাতে সন্দেহ নাই। তন্মধ্যে একটি ভাবের কারণস্বরূপ, ইহাকে সাধনভক্তি বলে এবং অপরটি ভাবের কার্যাস্বরূপ, ইহাকে অনুভাব বলে। ভাবও সেই প্রকার দ্বিবিধ। একটি স্থায়ীভাব এবং অপরটি সঞ্চারীভাব। যেটি স্থায়ীভাব তাহাকে সাধারণতঃ কেবলমাত্র ভাব অথবা রতি বলা হয়। ইহাই প্রেমের অঙ্কুর স্বরূপ। প্রণয় প্রভৃতি অবস্থা সকল প্রেমেরই ভিন্ন ভিন্ন বিলাস মাত্র। একথা পূর্বেই বলা হইয়াছে। সঞ্চারীভাব স্থায়ী নহে ব্যাভিচারী। এখানে তাহার আলোচনা আবশ্যক নহে। এই যে স্থায়ীভাব যাহাকে সাধারণতঃ রতি অথবা ভাব বলিয়া উল্লেখ করা হয় ইহা শুদ্ধ সত্ত্বের বিশিষ্ট রূপ। ভগবানের স্বয়ংপ্রকাশ স্বরূপ-শক্তির যে সকল বৃত্তি আছে তাহাদের মধ্যে সংবিদ্ নামক বৃত্তিকে শুদ্ধ সত্ত্ব বলা হয়। ইহা মায়াখ্যা বহিরঙ্গ শক্তির বৃত্তি নহে। সুতরাং শুদ্ধ সত্ত্ব বিশেষ বলিয়া ভাবের বর্ণনা করাতে বুঝিতে পারা যায় যে ইহা আচার্য্যগণের মতে সংবিদ্ ও হ্লাদিনী শক্তির সমবেত সারাংশ। মহাভাবের সবিশেষ আলোচনা প্রসঙ্গে ইহা নিরূপিত হইবে।

ভাবের অভিব্যক্তি চিত্তবৃত্তিতে হইয়া থাকে। যখন ভাব আবির্ভূত হয় তখন ইহা চিত্তের বৃত্তির সহিত অভিন্ন রূপেই প্রকাশিত হয়। ভাব স্বয়ং প্রকাশ হইলেও ইহা প্রকাশ্যরূপে আবির্ভূত হয়। কেবল প্রকাশের দিক দিয়া নহে, আস্বাদনের দিক দিয়া এইরূপই হইয়া থাকে। ইহা স্বয়ংই আস্বাদ স্বরূপ। অথচ ইহাই ভগবদ্

বিষয়ক আস্বাদের কারণরূপে পরিণত হয়। ভাব ও রতি বর্তমান প্রসঙ্গে অভিন্নার্থক বলিয়া বুঝিতে হইবে।

সাধন অভ্যাস ব্যতিরেকেও কোন কোন স্থলে সহসা ভাবের আবির্ভাব হইয়া থাকে দেখিতে পাওয়া যায় ইহা পূর্বে বলা হইয়াছে। ঐ স্থলে ভগবানের অথবা ভগবদ্ ভক্তের কৃপাই উহার কারণ বুঝিতে হইবে। ভগবানের কৃপার বিভিন্ন উপায়ের মধ্যে বাক্য এবং দৃষ্টি - এই দুইটি প্রধান উপায়। কিন্তু কোন কোন স্থলে ভগবদ্ বাক্য অথবা ভগবানের দৃষ্টি না থাকিলেও ভগবৎ কৃপা সঞ্চারিত হইয়া থাকে। এই কৃপা ভিতরে ভিতরে হইয়া থাকে—ইহা আন্তর কৃপা। দৃষ্টি অথবা বাক্য হইতে ইহার কোন পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায় না। ইহাকেই হার্দ্দ বলে।

কাহারও চিত্তে প্রেমের অঙ্কুর স্বরূপ ভাবের উদয় হইলে তাহার জীবনে ও চরিত্রে যে সকল লক্ষণ প্রকাশিত হয় তাহাদের মধ্যে প্রধান কয়েকটি লিখিত হইল,—যথা, (১) ক্ষান্তি চিত্তে ক্ষোভ উৎপন্ন হইবার কারণ বিদ্যমান থাকিলেও যে ক্ষোভহীন অবস্থা তাহারই নামান্তর ক্ষান্তি। যাহার চিত্তে ভাব জাগিয়া উঠিয়াছে তাহার পক্ষে ক্ষান্তি উদয় একটি অব্যর্থ নিদর্শন।

(২) ভাবযুক্ত জীব জীবনের এক মুহূর্ত্ত সময়ও বৃথা নষ্ট করে না।

(৩) অন্তঃকরণে ভাব ফুটিয়া উঠিলে ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য বিষয় সমূহে রুচি থাকে না, অর্থাৎ বিষয় মাত্রের প্রতি বিতৃষ্ণা উদিত হয়।

(৪) নানা বিষয়ে উৎকর্ষ সম্পন্ন হইলেও চিত্তে উল্লাস থাকে না। এই অবস্থায় অভিমান বিগলিত হয় বলিয়া ইহাকে মানশূন্যতা বলে।

(৫) ভগবানকে প্রাপ্ত হইবার জন্য উৎকট আশা সর্বদাই হৃদয়ে জাগিয়া থাকে। ইহা আশাবন্ধ নামক অবস্থা।

(৬) আপন ইষ্ট প্রাপ্তির জন্য একটি তীব্র লোভ উৎপন্ন হয়। এই অবস্থার নাম সমুৎকণ্ঠা।

(৭) এই অবস্থায় সর্বদা ভগবানের নাম করিতে ভাল লাগে এবং ভগবানের গুণ কীর্ত্তন করিতে আসক্তি উৎপন্ন হয়।

(৮) ভগবানের বাসস্থানের প্রতি প্রীতি জন্মে ইত্যাদি। এই সকল লক্ষণের দ্বারা বিবেকশীল মনুষ্য বুঝিতে পারে তাহার অথবা কাহারও অন্তঃকরণে ভাবের সঞ্চার হইয়াছে কিনা। কারণ এমন অবস্থাও আছে যখন ভাবের সঞ্চার না হইলেই বাহ্য দৃষ্টি সম্পন্ন লোক ঐ অবস্থাকে ভাব বলিয়া ধারণা করিয়া থাকে।

এই অবস্থাটির নাম ভাবাভাস—ইহাতে প্রকৃত ভাবের কোন কোন গুণ প্রতিবিম্বরূপে দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু ইহা প্রকৃত ভাব নহে।

ভাব অথবা রতির মুখ্য এবং গৌণ দুই প্রকার লক্ষণ আছে; তন্মধ্যে ভগবদ্ বিষয়ে একনিষ্ঠ স্পৃহা—ইহাই ভগবৎ প্রাপ্তির মুখ্য উপায়। ইহাই প্রকৃত ভাব। কিন্তু আভাসাত্মক ভাবে এই একনিষ্ঠ স্পৃহার অভাব দৃষ্ট হয়। ঐশ্বর্য্যের আকাঙ্ক্ষা অথবা মোক্ষের আকাঙ্ক্ষা বর্তমান থাকিলে ভগবদ্ বিষয়ক একনিষ্ঠতার ত্রুটি হয়। অর্থাৎ যে ভাবুক সে একমাত্র ভগবান ভিন্ন অন্য কিছু চায় না, ঐশ্বর্য্য তাহার প্রার্থনীয় নহে এবং মোক্ষও প্রার্থনীয় নহে। একমাত্র ভগবদ্প্রাপ্তিই তাহার লক্ষ্য। ভাব অত্যন্ত দুর্লভ জিনিষ, মুক্ত পুরুষগণও যাবতীয় তৃষ্ণা পরিহার করিয়া ইহার অন্বেষণ করিয়া থাকেন। অন্বেষণের ফলে কেহ কেহ ইহা প্রাপ্ত হন; কিন্তু সকলে নহে। ভাব বস্তুটি এতই গোপনীয় যে স্বয়ং ভগবানও ভজনশীল ভক্তকেও সহজে ইহা দেন না। যে সকল লোকের হৃদয়ে ভোগের আকাঙ্ক্ষা অথবা মুক্তির আকাঙ্ক্ষা রহিয়াছে যাহারা শুদ্ধা ভক্তি প্রাপ্ত হয় নাই তাহাদের হৃদয়ে ভাব অথবা রতি আবির্ভূত হয় না। যাহা আবির্ভূত হয় তাহা প্রকৃত ভাব নহে, ভাবের আভাস মাত্র। এই আভাসটি কোনস্থলে প্রতিবিম্ব এবং কোনস্থলে ছায়ারূপে আত্মপ্রকাশ করে। যেটি প্রতিবিম্ব ভাবাভাস তাহা কখনও না কখনও ভাবুক ও রসিক জনের দৃষ্টিতে পতিত হইয়া পূর্ণ ভাবরূপে পরিণত হয়। তখন উহার ন্যূনতা কাটিয়া

যায়। ভোগ অথবা ভোগের আকাঙ্ক্ষাই শুদ্ধ ভাবের উপাধি। এই উপাধি বর্জিত না হইলে একনিষ্ঠ স্পৃহা অক্ষুণ্ণ থাকিতে পারে না। ভাবোদয়ের যে সকল সাধারণ লক্ষণ আছে—সেই সকল পরিদৃষ্ট হইলেও ভাবরূপে উহার কারণ নির্ণয় করা সব সময় চলে না। কারণ ভাবাভাস হইতেও ঐ সকল লক্ষণ উদিত হইতে পারে। এইজন্য এক স্পৃহা রূপ মুখ্য লক্ষণের দ্বারাই ভাবের ঠিক ঠিক পরিচয় পাওয়া যায়। প্রতিবিম্বরূপ ভাবাবাস কখন উৎপন্ন হয়? যখন ভোগার্থী অথবা মোক্ষার্থী ভক্ত দৈবাৎ কোন সময় সৎভক্তের সঙ্গ বশতঃ কীর্ত্তনাদি অনুসরন করিয়া থাকে তখন ভক্তের হৃদয়াকাশস্থিত ভাবরূপী চন্দ্রমার প্রতিবিম্ব সংস্কারস্বরূপ সদ্‌ভক্তের সংসর্গ বশতঃ আবির্ভূত হয়। ইহা প্রতিবিম্বরূপে আভাস, কিন্তু ইহার চেয়েও নিকৃষ্ট আভাস আছে, তাহাকে ছায়া বলা হয়। তাহাতে প্রকৃত ভাবের কিঞ্চিৎমাত্র সাদৃশ্য লক্ষিত হয়। প্রতিবিম্ব আভাসরূপী হইলেও স্থির, কিন্তু ছায়া চঞ্চল। লৌকিক কৌতূহল যেরূপ স্থায়ী হয় না সেইরূপ কৌতূহলময় ছায়াভাবও স্থির হয় না। কিন্তু ইহাও বৃথা নহে। জীবের দুঃখ নাশ করিবার অসাধারণ সামর্থ্য ইহাতেও রহিয়াছে। কিন্তু ইহা তো প্রকৃত লাভ নহে। কারণ প্রতিবিম্ব অথবা ছায়ারূপী আভাসময় ভাব হইতে প্রেম ভক্তির উদয় হইতে পারে না এবং প্রেমভক্তি না হইলে ভগবদ্‌-দর্শনও হয় না। সুতরাং ভাবাভাস হইতে কোন সময়েই ভগবদ্দর্শনের আশা করা যায় না,—ঐশ্বর্য্য মুক্তি, দুঃখ-নিবৃত্তি প্রভৃতি নানাপ্রকার ফল ভাবের আভাস হইতেও প্রাপ্ত হওয়া যাইতে পারে, কিন্তু ভগবৎ প্রেমলাভ সুদূরপরাহত। একমাত্র ভগবানকেই চাই আর কিছুই চাই না, এমন কি মুক্তিও চাই না দুঃখনিবৃত্তিও চাই না, ঐশ্বর্য্যও চাই না—এই প্রকার একনিষ্ঠ স্পৃহা না থাকিলে কোন সময়ই ভগবৎ সাক্ষাৎকার হয় না। তবে ইহা সত্য যে ভগবানের বা ভক্তজনের কৃপা হইলে আভাসরূপী ভাবও পূর্ণ এবং প্রকৃত ভাবরূপে পরিণত হইতে পারে। পক্ষান্তরে ভগবদ্ভক্তের প্রতি অপরাধ হইলে ভাবাবাস ক্রমশঃ ক্ষীণ হইয়া নষ্টপ্রায় হইয়া যায়। শুধু তাহাই নহে। ভগবৎ প্রিয়জনের

প্রতি অপরাধ উৎপন্ন হইলে ভাব অভাব রূপে পরিণত হয় এবং আভাস প্রভৃতি আকার ধারণ করে। কখনও কখনও ভাবের আকস্মিক উদয় লক্ষিত হয়। তাহা পূর্ব জন্মের সাধনার ফলস্বরূপ বুঝিতে হইবে। কারণ অনেক সময় এমন হয়—সাধন সুসম্পন্ন হইলেও বিঘ্ন বশতঃ তাহার ফলের উদয় স্থগিত থাকে। পরে অবসরপ্রাপ্ত হইলে ঐ ফল অকস্মাৎ ফুটিয়া উঠে।

ভাব ঘনীভূত হইলে প্রেমরূপে পরিণত হয়। এই প্রেমই প্রেম-লক্ষণা ভক্তি নামে ভক্তিসাহিত্যে প্রসিদ্ধ। ইহাতে মমতা অথবা মদীয়তা ভাব অত্যন্ত প্রবল রূপে ফুটিয়া উঠে। ভাব যেমন সাধন হইতে উৎপন্ন হয়, আবার বিনা সাধনায় ভক্ত বা ভগবানের কৃপা হইতেও উৎপন্ন হয়, প্রেমও তেমনি কোন কোন স্থলে ভাব হইতে উৎপন্ন হয়, আবার কোন কোন স্থলে ভক্ত বা ভগবানের সাক্ষাৎ কৃপা হইতেই উৎপন্ন হয়। সাধনা মূলে বিধিমার্গে ও রাগমার্গে পৃথক্ পৃথক্ বলিয়া দুই প্রকার। এই জন্য সাধনজনিত ভাবও দুই প্রকার হইয়া থাকে। অর্থাৎ বৈধ সাধন ভক্তি হইতে উৎপন্ন ভাব এবং রাগানুগা সাধনভক্তি হইতে উৎপন্ন ভাব স্বরূপতঃ বৈলক্ষণ্য সম্পন্ন। তাই ভাব অবস্থায় উপনীত হইলেও মার্গগত পার্থক্যের চিহ্ন সম্পূর্ণরূপে অপনীত হয় না। প্রেম সম্বন্ধেও ঠিক ঐ প্রকারই বুঝিতে হইবে। কারণ সাধনজভাব দুই প্রকার বলিয়া ভাবজনিত প্রেমও দুই প্রকার। বৈধ সাধনভক্তিজনিত ভাব হইতে উৎপন্ন প্রেমে মাহাত্ম্যজ্ঞান বা ঐশ্বর্য্যজ্ঞান মিশ্রিত থাকে। অর্থাৎ প্রেমের বিষয়ভূত ভগবান অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ড ও বৈকুণ্ঠাদির পরম অধিষ্ঠাতা। তিনি সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তিমান, তদপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কেহ নাই, এমন কি তাঁহার সমানও কেহ নাই। তিনি সৌন্দর্য, লাবণ্য, ঔদার্য্য, প্রভৃতি অনন্ত কল্যাণগুণের আকর। ভগবৎ মহিমার জ্ঞান এই জাতীয় প্রেমভক্তিতে বিদ্যমান থাকে। কিন্তু যে প্রেমভক্তি রাগানুগা সাধন ভক্তিজনিত ভাব হইতে উৎপন্ন হয় তাহা শুদ্ধ বা কেবল। তাহাতে মাহাত্ম্য জ্ঞান মিশ্রিত থাকে না।

প্রেমের উদয়ে বিশ্লেষণের প্রক্রিয়া ভেদ অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন ক্রম লক্ষিত হয়। তন্মধ্যে সর্ব্বত্র পরিচিত প্রসিদ্ধ ক্রম এই :—প্রথম — শ্রদ্ধা, দ্বিতীয় সাধুসঙ্গ, তৃতীয় ভজনক্রিয়া, চতুর্থ অনর্থ নিবৃত্তি। ইহাই মুক্ত ভাব। পঞ্চম নিষ্ঠা, ষষ্ঠ রুচি, সপ্তম আসক্তি, অষ্টম ভাব, নবম প্রেম। সাধন ভক্তি হইতে প্রেমভক্তি উদয়ের ইহাই ক্রম। ইহা হইতে বুঝিতে পারা যাইবে সাধন ভক্তির উদয়ের পূর্ব্বে শ্রদ্ধা ও সৎসঙ্গ আবশ্যক। সাধনভক্তি এবং ভাবভক্তির অন্তরালে চারিটি পৃথক্ পৃথক্ অবস্থা রহিয়াছে। সাধনভক্তি হইতে যাবতীয় অনর্থ নিবৃত্ত হইয়া গেলে সাধনার আবশ্যকতা থাকে না। তখন ক্রিয়া নিবৃত্তি হয়। কিন্তু নিষ্ঠা নামক একটি অভিনব অবস্থার উদয় হয়। অনর্থ নিবৃত্তি না হওয়া পর্যান্ত নিষ্ঠা আবির্ভূত হইতে পারে না। নিষ্ঠা হইতে হয় রুচি অর্থাৎ ভাললাগা এবং তাহার ফলে হয় আসক্তি, যাহা হইতে যথা সময়ে ভাবের আবির্ভাব অবশ্যম্ভাবী। প্রেমের পর আর কোন পৃথক্ অবস্থা নাই। কিন্তু না থাকিলেও প্রেমের বিলাসরূপ অবস্থা অবশ্যই আছে, যাহার বিশেষ বিবরণ সময়ান্তরে করা যাইবে। এই সকল বিলাস সাধক দেহে অত্যন্ত দুর্লভ, এক প্রকার লক্ষিত হয় না বলিলেই চলে। কিন্তু ইহারা সিদ্ধদেহের স্বাভাবিক ধর্ম্ম।

প্রেমভক্তির উদয় সম্বন্ধে কোন কোন আচার্য্য বিশিষ্ট মত পোষণ করেন। তত্ত্ব বিশ্লেষণের দিক হইতে ঐ মতটিও সর্ব্বথা উপাদেয় বলিয়া এখানে উহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিতেছি। এই মতানুসারে জীব মাত্রই শুদ্ধ প্রেমভক্তির অধিকারী নহে। যে প্রেম ভক্তি ভগবানের বিশেষ অনুগ্রহ ভিন্ন কোন জীব প্রাপ্ত হইতে পারে না তাহা জীব মাত্রের প্রাপ্য নহে। যাহার উপর শ্রীভগবানের কৃপা হয় শুধু সেই ইহার অধিকারী, অন্যে নহে। দৈবজীবের মধ্যে যাহাকে ভগবান আপন অসাধারণ কৃপার পাত্র করিতে ইচ্ছা করেন সর্ব্বপ্রথম সে সৎসঙ্গ লাভ করিয়া থাকে। তাহার পর পরিচর্য্যা প্রভৃতির ফলে ও যথাশক্তি শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত শ্রবণ, দৈহিক সেবা ও অন্যান্য ভজন প্রক্রিয়ার অনুষ্ঠানের ফলে কৃপাপথে (মার্গে) রুচি উৎপন্ন হয়। তখন শ্রবণাদি

অনুষ্ঠিত হইলে চিত্তে ভগবানের আবেশ হয়, যাহার ফলে চিত্ত নির্ম্মল হইয়া উজ্জ্বল রূপ ধারণ করে। শ্রবণাদির অনুষ্ঠান তখনও পূর্ব্ববৎ চলিতেই থাকে। এইভাবে দীর্ঘকালে ভগবানে রুচি উৎপন্ন হয়। বলা বাহুল্য ভগবদ্দর্শন এখনও হয় নাই। সুতরাং এই রুচিকে পরোক্ষ রুচি বলা যাইতে পারে। অর্থাৎ যে রুচির বিষয় পূর্ব্বে অনুভবের বিষয় রূপে আবির্ভূত হয় নাই তাহাই পরোক্ষ রুচি অর্থাৎ প্রত্যক্ষ না দেখিয়াও ভাল লাগা। এই রুচি উৎপন্ন হওয়ার পরেও শ্রবণাদি রূপ ভজন চলিতেই থাকে। তখন বীজরূপী ভাব বা সূক্ষ্ম ভক্তি ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইতে আরম্ভ হয়। এই ভাবটি কি ? গৌড়ীয় আচার্য্যগণ ইহাকে শুদ্ধ সত্ত্বের বৃত্তি বলিয়া আখ্যাত করিয়াছেন। সুতরাং ইহা স্বরূপশক্তির ধর্ম্ম বিশেষ। জীব তটস্থ শক্তি। ভগবদ্ অনুগ্রহ ভক্তানুগ্রহ বা ভিন্ন জীব ইহা প্রাপ্ত হইতে পারে না। কোন কোন জীব সাধনভক্তি দ্বারা (বৈধ বা রাগানুগা যাহাই হউক না কেন) কি প্রকারে ভাব প্রাপ্ত হইতে পারে তাহার কারণ নির্ণয় করা যায় না। বল্লভীয় আচার্য্যগণ ইহার সমাধান অন্য প্রকারে করিয়া থাকেন। তাঁহাদের মতে আদি সৃষ্টির সময় জীবত্ব সম্পাদনের পরেই কোন কোন জীবের মধ্যে ভগবান সূক্ষ্ম রূপে বীজরূপিণী ভক্তি বা ভাব স্থাপনা করেন। ইহাই বীজভাব। যে জীবে এই বীজভাব নিহিত হয় সেই উত্তরকালে ভগবানের বিশেষ অনুগ্রহের পাত্র হইয়া থাকে।

পূর্ব্ব বর্ণিত পরোক্ষ রুচির প্রভাবে এবং শ্রবণাদি সহকারী কারণের কার্য্যরূপে ঐ ভাব হইতে জীবের চিত্ত ভগবৎ স্বরূপের স্ফুরণ হয়। চিত্ত মধ্যে এই প্রকার স্ফূর্ত্তি আবির্ভূত হইলে যখন অনুভূতি গাঢ় অবস্থা প্রাপ্ত হয় তখন ঐ পরোক্ষ রুচি অপরোক্ষ রুচি রূপে পরিণত হয়। এইভাবে ঐ বীজরূপী ভাব শ্রবণাদি সাধনা দ্বারা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া প্রেমরূপ ধারণ করে। এই প্রেম স্বরূপতঃ স্নেহাত্মক। ইহার উদয় হইলে চিত্ত হইতে অন্য বিষয়ের ইচ্ছা বা স্পৃহা তিরোহিত হইয়া যায়। ইহার পর সেবা এবং শ্রবণাদি সাধনের আবৃত্তির ফলে আসক্তির উদয় হয়। এই অবস্থার আবির্ভাব হইলে জগতের যাবতীয় পদার্থ—যাহার

সহিত ভগবৎ সম্বন্ধ নাই—বাধকরূপে প্রতীত হয়। যখন ঐ আসক্তির আরও অধিকতর ঘনীভূত অবস্থার বিকাশ হয় তখন যে অবস্থার আবির্ভাব হয়—ভক্তি শাস্ত্রে তাহাই প্রেমের পরাকাষ্ঠা রূপে পরিগণিত হইয়া থাকে। এই অবস্থার নাম ব্যসনা, ইহারই নামান্তর মানসী সেবা। তখনই জীব কৃতার্থতা লাভ করে। সেবা সম্বন্ধে বল্লভীয় আচার্যাগণ বহু সূক্ষ্ম বিচার করিয়াছেন, এখানে তাহার উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

পূর্ব্বোক্ত বিবরণ হইতে বুঝিতে পারা যায়, ভগবদ বিষয়ক রুচি উৎপন্ন হওয়ার পর শ্রবণাদি সাধনার অনুষ্ঠানের ফলে প্রেম ভক্তির আবির্ভাব হয়। ইহার প্রথম অবস্থা আসক্তি এবং পরিপক্কাবস্থা ব্যসনা। এই সকল শব্দ অনেক স্থলে অভিন্নার্থে প্রয়োগ হইয়া থাকে।

ব্যসনা পর্যান্ত প্রেমের বিকাশ সম্পন্ন হইলে সর্ব্বত্র ভগবৎ স্ফূর্ত্তি হইয়া থাকে। ইহারই নাম সর্ব্বাত্মভাব। এই অবস্থায় প্রতি বস্তুর প্রতিই উৎকট স্নেহের উদয় হয়। ইহার পর ভিতরে এবং বাহিরে অভিন্নরূপে ভগবানের আবির্ভাব হয়। ইহার পর নিত্যলীলায় প্রবেশ, যাহা পুষ্টিভক্তগণের চরম লক্ষ্য।

ভক্তির আবির্ভাব সম্বন্ধে কয়েকটি প্রশ্ন স্বভাবতঃই উদিত হইয়া থাকে। সূক্ষ্মভাবে বিচার করিলে এই কয়েকটি প্রশ্নের সঙ্গে অন্য কয়েকটি অবান্তর প্রশ্ন মিশ্রিত রহিয়াছে দেখিতে পাওয়া যায়। এই সকল প্রশ্নের সমাধানের চেষ্টা না করিয়া প্রশ্নগুলি আলোচনার সুবিধার জন্য উল্লেখ করা যাইতেছে।

সাধন ভক্তির মধ্যে বৈধী ও রাগানুগা ভক্তির পার্থক্যের কথা বলা হইয়াছে। বিভিন্ন প্রকার ভক্তির আবির্ভাবের মূলে অধিকারগত পার্থক্য স্বীকার করিতে হইবে। অর্থাৎ যে প্রকার অধিকার সম্পত্তি থাকিলে বৈধী ভক্তি লাভ করা যায় রাগানুগা ভক্তি লাভের অধিকার তাহা হইতে পৃথক। এই অধিকার গত ভেদের মূল কারণ প্রকৃতিগত; ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। এই

প্রাকৃতিক ভেদ জীবের প্রথম আবির্ভাবের সহজাত অথবা বর্তমান দেহ প্রাপ্তির সমকালীন তাহা বিচারণীয়। প্রকৃতিগত এই ভেদ থাকা সত্ত্বেও দেখিতে পাওয়া যায় যে উভয় প্রকার ভক্তই অনুশীলনের প্রভাবে সাধনার পরিপক্কাবস্থায় ভাবের অধিকারী হন। মূল প্রকৃতিগত ভেদ ভাবাবস্থায় উপনীত হইলেও নিবৃত্ত হয় না—এ কথাও পূর্বে বলা হইয়াছে। এই স্থলে প্রশ্ন এই—সাধক হৃদয়ে ভাবের বীজ পূর্ব হইতে নিহিত না থাকিলে সাধনার প্রভাবে ভাবের অভিব্যক্তি কি প্রকার হইতে পারে? এই ভাব বীজ প্রতি সাধকের হৃদয়েই নিহিত আছে কি? যদি থাকে তবে তাহা কখন নিহিত হইয়াছে। এই বীজের মধ্যেও স্বরূপগত পার্থক্য আছে কি? নতুবা ভাব ভক্তির বিকাশের সময় বৈধী সাধন জনিত ভাবভক্তি এবং রাগানুগা সাধন-জনিত ভাবভক্তির মধ্যে পার্থক্য আসে কোথা হইতে? যদি প্রতি সাধকে ভাবরূপ বীজ নিহিত না হইয়া থাকে তাহা হইলে বলিতে হইবে কোন কোন সাধকে ভাব বীজ নিহিত হয় নাই। যদি ইহা স্বীকার করা হয় তাহা হইলে এই সকল সাধক ভক্তি সাধনা করিয়াও ভাব লাভ করিতে পারিবেন না ইহা বলিতেই হইবে। তাহা কি সম্ভবপর? আর এক কথা—সাধক মাত্রেই ভবরূপ বীজ নিহিত থাকে, ইহা বলার তাৎপর্য্য কি? অসাধকের ইহা থাকে না। কেহ ভক্তি সাধনা করিয়া থাকে কেহ করে না—ইহার মূলত প্রকৃতি ভেদ? যদি তাহাই হয় তাহা হইলে অসাধকেও ভাববীজ নিহিত থাকা স্বীকার করিলে ক্ষতি কি? বীজ থাকিলেও অভিব্যঞ্জক সামগ্রীর অভাব থাকিলে তাহা ফুটিতে পারে না। প্রতি জীবেই ভাব বীজ নিহিত স্বীকার করিলেও বলা যাইতে পারে না কি যে অভিব্যঞ্জক কারণের সম্বন্ধের অভাববশতঃ সকল জীব সাধক হয় না, এবং যাহারা সাধক হয় তাহাদের মধ্যেও পূর্বোক্ত কারণেই সকলের ভাব অভিব্যক্ত হয় না, শুধু কাহারও কাহারও হইয়া থাকে। কিন্তু উদ্দীপক কারণের উপস্থিতি হইলে পরে হইবে না একথা বলা যায় না।

আরও একটি কথা। যে সকল জীব সাধক নহে তাহাদের, মধ্যেও ভগবানের বা ভক্তের বিশেষ অনুগ্রহে ভাবের বিশেষ অভিব্যক্তি হইতে দেখা যায়। এই সব ক্ষেত্রে কি ভাব বীজ তখনই নিহিত হয় বলিতে হইবে? তাহা হইলে স্বীকার করিতে হইবে প্রথমে এই সকল জীবের মধ্যে বীজ নিহিত হয় নাই। ইহা হইতে বুঝিতে পারা যায় যে কোন কোন স্থলে সাধনা করিয়াও ভাব পাওয়া যায় না। আবার কোন কোন স্থলে সাধনা না করিয়াও ভাব পাওয়া যায়। ইহার তাৎপর্য্য কি? শুধু তাহাই নহে। প্রেমের উদয় সম্বন্ধেও এই জাতীয় জটিল প্রশ্ন আবির্ভূত হয়। ভাব প্রেমের মূল ইহা সত্য। ভাব হইতেই প্রেমের বিকাশ হয়। ইহা সত্য। ভাবেরই পরিপক্কাবস্থা প্রেম তাহাতে সন্দেহ নাই, কিন্তু ভাব ছাড়াও তো প্রেমের আবির্ভাব হইয়া থাকে। কোন কোন বিরল স্থানে সাক্ষাদ্ ভগবান অথবা ভক্তের অনুগ্রহ হইতে প্রেমের আবির্ভাব হইতে দেখা যায়। ঐসব স্থলে প্রেমের পূর্ব্বাবস্থায় ভাবের কোন পরিচয় পাওয়া যায় না, সাধন তো দূরের কথা। ইহার কারণ কি? অধিকার ভেদে প্রেমের স্বরূপেও পার্থক্যের অস্তিত্ব স্বীকার করা চলে কি? যেখানে মূলে ভাব নাই এমন আধারে যে প্রেম উৎপন্ন হয় এবং যে প্রেম ভাব হইতে অভিব্যক্ত হইয়া আবির্ভূত হয় উভয়ের মধ্যে পার্থক্য আছে কি? বৈধ সাধনাজনিত ভাব হইতে উত্থিত প্রেম এবং রাগানুগা সাধন-জনিত ভাব হইতে উত্থিত প্রেম— এই উভয় প্রেমে পার্থক্য আছে কি? আছে, স্বীকার করিতেই হয়। কারণ একটিতে মাহাত্ম্যজ্ঞান মিশ্রিত থাকে, অপরটিতে তাহা থাকে না। সাক্ষাদ ভগবদ্ অনুগ্রহ অথবা ভক্তানুগ্রহ হইতে যে প্রেম ফুটিয়া উঠে, তাহাতেও জাতিগত ভেদ আছে কি? তাহা মাহাত্ম্য জ্ঞানযুক্ত প্রেম অথবা শুদ্ধ প্রেম অথবা উভয় হইতে বিলক্ষণ অন্য কোন প্রকার প্রেম? প্রেমগত বৈচিত্র্যের নিয়ামক কি? যদি আধাররূপী উপাধি ভেদই ইহার কারণ হয় তবে আধারগত ভেদেরই বা কারণ কি? বিষয়গত ভেদ কি ইহার উপরই নির্ভর করে?

অথবা বিষয়গত ভেদের উপর ইহা নির্ভর করে ?

প্রেমরহস্য সম্বন্ধে এই সকল প্রশ্নের মীমাংসা হওয়া আবশ্যক। এখানে মীমাংসার চেষ্টা করা হইতেছে না, শুধু আলোচনার জন্য প্রশ্নগুলি উত্থাপিত হইয়াছে।

আর একটি কথা। রাগানুগা ভক্তির অনুশীলনের সময় গুরু অন্তর্দৃষ্টির দ্বারা শিষ্যের প্রকৃতি নিরীক্ষণ করিয়া তাহাকে তদনুরূপ সাধনায় ব্রতী করেন। অযোগী গুরু অন্তর্দৃষ্টি রহিত বলিয়া ব্যবহার ক্ষেত্রে শিষ্যের বাহ্য প্রকৃতি অনুসরণ করিয়াই ভজনের পথ নির্দেশ করিতে বাধ্য হন। কিন্তু ইহা ব্যবহারিক মাত্র। যিনি সদ্‌গুরু তিনি চৈতন্যময়ী দৃক্‌শক্তি দ্বারা শিষ্যের অন্তঃপ্রকৃতি দর্শন করিয়া তদনুসারে তাহার সাধনার ব্যবস্থা করেন। এখন প্রশ্ন এই—অন্তঃ প্রকৃতির সহিত রাগাত্মিকা ভক্তির সাক্ষাৎ সম্বন্ধ আছে বুঝিতে হইবে। যদি তাহা স্বীকার না করা যায়, তাহা হইলে কোন সাধক কোন এক বিশিষ্ট ভাবে প্রীতিলাভ করে, এরূপ ভেদ কি জন্য হয় তাহার সমাধান করা যায় না। অথচ জীব তটস্থ শক্তি মাত্র হইলে এক জীবে অন্য জীব হইতে অন্তঃপ্রকৃতিগত পার্থক্য কি প্রকারে হয় তাহা বুঝা যায় না। জীব যদি শ্রীভগবানের স্বরূপশক্তির বিলাসাত্মক হইত তাহা হইলে বিলাসের গুণগত, ক্রিয়াগত, মাত্রাগত এবং স্বরূপগত বৈশিষ্ট্য হইতে জীবের রুচি ও প্রকৃতির বৈচিত্র্য নিরূপিত হইতে পারিত। কিন্তু তটস্থ শক্তিরূপী জীবের রুচিগত ভেদের কারণ কি ? এইস্থলে আদি সৃষ্টিতে স্বরূপশক্তির প্রতিবিম্বপাত অর্থাৎ তটস্থ শক্তি স্বরূপ-শক্তির দ্বারা রঞ্জিত হওয়া, ইহাই মূল কারণ বলিয়া ধরিতে হয়। এই ক্ষেত্রে দর্পণরূপী তটস্থ শক্তি এক জাতীয় হইলেও উহার অভ্যন্তরে প্রতিবিম্বিত হ্লাদিনী রূপা স্বরূপ শক্তির বিলাস ভিন্ন ভিন্ন হওয়াতে ঐ অন্তঃস্থিত হ্লাদিনীর বিলাসের প্রতিবিম্বই জীবের অন্তঃপ্রকৃতির নিয়ামক বলিয়া বুঝিতে হইবে।

যে কোন প্রকারেই হউক কোন বিশিষ্ট জীব স্বরূপশক্তির কোন্ ধারায় অনুগত তাহা কোন না কোন প্রকারে নির্দিষ্ট না হইলে

রাগাত্মিকা ভজনের অনুকরণে রাগানুগা ভক্তির অনুশীলন সম্ভবপর হয় না।

শুদ্ধাদ্বৈত শাস্ত্রে রাগভক্তি বা পুষ্টিভক্তির সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ দেখিতে পাওয়া যায়। পুষ্টি শব্দের অর্থ ভগবানের বিশেষ অনুগ্রহ। সুতরাং ভগবানের বিশিষ্ট অনুগ্রহজনিত যে ভক্তি তাহাই পুষ্টিভক্তি। এই বিশেষ অনুগ্রহ হইতেই কালাদি প্রতিবন্ধক সকল অপসারিত হয়। ইহা হইতে লৌকিক এবং অলৌকিক সকল ফলই সিদ্ধ হইতে পারে। কোন্ জীবের উপর ভগবদনুগ্রহ পতিত হইয়াছে তাহা কার্য্য দর্শনে অনুমিত হইয়া থাকে। শ্রীমদ্ভাগবতের বিভিন্ন উপাখ্যান হইতে ভগবদনুগ্রহ তত্ত্বের বহু প্রকার পরিচয় পাওয়া যায়। এই অনুগ্রহের উপর জীবের কোন প্রকার বিচার চলে না। অধিকারী বিশেষে সাধন সম্পত্তি না থাকিলেও শুধু অনুগ্রহ হইতেই শ্রেষ্ঠ ফল উৎপন্ন হইতে পারে। আবার কোন লোক নিন্দিত কর্ম করিয়াও সাংকেতিক ভগবদ্ নামের প্রভাবে অব্যহতি লাভ করে। ইহাও ভগবদনুগ্রহেরই ফল। দৃষ্টান্ত স্বরূপ অজামিলের কথা বলা যাইতে পারে। কোন কোন স্থলে পাপকর্মের অনুষ্ঠাতা এবং সর্বথা দণ্ডনীয় পুরুষও ভগবদ-অনুগ্রহে দণ্ড হইতে বাঁচিয়া যায়। যেমন ইন্দ্র কর্মী বিশ্বরূপকে জ্ঞানী দধীচিকে এবং ভক্ত বৃত্রকে বধ করিয়াও ভগবদ্ অনুগ্রহে রক্ষাপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ভগবানের মহা অনুগ্রহ অতি অদ্ভুত এবং অচিন্ত্য শক্তিময়। প্রতিবন্ধক যতই প্রবল হউক না কেন ইহার প্রভাবে উহা নিঃশেষে কাটিয়া যায় এবং ভগবদ্ চরণে স্থিতিলাভ হয়। প্রতিকূল কাল, কর্ম এবং স্বভাব এই সকল প্রতিবন্ধকের অন্তর্গত। ভগবানের বিশেষ অনুগ্রহ থাকিলে ইহারা কোন প্রকার বাধা উৎপাদন করিতে পারে না।

ভগবদনুগ্রহ হইতেই যেখানে ফল উৎপন্ন হয় সেখানেও নিমিত্ত অথবা ব্যাপাররূপে লৌকিক কারণ অবশ্যই থাকিতে পারে। অজামিলের পক্ষে সাংকেতিক ভগবন্নাম গ্রহণ ব্যাপার মাত্র। কোন কোন স্থলে যোগ অর্চ্চনা প্রভৃতির অনুষ্ঠান থাকে, তাহাও ব্যাপার

মাত্র। এই অনুগ্রহ সাধারণ অনুগ্রহ নামে পরিচিত। ভগবানের বিশেষ অনুগ্রহে একমাত্র ভগবৎ স্বরূপেরই প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

একমাত্র ভগবদনুগ্রহ সাধ্য ভক্তি মর্য্যাদা ও পুষ্টিরূপে দ্বিবিধ। ভগবানের সামান্য অনুগ্রহ হইতে যে ভক্তি উৎপন্ন হয় তাহাই মর্য্যাদা ভক্তি, যাহাকে পূর্ব্বে অন্য প্রসঙ্গে বৈধী ভক্তি বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। ভগবানের বিশেষ অনুগ্রহ হইতে যে ভক্তি তাহার নামান্তর রাগভক্তি। মর্য্যাদা ভক্তির আলোচনা না করিয়া সংক্ষেপে পুষ্টিভক্তি সম্বন্ধে দুই চারিটি কথা বলা যাইতেছে।—পুষ্টিভক্তি চারি-প্রকার—১। পুষ্টি পুষ্টিভক্তি ২। প্রবাহ পুষ্টি ভক্তি ৩। মর্য্যাদা পুষ্টি ভক্তি এবং ৪। শুদ্ধ পুষ্টি ভক্তি। যে পুষ্টি ভক্তির সঙ্গে পুনরায় পুষ্টি জড়িত থাকে তাহাই পুষ্টি-পুষ্টি ভক্তি। এই যে দ্বিতীয় পুষ্টি বা বা অনুগ্রহের কথা বলা হইল ইহা হইতে ভজনোপযোগী জ্ঞান উৎপন্ন হইয়া থাকে। যাঁহারা পুষ্টি পুষ্টি ভক্তি লাভ করিয়া থাকেন, তাঁহারা ভগবৎ তত্ত্ব অর্থাৎ ভগবৎস্বরূপ, ভগবানের সর্ববিধ লীলা, তাঁহার যাবতীয় পরিকর এবং প্রপঞ্চ বিষয়ে অখিল জ্ঞান লাভ করিয়া থাকেন। ইহাঁরা সর্বজ্ঞ। প্রবাহ বলিতে অহন্তা এবং মমতা বুঝাইয়া থাকে। ইহাই সংসার। প্রবাহ-পুষ্টি ভক্তিতে সংসার ভাবের প্রাধান্য থাকে বলিয়া কেবল কর্মে রুচি বিদ্যমান থাকে, অথচ পুষ্টি ভক্তি নিবন্ধন ভগবদ্ উপযোগী ক্রিয়াতে প্রবৃত্তি হয়। সুতরাং যাহারা প্রবাহ-পুষ্টি ভক্ত তাহারা নিরন্তর ভগবানের ইচ্ছানুরূপ কর্ম্মে প্রবৃত্ত থাকে। মর্য্যাদার প্রভাবে জীবের স্বারসিক বিষয় প্রবৃত্তি অপগত হয় এবং সংযম, নিরোধ প্রভৃতি নিবৃত্তি মার্গীয় ধর্মে যোজনা হয়। অতএব যাহারা মর্য্যাদা-পুষ্টি ভক্ত, তাঁহারা ভগবৎ কথা শ্রবণ প্রভৃতিতে বিষয়াসক্তি পরিহার পূর্বক প্রবৃত্ত হন। যাঁহাদের পুষ্টিভক্তিতে কোন প্রকার মিশ্রণ নাই অর্থাৎ পুষ্টি অথবা প্রবাহ অথবা মর্য্যাদার সাংকর্য নাই তাঁহারা শুদ্ধ পুষ্টিভক্ত। ইহাদের ভক্তিতে প্রেমের প্রাধান্য। ইহারা কেবল স্নেহবশতঃই ভগবানের পরিচর্যা, গুণগান প্রভৃতি করিয়া

থাকেন। এই জাতীয় ভক্ত অতি দুর্লভ। স্নেহোৎপত্তির পর যে শ্রবণাদির অনুষ্ঠান করা হয় তাহাই উত্তম পুষ্টিভক্তের লক্ষণ।

এই চারি প্রকার পুষ্টিভক্তির মধ্যে জীবের পক্ষে পুষ্টি পুষ্টি ভক্তির জন্য চেষ্টা করা উচিত। ভক্তির প্রভাবে ভগবদ্ ভক্তির উপযোগী জ্ঞান সম্পন্ন হয় এবং ঠিক ঠিক ভাবে ভগবানের ভজন সম্ভবপর হয়। শুদ্ধ পুষ্টিভক্তি সাধনার অতীত, তাহা চেষ্টা করিয়া কেহ প্রাপ্ত হইতে পারে না। একমাত্র ভগবানের দান রূপেই তাহা প্রাপ্ত হওয়া যায়। ইহাই স্বতন্ত্রাভক্তি যাহাকে অত্যন্ত দুর্লভ বলিয়া বর্ণনা করা হয়। শুদ্ধ পুষ্টিভক্তির প্রভাবেই ভক্তের পূর্ণ স্বাতন্ত্র্যের উদয় হয়। ভক্তের স্বাতন্ত্র্য উদিত হইলে ভগবান ভক্তের বশীভূত হন। অর্থাৎ ভক্তের যে প্রকার ইচ্ছা আবির্ভূত হয় ভগবানের কৃতি তাহারই করিয়া থাকে। অর্থাৎ তখন ভক্ত যাহা ইচ্ছা করেন ভগবান তাহাই করেন। শুদ্ধ পুষ্টি তো সর্বোচ্চ, কিন্তু অন্যান্য পুষ্টি ভক্তিও মর্য্যাদা ভক্তি হইতে শ্রেষ্ঠ। যাবতীয় পুষ্টি ভক্তের পক্ষেই স্বর্গাদি লৌকৈশ্বর্য যোগসিদ্ধি, এমনকি পরমপুরুষার্থ মোক্ষ পর্যান্ত আকাঙ্ক্ষার বিষয়ীভূত হয় না।

পুষ্টি ভক্তি যে চারি প্রকার তাহা বলা হইয়াছে, কিন্তু প্রকারগত ভেদ থাকিলেও চারি প্রকার ভক্তিই পুষ্টি ভক্তিরূপে সমভাবাপন্ন। ইহার ফল নিত্যলীলায় অন্তঃপ্রবেশ, ইহা পূর্বেই উক্ত হইয়াছে। তথাপি ইহার মধ্যেই প্রকারগত বৈচিত্র রহিয়াছে। কারণ নিত্যলীলায় ভক্তরূপে গো পশু প্রভৃতি রূপে এবং বৃক্ষাদিরূপে বিভিন্ন প্রকারে প্রবেশ সম্ভবপর। বস্তুতঃ ইহাই তারতম্য। পুষ্টিভক্ত মাত্রই নিত্য লীলায় প্রবিষ্ট হইলেও ভক্তিগত তারতম্যবশতঃ লীলা প্রবেশে তারতম্য ঘটিয়া থাকে। নিত্যলীলায় প্রবেশ করাই অলৌকিক সামর্থ্য লাভ।

পুষ্টি মার্গীয় ভক্তগণ এই অলৌকিক সামর্থ্যরূপ ফল লাভ করিয়া থাকেন অর্থাৎ তাঁহারাই ভগবানের নিত্যলীলায় প্রবেশ করিতে সমর্থ হন। মর্যাদা ভক্তগণ স্ব স্ব অধিকার অনুসারে কেহ কেহ সাযুজ্য লাভ করেন এবং কেহ কেহ বৈকুণ্ঠাদি ভগবদ্-ধামে ভগবৎ সেবার উপযোগী

দেহ লাভ করেন। সাযুজ্য শব্দের প্রয়োগ কখনও কখনও পুষ্টি ভক্ত-গণের ফল সম্বন্ধেও দৃষ্ট হয়। ঐ স্থলে উহা মর্য্যাদা মার্গীয় ভক্তগণের সাযুজ্য হইতে পৃথক বলিয়া বুঝিতে হইবে। ঐ স্থলে সাযুজ্য শব্দে অলৌকিক সামর্থ্যই গ্রাহ্য। মর্য্যাদা ভক্তগণের যে দুইটি ফলের কথা বলা হইল তাহার মধ্যে সেবক দেহ লাভ গৌণ ফল এবং সাযুজ্য মুখ্য ফল জানিতে হইবে। এই সাযুজ্য মুক্তি সারূপ্যাদি যাবতীয় মুক্তির পরমাবধি। সালোক্য সারূপ্য ও সামীপ্য চরমাবস্থায় সাযুজ্যরূপে পরিণত হয়।

পুষ্টি ভক্তগণ সাযুজ্য আকাঙ্ক্ষা করেন না। তাঁহারা বলেন ব্রহ্মানন্দে প্রবিষ্ট হইলে ভক্তির বিলাস সম্ভবপর হয় না। সাযুজ্য ব্রহ্মানন্দেরই নামান্তর। ভিন্নরূপে স্থিত ব্যতিরেকে অনুভব রস ফোটে না, এই জন্য পুষ্টি ভক্তগণ সাযুজ্য প্রার্থনা করেন না। পরমা-নন্দের অনুভব সাযুজ্য প্রাপ্ত ভক্তগণেরও হয় তাহাতে সন্দেহ নাই, কিন্তু সাযুজ্য প্রাপ্ত ভক্তগণ ঐ অনুভব স্ব স্বরূপেই প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, কিন্তু ইন্দ্রিয়বর্গের ভোগ্যরূপে নহে। পক্ষান্তরে নিত্যলীলায় প্রবিষ্ট ভক্তগণ ঐ এক পরমানন্দ স্ব স্বরূপে বা আত্মস্বরূপে ত অনুভব করিয়া থাকেনই, তদ্ব্যতীত যাবতীয় ইন্দ্রিয় দ্বারাও তৎ তৎ ভোগ্যরূপে করিয়া থাকেন। সেই জন্য পুষ্টি ভক্তগন স্বরূপান্তঃ পাতরূপী সাযুজ্য প্রার্থনা করেন না। তাঁহারা নিত্যলীলায় প্রবেশ করাই প্রার্থনীয় বোধ করেন।

সর্বাত্মভাব মানসী সেবার নামান্তর। ইহা প্রাপ্তির জন্য দৈহিক এবং বিত্তজনিত সেবা আবশ্যক। মানসী সেবা সাধনরূপ নহে, ফল-স্বরূপ ইহা মনে রাখিতে হইবে। অপর দ্বিবিধ সেবা সাধনরূপ। সর্বাত্মভাব প্রতিষ্ঠিত হইলে অহন্তা ও মমতারূপ সংসার নিবৃত্ত হয়। সমস্ত জগৎরূপকে ব্রহ্মরূপে জানিতে পারা যায়। এবং তাহার ফলে অবিদ্যার নিবৃত্তি হওয়ার সঙ্গে যাবতীয় প্রাকৃত ধর্ম তিরোহিত হয়। তখন শুদ্ধি পূর্ণরূপে নিষ্পন্ন হইলে ভগবানকে প্রাপ্ত হইবার স্বরূপযোগ্যতা জন্মে। কিন্তু কেবল মাত্র স্বরূপ যোগ্যতা হইতেই

ভগবৎপ্রাপ্তি হয় না। তাহার জন্য সহকারী যোগ্যতাও আবশ্যক। এই সহকারী যোগ্যতা জীবনিষ্ঠ ভক্তিভাব। কিন্তু এই ভক্তিভাব প্রতি জীবেই থাকে না। যে সকল জীবকে ভগবান আপনরূপে বরণ করেন শুধু তাহাদের মধ্যেই ভক্তিভাবের বিকাশ হয়, অন্যত্র নহে। সুতরাং স্বরূপ যোগ্যতা এবং সহকারী যোগ্যতা উভয়ের প্রভাবে ভগবৎপ্রাপ্তি ঘটিয়া থাকে। প্রশ্ন হইতে পারে, প্রতিবন্ধকরূপিণী অবিদ্যা বর্ত্তমান থাকিতে ভগবৎপ্রাপ্তি কি প্রকারে সম্ভবপর? ইহার উত্তর এই যে অবিদ্যা মায়াজনিত বলিয়া মায়া অপগত হইলে অবিদ্যা আপনি কাটিয়া যায়। ভক্তের পক্ষে অর্থাৎ ভগবান পুরুষোত্তমকে সর্বোৎকৃষ্ট জানিয়া তাঁহার নিকট যে শরণাগত প্রপন্নবা হয় তাঁহার পক্ষে অক্ষর ব্রহ্মের জ্ঞান এবং অন্যান্য যাবতীয় জ্ঞান সহজে উপস্থিত হয়। এই জন্য ভক্ত একমাত্র শ্রীকৃষ্ণের শরণাগতির দ্বারাই অবিদ্যা-সাগর পার হইতে সমর্থ হয়। ইহার পর অবিদ্যাবর্জিত শুদ্ধ জীব অক্ষরব্রহ্মে প্রবিষ্ট হয় বা লীন হয়। এই অক্ষরব্রহ্ম ভগবানের পরম-ধাম যাহা প্রাপ্ত হইলে আর ফিরিয়া আসিতে হয় না। ভক্তগণ ভগবদ্‌ধামরূপে ব্রহ্ম প্রবেশ করেন। ভক্ত ও জ্ঞানীর স্বভাবগত ভেদ অনুসারে এইরূপ হইয়া থাকে। এই অক্ষর ব্রহ্মরূপী ধামের যিনি অধিষ্ঠাতা তিনিই ভগবান পুরুষোত্তম। পরমপুরুষ পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ ক্ষর ও অক্ষর উভয়ের অতীত। অর্থাৎ জীব ও অন্তর্যামী উভয়ের অতীত। অক্ষরব্রহ্ম হইতে ভগবৎপ্রাপ্তি যে উপায়ে সিদ্ধ হয় তাহা অত্যন্ত রহস্যময়। কারণ ভক্তি ভিন্ন ভগবৎপ্রাপ্তি কাহারও পক্ষে সম্ভবপর নহে। যে সকল ভক্ত অক্ষরব্রহ্মে পূর্ব্বোক্ত প্রণালীতে লীন হয় অর্থাৎ যাহারা সদ্‌গুরুর আশ্রয় প্রাপ্ত হইয়া ভজন অভ্যাসের প্রভাবে ভক্তিলাভ করে এবং ভগবল্লীলায় প্রবেশ করিতে অধিকার প্রাপ্ত হয় তাহাদিগকে ভগবান বিশিষ্ট অনুগ্রহবশতঃ যত্নপূর্ব্বক উদ্ধার করিয়া ভজনানন্দে যুক্ত করেন। কারণ এই সকল ভক্তকে তিনি আপনরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। ভগবৎ কর্তৃক উদ্ধার সম্পন্ন না হইলে ঐ সকল জীব ব্রহ্ম সত্তায় অভিন্ন রূপে অর্থাৎ ব্রহ্মের সহিত

একীভূত ভাবে বিদ্যমান থাকে। এই যে উদ্ধার ইহা লীলারসের অনুভবের জন্য। ব্রহ্ম সাযুজ্য অবস্থায় জীবের যে স্থিতি তাহা নিরাকার। কিন্তু প্রাদুর্ভাব অবস্থায় সাকার স্থিতি স্বভাবসিদ্ধ। কিন্তু এই সাকার ভাব নিত্য, ইহার বিকাশ নাই। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নিজ ভক্তজনকে ব্রহ্মানন্দ হইতে উদ্ধার করিয়া থাকেন। এই সময়ে জীবের বিরহভাব আত্যন্তিক তীব্রতা লাভ করিয়া তীব্র অনলের ন্যায় তাহাকে দগ্ধ করিতে থাকে। এই ক্লেশ দেহ প্রভৃতি নাশে সমর্থ। এই তীব্র বিরহের অবস্থায় ভগবান ভক্তের আপন অধিকার অনুসারে তাহাকে আপন ভাবের উপযোগী পরমানন্দ লীলা অনুভব করাইয়া বিরহের উপশম করাইয়া দেন।

উল্লিখিত বিবরণ হইতে বুঝিতে পারা যায়, জীবের ব্রহ্মরূপে যে স্থিতি তাহা নিরাকার। শুধু নিরাকার নহে, ইহা সর্ব্বাংশে ব্রহ্মের সহিত ঐক্য ভাবাপন্ন বলিয়া ইহাতে স্বভাবের বিকাশ থাকে না। অবশ্য জীব মাত্রেরই স্বভাব বা স্বরূপ ব্রহ্মই তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু ব্রহ্মতত্ত্বের দুইটি দিক আছে একটি সামান্য এবং অপরটি বিশেষ, একটি নিরাকার এবং অপরটি সাকার, একটি চিদাত্মক —অপরটি চিদানন্দময়। জীব যতদিন মায়ার অধীনে অবিদ্যায় আচ্ছন্ন হইয়া মলিন ভাবে বিদ্যমান থাকে ততদিন সে তাহার প্রকৃত স্বভাব উপলব্ধি করিতে পারে না। প্রত্যেক জীবেরই একটি আপন স্বভাব আছে। কিন্তু অশুদ্ধ অবস্থায় তাহার অনুভব হয় না। অশুদ্ধি পরিহার করিয়া ভাবরাজ্যে প্রবেশ করাই স্বীয় স্বীয় স্বভাব প্রাপ্তি। এই অশুদ্ধি পরিহার এবং শুদ্ধতা লাভ চৈতন্যের পূর্ণ বিকাশে ব্রহ্মাবস্থায় সুসম্পন্ন হয়। এই ব্রহ্ম অক্ষর ব্রহ্মরূপে বর্ণিত হইয়া থাকে। যে জীব জ্ঞান পথের সাধক সে যখন অক্ষর ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হয় তখন ঐ ব্রহ্মের সহিত সর্ব্বথা ঐক্য লাভ করে। নিজের বিশিষ্ট সত্তার অভিব্যক্তি তাহার থাকে না। যে কোন জীব ব্রহ্ম সমুদ্রে মগ্ন হইলে এক অনন্ত স্বয়ং প্রকাশ ব্রহ্মরূপেই বিরাজ করিয়া থাকে। কিন্তু এই ব্রহ্ম সমুদ্রে জ্ঞানী সাধক যেমন প্রবেশ করে তেমনি ভক্ত

সাধকও প্রবেশ করিয়া থাকে; কিন্তু উভয়ে পার্থক্য আছে। ভক্ত ব্রহ্মে জ্ঞানীবৎ লীন হইলেও ভক্তির প্রভাবে পুনর্ব্বার তাহা হইতে উত্থিত হয়। ভক্তের পক্ষে ব্রহ্মে চিরস্থিতি সম্ভবপর নহে। ভক্ত ভগবানের বিশেষ অনুগ্রহের পাত্র। এইজন্য তাহাকে উদ্ধার করিবার ভার স্বয়ং ভগবানেই ন্যস্ত থাকে। ইহা হইতে বুঝা যায় যে জীব ব্রহ্মের সহিত ঐক্য লাভ করিলেও ভগবৎ শক্তিতে পৃথক্‌কৃত হইতে পারে। কিন্তু এই পৃথক্ করণ বাস্তবিক পৃথক্ করণ নহে, লীলারসের আস্বাদনের জন্য আপন আপন স্বভাবের বিকাশ মাত্র। প্রতি জীবের আকৃতি প্রকৃতি ভাব গুণ ক্রিয়া পৃথক্। ইহারা সবই নিত্য এবং মায়াতীত। পরম পুরুষ পুরুষোত্তমের স্বভাবও যেমন নিত্য ও অচিন্ত্য প্রতি জীবের স্বভাবও ঠিক সেইরূপ। এই উভয় স্বভাবের খেলা লইয়াই অনন্ত ভগবল্লীলার অপরিসীম মাধুর্য্য। কিন্তু ব্রহ্মাবস্থায় এই স্বভাব আচ্ছন্ন থাকে। স্বভাবের উন্মেষ না হওয়া পর্য্যন্ত লীলায় প্রবেশ সম্ভবপর নহে। কিন্তু এই উন্মেষ তখনই সম্ভবপর যখন জীব অব্যক্ত ব্রহ্মরূপা মহাসত্তা হইতে উত্থিত হইয়াছে। এই উদ্ধার ব্যাপার জীবের স্বীয় কৃতিসাধ্য নহে, অর্থাৎ ইহা তাহার নিজের চেষ্টার অতীত। বস্তুতঃ চেষ্টা তো দূরের কথা, এই অবস্থায় জীবে ইচ্ছার বা জ্ঞানের বিকাশও থাকে না। এইজন্য ভগবান পুরুষোত্তম স্বতঃ প্রেরিত হইয়াই এই সকল জীবকে উদ্ধার করেন, কিন্তু জ্ঞানী জীবকে উদ্ধার করেন না। জ্ঞানীর সহিত তাঁহার লীলারস সম্ভোগ সম্ভব না। জ্ঞানী তাঁহার আত্মরূপে—স্বপ্রকাশ ব্রহ্মরূপে—প্রতিষ্ঠিত থাকে। ভক্ত তাঁহার প্রিয় বলিয়া তাহাকে তিনি উদ্ধার করেন। ইহার মূল তাঁহার বরণ, যাহার কথা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। বস্তুতঃ ইহাও স্বভাবেরই খেলা।

মায়াশক্তি বহিরঙ্গা। ইহা স্বরূপশক্তির বিরোধী। স্বরূপশক্তি ও মায়াশক্তির মধ্যে শুদ্ধ জীবের স্থান। বহিরঙ্গা শক্তির বৈভব অনন্ত বৈচিত্র্য সম্পন্ন। শুদ্ধ জীব নিরাকার চিন্মাত্র ও অণুপরিমাণ, এই জীব বহিরঙ্গা শক্তিতে আকৃষ্ট হইয়া মায়িক জগতের বৈচিত্র্য আস্বাদন

করিয়া থাকে। এই অনুভূতিতে সুখদুঃখ উভয়ই থাকিলেও মূলে ইহা দুঃখেরই অনুভূতি। এই অনুভূতি দ্বারা জীবের সত্তাটি বিকশিত হয়। ইহার পর জীব স্বরূপ শক্তির রাজ্যে প্রবিষ্ট হইলে সেখানকার বৈচিত্র্য পূর্ণরূপে আস্বাদন করিতে পারে। এখানেও সুখ-দুঃখ দুইই আছে কিন্তু মূলে উভয়ই আনন্দ বা রসেরই খেলা। জীব যদি সাক্ষাৎ ভাবে আপন তটস্থ স্বরূপ হইতে স্বরূপ শক্তিতে প্রবিষ্ট হইতে পারিত তাহা হইলে সে আনন্দের আস্বাদন প্রাপ্ত হইতে পারিত না। শুদ্ধ একটি বিরাট চৈতন্যে স্থিতিলাভ করিত। কিন্তু ঐখান হইতে পুনর্বার তাহার নির্গম হইতই। আণব অবস্থা হইতে মায়াতে প্রবিষ্ট হইয়া অজ্ঞানমূলক কর্তৃত্বাভিমানের ফলে কর্ম্মদেহ প্রাপ্ত হইয়া জীব কর্ম্ম করিতে করিতে ফলভোগের জন্য সুখদুঃখময় সংসারে লোক হইতে লোকান্তরে জন্ম মৃত্যুর আবর্ত্তনে সঞ্চরণ করিতে থাকে। এইখান হইতে ফিরিবার পথে কর্তৃত্বাভিমান পরিষ্কৃত হয় ও মায়ারাজ্য অতিক্রান্ত হয়। তারপর দুইপ্রকার গতি সম্ভবপর। আণবভাব পরিত্যাগ না করিয়া স্বরূপ শক্তিতে প্রবিষ্ট হইলে প্রকৃতি অনুসারে আনন্দের আস্বাদন প্রাপ্ত হওয়া যায়। ইহাই কমলের দলে স্থিতি। পক্ষান্তরে যদি আণবভাব কাটিয়া যায় তাহা হইলে জীব ঐশ্বরিক সত্তা প্রাপ্ত হইয়া কমলের কর্ণিকা বা বিন্দুমধ্যে অবস্থান করে। প্রথম গতির ফল কৈঙ্কর্য্য বা দাস্য। দ্বিতীয় গতির ফল ঐশ্বর্য্য বা প্রভুত্ব।

জীবকে বহিরঙ্গা শক্তির সম্বন্ধেই স্বরূপ শক্তিরূপ মহিমা ও মাধুর্য্য চিনাইয়া দেয়। মায়ারাজ্যে যে যে প্রকার অভাব অনুভব করিয়াছে স্বরূপরাজ্যে সে ঠিক তদনুরূপ আনন্দের আস্বাদন পাইয়া তৃপ্তিলাভ করে।

—•:•—

পূর্ব্বে প্রবাহ, মর্য্যাদা এবং পুষ্টি এই তিনটি মার্গের কথা বলা হইয়াছে। ভগবানের সাক্ষাদ্ দর্শন একমাত্র ভক্তিমার্গেই সম্ভবপর; কিন্তু মনঃ-কল্পিত রূপে ভগবদ্দর্শন ও সেবা ভক্তিযুক্ত জ্ঞান মার্গেও সম্ভবপর। ভক্তিমার্গের যথার্থ স্বরূপ বুঝিতে হইলে এই মৌলিক ত্রিবিধ অবস্থার কথা স্মরণ রাখিতে হইবে। জীব জীবের দেহ এবং জীবের কৃতি মার্গ ভেদে ভিন্ন ভিন্ন প্রকার হইয়া থাকে। যে সব জীব প্রবাহ মার্গে চলিয়া থাকে তাহারা আসুরিক জীব। দৈব জীব হইতে ঐ সকল জীব স্বরূপতঃ ভিন্ন। প্রবাহী জীবের দেহ ভগবদ্ ভজনের অনুকূল ত নহেই, বরং প্রতিকূল। ঐ জাতীয় দেহে ভগবদ্ জ্ঞান হয় না। এই সকল জীবের কার্য্যও বিলক্ষণ। স্বার্থের জন্য পশু-হিংসা প্রভৃতি কৃতি প্রবাহী জীবের স্বভাবসিদ্ধ। ঠিক এই প্রকার মর্য্যাদামার্গে যে সকল দৈব জীব চলিয়া থাকে তাহারা প্রবাহমার্গে চরণশীল আসুরিক জীব হইতে ভিন্ন। মর্য্যাদামার্গের জীবের দেহ বৈদিক ধর্ম ভগবৎপূজা প্রভৃতির অনুকূল। তাহাদের কৃতি অগ্নি-হোত্রাদি শ্রৌত কর্ম। সুতরাং ইহাতেও বৈলক্ষণ্য লক্ষিত হয়। মর্য্যাদা মার্গের যথাবিধি অনুসরণের ফলে জ্ঞানোৎপত্তি হইয়া থাকে। ইহা প্রবাহ মার্গে সম্ভবপর হয় না। জীবদেহ এবং কৃতির পরস্পর পার্থক্য আছে, ইহা বলা হইয়াছে। কিন্তু শুধু তাহাই নহে, ইহাদের নিত্যতাও শাস্ত্র ও অনুমান হইতে বুঝা যায়—যাহার আলোচনা এখানে অনাবশ্যক। পুষ্টিমার্গের জীব মর্য্যাদামার্গীয় জীবের ন্যায় দৈব তাহাতে সন্দেহ নাই, কিন্তু এই উভয় প্রকার দৈব জীবের মধ্যেও পরস্পর পার্থক্য রহিয়াছে। কারণ পুষ্টিমার্গীয় জীব ভগবদ অনুগ্রহ বিশিষ্ট। কিন্তু মর্য্যাদামার্গীয় জীব শাস্ত্রীয় বিধি নিষেধের অধীন। এতদ্ব্যতীত পুষ্টিমার্গীয় জীব সাক্ষাৎ পরমপুরুষ কর্ত্তৃক বৃত হয় বলিয়া সাক্ষাৎ পুরুষোত্তমকে প্রাপ্ত হইয়া থাকে। কিন্তু মর্য্যাদা মার্গীয় জীব তাদৃশ অনুগ্রহ প্রাপ্ত হয় না বলিয়া অক্ষর ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হইয়া থাকে। পুষ্টিমার্গীয় জীবের দেহ অত্যন্ত বিলক্ষণ, কারণ এই দেহ ভগবৎ সেবার উপযোগী। পুষ্টিভক্তের দেহ ভিন্ন অন্য দেহ দ্বারা

ভগবৎ সেবা হয় না। বস্তুতঃ ভগবৎ সেবার জন্যই পুষ্টিভক্তের আবির্ভাব।

বাস্তবিক পক্ষে এই তিনটি সৃষ্টিই স্বতন্ত্র। যদিও সকল জীবই পরমপুরুষ হইতেই আবির্ভূত হইয়াছে ইহা সত্য, তথাপি সৃষ্টির প্রণালীগত ভেদানুসারে সৃষ্টিতে ভিন্নতা উৎপন্ন হইয়াছে। প্রবাহ-জীব সকল ভগবানের মন হইতে, মর্য্যাদা জীব সকল তাঁহার বাক্য হইতে এবং পুষ্টি মার্গীয় জীব সকল তাঁহার কায় হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। ইহা হইতে বুঝা যায় যে প্রবাহ সৃষ্টির মূল মন এবং মর্য্যাদা সৃষ্টির মূল বাক্য অর্থাৎ বেদরূপিণী বাণী। কিন্তু পুষ্টি সৃষ্টির মূল সম্পূর্ণ কায় বা দেহ. যাহা চিদানন্দঘন। প্রবাহ মার্গই লৌকিক পথ। এই মার্গে যাহারা বিচরণ করে তাহারা অন্ধতমসারূপ ফল লাভ করিয়া থাকে অর্থাৎ পুনঃ পুনঃ সংসারে আবর্ত্তন করিয়া থাকে। ইহার মূল ভগবদিচ্ছা, যাহার প্রভাবে ঐ সকল জীব আসুর ভাবাপন্ন হইয়াছে। বৈদিক পথ কর্ম ও জ্ঞান উভয়াত্মক বলিয়া মর্যাদা মার্গ দুই প্রকার। তন্মধ্যে জ্ঞান মার্গের ফল অক্ষর প্রাপ্তি বা নির্গুণ ব্রহ্মলাভ। কর্মমার্গে সকাম কর্মের ফল স্বর্গ প্রাপ্তি। নিষ্কাম কর্মের ফল বিশুদ্ধ আত্মসুখ। কিন্তু এই সকল জীবও যদি কখনও ভগবদ-অনুগ্রহে ভক্ত সঙ্গ লাভ করে তাহা হইলে মর্য্যাদামার্গীয় ভক্তের মুক্তিরূপ পুরুষোত্তম প্রাপ্তি হইয়া থাকে। পুষ্টিমার্গীয় ভক্তির ফল সর্বেন্দ্রিয়ের আস্বাদ্য পুরুষোত্তম-স্বরূপ আনন্দের প্রাপ্তি। পূর্বে বলা হইয়াছে মর্যাদামার্গীয় ভক্তও পুরুষোত্তমকে প্রাপ্ত হইয়া থাকে, এখন বলা হইল পুষ্টিমার্গীয় ভক্তও ভগবানকে প্রাপ্ত হইয়া থাকে। এই উভয় প্রাপ্তির মধ্যে পার্থক্য আছে। মর্য্যাদাভক্ত পুরুষোত্তমকে যে প্রাপ্ত হয় তাহা মুক্তিরই নামান্তর। কিন্তু পুষ্টি ভক্তের পুরুষোত্তম প্রাপ্তি সাক্ষাৎ স্বরূপ সম্বন্ধের অনুভব রূপা। বলা বাহুল্য উভয়ত্রই ভগবৎ ইচ্ছাই মূল।

এই ত্রিবিধ সৃষ্টির প্রয়োজনও পৃথক পৃথক। পুষ্টি ভক্তের সৃষ্টির মুখ্য উদ্দেশ্য ভগবৎ স্বরূপের সেবা। এই সেবার প্রকার ভেদ অনেক

রহিয়াছে। স্বরূপ অর্থাৎ লীলোপযোগী দেহ, অবতার অর্থাৎ প্রাকট্য লিঙ্গ অর্থাৎ ভজন দেহের চিহ্ন, বয়স প্রভৃতি এবং গুণ অর্থাৎ সৌন্দর্য্য এবং রসবোধক চাতুর্য্য প্রভৃতি,—এই সকল উপায়ে সেবার বৈলক্ষণ্য দৃষ্ট হইয়া থাকে।

পূর্বোক্ত বিবরণ হইতে জানিতে পারা যায় যে ভগবানের অন্তরঙ্গ লীলাতে বল্লভমতে সকল জীবের প্রবেশাধিকার নাই। আসুরিক জীবের ত নাই-ই সকল দৈব জীবেরও নাই। কারণ যাঁহারা বিধি মার্গ বা মর্য্যাদা মার্গের অধীন হইয়া চলেন তাঁহারা অক্ষর ব্রহ্মে বা নির্গুণ ব্রহ্মে কিংবা আত্মানন্দে মগ্ন হইয়া থাকেন। ভগবল্লীলায় প্রবেশ তাঁহাদের পক্ষে সম্ভবপর নহে। একমাত্র পুষ্টি মার্গের জীবই স্ব স্ব প্রকৃতি অনুসারে লীলাদেহ অবলম্বন করিয়া ভগবল্লীলায় প্রবিষ্ট হইতে সমর্থ। ইহার মূল সৃষ্টির আদিতে ভগবৎ কৃত বরণ।

অতএব বুঝিতে পারা যায় যে জীবকে তটস্থ শক্তি প্রসূত অণু বলিয়া গ্রহণ করিলেও যে সকল জীবে ভগবৎ অন্তরঙ্গভূতা হ্লাদিনী শক্তির প্রতিবিম্ব অথবা আভাস নিহিত তাঁহারাই তৎকালে বিপর্য্যয় বশতঃ মায়াগর্ভে প্রবিষ্ট হইলেও কালান্তরে মায়া হইতে শুধু তটস্থ স্বরূপে বিশ্রান্ত থাকার পরিবর্তে হ্লাদিনী শক্তির রঙ্গমহলে প্রেমিক-ভক্তরূপে ভগবানের সহিত আনন্দের খেলা খেলিবার জন্য প্রবেশ লাভ করিতে সমর্থ হন।

জীবতত্ত্ব ও ভগবত্তত্ত্বের আনুসঙ্গিক সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে মাধ্বমতে কোন কোন অংশে বৈশিষ্ট্য আছে। তাঁহাদের সিদ্ধান্ত অনুসারে জীব সকলের সাম্যভাব মুক্ত অবস্থাতেও স্বীকৃত হয় না। জীবের প্রকৃতি-গত বৈলক্ষণ্য সর্বাবস্থায়ই বিদ্যমান থাকে। যদিও জীবমাত্রই ভগবানের আশ্রিত এবং অণুচৈতন্য স্বরূপ তথাপি তাহাদের সকলের প্রকৃতি এক প্রকার নহে। সাত্ত্বিক রাজসিক এবং তামসিক ভেদে বদ্ধ জীবের শ্রেণীবিভাগ রহিয়াছে। বদ্ধ জীব এবং মুক্ত জীবের মধ্যেও পার্থক্য স্পষ্ট প্রতীত হয়। ব্রহ্মাদি দেবগণ ঋষিগণ পিতৃগণ গন্ধর্ব প্রভৃতি সাত্ত্বিক জীব। শ্রেষ্ঠ মনুষ্যগণও সাত্ত্বিক জীবের অন্তর্গত। কিন্তু

নিকৃষ্ট প্রকৃতির মনুষ্য রাজসিক জীবের অন্তর্গত, কারণ তাহারা কাম্য কর্মে রত থাকে। তা'ছাড়া কলি কালনেমি প্রভৃতি এবং রাক্ষস ও দানবগণ তামসিক জীব। সাত্ত্বিক জীব মুক্তির যোগ্য—রাজসিক জীব নিত্য সংসারী এবং তামসিক জীব নরকাদি অধোগতির যোগ্য।

ভগবানের উদরে মুক্ত এবং বদ্ধ সকল প্রকার জীবই বিদ্যমান আছে। প্রত্যেকটি জীবেরই আপন স্বরূপ অনুযায়ী স্বরূপ দেহ আছে। এই স্বরূপ দেহ সকলের একপ্রকার নহে। সাত্ত্বিক জীবের স্বরূপ দেহ জ্ঞানানন্দময়। কিন্তু রাজসিক জীবের স্বরূপ দেহে জ্ঞান ও অজ্ঞান মিশ্রভাবে রহিয়াছে, তামসিক জীবের স্বরূপ দেহে দুঃখ ও অজ্ঞান ভিন্ন অন্য কিছু লক্ষিত হয় না। স্বরূপ দেহের ন্যায় স্বরূপানুগত অর্থাৎ স্বাভাবিক ধর্মও সকলের পৃথক পৃথক।

জীবের স্বরূপ দেহ লিঙ্গ ও স্থূল দেহ দ্বারা ক্রমশঃ আবৃত, অর্থাৎ স্বরূপ দেহের প্রথমাবরণ অনাদি লিঙ্গ দেহ। লিঙ্গ দেহের আবরণরূপে একটি দেহ আছে, তাহাকে কর্ম দেহ বলে। ইহা ভৌতিক। এই ভৌতিক দেহ প্রতিকল্পে পৃথক্ পৃথক্ হয়।

পূর্ব্বোক্ত বিবরণ হইতে বুঝিতে পারা যায় যে জীবের স্বরূপ দেহই তাহার আত্মা। ইহা চিদানন্দময়, তাহাতে সন্দেহ নাই। অতএব আত্মা সাকার ইহাই শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের সিদ্ধান্ত। কিন্তু জীবের এই চিদানন্দময় নিত্য আকার ভগবানেরই নিত্য আকারের প্রতিবিম্ব স্বরূপ। অর্থাৎ ভগবান বিষ্ণু অনন্ত আকারময় সাকার বিগ্রহ। তাঁহার বিগ্রহে না আছে এমন কোন আকার নাই। এই সর্ব্ব আকারই সচ্চিদানন্দ স্বরূপ। পশু, পক্ষী, কীট পতঙ্গ মনুষ্য, গন্ধর্ব্ব, দেবতা প্রভৃতি সব আকারই মূলতঃ ভগবদাকার। দেবতার আকার বা দৈত্যের আকার যাহাই হউক না কেন সবই ভগবানের আকার এবং সচ্চিদানন্দময়। যাহাকে জীবের স্বরূপদেহ বলা যায় তাহা ঐ নিত্যসিদ্ধ ভগবদাকারের নিরূপাধি প্রতিবিম্ব স্বরূপ। জীব মাত্রই নিজের শুদ্ধ স্বরূপে ভগবানের বিভিন্নাংশরূপে চিন্ময়রাজ্যে নিত্য বর্ত্তমান। স্বরূপ দেহের আকার স্থূল দেহের আকারের অনুরূপ বলিয়া কেহ যেন

ভ্রমে পতিত না হন। কারণ স্বরূপদেহে যাহা নররূপ স্থূলদেহে তাহা পশুপক্ষীও হইতে পারে এবং মনুষ্যের স্বরূপদেহও মনুষ্যাকার না হইয়া পশুপক্ষী রূপ হইতে পারে। স্বরূপদেহ নিত্য ও কর্মজন্য নহে। কিন্তু ভৌতিক দেহ কর্মজন্য। স্বরূপদেহ সাকার না হইলে লিঙ্গ ও ভৌতিক দেহে আকার হইতে পারিত না।

অতএব জীব মাত্রই যে ভগবানকে প্রাপ্ত হইবে বা হইতে পারে এমন নহে। সাত্বিক জীবের মধ্যে উচ্চতম অধিকার বিশিষ্ট জীব ভিন্ন অন্যের পক্ষে ভগবৎ প্রাপ্তি অসম্ভব।

ভগবানের স্বরূপাংশ বিভিন্নাংশ নামে দুই প্রকার অংশ স্বীকৃত হয়। তন্মধ্যে পূর্ব্ববর্ণিত জীবের স্বরূপদেহ তাঁহার বিভিন্নাংশের অন্তর্গত। স্বরূপাংশ বলিতে অবতার আদি বুঝিতে হইবে। ইহাদের দেহ শ্রীভগবানের স্বরূপ হইতে অভিন্ন।

মাধ্বমতে মুক্তগণেরও আনন্দানুভূতির তারতম্য আছে। তদ্রূপ দেবতাগণেরও তারতম্য আছে। অসুরগণের দুঃখানুভূতির তারতম্য আছে। মুক্তাবস্থায় ব্রহ্মার আনন্দ অপরের আনন্দ অপেক্ষা সর্ব্বাংশে অধিক। একমাত্র ব্রহ্মা ভিন্ন আর কাহারও সাযুজ্য মুক্তি হয় না। সাযুজ্য মুক্তির সময় জীব নিজের বিম্বরূপ ভগবৎ স্বরূপে প্রবিষ্ট হয়। বাস্তবিক পক্ষে ইহা জীবের স্বেচ্ছাক্রমে আত্মবিম্বে প্রবেশ মাত্র, অপর কিছু নহে। ইচ্ছানুসারে স্ববিম্ব হইতে পৃথকরূপে অবস্থান সম্ভবপর হয়। অন্যান্য মুক্ত পুরুষদের মধ্যে অধিকার অনুসারে কেহ সামীপ্য কেহ বা সালোক্য লাভ করিয়া থাকে। তবে মনে রাখিতে হইবে মুক্ত মাত্রেরই সারূপ্য লাভ অবশ্যম্ভাবী, কারণ প্রতি মুক্তপুরুষই আপন আপন অধিকার অনুসারে যে অবস্থাই লাভ করুন না কেন ভগবৎ স্বরূপভূত স্বীয় বিম্বের অনুরূপ আকার প্রাপ্ত হন। সকলেই যে চতুর্ভুজ বিষ্ণু অথবা দ্বিভুজ কৃষ্ণের আকার ধারণ করিবেন স্বারূপ্য শব্দের ইহা অর্থ নহে। আর এক কথা—যে সকল জীব মুক্ত হইয়া যান তাঁহাদের স্থিতি সম্বন্ধেও পরস্পর বৈচিত্র্য দৃষ্ট হয়, কারণ সৃষ্টি কালে এই সকল মুক্তপুরুষ আপন ইচ্ছানুসারে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে বিচরণ

করেন। সকলেই বিভিন্ন প্রকার অপ্রাকৃত দিব্য জ্ঞান ও আনন্দ অনুভব করেন এবং ভগবৎ চিন্তা ও ধ্যানেতে তৎপর থাকেন। কিন্তু সকলেই যে বৈকুণ্ঠেই অবস্থান করিবেন এমন কোন কথা নাই। স্বর্গ হইতে আরম্ভ করিয়া সত্যলোক পর্য্যন্ত যে কোন লোকে এবং অনন্তাসন, শ্বেতদ্বীপ, বৈকুণ্ঠ প্রভৃতি যে কোন স্থানে তাঁহারা বিহার করিতে পারেন। তবে ইহা সৃষ্টি অবস্থার কথা। যখন সৃষ্টির উপসংহার হয় তখন এই সকল লোক অবগুণ্ঠিত হয় বলিয়া সকলেই বৈকুণ্ঠে অবস্থান করেন।

যাঁহারা নিত্য সংসারী তাঁহারা ত্রিলোকে সঞ্চরণ করিয়া থাকেন। তাঁহাদিগকে জন্ম বা মৃত্যু ভোগ করিতে হয় না। যাহারা তামসিক তাহারা তাহাদের তামস স্বরূপের অভিব্যক্তিতে অন্ধতম অবস্থায় সুষুপ্তবৎ থাকে। ঐ অবস্থা হইতে তাহাদের পুনরাবৃত্তি হয় না। কল্পাবসানে এই রূপেই হইয়া থাকে। এক কল্পের জীব অন্য কল্পে প্রবেশ করিতে পারে না।

ভগবদ্দর্শন কি প্রকারে হয় সে সম্বন্ধে ভক্তগণ আপন আপন সাম্প্রদায়িক দৃষ্টি অনুসারে কোন কোন অংশে পৃথক্ মত পোষণ করিলেও ভক্তির কারণ সম্বন্ধে তাঁহাদের মধ্যে মতভেদ নাই। মাধ্বাচার্য্য বলেন ভক্তি বিভিন্ন প্রকার এবং বিভিন্ন ভক্তির ফলও বিভিন্ন প্রকার। সর্ব্বপ্রথম ভক্তিমার্গে প্রবৃত্ত হইবার মূলে যে শ্রদ্ধারূপা বৃত্তি হৃদয়ে সঞ্জাত হয় তাহাই ভক্তির প্রাথমিক রূপ। ইহা দ্বারা শাস্ত্র এবং মহাজনের মুখ হইতে ভগবানের মাহাত্ম্য শ্রবণ পূর্ব্বক তদ্বিষয়ক জ্ঞান লাভ হয়। এই মাহাত্ম্য জ্ঞান হইতে পুনর্ব্বার দ্বিতীয় ভক্তির উদয় হয়—ইহার নাম সাধনভক্তি। এই ভক্তির ক্রমিক উৎকর্ষ সিদ্ধ হইলে ভগবদ্ বিষয়ক অপরোক্ষ জ্ঞান লাভ হয়। এই অপরোক্ষ জ্ঞানের পর তৃতীয় ভক্তির উদয় হয়। ইহার নাম পরমা-ভক্তি। পরমাভক্তি উদিত না হওয়া পর্য্যন্ত মুক্তিলাভ সম্ভবপর হয় না। ভগবানের শ্রীচরণ লাভই মুক্তির স্বরূপ। মুক্তি হওয়ার পর চতুর্থ ভক্তির উদয় হয় ইহার নাম স্বরূপভক্তি। ইহাই জীবমাত্রের অন্তিম লক্ষ্য, ইহা স্বয়ং সাধ্যরূপা এবং পরম আনন্দস্বরূপা।

এই যে মুক্তির কথা বলা হইল ইহার অভিব্যক্তি ততক্ষণ পর্য্যন্ত হইতে পারে না যতক্ষণ লিঙ্গদেহের বিনাশ না হয়। পূর্বেই বলা হইয়াছে স্বরূপ দেহের আবরণ ভৌতিক দেহ। লিঙ্গ দেহরূপ আবরণ নিবৃত্ত না হইলে স্বরূপ দেহের আবির্ভাব কি প্রকারে হইবে? স্বরূপ আবির্ভাবেরই নামান্তর মুক্তি। জীব স্বরূপদেহে প্রতিষ্ঠিত হইয়া ভগবানকে ভজনা করিয়া থাকে। ইহা অহেতুক ও স্বভাবসিদ্ধ— ইহারই নাম স্বরূপভক্তি যাহাকে পরম পুরুষার্থ বলা যাইতে পারে। লিঙ্গদেহরূপ আবরণের নিবৃত্তির উপায় ভক্তিসাধনা, তাহা বলাই বাহুল্য। মুক্তি যে জীবের স্বীয় স্বরূপের অভিব্যক্তি তাহা সর্ব্ববাদিসিদ্ধ। কিন্তু এই স্বরূপে দুইপ্রকার আবরণ রহিয়াছে, যাহার প্রভাবে ইহা অভিব্যক্ত হইতে পারিতেছে না। এই দুইটি আবরণের মধ্যে একটি জীবাবরণ ও অপরটি পরাবরণ। যে অবিদ্যা জীবে আশ্রিত হইয়া রহিয়াছে এবং জীবের স্বরূপকে ঢাকিয়া রাখিয়াছে তাহাই জীবাবরণ। আর যে আবরণ পরতত্ত্ব বা ঈশ্বরকে আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে তাহা অর্থাৎ ঈশ্বরের মায়াশক্তি পরাবরণ। ভগবানের প্রসন্নতা বশতঃ পূর্ব বর্ণিত ভক্তি সাধানার প্রভাবে এই উভয় প্রকার আবরণ কাটিয়া গেলে লিঙ্গ দেহের নিবৃত্তি হয় ও স্বরূপদেহের আবির্ভাব হইয়া থাকে। ভক্তি সাধনায় ভগবানের প্রসন্নতা হয়। তখন তিনি জীবাবরণকে বিনাশ করেন এবং পরাবরণকে অপসারিত করেন। তখন জীব নিজের হৃদয়স্থিত পরমপুরুষকে চিন্ময় চক্ষুদ্বারা দর্শন করিতে সমর্থ হয়। মাধ্বমতে জীবস্বরূপের তারতম্য আছে বলিয়া স্বরূপনিষ্ঠ জ্ঞান ও আনন্দের ও তারতম্য ঘটিয়া থাকে।

উপরিলিখিত বিবরণ হইতে নিম্নলিখিত তত্ত্বগুলি স্পষ্ট বোধগম্য হয়। সাত্ত্বিক জীবের নিত্যস্বরূপ ভক্তিময় কারণ যাহা ফলরূপা ভক্তি বা চরম ভক্তি তাহা মুক্ত পুরুষে নিত্য সিদ্ধরূপেই বর্ত্তমান থাকে। বস্তুতঃ ইহা বিম্বের প্রতি প্রতিবিম্বের ভক্তি। ইহা নিত্য। লিঙ্গ নিবৃত্তি না হওয়া পর্য্যন্ত এই নিত্য পরমানন্দময়ী ভক্তিদশা আস্বাদন যোগ্য হয় না। কারণ লিঙ্গ থাকা পর্য্যন্ত স্বরূপদেহ আচ্ছন্ন থাকে।

তাই স্বরূপ দেহের আনন্দও আচ্ছন্ন থাকে। অবিদ্যা ও মায়ারূপ যে দুইটি আবরণের কথা বলা হইয়াছে তাহাদের নিবৃত্তি না হওয়া পর্য্যন্ত লিঙ্গ নিবৃত্তি হয় না। অবিদ্যা জীবকে আচ্ছন্ন করে ও আত্মবিস্মৃত করিয়া রাখে ইহাই হৃদয়গ্রন্থি। তাহা মোচন হইলে জীব নিজেকে নিজে চিনিতে পারে ইহা সত্য, কিন্তু তখনও মায়ারূপ পরমাবরণ বিদ্যমান থাকে। কারণ অবিদ্যা না থাকিলেই যে মায়া থাকিবে না এমন কোন কথা নাই। মায়া ঈশ্বরের শক্তি, ইহা প্রকৃতির অংশভূত এবং যবনিকা স্বরূপ। তিনি মায়াদ্বারা স্বেচ্ছাক্রমে নিজেকে নিজে আচ্ছন্ন করিয়া রাখেন। জীবের অবিদ্যাচ্ছন্ন নিজের আবরণ সরিয়া গেলেও অর্থাৎ জীব অবিদ্যা হইতে মুক্ত হইলেও ততক্ষণ পর্য্যন্ত পরমাবরণ অপগত হয় না যতক্ষণ ভগবান কৃপা পূর্বক উহার অপসারণ না করেন। অবিদ্যা ধ্বংস ও মায়ার অপসারণ সিদ্ধ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই স্বরূপদেহ হইতে লিঙ্গের আচ্ছাদন সরিয়া যায়। যে ভক্তি-জনিত ভগবৎ প্রসাদের প্রভাবে এই আবরণ নিবৃত্তি নিষ্পন্ন হয় তাহার নাম পরমা ভক্তি। ভগবৎ প্রসাদ সামান্য ও বিশেষ এই দুই প্রকার। সামান্য প্রসাদ হইতে হৃদয়গ্রন্থির ভেদ হয় যাহার ফলে জীব আত্মজ্ঞান লাভ করে। কিন্তু তখনও ভগবৎ দর্শন হয় না। বিশেষ প্রসাদের ফলে ভগবানের নিজের স্বরূপাবরণ নিবৃত্তি হয়। ইহাই পরমাভক্তি। ইহা লিঙ্গ দেহে থাকিতেই হইয়া থাকে। কিন্তু ইহারই ফলে লিঙ্গদেহও নিবৃত্ত হয়। বস্তুতঃ এই পরমা ভক্তি মুক্তির অব্যবহিত হেতু। পরমা ভক্তির মূল ভগবৎ সাক্ষাৎকার। ভগবৎ সাক্ষাৎকারের সঙ্গে সঙ্গেই লিঙ্গদেহের নিবৃত্তি হয় না—ইহা বলাই বাহুল্য। পূর্বেই বলা হইয়াছে ভগবদ্দর্শন হইলেও লিঙ্গদেহ থাকে এবং ঐ দেহে অবস্থান করিয়া পরমাভক্তির অনুশীলন হয়, ক্রমশঃ দুই প্রকার আবরণ এবং লিঙ্গ নিবৃত্ত হইয়া যায়। ভগবদ্দর্শনের কারণভূত ভক্তি সাধন ভক্তি। ইহা ভৌতিক দেহেই উপলব্ধ হইয়া থাকে। শ্রদ্ধা হইতে আরম্ভ করিয়া সাধন ভক্তির অনুভব পর্য্যন্ত ভৌতিক দেহের অভিমান থাকে। পরমা ভক্তির অনুভব ভৌতিক দেহাভিমান থাকিতে হয়

না। ইহা শুধু লিঙ্গ দেহে হইয়া থাকে। স্বরূপ ভক্তির অনুভব ভৌতিক দেহেও হয় না। লিঙ্গদেহেও হয় না—মুক্তপুরুষের স্বরূপদেহে হইয়া থাকে।

অতএব নিত্যলীলাদি ভক্তিবিলাসের অনুভূতি সকল মুক্তাবস্থার পর স্বরূপ দেহে হইয়া থাকে ইহাই সিদ্ধান্ত।

অপরোক্ষ জ্ঞান উদিত না হওয়া পর্য্যন্ত পরমাভক্তির আবির্ভাব হয় না একথা পূর্বে বলা হইয়াছে। অপরোক্ষ জ্ঞানের মূলে সাধন-ভক্তি ইহাও বলা হইয়াছে। বস্তুতঃ এই সাধন ভক্তিই শ্রবণ মনন ও নিদিধ্যাসনরূপ পরোক্ষ জ্ঞান। অপরোক্ষ জ্ঞানের করণ মন। কিন্তু যতদিন মন মায়ারূপ যবনিকা দ্বারা আচ্ছন্ন থাকে ততদিন ইহা ঠিক ঠিক কার্য্য করিতে পারে না। এই যবনিকা প্রতিবন্ধক স্বরূপ। ইহা দ্বারা মন নিরুদ্ধ থাকে বলিয়া মন দর্শন করিতে সমর্থ হয় না। কিন্তু যখন শ্রবণাদি দ্বারা এই প্রতিবন্ধক দূর হইয়া যায় তখন মন ভগবদ্দর্শনের প্রধান অঙ্গরূপে কার্য্য করিয়া থাকে। শ্রবণ বলিতে কি বুঝায়?—উপনিষদের যে সকল বাক্যে ভগবানের মহিমা কীর্ত্তিত হইয়াছে ঐ সকল বাক্যের অর্থ গুরু মুখ হইতে শ্রবণ করিতে হয়। ইহার জন্য উপক্রমাদি লিঙ্গের আবশ্যকতা আছে। বেদান্ত দর্শনে ইহার প্রক্রিয়া প্রদর্শিত হইয়াছে। মনন বলিতে বুঝায়—প্রবল যুক্তি দ্বারা পুনঃ পুনঃ পূর্বোক্ত অর্থের স্বয়ং অথবা শাস্ত্র অভ্যাসের দ্বারা অথবা অন্য কোন উপায়ে ক্ষণে ক্ষণে চিন্তন করা। নিদিধ্যাসন শব্দের অর্থ এই—যে সকল ভগবদ্‌গুণ শ্রবণ ও মননের দ্বারা নির্নীত হইয়াছে তাহাদের নিরন্তর ধ্যানই নিদিধ্যাসন। ইহা তৈলধারাবৎ অবিচ্ছিন্ন মনোবৃত্তিদ্বারা সম্পন্ন করিতে হয়। যে সকল বিষয় ভগবৎ স্বরূপ হইতে ভিন্ন তাহাদিগকে অসার মনে করিয়া তাহা হইতে নিবৃত্তি আবশ্যক। তা ছাড়া একমাত্র ভগবৎ তত্ত্বে স্নেহ ও প্রেমের সহিত অনুবৃত্তি আবশ্যক। পুনঃ পুনঃ শ্রবণ করিতে পারিলে মনন শক্তি আবির্ভূত হয় এবং মনন করিতে করিতেই ধ্যানশক্তি জাগে, ধ্যানের পুনঃ পুনঃ অভ্যাসের ফলই অপরোক্ষ জ্ঞান।

শ্রবণ মনন ও নিদিধ্যাসন এই তিনটি পরোক্ষ জ্ঞান স্বরূপ। ইহারা সকলেই মনের সহকারী, মন অঙ্গী, এই সকল তাহার অঙ্গ স্বরূপ। এই সকল সহকারী দ্বারা ক্রমশঃ অন্য বিষয় হইতে মন বিরক্ত হইয়া ভগবানে ভক্তি করিতে সমর্থ হয়। নিরন্তর ভগবদ্ধ্যানের ফলে বিশিষ্ট প্রেমের আবির্ভব হয়—ভগবান প্রসন্ন হন। তখন তিনি নিরোধ বা প্রতিবন্ধক অপসারণ করিয়া নিজকে প্রদর্শন করেন। এই অপসারণ কিঞ্চিন্মাত্র হইলে তাহার ফল হয় জীবন্মুক্তি এবং সম্পূর্ণরূপে হইলে তাহার ফল হয় পরামুক্তি।

শ্রীসম্প্রদায়ের আচার্য্যগণ ভক্তিতত্ত্বের যতটা বিশ্লেষণ করিয়াছেন তাহা হইতে বুঝা যায়, তাঁহাদের মতেও ভক্তির চরম অবস্থাতেই অর্থাৎ ঐকান্তিক ও আত্যন্তিক অবস্থাতেই ভগবদ্দর্শন হইয়া থাকে। এই ভক্তিকে পরমা ভক্তি বলিয়া বর্ণনা করা হয়। তাঁহারা বলেন, একমাত্র ভক্তি দ্বারাই ভগবানের উপলব্ধি সম্ভবপর। কর্ম এবং জ্ঞান ভক্তির সহায়ক অঙ্গরূপে আবশ্যক হইয়া থাকে। বিশুদ্ধ ভক্তির অধিকারী অত্যন্ত দুর্লভ। এইজন্য সাধারণ অধিকারীর পক্ষে কর্ম ও জ্ঞানের সহায়তা গ্রহণ করিয়া ভক্তিমার্গে প্রবিষ্ট হওয়া সম্ভবপর। জ্ঞান ভক্তির অন্তরঙ্গ সাধন এবং কর্ম বহিরঙ্গ সাধন। নিষিদ্ধ ও কাম্য কর্ম বর্জন করিয়া নিষ্কাম ভাবে নিত্য ও নৈমিত্তিক কর্ম সম্পাদন করা অর্থাৎ নিষ্কাম কর্মের অনুষ্ঠান ইহাই কর্মযোগ। এই যোগ যথাবিধি অনুষ্ঠান করিতে পারিলে জীবের চিত্ত কলুষ হইতে মুক্ত হয়। তখন জীব অপেক্ষাকৃত সহজে জ্ঞানযোগের আশ্রয় গ্রহণ করিতে পারে। আত্মা ও পরমাত্মাতে অঙ্গাঙ্গি সম্বন্ধ। সুতরাং আত্মাকে অর্থাৎ প্রকৃতি সম্বন্ধহীন নিজ আত্মাকে পরমাত্মার অঙ্গ বা শেষরূপে চিন্তা করাই জ্ঞান যোগের উদ্দেশ্য। এই প্রকার কর্ম ও জ্ঞান উভয়ের দ্বারা অনুগৃহীত ভক্তিযোগই ভগবৎ প্রাপ্তির প্রধান সাধনা। ভক্তি বলিতে আচার্যগণ জ্ঞান বিশেষকেই লক্ষ্য করিয়া থাকেন। তাঁহারা বলেন, উপাসনা বেদন ধ্যান ও স্মৃতি মূলে একই বস্তু। পুনঃ পুনঃ ইহার অভ্যাস করিতে পারিলে ভগবদ্ বিষয়ক

স্মৃতি অবিচ্ছিন্ন এবং প্রীতিযুক্ত হইয়া প্রকাশিত হয় ঐ অবস্থার উহাকে ভক্তিনামে অভিহিত করা হয়। ভক্তির উৎকর্ষের ফলে পরাভক্তির উদয় হয়। পরাভক্তি ক্রমশঃ পরমজ্ঞানে পরিণত হইয়া তদনন্তর চরমাবস্থায় পরমা ভক্তিরূপে আবির্ভূত হইয়া থাকে। পরমা-ভক্তির পর ভগবৎ সাক্ষাৎকার নিশ্চিত।

পূর্বোক্ত বিবরণ হইতে বুঝা যায় প্রকৃত প্রস্তাবে আচার্য্যমতে কর্ম জ্ঞান ও ভক্তি ইহাই স্বাভাবিক ক্রম।

রামানুজীয় আচার্যগণও ভগবানের নিত্যলীলা স্বীকার করেন এবং পরমধামে ভগবানের সত্তা এবং নিত্য ও মুক্ত ভক্তগণের সত্তা স্বীকার করেন। তাঁহাদের মতে ভগবান্ নিত্য সাকার, তাঁহাতে অনন্ত কল্যাণগুণ সকল বিরাজ করিতেছে। সৌন্দর্য্য ঔদার্য্য মাধুর্য্য লাবণ্য সৌশীল্য করুণা বাৎসল্য প্রভৃতি অনন্ত মঙ্গলময় গুণরাজি ভগবানে অর্থাৎ ভগবৎ বিগ্রহে নিত্য বিরাজমান। জীব মুক্তাবস্থায় বৈকুণ্ঠধামে যাইয়া চিদানন্দময় পার্ষদদেহ প্রাপ্ত হয় এবং ভগবানের সহিত সাক্ষাৎভাবে লীলায় যোগদান করিয়া থাকে। জীব স্বরূপতঃ অণু হইলেও মুক্তাবস্থায় সে স্থূল সূক্ষ্ম কারণ এই তিন দেহ হইতে অব্যাহতি পাইয়া বিশুদ্ধ সত্ত্বময় নিত্য ও নির্মল দেহ লাভ করিয়া থাকে। ঐ দেহে সর্বদা ভগবদ্ গুণ সকল ক্রীড়া করিয়া থাকে। তবে লীলার জন্য উহা কখনও কখনও কিঞ্চিৎ প্রচ্ছন্ন হয় মাত্র। চতুর্ভুজ নারায়ণ মূর্ত্তিই ভগবানের স্বরূপ, দ্বিভুজ শ্রীকৃষ্ণ মূর্ত্তি উহার অবতার মাত্র। বলা বাহুল্য, অবতার ও অবতারী স্বরূপতঃ অভিন্ন। ভগবানের ব্যূহ, অর্চা প্রভৃতি ভেদের বিবরণ প্রসঙ্গতঃ বলা হইয়াছে।

ভক্তি এবং প্রপত্তি এই দুইটি সৎগুণের জন্য ভগবান জীবের প্রতি প্রসন্ন হইয়া তাহাকে মোক্ষফল দান করিয়া থাকেন। যথার্থ মোক্ষ ভগবচ্চরণের আশ্রয় প্রাপ্তি বা কৈঙ্কর্য্য লাভ। ইহা ভক্তি ভিন্ন হইতে পারে না। শুষ্ক জ্ঞান অর্থাৎ প্রকৃতি বিমুক্ত আত্মস্বরূপ জ্ঞান মাত্র হইতে যে মুক্তি লাভ হয় তাহা কৈবল্যের নামান্তর। ঐ প্রকার মুক্তিতে ভগবদ্ আনন্দের আস্বাদন পাওয়া যায় না। যথার্থ

ভক্তি বা শুদ্ধা ভক্তি সাত প্রকার সাধনার অনুশীলন হইতে উৎপন্ন হয়। এই সাতটি সাধনার নাম—বিবেক, বিমোক, অভ্যাস, ক্রিয়া কল্যাণ, অনবসাদ ও অনুদ্ধর্ষ। ইহাদের মধ্যে বিবেক শব্দে জাতি আশ্রয় ও নির্মিত্ত এই ত্রিবিধ দোষ রহিত অন্নদ্বারা দেহের পুষ্টি বা শুদ্ধিকে লক্ষ্য করা হয়। ভোগ্য অন্নের তিন প্রকার দোষ আচার্য্যগণ উল্লেখ করিয়া থাকেন—তন্মধ্যে কোন কোন ভোগ্য পদার্থ জাতি দোষে দুষ্ট যেমন—পেঁয়াজ, লসুন, প্রভৃতি। আশ্রয় দোষের দৃষ্টান্ত উচ্ছিষ্ট কিংবা অপর জাতি স্পৃষ্ট অন্নগ্রহণ। ইহা হইতে বুঝা যায়, যে অন্ন এই ত্রিবিধ দোষ দুষ্ট নহে তাহাই দেহ শুদ্ধি বা বিবেকের সাধন। 'বিমোক' শব্দে কামশূন্যতা বুঝায়। শুভ আশ্রয়ের পুনঃ পুনঃ অনুশীলনকে 'অভ্যাস' বলে। যথাশক্তি পঞ্চমহাযজ্ঞ প্রভৃতির অনুষ্ঠানকে 'ক্রিয়া' বলে। সত্য, সরলতা, অহিংসা, দয়া, দান প্রভৃতি সদগুণকে 'কল্যাণ' বলে। দৈন্যের অভাবই অনবসাদ। অর্থাৎ কখনই অবসন্ন বা উৎসাহহীন হইতে নাই, ইহাই উদ্দেশ্য। সন্তোষের অর্থাৎ তুষ্টির অভাবকে অনুদ্ধর্ষ বলে। এই প্রকার সাতটি সাধনার দ্বারা ভক্তির যথাবিধি পরিশীলন হইলে উহা যথা সময়ে দর্শন সমানাকার অর্থাৎ অপরোক্ষ রূপ ধারণ করে। এই ভক্তির চরম অবধি অন্তিম প্রত্যয়, যাহা বর্তমান শরীরের অবসান কালেই হউক, অথবা প্রারব্ধ অসমাপ্ত থাকিলে শরীরান্তরের অবসান কালেই হউক, অবশ্য আবির্ভূত হয়। প্রপত্তি অথবা শরণাগতি ভক্তিরই অঙ্গ স্বরূপ। আচার্য্যমতে সাধন ভক্তি ও ফল ভক্তি ভেদে দুই প্রকার ভক্তির কথা বর্ণিত দেখা যায়। সাধন জন্য ভক্তি সাধন ভক্তি। কিন্তু যে ভক্তি সাক্ষাৎ ভগবানের কৃপা জন্য তাহাই ফল ভক্তি। পরাঙ্কুশ প্রভৃতি ভক্তগণের ভক্তি ফলভক্তির দৃষ্টান্তরূপে গৃহীত হইয়া থাকে।

ভগবৎ প্রসন্নতার দুইটি উপায়—ভক্তি ও প্রপত্তি, একথা পূর্বে বলা হইয়াছে। তন্মধ্যে ভক্তি সম্বন্ধে কিছু বলা হইয়াছে। প্রপত্তি সম্বন্ধে সংক্ষেপে দুই একটি কথা বলা আবশ্যক মনে হইতেছে।

প্রপত্তি শব্দের অর্থ শরণাগতি ; অর্থাৎ ভগবৎ প্রাপ্তির যত প্রকার

উপায় শাস্ত্রে বর্ণিত হইয়াছে তাহার কোনটিই লাভ করিতে না পারিয়া জীব যখন অনন্যগতি হয় এবং তাহাকে পাইবার পক্ষে নিজের পৌরুষ ও বলকে অপর্য্যাপ্ত বলিয়া মনে করে তখন তাঁহাকে লাভ করিবার জন্য তাঁহাকেই একমাত্র উপায় রূপে গ্রহণ করে। ইহারই নাম প্রপত্তি। ইহা মহাবিশ্বাসের সহিত অবলম্বন করিতে হয়। যে বিশ্বাসে নিম্নলিখিত তিন প্রকার দোষ বিদ্যমান নাই তাহাই মহা-বিশ্বাস। এই সকল দোষের জন্য বিশ্বাসের বল কম হইয়া যায়। দোষ তিনটি এই—(১) উদ্দেশ্যকে দুর্লভ বলিয়া মনে করা। এই অবস্থায় চিত্তে নিরুৎসাহ ভাব আসে, কারণ হৃদয়ে ধারণা হয় যে নিজের মধ্যে সাধন সামর্থ কিছুই নাই। অতএব ভগবৎ প্রাপ্তি কি প্রকারে সম্ভবপর হইবে ? (২) উপায় সকলের মধ্যে কল্পভাব অর্থাৎ কর্ম্ম এবং জ্ঞান সাধনরূপ ভক্তিকে তুচ্ছতা বোধে পরিহার করিয়া কেবল ভগবানের শরণ গ্রহণ করিলেই ভগবৎপ্রাপ্তি হইতে পারে এইরূপ মনে করা। (৩) সর্বদা নিজ দোষের অনুসন্ধান। অর্থাৎ নিরন্তর নিজের দোষ স্মরণ করিয়া আশা-ভরসা ত্যাগ করা। 'আমার মতন' পাপী কি প্রকারে প্রভুকে লাভ করিতে পারে—এইরূপ মনে করা দোষ স্বরূপ। যখন ভগবানের উপর পুর্ণ বিশ্বাস হয় — যাহাকে মহাবিশ্বাস বলে তখন উহাতে এই তিনটি দোষ থাকে না।

পাঞ্চরাত্র সম্প্রদায়ের কোন কোন গ্রন্থে প্রপত্তির যে ছয়টি অঙ্গের কথা উল্লিখিত হইয়াছে তাহাদের নাম (১) আনুকুল্যের সংকল্প অর্থাৎ ভগবান সর্বব্যাপক, তিনি চেতন এবং অচেতন যাবতীয় পদার্থে ওতপ্রোত ভাবে অনুস্যূত রহিয়াছেন, এই তত্ত্বটি বিশেষরূপে বোধগম্য করিয়া জীব মাত্রের প্রতি অনুকুল ভাব রক্ষা করাই শরণাগতির প্রথম অঙ্গ।

(২) প্রাতিকুল্যের ত্যাগ অর্থাৎ কোন জীবের প্রতি কায় মন এবং বাক্যে হিংসাভাব না রাখা। অর্থাৎ অহিংসা প্রতিষ্ঠা ইহাই দ্বিতীয় অঙ্গ।

(৩) তিনি আমাকে নিশ্চয়ই রক্ষা করিবেন এই বিশ্বাস। ভগবান

সর্বশক্তিমান এবং দয়াময়। জীব তাহার সেবক ও আশ্রিত। ইহাই অনাদি সিদ্ধ সম্বন্ধ। সুতরাং তিনি আশ্রিত বাৎসল্য নিবন্ধন আশ্রিত-জনকে অবশ্যই রক্ষা করিবেন। এরূপ দৃঢ়বিশ্বাস থাকিলে যাবতীয় দুষ্কৃতি হইতে জীব অব্যাহতি লাভ করিতে পারে। এই বিশ্বাসই তৃতীয় অঙ্গ।

(৪) ভগবানকে জীবের রক্ষকপদে বরণ করা। অর্থাৎ যদিও ভগবানে দয়া এবং সর্বসামর্থ রহিয়াছে এবং যদিও তিনি সকলের প্রভু তথাপি কেহ প্রার্থনা না করিলে তিনি তাহাকে রক্ষা করেন না। এই জন্য সংসার বন্ধন ত্যাগ করিয়া তাঁহাকে নিজের রক্ষকপদে বরণ করিতে হয়। অর্থাৎ নিজেকে রক্ষা করিবার জন্য নিরন্তর তাঁহাকে প্রার্থনা করিতে হয়। ইহাই চতুর্থ অঙ্গ।

(৫) আত্মনিক্ষেপ বা আত্মসমর্পণ। নিষ্কাম ভগবৎ সেবা ব্যতীত ভোগ অথবা মোক্ষরূপ কোন ফল প্রপন্ন চায় না। যে বস্তুতঃ শরণাগত সে উপায় এবং ফল উভয় বিষয়ে নিজের প্রযত্ন হইতে নিবৃত্ত হয় এবং মনে করে সবই ভগবানের অধীন। ইহারই নাম আত্মনিক্ষেপ —ইহাই মুখ্য শরণাগতি। আত্মসমর্পণকে অঙ্গ না বলিয়া অঙ্গী বলিলেও ক্ষতি হয় না।

(৬) কার্পণ্য। কার্পণ্য শব্দের অর্থ দীনতা অথবা চিত্তের গর্বহীন ভাব। যখন দেখিতে পাওয়া যায় অধিকার এবং উপায় প্রভৃতির সিদ্ধিপথে অনেক প্রতিবন্ধক এবং একটি বিষয় সিদ্ধ হইতে না হইতেই অনেক অনর্থ উপস্থিত হয় তখন এই সকল বিচার করিয়া চিত্ত স্বভাবতঃই দীনভাব প্রাপ্ত হয়।

প্রপত্তি সম্বন্ধে শ্রীবৈষ্ণবগণ সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বহু আলোচনা করিয়াছেন এবং বহু গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। বেদান্ত দেশিকাচার্য্য এবং লোকাচার্য্যের মধ্যে পরস্পর এ বিষয়ে কিঞ্চিৎ মতভেদও লক্ষিত হয়। তথাপি ইহার প্রয়োজনীয়তা সকল ভক্তগণই স্বীকার করেন—শ্রীবৈষ্ণব গণের ত কথাই নাই। প্রপত্তির এমনি মহিমা যে ইহা প্রারব্ধকেও খণ্ডন করিয়া থাকে এবং নিয়তিকেও লঙ্ঘন করিয়া স্ব সামর্থ প্রকাশ করে।

যাবতীয় লৌকিক সুখ সম্পত্তি, স্বর্গাদি অলৌকিক ঐশ্বর্য, কৈবল্য ভগবৎপ্রাপ্তি প্রভৃতি সকল ফলই প্রপন্নের পক্ষে সুলভ। ইহা প্রপত্তির অসাধারণ মাহাত্ম্যের দ্যোতক।

যে উপায়ান্তর দুষ্কর মনে করিয়া সকল প্রকার উপায় অবলম্বন হইতে নিবৃত্ত থাকে সেই বাস্তবিক পক্ষে প্রপত্তির অধিকারী। অর্থাৎ যে অন্য উপায়ে আসক্ত হয় না অথচ প্রাপ্য বস্তুকে ইচ্ছা করে সেই প্রপত্তির অধিকারী বলিয়া পরিগণিত হইবার যোগ্য। ইহা হইতে বুঝা যায় অকিঞ্চন ভিন্ন প্রপত্তির অধিকারী কেহ হইতে পারে না। ইহাতে বর্ণ বা আশ্রমগত ভেদ, জাতি বা লিঙ্গগত ভেদ, বিদ্যা, ঐশ্বর্য্য, জ্ঞান প্রভৃতি গুণগত ভেদ কিছুরই বিচার আবশ্যক হয় না। শুধু অকিঞ্চনভাব এবং উপায়ান্তর নিরপেক্ষতা থাকিলেই প্রপন্ন হওয়া যায়।

প্রপত্তি দুই প্রকার—আর্ত্ত ও দৃপ্ত। আর্ত্ত প্রপত্তিতে সকল অঙ্গের সান্নিধ্য একসঙ্গেই হইয়া থাকে। কিন্তু দৃপ্ত প্রপত্তিতে একটা নির্দ্দিষ্ট ক্রম লক্ষিত হয়। আর্ত ও দৃপ্ত প্রপত্তির পরস্পর পার্থক্য এই প্রকার: এই দেহ দ্বারা যাবতীয় প্রারব্ধ ভোগ করিয়া আর যেন দেহান্তর গ্রহণ করিতে না হয় এই বিশ্বাসে যে ভগবানের শরণাগত হয় তাহাকে দৃপ্ত প্রপন্ন বলে। কিন্তু যে জন সংসার তাপ মোটেই সহ্য করিতে পারে না, যাহার নিকট ক্ষণকালের জন্য সংসারে অবস্থানও দীর্ঘ প্রতীত হয়, যে দাবাগ্নির জ্বালাতে পতিত পশু পক্ষীর ন্যায় ছট্‌ফট্ করে ও অব্যাহতি লাভের জন্য ইতস্ততঃ ধাবমান হয় এই প্রকার লোক অবিলম্বে সর্বদুঃখ শমন ভগবৎ প্রাপ্তির জন্য যে তীব্র উৎকণ্ঠা বোধ করে তাহারই প্রপত্তির নাম আর্ত প্রপত্তি।

প্রপন্নের মুখ্যগুণ চাতকের ন্যায় দৃঢ়নিষ্ঠা। শরণ্যের মুখ্যগুণ প্রপন্নকে রক্ষা করিবার জন্য স্বর্ব্বস্ব দানের সংকল্প ইত্যাদি।

পৌরাণিক স্যহিত্য ও প্রাচীন ইতিবৃত্ত অনুসন্ধান করিলে সর্ব্ব-শ্রেণীর জীবের মধ্যেই প্রপন্নের দৃষ্টান্ত দেখিতে পাওয়া যায়। দেবগণের মধ্যে ব্রহ্মা রুদ্র প্রভৃতি, নরগণের মধ্যে যুধিষ্ঠিরাদি এবং

দ্রৌপদী ও রাম লক্ষ্মণ প্রভৃতি, জীবের মধ্যে গজেন্দ্র কালিয়ানাগ প্রভৃতি, রাক্ষসগণের মধ্যে বিভীষণ প্রপন্নের উদাহরণ। ইন্দ্রপুত্র জয়ন্ত ও রামানুজ আদি সম্প্রদায় প্রবর্তক ভক্তগণ সকলেই প্রপত্তির মহিমা ঘোষণা করিয়া গিয়াছেন।

প্রপত্তির অধিকারিগণ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। তন্মধ্যে কেহ কেহ উপায়নিষ্ঠ, যেমন সীতা ও দ্রৌপদী এবং কেহ কেহ উপেয়নিষ্ঠ, যেমন লক্ষ্মণ, জটায়ু, চিন্তাশীল গোপীগণ ইত্যাদি।

প্রপত্তি ও শরণাগতি সমানার্থক। ইহাকেই প্রাচীন ঋষিগণ ন্যাসবিদ্যা বলিয়া উল্লেখ করিতেন। বস্তুতঃ ইহাই সন্ন্যাসেরও স্বরূপ। শ্রীবৈষ্ণবীয় ভক্তগণের সাহিত্যে ইহাকে নিক্ষেপতত্ত্ব বলিয়াও বর্ণনা করা হইয়াছে। প্রপত্তির বৈশিষ্ট্য এই যে ইহা একবারই আশ্রয় করিতে হয়, অন্যান্য সাধনার ন্যায় ইহা পুনঃপুনঃ অভ্যাস করিতে হয় না। যদিও প্রপত্তি কোন সাধন্ নহে সুতরাং কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ ও ভক্তিযোগ হইতে ইহার পার্থক্য স্পষ্ট, তথাপি লৌকিক দৃষ্টিতে প্রপত্তির মধ্যেও এক হিসাবে ত্রিবিধ যোগের সমাবেশ রহিয়াছে। ভগবদাজ্ঞা পালন বা ভগবৎ কৈঙ্কর্য্য ইহাই প্রপন্নের কর্মযোগ, স্বরূপজ্ঞানে যুক্ত থাকা ইহাই প্রপন্নের জ্ঞানযোগ, যুগল-স্বরূপের সাক্ষাৎকারের পর তাঁহাদিগের প্রতি প্রীতিতে যুক্ত থাকা ইহাই প্রপন্নের ভক্তিযোগ। শিষ্টাচার বলিয়া এই ত্রিবিধ যোগই প্রপন্নগণ এক হিসাবে পালন করিয়া থাকেন। প্রারব্ধকে ভোগের দ্বারা নিঃশেষ করিয়া ভগবচ্চরণে নিত্যসেবা রূপ মহাকালের জন্য প্রতীক্ষা করা, ইহাই প্রপন্নের জ্ঞানগোচর একমাত্র উদ্দেশ্য।

প্রপত্তি নিক্ষেপ বা আত্মসমর্পণের নামান্তর, ইহা পূর্বেই বলা হইয়াছে। এই সমর্পণ ফলসমর্পণ, ভারসমর্পণ ও স্বরূপসমর্পণ ভেদে তিন প্রকার। যে সাধক ঐশ্বর্য্য ও কৈবল্যের প্রার্থী সে যথাক্রমে স্বর্গাদি উচ্চ পদলাভজনিত সুখ এবং আত্মদর্শনজনিত আনন্দ আকাঙ্ক্ষা করে। কিন্তু যে জন ভগবচ্চরণে প্রপন্ন সে এই দুই প্রকার আনন্দের কোনটিই চায় না। সে জানে সে নিজে শেষ বা অঙ্গ, ভগবান "শেষী

বা অঙ্গী। অঙ্গ অঙ্গীতে আশ্রিত এবং অঙ্গীর তৃপ্তি সাধনই অঙ্গের জীবনের সার্থকতা। তাই ভগবানের তৃপ্তি সাধনই প্রপন্ন জীবের একমাত্র লক্ষ্য—আত্মতৃপ্তি নহে। এই জন্য প্রপন্ন নিজের সুখাকাঙ্ক্ষা সর্বতোভাবে বর্জ্জন করে এবং সঙ্গে সঙ্গে কর্ত্তৃত্ব, মমত্ব এবং স্বার্থ-লিপ্সাও পরিহার করে—ইহাই ফল সমর্পণ। ভার সমর্পণের অর্থ এই—আত্মরক্ষার দায়িত্ব আমার উপর নহে, তাঁহার উপর। তিনিই সাধ্য, তিনিই সাধন। প্রপন্ন জানে যে সে নিজের চেষ্টায় নিজেকে রক্ষা করিতে পারে না। তাহার ইচ্ছার উপর তাহার রক্ষা নির্ভর করে না। এই জন্য সে আত্মরক্ষার ভার ভগবচ্চরণেই সমর্পণ করিয়া থাকে—ইহার নাম ভার সমর্পণ। স্বরূপ সমর্পণ আরও উচ্চতর ব্যাপার। শুধু অহংকার ত্যাগ করিলেই স্বরূপ সমর্পণ হয় না। প্রপন্ন যখন বুঝিতে পারে ভগবানই বস্তুতঃ আত্মার মালিক, যদিও ব্যবহার ক্ষেত্রে বলা হয় জীবের সত্তাও তো আছে, তথাপি ইহা সত্য যে ভগবানের সত্তাই জীবের সত্তা। তাঁহার সত্তা বাদ দিয়া জীবের কোন পৃথক সত্তা নাই। যাহাকে অহং বলিয়া গ্রহণ করা হয় তাহা বস্তুতঃ ভগবানই। অতএব এই অহংকেও ত্যাগ করার নাম স্বরূপ সমর্পণ।

আত্মাতে জ্ঞাতৃত্ব, কর্তৃত্ব ও ভোক্তৃত্ব এই তিনটি ধর্ম আছে, কিন্তু জীব পরমাত্মার শরীর বলিয়া জ্ঞান ক্রিয়া ও ভোগ এই তিনটি শরীরী বা পরমাত্মার জীবনেই সিদ্ধ করিয়া থাকে। বেদান্ত দেশিকাচার্য্য একটি শ্লোকে প্রপত্তির মূল রহস্যগুলি অতি সুন্দর ভাবে প্রকাশ করিয়াছেন। শ্লোকটি এই—

> "স্বামিন্ স্বশেষং স্বভারত্বেন নির্ভরম্
> স্বদত্ত স্বধিয়া স্বার্থং স্বস্মিন ন্যস্যসি মাং স্বয়ম্।"

টেঙ্কলই ও বড়্‌গলই শাখানুসারে প্রপত্তি সম্বন্ধে কোন কোন স্থলে কিছু কিছু মতভেদ দৃষ্ট হয়। লোকাচার্য্য টেঙ্কলই শাখার প্রধান প্রতিনিধি। তিনি বলেন ভক্তিযোগ ও প্রপত্তিযোগ সাধ্য উপায় পরিগণিত হইবার যোগ্য নহে। ভক্তিযোগ ব্যর্থ এবং বহু

আয়াস সাপেক্ষ। পক্ষান্তরে আকিঞ্চন্যহীন প্রপত্তিযোগ অসামর্থ্য ব্যঞ্জক। তিনি বলেন, প্রপত্তি যোগই নয়—ইহা জীবের চেষ্টার অন্তর্গত নহে, ভগবানের নির্হেতুক কটাক্ষে বিশ্বাসই প্রপত্তির স্বরূপ। টেঙ্কলই মতে জীবের কিছুই কর্তব্য নাই—আবশ্যকও হয় না। কারণ ভগবৎ কৃপা স্বতন্ত্র, ইহা জীবের চেষ্টার অপেক্ষা রাখে না ভগবৎ কৃপাই যদি মূলে না থাকে তাহা হইলে জীবগত চেষ্টার মূল্যই বা কি?

বড্‌গলইগণ বলেন যে ভগবৎকৃপা স্বতন্ত্র নহে। বড্‌গলই মধ্যে প্রধানাচার্য্য বেদান্তদেশিক। ইনি ভগবানের সহেতুক কটাক্ষে বিশ্বাস করেন। ইহাঁর মতে ভগবৎকৃপা অহেতুক নহে। জীবের কর্মকে আশ্রয় করিয়াই ভগবান্ কৃপা করিয়া থাকেন। কিন্তু কর্মাশ্রয় করা নিমিত্ত মাত্র ইহা একটি অছিলা। ইহাই বেদান্তদেশিকের ব্যাজবাদ। জীব কণামাত্রও চেষ্টা না করিলে ভগবান শুধু কৃপা দ্বারা তাহাকে উদ্ধার করিতে পারেন না। এই যে কণামাত্র জীবের কর্ম ইহা জীবকে উদ্ধার করিবার পক্ষে ভগবানের দিক হইতে একটি ব্যাজ মাত্র। এইমতে প্রপত্তি উপায় স্বরূপ।

টেঙ্কলইগণ বলেন—ভগবান্ নিজে জীবকে ধরিয়া উঠাইয়া নেন, যেমন—বিড়াল তাহার ছানাকে নিজে ধরিয়া একস্থান হইতে স্থানান্তরে লইয়া যায়। ইহাঁরা মার্জার কিশোর ন্যায়ের অনুসরণ করেন। কিন্তু বড্‌গলইগণ বলেন জীব ভগবানকে ধরিয়া থাকে তখন ভগবান তাহাকে উঠাইয়া লইয়া যান জীবকে ধরা ভগবানের কাজ নহে, তাহাকে উদ্ধার করা ভগবানের কাজ। ভগবানকে ধরা জীবেরই কর্তব্য। যে জীব তাঁহাকে আশ্রয় করে তিনি তাহাকে ফেলিয়া দেন না। বানর ছানা যেমন তাহার মাকে ধরিয়া থাকে এবং তাহার মা ছানাকে পৃষ্ঠে করিয়া এক স্থান হইতে স্থানান্তরে চলিয়া যায় ইহাও ঠিক সেইরূপ। বড্‌গলইগণ মর্কট কিশোর ন্যায়ের অনুসরণ করিয়া থাকেন। সংক্ষিপ্ত ভাবে ইহাই উভয় মার্গের পার্থক্য নির্দ্দেশ জানিতে হইবে।

প্রাচীন ভক্তি সম্প্রদায়ের মধ্যে নিম্বার্ক সম্প্রদায়ও বিশেষরূপে উল্লেখ যোগ্য। এই সম্প্রদায়ের ভক্তগণও সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণ-রূপী পরমপুরুষের উপাসক। ইহাঁদের মতে ভক্তসাধকের পক্ষে যে পাঁচটি পদার্থের নিরন্তর অনুসন্ধান আবশ্যক—তাহার মধ্যে উপাস্য-রূপী ভগবৎস্বরূপই প্রধান। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অপ্রাকৃত চিদানন্দময় বিগ্রহবিশিষ্ট। এই বিগ্রহ ব্রজধাম ও অন্যান্য নিত্য ভূমিতে ভক্তগণ কর্তৃক পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। বিগ্রহ এক হইলেও ধামভেদে উহার প্রকাশগত ভেদ লক্ষিত হয়। ব্রজে যে বিগ্রহ দ্বিভুজ ও গোপবেশ, দ্বারকাতে তাহাই চতুর্ভুজ এবং সর্ব্বজ্ঞত্ব, সর্ব্বশক্তিমত্তা, সৌহার্দ্দ, কারুণিকত্ব, ভক্তবাৎসল্য প্রভৃতি গুণের আকর। এই সকল ধাম শ্রৌত সাহিত্যে "স্বমহিমা" "সংব্যোম" প্রভৃতি নামে অভিহিত হয়। পঞ্চপদার্থের মধ্যে দ্বিতীয় পদার্থ জীব, যাহাকে ভগবানের নিত্য উপাসক বলিয়া বর্ণনা করা হয়। নিত্য বিজ্ঞান ও আনন্দই জীবের স্বরূপ। জীব স্বরূপতঃ অণু এবং নিত্য, ইহার নিত্য জ্ঞান প্রভৃতিগুণ স্বভাবসিদ্ধ। জীব ভগবানের নিত্য কিঙ্কর বা দাস এবং স্থুল ও ও সূক্ষ্ম উভয় দেহ হইতে বিলক্ষণ। পদার্থ পঞ্চকের মধ্যে তৃতীয় পদার্থ কৃপাফল নামে অভিহিত হয়। ভগবৎপ্রপত্তি লাভই কৃপার ফল। এই প্রপত্তির ছয়টি অঙ্গ আছে তাহা শ্রীবৈষ্ণবগণ যেরূপ স্বীকার করেন ইহাঁরাও তদ্রূপই করিয়া থাকেন। প্রপন্নের পক্ষে ভগবদ দাস্য ভিন্ন অন্যান্য সকল কর্মই পবিত্যজ্য। দাস্য অবলম্বন পূর্ব্বক আত্ম নিবেদনই প্রপত্তির যথার্থ স্বরূপ। চতুর্থ পদার্থ ভক্তিরস। ইহাঁরা বলেন যে শ্রবণাদি সাধনভক্তি পুনঃ পুনঃ অনুশীলন করিলে উহা ক্রমশঃ হৃদয়ে রতিরূপ ধারণ করে। এই রতি চরমাবস্থায় বিভিন্ন প্রকার রসে পরিণত হয়। ইহা উপাসকের ভাবনাগত বৈচিত্র্যবশতঃ শান্ত দাস্য প্রভৃতি ভাবের আকারে আকারিত হইয়া বিভাবাদি কারণ কলাপের প্রভাবে রসরূপে পরিণত হয়। এই রসই ভক্তিরস। শান্ত ভক্তি রসের দৃষ্টান্ত বামদেব, দাস্যের দৃষ্টান্ত রক্তক পত্রক উদ্ধব ইত্যাদি, সখ্যের দৃষ্টান্ত শ্রীদাম সুদাম অর্জ্জুন ইত্যাদি,

বাৎসল্যের দৃষ্টান্ত নন্দ যশোমতী বসুদেব দেবকী ও তদনুসারে ভাববিশিষ্ট ভক্তগণ। মাধুর্য্যের দৃষ্টান্ত রাধা রুক্মিণী প্রভৃতি।

পদার্থ পঞ্চকের অন্তর্গত পঞ্চম পদার্থ কৃষ্ণপ্রাপ্তির বিরোধী। ভক্তগণ বিরোধীবর্গের একটি নামাবলী রচনা করিয়াছেন তাহাতে দেখিতে পাওয়া যায় সাধুনিন্দা প্রভৃতি দশটি এবং সেবাপরাধ প্রভৃতি বত্রিশটি দোষ ভগবৎপ্রাপ্তির প্রতিবন্ধক বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে।

ভক্তগণ বলেন জীব অনাদিকাল হইতে ভগবদ্ বিমুখ বলিয়া স্থূল ও সূক্ষ্মদেহরূপে পরিণত অনাদি মায়া দ্বারা আছন্ন। সৎপ্রসঙ্গ এবং তজ্জন্য ভগবৎ প্রসঙ্গ বশতঃ জীব হৃদয়ে ভক্তির উদয় হয়। ভক্তির ফলে মোক্ষ, ইহা ভক্তি সিদ্ধান্তের চরম সত্য। বৈষ্ণবী মায়ার প্রভাবে জীব দেহযুক্ত হয়। এই প্রাকৃতিক দেহযুক্ত অবস্থাই জীবের সংসার। পূর্ব্বে যে ভগবদ্‌বিমুখতার কথা বলা হইল তাহা অজ্ঞানাত্মক।

সদ্যমুক্তি ও ক্রমমুক্তি ভেদে মুক্তি দুইপ্রকার। যে সকল ভক্ত শ্রবণাদি ভক্তির প্রভাবে বন্ধন হইতে মুক্ত হয় তাহারা অবিলম্বে ভগবৎ পদে প্রবেশ করে। ইহাই সদ্যোমুক্তি। পক্ষান্তরে যাহারা ভগবদর্চ্চনারূপ নিষ্কাম কর্ম্ম দ্বারা ক্রমশঃ স্বর্গাদি উর্দ্ধলোকের সুখ অনুভব করিয়া সত্যলোকে স্থিতিলাভ করে এবং অধিকার প্রাপ্ত হয় ইহারা ক্রমমুক্ত। কারণ ইহারা প্রলয়কালে সত্যলোকের অধিষ্ঠাতা ব্রহ্মার সঙ্গে মুক্তি লাভ করে। উপনিষদ সিদ্ধান্ত এইরূপই বটে। কিন্তু ভাগবতের দ্বিতীয় স্কন্ধে আছে—যাহারা কর্ম্ম দ্বারা বিশুদ্ধ হয় এবং যোগযুক্ত ভক্তি দ্বারা যাহাদের লিঙ্গ শরীর দগ্ধ হয় তাহারাও সদ্যমুক্তি লাভ করে অর্থাৎ অবিলম্বেই ভগবৎ স্বরূপে প্রবেশ করে। এবং যাহারা স্বর্গ হইতে সত্যলোক পর্য্যন্ত ক্রমশঃ অনুভব করিয়া এবং আবরণ সকল ভেদ করিয়া পরম পদে প্রবেশ করে তাঁহারা ক্রম মুক্ত। সর্ব্বত্রই ভক্তকে অর্চ্চিরাদি দেবগণ তৎ তৎ ধামে সঙ্গে লইয়া যান।

কিন্তু যে ভক্ত অত্যন্ত আতুর তাহাকে সঙ্গে করিয়া নিয়া যাইবার জন্য স্বয়ং ভগবানকেই আসিতে হয়।

ঐশ্বর্য্যানন্দ ও সেবানন্দ ভেদে মুক্ত পুরুষের ভোগ্য আনন্দ পুরুষের ভোগ্য আনন্দ দুই প্রকার। নিষ্কাম ভক্তগণ ঐশ্বর্য্যানন্দ চান না। তাঁহাদের ভক্তির ফল একমাত্র ভগবান্। সকাম ভক্তির ফল ভগবৎ প্রদত্ত ঐশ্বর্য্যানন্দ।

শ্রীকৃষ্ণতত্ত্বের আলোচনা প্রসঙ্গে ভক্তি ও ভগবৎ স্বরূপের কিঞ্চিদ আলোচনা—সাম্প্রদায়িক বৈষ্ণবদিকের পক্ষ হইতে করা হইল। কিন্তু ভক্তি তত্ত্বের রহস্য বৈষ্ণব সহজিয়াগণ যতটা বিশ্লেষণ করিয়াছিলেন ঠিক ততটা অন্যত্র দেখিতে পাওয়া যায় না। বৌদ্ধ বজ্রযান এবং সহজযান কি প্রকারে পরবর্ত্তী যুগে বৈষ্ণব সহজ সিদ্ধান্ত রূপে আবির্ভূত হইল তাহার বিবরণ ঐতিহাসিক আলোচনার বিষয়। এখানে তাহার কোনো প্রয়োজন নাই। বৈষ্ণব সহজমত শ্রীমন্মহাপ্রভুর পূর্ব্বেও বঙ্গ দেশে প্রচলিত ছিল। কিন্তু সহজধর্ম্মের পূর্ণ বিকাশ মহাপ্রভুর পরেই হইয়াছে। অনেকে মনে করেন প্রকৃত সহজমতের আদিগুরু স্বরূপদামোদর। তাঁহা হইতে রূপ গোস্বামী সহজ সাধনার রহস্য কিছু কিছু শিখিয়াছিলেন। রূপ গোস্বামীর শিষ্য রঘুনাথদাস গোস্বামী এবং রঘুনাথের শিষ্য কৃষ্ণদাস কবিরাজ যিনি সিদ্ধ মুকুন্দদেবের গুরু ছিলেন। এই সিদ্ধ মুকুন্দদেবকেই এক হিসাবে প্রচলিত সহজ সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক বলা যাইতে পারে। কথিত আছে যে ইহাঁরা চারিজন শিষ্য সহজিয়া ধর্ম্মের চারিটি শাখার প্রবর্ত্তক। এই চারিজনের নাম—(১) নৃসিংহানন্দ (২) রাধারমণ (৩) গোকুলবাউল এবং (৪) মথুরানাথ। সিদ্ধ মুকুন্দদেব রাজপুত্র ছিলেন এরূপ প্রসিদ্ধি আছে। বৈরাগ্য বলে তিনি কৃষ্ণদাসের আশ্রয় লইয়াছিলেন। কবিরাজ গোস্বামী তাঁহার চৈতন্য চরিতামৃতগ্রন্থ ইহাঁকে দিয়াই লিখাইয়া লইয়াছিলেন। তিনি মুখে বলিয়া যাইতেন ও ইনি লিখিতেন এরূপ কিংবদন্তী আছে। সিদ্ধ মুকুন্দদেবের শিষ্য ছিলেন মুকুন্দরাম দাস যিনি ভৃঙ্গ রত্নাবলী আছ্য সরস্বতী কারিকা প্রভৃতি গ্রন্থ

লিখিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করেন। মুকুন্দদেবের অন্যশিষ্য সুন্দরানন্দও সম্প্রদায়ের ইতিহাসে প্রসিদ্ধ স্থান অধিকার করিয়াছিলেন ইহাঁদের বহুগ্রন্থ আছে যাহার সন্ধান শিক্ষিত সমাজ এখনও সম্পূর্ণভাবে পান নাই।

ইহাঁদের মতে পরমার্থ তত্ত্বের নাম সহজ অথবা সহজ মানুষ। স্বতসিদ্ধ মানুষ অথবা নিত্যের মানুষ বলিয়াও এই পরম বস্তুটিকে নির্দেশ করা হয়। বলা বাহুল্য—এই পরম বস্তুটি জ্যোতিঃ মাত্র নহে। ইহা অপ্রাকৃত নরাকার। এই অদ্বৈত পরম তত্ত্বটি নিত্যযুগল স্বরূপে বিরাজ করিতেছেন অর্থাৎ ইনি (নিত্য) কৃষ্ণ ও রাধা এই দুইটি যুগলভাব গ্রহণ করিয়া অবস্থিত আছেন। বাহ্যদৃষ্টিতে মনে হয় কৃষ্ণ পুরুষ এবং রাধা প্রকৃতি, কিন্তু ভিতরে লক্ষ্য করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যদিও লীলারস আস্বাদন করিবার জন্য বাহ্যতঃ দুইটি দেহ গ্রহণ করা হইয়াছে বটে তথাপি বাস্তবিক পক্ষে দুইটিই নিত্যমিলিত, এমনকি একই আত্মার স্বরূপ। অর্থাৎ দুই তনু এবং এক আত্মা। কৃষ্ণ ও রাধিকা নিত্য কিশোর ও কিশোরী রূপে নিত্যধামে রত্ন-সিংহাসনে বিরাজমান। এই নিত্যধাম নিত্য বৃন্দাবন, গুপ্ত চন্দ্রপুর সহজপুর সদানন্দগ্রাম প্রভৃতি আখ্যায় সহজিয়া সাহিত্যে বর্ণিত হইয়া থাকে। শ্রীকৃষ্ণ কামস্বরূপ, তিনি কন্দর্প এবং রাধা মদন স্বরূপ। উভয়ের মধ্যে অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ। কারণ একটি না থাকিলে অপরটি থাকিতে পারে না। এই নিত্য বৃন্দাবন বিরজা নদীর পারে অবস্থিত। বিরজা সূর্যের মানসী কন্যা যমুনারই নামান্তর।

সহজিয়াগণ বৈধী ভক্তির সাধনা করেন না, তাঁহারা রাগানুগা মার্গের সমর্থন করিয়া থাকেন। তাঁহাদের সিদ্ধান্ত এই রাগময়ী ভক্তি ব্যতিরেকে অর্থাৎ যে ভক্তিতে গাঢ় তৃষ্ণা এবং আবেশভাব রহিয়াছে তাদৃশ ভক্তিমার্গে ভজন করিতে না পারিলে ব্রজভাবের উদয় হয় না এবং রাধাকৃষ্ণ যুগল স্বরূপ বা পরম বস্তুর লাভও হয় না।

পূর্বেই বলা হইয়াছে পরমবস্তুটি জ্যোতি নহে, দেবতা নহে, ঈশ্বর নহে—কিন্তু মানুষ। এই সম্বন্ধে তাঁহারা বলেন ব্রহ্মতত্ত্ব বা ঈশ্বরতত্ত্ব

দুর্গম হইলেও ধারণা করা যাইতে পারে, কিন্তু মানুষের তত্ত্ব বোঝা অতি কঠিন। এইজন্যই তাঁহারা বলিয়াছেন "মানুষের তত্ত্ব অতি অদ্ভুত, কেবা কহে কেবা জানে।" একপক্ষে দেখিতে গোল যোনিসম্ভব অযোনি-সম্ভব এবং স্বতঃসিদ্ধ এই তিনপ্রকার মানুষের সন্ধান পাওয়া যায়। ইহার মধ্যে স্বতঃসিদ্ধ মানুষ নিত্য বৃন্দাবনে বিরাজ করেন। অযোনি-সম্ভব মানুষ গোলোকে বাস করেন এবং যোনি সম্ভব মানুষ সর্বত্র বর্ত্তমান। এই বর্ত্তমান মানুষই 'সহজ মানুষ'—যাহাতে গূঢ়রূপের অর্থাৎ অবর্ত্তমান রূপের স্থিতি আছে। বর্ত্তমান মানুষই ভাবনার বিষয়ীভূত।

"যেরূপ নেত্রে দেখে সেইরূপ হৃদয়ে থাকে,
বর্ত্তমান হৃদয়ে রয় দুই যে বোঝ কিবা হয়॥"

চণ্ডীদাস তাঁহার পদাবলীতে মানুষকে অন্যপ্রকার তিনভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। তাঁহার মতে সহজ মানুষ অযোনিজ মানুষ এবং সামান্য মানুষ—ইহাই মানুষের বিভাগ। সহজ-মানুষ গোলোকের উর্দ্ধদেশে দিব্য বৃন্দাবনে অবস্থিত। অযোনিমানুষ গোলোকে অবস্থিত। ইহা সর্বদা নিত্যস্থানে বিরাজ করেন। ইহারই প্রকাশ বৈকুণ্ঠের অধিষ্ঠাতা লীলাময় নারায়ণ। সামান্য মানুষ সংস্কার মাত্র। ইহার ধাম ক্ষীরোদ সাগরে। ইনি ব্রহ্মাণ্ড মধ্যে জীবনে এবং মরণে যাতায়াত করিতেছেন। বাস্তবিক পক্ষে সহজমানুষ কোথাও নাই। সে অযোনিজও নয় এবং সামান্যও নয়। বলা হইয়াছে যে তাঁহার স্থান দিব্য বৃন্দাবন। কিন্তু দিব্য বৃন্দাবন কোথায়? ইহা সৃষ্টির অন্তর্গত নহে। ইহার সৃষ্টি হয় রাগে অথবা রাগানুগা ভজনে। শব না হইতে পারিলে অর্থাৎ 'মরাতনু না হইতে পারিলে প্রেমের বাতাস লাগে না এবং সহজ মানুষেরও আবির্ভাব হয় না। সহজ মানুষকে গঠন করিয়া নিতে হয়। ইহা বিধাতার সৃষ্টিতে পাওয়া যায় না।

সহজিয়াগণ বলেন মানুষ মাত্রের প্রধান আলোচ্য বস্তু তাহার স্বীয় দেহ। দেহের তত্ত্ব না বুঝিতে পারিলে কিছুতেই কিছু হইবার নহে। ইহাঁদের মতে দেহের মধ্যে চারিটি প্রধান সরোবর আছে। তাহাদের নাম কামসরোবর মানসরোবর প্রেমসরোবর ও অক্ষয়

সরোবর। ইহাদের মধ্যে প্রথম দুইটি সরোবর শরীরের বামার্দ্ধে—প্রকৃতি অঙ্গে বিদ্যমান। এবং তৃতীয় ও চতুর্থ সরোবর শরীরের দক্ষিণার্দ্ধে পুরুষ-অঙ্গে বিদ্যমান। অক্ষয় সরোবরটি সহস্রদলের নামান্তর অর্থাৎ সহস্রদল কমল যে সরোবরে অবস্থিত তাহারই নাম অক্ষয় সরোবর। নিত্যের মানুষ বা পরমাত্মা অক্ষয় সরোবরে বাস করেন। এই সরোবর হইতে বাণ আসিয়া বিরজা নদীতে পতিত হয়, এবং বিরজা হইতে ঐ তরঙ্গ রেবাতে পতিত হয়। নিত্যধামে মানুষ আছে যাহাকে নিত্যের মানুষ বলে। সেখানে জরামৃত্যু অথবা কালের কোনপ্রকার বিক্রম নাই। ঐ স্থান বহুদূরে অবস্থিত। চতুর্দ্দশ ভুবনের পরে স্থিত।

গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের ন্যায় সহজিয়াগণও বলেন ব্রহ্ম ভগবানের অঙ্গকান্তি। তাঁহাদের মতে ব্রহ্ম জ্যোতির্ময় বা জ্যোতিঃ স্বরূপ। ইনিই আত্মা, ইঁহারই নামান্তর নিরঞ্জন। ইঁহা সূক্ষ্ম সত্তা। যোগী ও সিদ্ধগণ এই জ্যোতিঃরূপ ব্রহ্মেই চিত্ত প্রণিধান করিয়া থাকেন। কিন্তু ইহা পূর্ণ ব্রহ্ম নহে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণই পূর্ণব্রহ্ম। তিনিই সনাতন এবং স্থূলরূপ। তিনি সকলের অগোচর স্বতন্ত্র নিত্যানন্দ বিগ্রহ এবং নিত্যবৃন্দাবন অথবা ব্রজপুরে নিত্যবিহারশীল। তিনি কিশোর বয়স্ক। চরাচরের সৃষ্টি জ্যোতির্ব্রহ্ম হইতে হইয়া থাকে—পূর্ণ ব্রহ্ম হইতে নহে। জ্যোতির্ব্রহ্ম পূর্ণব্রহ্মেরই অঙ্গছটা একথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে।

সহজিয়াগণ বলেন বৈষ্ণবসাধনা দুই প্রকার। তন্মধ্যে একটি সাধনা বৈদিক সম্প্রদায়ের অনুগত, ইহাই সাম্প্রদায়িক সাধনা। দ্বিতীয় সাধন প্রণালী তান্ত্রিক সাধনার অন্তর্গত। এই সকল বৈষ্ণবকে সাম্প্রদায়িক বৈষ্ণব হইতে পৃথক করিয়া সামান্য নামে অভিহিত করা হয়। রসতত্ত্বের সাধনা বেদে স্পষ্টভাবে নির্দিষ্ট নাই, কিন্তু তন্ত্রে আছে। এই রসসাধনারই নামান্তর সহজ সাধনা। ইহা অত্যন্ত গুহ্য বিষয়। ইহা সাধারণ লোকের পক্ষে উপযোগী নহে। কারণ সহজিয়াগণের সমর্থিত রসসাধনায় ইন্দ্রিয় জয় পূর্ণভাবে সিদ্ধ না হওয়া পর্য্যন্ত অধিকার লাভ করা যায় না। এই সাধনা রামানুজ নিম্বার্ক

প্রভৃতি সাম্প্রদায়িক বৈষ্ণবদের মধ্যে প্রচলিত নাই, থাকিলেও গুপ্তভাবে আছে।

রসসাধনা বা সহজসাধনায় প্রবৃত্ত হইতে হইলে প্রকৃতির সাহায্য আবশ্যক। যে কোনো প্রকার প্রকৃতিতে রসসাধনা হয় না। অসামান্য সামর্থ্য প্রকৃতি আবশ্যক হয়। যাঁহারা জিতেন্দ্রিয় নহেন এবং রসসাধনার উপযোগী আধার লাভ করিতে সমর্থ হন নাই এবং যাঁহারা শাস্ত্রোক্ত লক্ষণাক্রান্ত প্রকৃতির সাহায্য পান নাই তাঁহাদের পক্ষে রসসাধনায় প্রবৃত্ত হওয়া সর্বথা অনুচিত। উজ্জ্বল নীলমণির প্রদর্শিত শ্রেণীবিভাগ স্বীকার করিয়া ইহারাও বলেন নায়িকারতি সমর্থা সমঞ্জসা ও সাধারণী ভেদে তিন প্রকার। কুব্জাদি সাধারণীরতিতে শ্রীকৃষ্ণদর্শন জন্য নিজসুখাসক্তিই প্রধান। রুক্মিণী প্রভৃতি সমঞ্জসাতে ধর্মের প্রাধান্য থাকিলেও নিজসুখ রহিয়াছে। কিন্তু রাধা প্রভৃতি গোপীগণের সমর্থারতিতে কেবল শ্রীকৃষ্ণ সুখেই তাৎপর্য্য, নিজসুখ লক্ষ্য নহে। সমর্থারতিতেই ব্রজে স্থিতি হয়, নিত্য বৃন্দাবনে বাস হয়। রসসাধনার পক্ষে ইহাই সর্বথা অনুকুল। সাধারণ তান্ত্রিক সাধনাতে যেমন পশুভাব দূর করিতে না পারিলে বীরভাবের উদয় হয় না, রস সাধনাতেও ঠিক সেই প্রকার ব্রহ্মচর্য্যে প্রতিষ্ঠালাভ না হইলে ভাবরাজ্যে সঞ্চরণের অধিকার হয় না। সাম্প্রদায়িক বৈষ্ণবগণ রসসাধনার চর্চ্চা না করিয়া ভালই করিয়াছেন। কারণ এই সাধনা ব্যাপকভাবে প্রচারিত হইবার বিষয় নহে। ইহার সাধক ও উপদেষ্টা বড়ই দুর্লভ।

রস সাধনায় পাঁচটি আশ্রয় ও তিনটি অবস্থা। প্রথম অবস্থা প্রবর্ত্ত। ইহা দাসের অবস্থা। এই অবস্থায় নাম এবং মন্ত্র এই দুইটি অশ্রয়। দ্বিতীয় অবস্থা—সাধক বা মঞ্জরীর অবস্থা। এই অবস্থায় আশ্রয়-ভাব। তৃতীয় অবস্থা সিদ্ধ বা সখীর অবস্থা। ইহাতে দুইটি আশ্রয়—একটি প্রেম, অপরটি রস। ইন্দ্রিয় সংযম শৌচ তীর্থে বাস প্রভৃতি প্রবর্ত্ত অবস্থার লক্ষণ। শ্রীগুরু চরণ আশ্রয় করিয়া এই অবস্থায় মন্ত্র প্রাপ্তির জন্য ব্যাকুলভাবে প্রতীক্ষা করিতে হয়। মন্ত্র প্রাপ্তির পূর্ব পর্য্যন্ত নাম অবলম্বন করিয়া নাম ও নামীকে অভিন্ন

জ্ঞানে অপরাধশূন্য হইয়া নাম গ্রহণ করিতে হয়। ইহার পর কলুষনাশ, দেহশুদ্ধি ও সাত্ত্বিক বিকারের উদয় হয়। গুরু বা ঈশ্বর প্রসন্ন হইলে মন্ত্রপ্রাপ্তি ঘটে। নামে রুচি না হইলে মন্ত্র লাভ হয় না। মন্ত্রসিদ্ধ না হওয়া পর্য্যন্ত প্রবর্ত্ত অবস্থাই চলিতে থাকে। ইহাই দাসভাব। মন্ত্রসিদ্ধির পর সাধকভাব আরম্ভ হয়। সাধকের পক্ষে ভাবই আশ্রয়। এই আশ্রয় গ্রহণ করিবার পূর্বে বৈরাগ্য অবলম্বন পূর্বক কামজয় করা আবশ্যক। যতদিন বৈরাগ্য চলিতে থাকে ততদিন প্রকৃতি দর্শন বা প্রকৃতির সঙ্গ সর্বতোভাবে নিষিদ্ধ। সাধক অবস্থায় প্রকৃতি বা নারী আবশ্যক হয়। কারণ প্রকৃতি ব্যতিরকে পুরুষ একেলা সাধন করিতে পারে না। কিন্তু তাহার পূর্বে কাম বশীভূত হওয়া একান্তই আবশ্যক প্রবর্ত্ত না হইয়া সাধক হইতে চেষ্টা করিলে সিদ্ধিলাভ অসম্ভব এবং পতন অবশ্যম্ভাবী। রতিকে স্থির করা, অবিচলিত ও অকম্প রাখা, ইহাই সাধনার উদ্দেশ্য। ইহা প্রকৃতির সহকারিতায় কুলাচারের দ্বারা সম্পন্ন হয়। কিন্তু যতদিন কামদমন না হয় ততদিন প্রকৃতির সঙ্গ ত দূরের কথা, প্রকৃত দর্শন ও প্রকৃতি চিন্তাও অবশ্যম্ভাবী নরকের দ্বার। মন্ত্রসিদ্ধি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মায়া ও ভ্রম নিবৃত্তি হয়, তারপর সাধনা দ্বারা রতি স্থায়ী হয়। ইহার পর সিদ্ধদেহ লাভ হইয়া থাকে। রতি বিন্দুরই নামান্তর। সুতরাং বুঝিতে হইবে বিন্দু অটল রাখিতে না পারিলে সহজ সাধনায় সিদ্ধিলাভ সুদূর পরাহত।

রস সাধনার মুখ্য উদ্দেশ্য রসিক হওয়া। এই রসিকত্ব যে কত উচ্চ অবস্থা তাহা সাধারণ লোক ধারণা করিতে সমর্থ হয় না। এই অবস্থা জীবভাব ঈশ্বরভাব উভয়ের অতীত। বিন্দুতে স্পন্দন থাকিলে অর্থাৎ রতি টলিলেই তাহা জীবভাব বলিয়া বুঝিতে হইবে। বিন্দু নিস্পন্দ হইলে অর্থাৎ রতি না টলিলে তাহাকে ঈশ্বরভাব বুঝিতে হইবে। শুকদের সনকাদি মুনিগণ জন্মাবধি প্রকৃতিসঙ্গ বিমুখ হইয়া কৌমার বৈরাগ্যের অবস্থা গ্রহণ করিয়া. অটলেরই সাধনা করিয়া গিয়াছেন। ইহার উপর রসিকের অবস্থা। প্রবর্ত্ত যেমন শ্রীগুরু চরণ আশ্রয় করে, সাধক তেমনি সখীর চরণ আশ্রয় করিয়া থাকে। প্রবর্ত্তের রাগ

যেমন শ্রদ্ধা সেই প্রকার সাধকের রাগ লীলারাগ, শ্রদ্ধামাত্র নহে।

বিন্দু সিদ্ধ হইলে সাধক দেহ সিদ্ধ দেহে পরিণত হয়, এই সিদ্ধদেহে প্রেম ও রস উভয়ের অভিব্যক্তি হয়। সিদ্ধদেহ ভিন্ন রসিক অবস্থার উদয় হয় না। প্রকৃতির সঙ্গ সত্ত্বেও বিন্দু অটল থাকা এবং রতি অখণ্ডিত থাকা, ইহাই রসিক অবস্থার লক্ষণ। রসিক ভিন্ন রসের আস্বাদন কেহই করিতে পারে না। রূপ লাবণ্য দর্শন করিয়া উহা আস্বাদন করিবার আকাঙ্ক্ষা জীবের অবশ্যই হয়। কিন্তু আস্বাদনের সামর্থ জীবের নাই। আস্বাদন করিতে গিয়া জীবের জীবন চলিয়া যায়, যৌবন খসিয়া পরে, কিন্তু আস্বাদনের তৃপ্তি পলকের জন্যও তাহার ঘটে না। ইহার একমাত্র কারণ জীব সচল বিন্দুকে অচল করিয়া প্রকৃতির সঙ্গেও সেই অচলতা সংরক্ষণ করিতে পারে না। গাভীর দুগ্ধ যথাবিধি দোহন করিয়া যদি আবার ঐ গাভীকেই খাওয়াইয়া দেওয়া যায়—উহা তাহার পুষ্টিসাধন করে। ঐ দুগ্ধ আর স্তনে আসে না। ঠিক সেই প্রকার চতুর্দ্দল হইতে বিন্দু ক্ষরণ হইলে উহা কোনোক্রমেই সহস্রারে যাইতে পারে না। সিদ্ধের আশ্রয় প্রেম ও রস অর্থাৎ শ্রীরাধার চরণযুগল। সহজিয়া মতে সিদ্ধের রাগ অনুরাগ, এবং নিবৃত্ত হইলে উহা প্রেমরাগ।

পদ্মিনী চিত্রিণী শঙ্খিনী ও হস্তিনী এই চারি প্রকারের নায়িকার মধ্যে রস সাধনার পক্ষে পদ্মিনী নায়িকা শ্রেষ্ঠ। পদ্মিনীর দৃষ্টান্ত শ্রীরাধা। চিত্রিণীর রুক্মিণী, শঙ্খিনীর চন্দ্রাবলী এবং হস্তিনীর কুব্জা। নায়িকার অনুরূপ নায়কগণেরও ভেদ আছে। কিন্তু তাহার উল্লেখ এখানে আবশ্যক মনে হইতেছে না। শুধু ইহাই বলিলে যথেষ্ট হইবে যে নায়ক ও নায়িকা নিজগণ হওয়া আবশ্যক। কারণ নিজগণে মিলন না হইলে প্রেম জাগে না। ভিন্নগণে ব্যভিচার হয় এবং নানাপ্রকার দুঃখের উদয় হয়। ঠিক ঠিক গুণ সম্পন্ন নায়িকা দুর্লভ বলিয়াই রাগ-মার্গের সাধনা সাধারণের জন্য বিহিত হয় নাই। সিদ্ধিলাভ বিধি-মার্গেই হইয়া থাকে, যাহা তন্ত্রমতে পশুভাবের অন্তর্গত। বর্তমান যুগে বীরভাব ও দেবভাব অতি দুর্লভ।

রাগ সাধনায় নায়িকার বিচার অপরিহার্য্য। সাধারণী নায়িকার সহিত সাধনা চলে না। কারণ সাধারণী ব্যভিচারিণী। তাহার পক্ষে কাণ্ডারী হইয়া উদ্ধার করা সম্ভবপর নহে। তাহার সংস্পর্শ পর্য্যন্ত রতির নাশক। কারণ উহা বিকার জন্মাইয়া থাকে। সমঞ্জসাতে ভাবের বিকাশ হয় না। এইজন্য একমাত্র সমর্থা রতিই রাগ সাধনার উপজীব্য। রতি অথবা বিন্দু যতক্ষণ সিদ্ধ না হইতেছে ততক্ষণ এই-প্রকার নিয়ম। সিদ্ধ হইয়া গেলে সমর্থা সমঞ্জসা ও সাধারণীতে কোন ভেদ থাকে না।

সহজিয়াগণ বলেন অগ্নির সহযোগ ভিন্ন যেমন দুগ্ধ আবর্ত্তিত হয় না ঠিক সেই প্রকার অগ্নিকুণ্ড স্বরূপ প্রকৃতির সংসর্গ ব্যতিরেকে বিন্দু আবর্ত্তিত হয় না। বিন্দুর আবর্ত্তন ব্যতিরেকে রসের অভিব্যক্তি আকাশকুসুম মাত্র। সহজিয়াগণ ভাণ্ড অথবা পিণ্ড এবং ব্রহ্মাণ্ড সম্বন্ধে অনেক আলোচনা করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে খণ্ডদেহ স্বরূপ ভাণ্ডকে জানিলে ব্রহ্মাণ্ডের তত্ত্ব জানিতে পারা যায়। ভাণ্ড অথবা দেহের মাহাত্ম্য কীর্ত্তনের ইহাই একমাত্র উদ্দেশ্য যে ভাণ্ডের স্বরূপ বিচার করিতে করিতে ভাণ্ডের জ্ঞান পূর্ণভাবে উদিত হইবে। তখন নিত্যবৃন্দাবনের তত্ত্ব জানিতে আর বেগ পাইতে হইবে না। কৃষ্ণের মহিমা এবং রাধাপ্রেমের পরম উৎকর্ষ ভাণ্ডজ্ঞান হইতে আপনি উপলব্ধ হয়।

একটি বিশেষ রহস্যের কথা এখানে বলা আবশ্যক মনে হইতেছে। সেই কথাটি এই—সাধক অবস্থায় নিজের প্রকৃতিভাব ক্রমশঃ অভিব্যক্ত হয়। প্রকৃতিভাবের অভিব্যক্তি হইলেই প্রেমলাভ সম্ভবপর হয়। সাধক অবস্থায় নিজেকে প্রকৃতি মনে করিতে হয়। কিন্তু সিদ্ধাবস্থায় প্রকৃতিভাবে নিজের রূপান্তর সম্পন্ন হইয়া যায়। নিজের মধ্যে প্রকৃতিভাবের উদয় না হইলে রাগরতি আবির্ভূত হইতে পারে না এবং প্রেমসাধনাও চলিতে পারে না। প্রবর্ত্ত অবস্থায় গুরু ও শাস্ত্রবাক্য অনুসরণ করিয়া কর্ম অনুষ্ঠানের বিধান ছিল। কিন্তু

সাধক অবস্থায় কোন প্রকার বিধানের আবশ্যকতা নাই। অমৃত রত্নাবলীতে আছে,—

"সাধি তত্ত্বদেহে হই সাধক প্রকৃতি।
স্বভাব প্রকৃতি হলে তবে রাগরতি॥
প্রকৃতি পুরুষ হয় দেহান্তর হলে।
রসাশ্রয় প্রেমাশ্রয় সাধন করিলে॥"

ইহা হইতে বুঝা যায় প্রথমে প্রকৃতিভাবে সাধন করিতে হয়, তাহার পর সিদ্ধাবস্থায় রসাশ্রয় ও প্রেমাশ্রয় সাধন করিলে পুরুষভাবের অভিব্যক্তি হয়।

পূর্বে চারিটি সরোবরের কথা বলা হইয়াছে। তন্মধ্যে অক্ষয় সরোবর মস্তকে অবস্থিত যাহার মধে সহস্রদল কমল শোভা পাইতেছে। উদর মধ্যে মানসরোবর। মানসরোবরের উপরেই ক্ষীরোদ সরোবর। মানসরোবর হইতে কমল উর্দ্ধমুখ হইয়া সহস্রদলের দিকে উত্থিত হয়। তাহার মধ্যে মূলবস্তু সর্বদা নিহিত থাকে। অক্ষয় সরোবরের রসাল সলিল ঐখান হইতে বহিয়া মানসরোবরে উপস্থিত হয়। পদ্মের মৃণাল আশ্রয় করিয়া উর্দ্ধ গতিতে সঞ্চার হইয়া থাকে। সত্তার সহিত পুনর্বার সেই জলে মিশিয়া যায়। কিন্তু ক্ষীরোদ সরোবরে যে পদ্ম ফোটে তাহা শতদল। তাহাতে মূলবস্তুর স্বরূপ লক্ষিত হয়। সকলের নীচে পৃথু সরোবর নামে একটি সরোবর আছে। ইহাতে অষ্টদল পদ্ম ফোটে। এই পদ্মই পরাৎপর বস্তু। উ.ত অধিকারী ভিন্ন কেহ ইহার সন্ধান পায় না। ইহার একমাত্র কারণ এই—সাধারণ অসাধারণ কোন ব্যক্তিই সহজতত্ত্ব ধরিতে পারে না।

সহজেতে জীব জন্মে সহজে বিনাশে,
সহজেতে খায় পিয়ে সহজেতে ভাসে।
সহজেতে খায় জীব দেখহ ভাবিয়া,
সহজ সন্ধান কেহ না পায় খুঁজিয়া॥

ভক্তির পরিণাম স্বরূপ ভগবানের নিত্যলীলায় প্রবেশের প্রসঙ্গে আনুষঙ্গিকভাবে ভক্ত ও ভগবৎস্বরূপ সম্বন্ধে বিভিন্ন বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের

মধ্যে কয়েকটির মত সংক্ষিপ্তভাবে বর্ণিত হইল। এই সকল মতের সমালোচনা অনাবশ্যক বলিয়া এখন আবার মুখ্য বিষয়ের অনুসরণ করিতে চেষ্টা করা হইতেছে। পূর্বে বহুস্থানে উল্লেখ করা হইয়াছে যে ভাব ভক্তি প্রেমরূপে পরিণত না হওয়া পর্য্যন্ত ভগবৎসাক্ষাৎকারের অধিকার জন্মে না। ইহা সত্য যে ভাব নিত্য এবং তাহার পরিপকাবস্থা স্বরূপ প্রেমও নিত্য। ভক্তি যতদিন পর্য্যন্ত সাধন-কোটিতে নিবিষ্ট থাকে ততদিন উহা অনিত্য বলিয়াই পরিগণিত হইয়া থাকে। ঐ সাধন বিধিমার্গের হউক অথবা রাগমার্গের হউক তাহাতে কিছু আসে যায় না। ঐ প্রকার সাধনভক্তি সম্পন্ন ভক্ত কখনই নিত্যধামে ভক্তরূপে প্রবেশাধিকার লাভ করিতে পারে না। নিত্য-ধামে সাধক ও সিদ্ধ উভয় প্রকার ভক্তের জন্যই স্থান নির্দিষ্ট আছে। কিন্তু ঐ সাধক ভক্ত পূর্ববর্ণিত সাধন ভক্তির অনুশীলনকারী সাধক ভক্ত হইতে ভিন্ন। কারণ কর্ত্তৃত্বাভিমান বিশিষ্ট জীবের সাধন এবং অভিমানশূন্য মুক্তপুরুষের সাধন একপ্রকার হইতেই পারে না। মুক্ত-পুরুষ ভিন্ন নিত্যধামে কেহই প্রবেশ করিতে পারে না—ইহা বলাই বাহুল্য। অভিমান বর্জ্জিত না হওয়া পর্য্যন্ত যে ভক্তি সাধনা করা হয় তাহা কৃত্রিম সাধনা—তাহা অনিত্য জগতেই সম্ভবপর। কারণ তাহার মূলে মিথ্যাজ্ঞানের খেলা রহিয়াছে। কিন্তু ভাব ভক্তির সাধনা অকৃত্রিম সাধনা—তাহাতে অভিমানের স্পর্শ থাকে না। তাহা যে অবস্থায় অনুষ্ঠিত হয় ঐ অবস্থায় জীব অভিমানহীন দ্রষ্টা পুরুষরূপে অবস্থিত থাকে এবং স্বভাবের খেলা রূপে ভাবভক্তির ক্রমবিকাশ চলিতে থাকে। এই অবস্থায় বাস্তবিক অভিমান না থাকিলেও ভক্তির আস্বাদনের জন্য একটি আরোপিত অভিমান থাকিতেও পারে। তাহাতে ভাবের অকৃত্রিমতার হানি হয় না। এই প্রকার ভাব ভক্তির সাধক নিত্যধামের বহিরঙ্গ প্রদেশে বিরাজ করেন। ইহাঁরা সকলেই সাধক—সকলেই নিজ নিজ ভাবানুসারে সাধন পথে অগ্রসর হইতেছেন। ইহাঁদের মধ্যে উৎকর্ষ অপকর্ষ আছে বলিয়া শ্রেণী বিভাগ রহিয়াছে। কিন্তু ভাবুক সাধক যতই উন্নত

হউন না কেন কেহই প্রেমিক পদ বাচ্য নহেন। কারণ প্রেম সিদ্ধা-বস্থার লক্ষণ। ভাবভক্তি ক্রমশঃ প্রেমভক্তিতে পরিণত হয়। তখন ঐ সকল ভক্ত বহিরঙ্গ প্রদেশ পরিত্যাগ করিয়া নিত্যধামের অন্তরঙ্গ প্রদেশে অর্থাৎ অন্তঃপুরে প্রবিষ্ট হইতে অধিকারী হন। যাঁহারা বহির্মণ্ডলে ভাবুক ভক্তরূপে স্থান লাভ করিয়াছেন তাঁহাদের দেহও নিত্যদেহ। প্রথম দেহ ভাবদেহ বা সাধকদেহরূপে এবং দ্বিতীয়দেহ প্রেমদেহ বা সিদ্ধদেহরূপে পরিগণিত হয়।

ভগবদ্ধাম অনন্ত প্রকার। আমরা দৃষ্টান্তরূপে আমাদের পরিচিত স্বরূপটিমাত্র গ্রহণ করিয়াছি। অর্থাৎ বৈকুণ্ঠ যেমন এক হইয়াও অনন্ত প্রকার তেমনি গোলোকধামও এক হইয়াও অনন্ত প্রকার। ভগবদ্-ধামের বহির্মণ্ডল ও অন্তর্মণ্ডলে প্রধান পার্থক্য এই, যে সকল ভক্ত বহির্মণ্ডলে অবস্থিত তাহারা কখনই ভগবৎ সাক্ষাৎকার লাভ করিতে পারে না। কারণ অন্তর্মণ্ডলে প্রবেশ ব্যতিরেকে ভগবৎ সাক্ষাৎকার হয় না। তবে অধিকার অনুসারে কেহ কেহ ভাগ্য বশে দর্শনের আভাস প্রাপ্ত হইয়া থাকেন—ইহা সত্য। কারণ এই আভাস প্রাপ্ত না হইলে ভাব হইতে প্রেমে উপনীত হওয়া সুকঠিন। কিন্তু দর্শন না পাইলেও তাঁহারা সকলেই তৎ তৎ ধামের অনুরূপ কোন না কোন ধ্বনি শুনিতে পান। এই ধ্বনি আশ্রয় করিয়াই দর্শন-আভাসের সাহায্যে তাঁহারা প্রেমলাভে সমর্থ হন এবং অন্তর্মণ্ডলে প্রবিষ্ট হইয়া প্রেমিকরূপে ভগবদ্ দর্শনের অধিকার লাভ করেন। এই শব্দ শব্দ-ব্রহ্মরূপী শব্দ তাহাতে সন্দেহ নাই। এই শব্দব্রহ্মকে আশ্রয় করিয়াই পরব্রহ্মরূপী ভগবানের সাক্ষাৎকার সম্পন্ন হয়। শ্রীবৃন্দাবনে এই শব্দ সুমধুর বংশীধ্বনিরূপে শ্রুত হইয়া থাকে। অন্যান্য ভগবদ্ধামে ধামানুরূপ পৃথক পৃথক শব্দ আছে বুঝিতে হইবে।

সুতরাং শ্রীবৃন্দাবনে ভাব ও ভক্তির অধিকারী যে সকল বহিরঙ্গ ভক্ত বাস করেন তাঁহারা সকলেই বংশীধ্বনি শুনিতে পান।

সাধন ভক্তি হইতে ভাবভক্তি নিষ্পন্ন হয় একথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। কিন্তু ইহা ভক্তির উৎপত্তি নহে, অভিব্যক্তি মাত্র। কারণ

ভাবভক্তি নিত্যবস্তু বলিয়া উৎপন্ন হইতে পারে না। সাধনার দ্বারা নিত্যসিদ্ধ ভক্তির আবরণ অপসারিত হইলে ভগবৎ কৃপায় ভাবের উদয় হয়। বস্তুতঃ সাধনার এমন কোন সামর্থ্য আছে কিনা যাহার প্রভাবে ভাবের আবরণ অপসারিত হইতে পারে তাহা সন্দেহের বিষয়। কেহ কেহ তাহা স্বীকার করিলেও সকলে তাহা যুক্তিযুক্ত মনে করেন না। তবে ইহা সত্য যে সাধন করিতে করিতে অহংকার গ্রন্থি শিথিল হইয়া যায়, নিজের দুর্বলতা এবং অসামর্থ্য ক্রমশঃ অনুভূত হয়। তখন দৈন্যের উদয় হইলেই ভগবৎকৃপা ক্রিয়াশীল হইয়া ভাবের আবরণ অপসারণ কবিয়া ভাবকে বিকশিত করিয়া তুলে। কিন্তু কোনো কোনো স্থলে সাধনার অপেক্ষা না করিয়াও সাক্ষাদ্-ভাবেই ভগবৎকৃপা ভাবের বিকাশ করিয়া থাকে। এইসব স্থলে বর্ত্তমান সাধনা না থাকিলেও পূর্বজন্মার্জ্জিত সাধনসম্পত্তি কোনো কোনো ক্ষেত্রে থাকিতে পারে। কিন্তু কোনো কোনো স্থলে পূর্বকালীন সাধনার অভাব সত্ত্বেও স্বাতন্ত্র্যময়ী সর্ব সমর্থ্য ভগবৎকৃপা নিরপেক্ষভাবে কার্য্য করিয়া থাকে। ইহা অহেতুক কৃপার নিদর্শন। ঠিক এইপ্রকার ভাবভক্তি হইতে প্রেমভক্তির বিকাশ বঝিতে হইবে। ভাবের বিকাশই প্রেমের উদয় হয়, ইহা যেমন সত্য, তেমনি অহেতুক ভগবৎ কৃপাবশেও কোনো কোনো স্থলে প্রেমের উদয় হইতে পারে —ইহাও সত্য। যে কোন প্রকারেই হউক লীলাময় ভগবানের দর্শন প্রাপ্ত হইতে হইলে আধারে প্রেমভক্তির বিকাশ আবশ্যক। ইহা স্বীয় ভাবের অভিব্যক্তি প্রভাবেই হউক অথবা নিরপেক্ষ ভগবৎ করুণার অবতরণ বশতঃই হউক—একই কথা।

(সাধনসিদ্ধের দৃষ্টান্ত মার্কণ্ডেয় মুনি; কৃপাসিদ্ধভক্তের দৃষ্টান্ত যজ্ঞপত্নী প্রহ্লাদ, শুকদেব প্রভৃতি)

তেমনভাবে আস্বাদনের বিষয়ভূত হইলে ভক্তিও রসাবস্থা পর্য্যন্ত উন্নীত হয়। শৈব আলঙ্কারিকগণ ভক্তিকে ভাবরূপেই গ্রহণ করিয়া-ছেন। ইহা যে রসাবস্থা পর্য্যন্ত অভিব্যক্ত হইতে পারে তাহা তাঁহারা স্বীকার করেন নাই। তবে বৈষ্ণব আলঙ্কারিকগণ, বিশেষতঃ

যাঁহারা গৌড়ীয় সিদ্ধান্তের অনুবর্তী তাঁহারা ভক্তিকে রসমধ্যে গণনা করিয়া থাকেন। রূপগোস্বামী জীবগোস্বামী প্রভৃতি গোস্বামী পাদগণ এবং কবি কর্ণপুর বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভৃতি বিদ্বদ্‌গণ ভক্তিকে রস বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত নিরপেক্ষ আলোচকগণের মধ্যে ভক্তিরসায়নকার মধুসূদন সরস্বতীও ভক্তির রসাত্মকতা অকুণ্ঠ চিত্তে স্বীকার করিয়াছেন।

স্থায়ীভাব বিভাব প্রভৃতি কারণ সামগ্রীদ্বারা অভিব্যক্ত হইলে এবং সহৃদয়গণের আস্বাদনযোগ্য হইলে ভক্তি রসরূপে পরিণত হয়। স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণবিষয়িনী রতিই ভক্তিরসের স্থায়ীভাব। ভক্তিরস মুখ্য ও গৌণভেদে দ্বাদশ প্রকার বলিয়া বর্ণিত হয়। তন্মধ্যে মুখ্য ভক্তিরস পাঁচ প্রকার এবং গৌণ ভক্তিরস সাত প্রকার। বিশেষ বিবরণ অনাবশ্যক বিভাব, অনুভাব ও ব্যভিচারীভাব ইহারাই ভাবকে রসে পরণিত করে। বিভাব আলম্বন এবং উদ্দীপন ভেদে দুই প্রকার। আলম্বনও আশ্রয় ও বিষয়ভেদে দুই প্রকার। ভগবদ্ রতির যাহা আশ্রয় তাহার নাম ভক্ত এবং যাহা বিষয় তাহা ভগবৎ স্বরূপ। অর্থাৎ অন্যান্যবৃত্তির ন্যায় ভক্তির একটি Subject আছে তাহাই ভক্ত এবং একটি Object আছে তাহাই ভগবান্। ভগবৎতত্ত্ব এখানে শ্রীকৃষ্ণ হইতে অভিন্নরূপে গ্রহণ করা হইয়াছে বলিয়া শ্রীকৃষ্ণই ভগবদ্‌ভক্তির বিষয়। ভক্তির আশ্রয় ও বিষয় উভয়ই সাকার ইহা মনে রাখিতে হইবে। কিন্তু এই আকার প্রাকৃত নহে অপ্রাকৃত। শ্রীকৃষ্ণের যাহা নিত্য অর্থাৎ স্বয়ংসিদ্ধরূপ তাহাই তাঁহার স্বরূপ, তদ্ভিন্ন তাঁহার যাবতীয় রূপই অন্তরূপের অন্তর্গত। এই স্বরূপও সর্বদা প্রকট থাকে এমন নহে, কখনো কখনো ইহা আবৃতও থাকে। সুতরাং বুঝিতে হইবে প্রকট স্বরূপ, আবৃত স্বরূপ, এবং অন্তরূপ সবই ভগবদ্ ভক্তির বিষয়ভূত। ভক্তির আশ্রয় ভক্ত, সাধক এবং সিদ্ধ ভেদে দুই প্রকার। সাধক ভক্ত বস্তুতঃ ভাবভক্তিরই আশ্রয়—সাধনভক্তির নহে, কারণ সাধনভক্তি ভাবভক্তি রূপে পরিণত না হওয়া পর্য্যন্ত অপ্রাকৃত ভাব-দেহের অভিব্যক্তিই হয় না। সুতরাং প্রাকৃত দেহসম্পন্ন লৌকিক

সাধক ভক্তিরসের বীজরূপ কৃষ্ণরতির আশ্রয় হইতে পারে না। মনে রাখিতে হইবে রতিই ভাব—সাধন ক্রিয়ারূপ। অতএব ভক্তগণের মধ্যে যাহারা সাধক বলিয়া পরিচিত তাহারা বর্ত্তমান ক্ষেত্রে ভাব-ভক্তির আশ্রয় ইহাতে সন্দেহ নাই। এই সকল ভাবভক্ত ভগবৎ সাক্ষাৎকারের স্বরূপযোগ্যতা বিশিষ্ট। যাঁহারা প্রেমলাভ করিয়াছেন তাঁহারাই সিদ্ধভক্ত। যাঁহারা নিত্যসিদ্ধ তাঁহারা অনাদিকাল হইতেই এই সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন অর্থাৎ তাঁহাদের প্রেমসিদ্ধি কারণ জন্য নহে —স্বভাব প্রাপ্ত।

নিত্যসিদ্ধ ভক্তগণের মধ্যে পঞ্চান্ন (৫৫) টি গুণ সদা বর্ত্তমান থাকে। অবশ্য এইসকল গুণ ব্যতিরেকে অচিন্ত্য সামর্থ্য প্রভৃতি অন্যান্য বহুগুণও নিত্যভক্তের থাকে। অন্যান্য সিদ্ধভক্তের যে একেবারে না থাকে এমন নহে। এখানে তাহার আলোচনা অনাবশ্যক। যাঁহারা নিত্যভক্ত নহেন তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ সাক্ষাৎ ভগবৎ কৃপাতেই হউক অথবা ভগবদ্ ভক্তের কৃপাতেই হউক প্রেমভক্তি লাভ করিয়াছেন। ইঁহারা সকলেই ভগবদ্ রতির আশ্রয় স্বরূপ।

শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্ হইলেও তাঁহার প্রকাশের তারতম্য আছে। দ্বারকাধামে তাঁহার প্রকাশ পূর্ণ, মথুরাধামে পূর্ণতর, এবং ব্রজধামে পূর্ণতম। ইহাই বঙ্গীয় আচার্য্যগণের নিষ্কৃষ্ট সিদ্ধান্ত। শ্রীকৃষ্ণ লীলা-পুরুষোত্তম বলিয়া নায়ক পদবাচ্য হন, এবং ধীরোদাত্ত ধীরোদ্ধত ধীরললিত ও ধীর প্রশান্ত এই চারিপ্রকার নায়করূপেই তিনি ভক্তগণের সঙ্গে অভিনয় করিয়া থাকেন।

তাঁহাতে অনন্ত গুণের সমাবেশ থাকিলেও আচার্য্যগণ তাঁহাতে প্রধানতঃ চতুঃষষ্ঠি গুণের অবস্থান স্বীকার করিয়া থাকেন। এই চৌষট্টিটি গুণের মধ্যে পঞ্চাশটি গুণ আপেক্ষিক মাত্রায় নরমাত্রেই আছে। যে সকল মনুষ্য ভগবদ্ অনুগৃহীত তাহাদের মধ্যে বিন্দু বিন্দু-মাত্রায় এই সকল গুণ দেখিতে পাওয়া যায়। অন্যান্য মনুষ্য আভাস রূপে লক্ষিত হয়। এই পঞ্চাশটি গুণের এখানে নাম নির্দ্দেশের

প্রয়োজন নাই। তবে মনে রাখিতে হইবে এই পঞ্চাশটি গুণের মধ্যে কায়িক, বাচিক ও মানসিক প্রায় সব সদ্‌গুণই আছে। এই পঞ্চাশটি গুণের সহিত আরও পাঁচটি অতিরিক্ত গুণ শিব ও ব্রহ্মাতে দেখিতে পাওয়া যায়। এই পাঁচটি গুণের নাম—১। সর্বদা-স্বরূপস্থিতি ২। সর্বজ্ঞত্ব ৩। নিত্য নূতনত্ব ৪। সচ্চিদানন্দ বিগ্রহত্ব ৫। সর্বসিদ্ধিসম্পত্তি। এই পাঁচটি গুণ ভগবৎস্বরূপে পূর্ণমাত্রায় আছে এবং শিব ও ব্রহ্মায় আংশিকরূপে আছে। নিম্নস্তরের জীবে এই পাঁচটি গুণ থাকে না। এই পঞ্চান্নটি গুণ এবং আরও অতিরিক্ত পাঁচটি গুণ বৈকুণ্ঠনাথ নারায়ণে লক্ষিত হয়। এই অতিরিক্ত পাঁচটি গুণের নাম। ১। অচিন্ত্য মহাশক্তি, ২। কোটি ব্রহ্মাণ্ড বিগ্রহত্ব, ৩। হতারি গতি দায়কত্ব, ৪। অবতারাবলীর বীজভাব এবং ৫। আত্মারামগণাকর্ষণ। অর্থাৎ ভগবান নারায়ণে পূর্বোক্ত পঞ্চান্নটি গুণাপেক্ষা অধিক এই পাঁচটি বিশেষ গুণ পরিদৃষ্ট হয়। তন্মধ্যে অচিন্ত্যমহাশক্তি সম্পন্নতা একমাত্র নারায়ণেই আছে। অবশিষ্ট চারিটি গুণ নারায়ণে তো আছেই তা ছাড়া নারায়ণের বিলাস স্বরূপ মায়াধিষ্ঠাতা পরমাত্মাতেও আছে। অর্থাৎ যিনি মায়াকে ঈক্ষণ করেন সেই মহাপুরুষেও এই চারটি গুণ লক্ষিত হইয়া থাকে। অর্থাৎ ইহাঁরা সকলেই সমরূপে মুক্তপুরুষগণের আকর্ষক। সকলেই অবতার সমূহের বীজ স্বরূপ। সকলেই শত্রুকেও বধ করিয়া গতিদান করিয়া থাকেন এবং প্রত্যেকের বিগ্রহই কোটি ব্রহ্মাণ্ড সমন্বিত। বৃন্দাবন বিহারী শ্রীকৃষ্ণে এই ষাটটি গুণ ছাড়াও অসাধারণ চারিটি গুণ লক্ষিত হয়। শ্রীকৃষ্ণ মাধুর্য্যময় বলিয়া ১। বেণুনাদের মাধুর্য্য, ২। রূপের মাধুর্য্য, ৩। প্রেম দ্বারা প্রিয়গণের আধিক্য এবং ৪। অদ্ভুত লীলা—এই চারিটি গুণের তুলনা অন্যত্র নাই। তাঁহার বংশীধ্বনি এমনি মধুর যে ত্রিভুবনের যে কোন প্রাণীর কর্ণকুহরে ঐ ধ্বনি প্রবিষ্ট হইলে তাহার মন তৎক্ষণাৎ আকৃষ্ট হইয়া ভগবচ্চরণে ধাবমান হয়। শ্রীকৃষ্ণের সৌন্দর্য্য ও লাবণ্য অপরিসীম বলিলে অত্যুক্তি হয় না। তাঁহার সমান রূপ জগতে বা জগতের বাহিরে কোথাও নাই, অধিক

রূপ থাকা তো দূরের কথা। স্থাবর ও জঙ্গম—সমগ্র জগৎ তাঁহার রূপ দর্শন করিয়া স্তম্ভিত হইয়া যায়। ইহা ছাড়া প্রেম অথবা প্রীতি—শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় অন্যত্র এতটা পরিদৃষ্ট হয় না। তিনি যেমন ভক্তের প্রেম গ্রহণ করেন তেমনি ভক্তকে প্রেম দানও করেন। তাঁহার অহেতুক প্রেমে বশীভূত হইয়া অনন্ত ভক্ত অনাদিকাল হইতে তাঁহাকে ঘেরিয়া রহিয়াছে। এত প্রিয়জনের সম্মিলন ভগবানের অন্য কোন স্বরূপে দেখিতে পাওয়া যায় না। এই সকল আছে বলিয়াই তাঁহার লীলাও এত মধুর। শ্রীকৃষ্ণ লীলাই ভগবদ্ লীলার অনন্ত মাধুর্য্যময় প্রকাশ। এইভাবে বুঝিতে পারা যায় শ্রীকৃষ্ণ অনন্ত গুণের নিধি হইলেও মুখ্যভাবে চতুঃষষ্টীগুণের আধার। ভক্তগণ যখন তাঁহাকে ভজন করেন তখন এই চতুঃষষ্টী গুণ বিশিষ্ট রূপেই করিয়া থাকেন।

উপসংহার

শ্রীকৃষ্ণ প্রসঙ্গের বর্ত্তমান আলোচনা এইখানেই সমাপ্ত হইল, বস্তুতঃ এখানে স্বাভাবিক পরিণতিক্রমে সমাপ্তি না হইলেও এইখানেই তাহার উপসংহার করা হইতেছে। আলোচনার প্রারম্ভও যেমন আকস্মিক অবসানও প্রায় সেইরূপই। শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব যে ভাবেই আলোচিত হউক না কেন তাহার স্বাভাবিক পর্য্যবসান হইল রাসলীলার গূঢ় মাধুর্য্যের আস্বাদনে। ইচ্ছা ছিল একবার যোগমায়ার অন্তরালস্থ চরম ও পরম ভাগবতী লীলার আভাসটা ধারণার জন্য চেষ্টা করিব, কিন্তু আপাততঃ তাহা হইল না। তবে ইহা বিশ্বাস করি যিনি এই আলোচনা ধারাবাহিক ভাবে মনন করিতে চেষ্টা করিবেন ভগবদনুগ্রহে তিনি মহারাসের ক্ষীণ আভাস দূর হইতেই অবশ্য লাভ করিতে সমর্থ হইবেন।